বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৩৮/১৩

পূর্ণিমা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৮৮/১০

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দশম বর্ষ।

বাঁশবেড়িয়া,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৯।

পূর্ণিমা

পূর্ণিমা

দশম বর্ষের

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভিষেক কথা	৬০
ণোদয়ে ধবলাশৃঙ্গ	১৬৬
ত্মোৎসর্গ	১৭৫
ড়য়া কাহিনী	১৮২
।	১১৯ । ১৬৭
ব বৃন্দাবন সেন	২৫১
হারি পণ্ডিত	৯২
ই পুরুত	৫২ । ৮৩ । ১৫৫ । ২২৮ । ২৮৯
।	২৮৮
ীন্দ্রমোহিনী ও মানকুমারী	১৬৫
সমালোচনা	১১৩
নাথদেবের পুরীদর্শন	৩৮৪
ন সন্ধ্যা	৩৩
ফ কৃত গঙ্গাষ্টক	৫০
ন্দ্রবালা	১৬৪
বর্ষাগমে	১
স্বরে কালমেঘ	২০০
ত বৈষ্ণব	২৪৭
তি	৩০৩
ান সাধন সঙ্গীত	১৪৪
য়নে	১৪২
যাত্রা	২৩ । ৬২ । ১০৭ । ১৮৬
ক সাহিত্য সমালোচনা	৩৪ । ৭২ । ১৭০ । ২৩১
র পর	২৭ । ৪১ । ১০২ । ১২৮ । ২৩৩ । ৩০৫
রাজেশ্বরী	২২
দীয়া	১৭৬
রাম কৃষ্ণ কথামৃত	২৪২
র	৮১
লয় দর্শন	৬
ী কাহিনী	৬৬ । ২৬৬ । ৩২২

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

কয়েক জন সহযোগীর অভিমত।

"পূর্ণিমার লেখা আজ কাল উৎকৃষ্ট হইতেছে। প্রতি বারেই শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ দেখিতেছি।" এডুকেশন গেজে ১২ই ভাদ্র, ১৩০৪।

"পত্রিকা খানি অনেক গুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সুলিপি-সাহ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচ সাহিত্য সেবীগণের সুখপাঠ্য। বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার সম্পাদকতায় সংসৃষ্ট আছেন। হি পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩০৬।

"শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর" আর্য্য সমাজে নারীজাতির অব ও শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহের "যজ্ঞ" উল্লেখযোগ্য সুপ্রবন্ধ। মাসিক সা সমালোচনায়" হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামি থাক, মুন্সিয়ানাও যথেষ্ট আ পাকা হাতের ওস্তাদী, সেবিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা না সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩০৬।

"এই সংখ্যার লেখকগণের মধ্যে বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম, বি, এল মহাশয় একজন প্রাচীন ও সুলে লেখক। বিষ্ণুবাবুর "মৃত্যুর "আকাশ কুসুম" প্রবন্ধদ্বয় পূর্ণিমালোক বেশ কুটন্ত রাখিয়াছে চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩০৬।

"মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়" নিপুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩০৬।

"চুট্‌কী" পাঁচ ফুলের সাজি – লেখকের মুন্সিয়ানা প্রশংসনীয়। সাহি আশ্বিন, ১৩০৬।

"'টানাটানি' এই সংখ্যার পূর্ণিমার উজ্জ্বল মুকুট। ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাসে, চিন্তাশীলের সুচিন্তায়, নিপুণ শিল্পীর মুন্সীয়ানায় "টানাটানি" হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।" সাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩০৬।

"আট বৎসর ধরিয়া যথা নিয়মে মফস্বল হইতে প্রকাশিত হইতেছে, ইহা গৌরবের কথা। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথামৃত, প্রকৃতই অমৃতের ন্যায় পূর্ণিমার প্রতি পৃষ্ঠায় ক্ষরিত হইয়াছে। এই কথোপকথন গুলি যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক। 'অম্বিকা' ছন্দোবন্ধে একটি সুন্দর পল্লীচিত্র, কবিতাটির মধ্যে এমন একটি বর্ণনা সংযম এবং সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা সমস্ত বিষয়টিকে উজ্জ্বল ও সকরুণ করিয়া তুলিয়াছে।" বসুমতী, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৭।

"এবারকার পূর্ণিমা সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ রচনায় পরিপূর্ণ। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহের "যজ্ঞ" একটি উপাদেয় সন্দর্ভ। লেখকের পাণ্ডিত্য ও বুঝাইবার প্রণালী প্রশংসনীয়।" মধুষশা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান" একটি বিদ্রূপাত্মক রচনা; সেকালের রসিকতা, একালের ইয়ারাকি বা ইংরাজী রস রচনার অনুকরণাত্মক রূপান্তর নহে। স্নিগ্ধ, শান্ত, সহজ,—পড়িয়া তৃপ্তি হয়। "অমৃতসরের গুরুদরবার" একটি সুমিষ্ট ভ্রমণ কাহিনী—কেবল বাক্যের ফোয়ারা নয়। লেখক অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। "মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়" গুণগ্রাহী লেখকের উজ্জ্বল মন্তব্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ও মূল্য ইঙ্গিত যেমন হিতকারী, তেমনি মনোহারী। লেখকের উৎসাহবাণী যেমন রসাল, সাহিত্য বিড়ম্বনার প্রতি তাঁহার লঘুগামী অন্তর্ভেদী ধীক্কারবাণ তেমনি ধারাল। মধ্যে মধ্যে ধার্ম্মিক হিন্দু লেখক গোঁড়ামির পরিচয় দেন; সাহিত্যের হিসাবে তাহা সাংঘাতিক। অপর সর্ব্বত্র তিনি আপনার ক্ষমতায় আপনি দীপ্যমান, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক—সাহিত্যের বন্ধু, লেখকের মন্ত্রী ও অপচারের ভুজু।" সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

"মৃত্যুর পর" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। দার্শনিক খচখচির অপেক্ষা এ প্রবন্ধ আমাদের অনেক ভাল লাগে। "মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়" আমরা সেই পুরাতন "বঙ্গদর্শনের" আভাস পাইলাম। এ রকম সমালোচনা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে।" বঙ্গভূমি, ১৩ই চৈত্র, ১৩০৭।

"হুগলী কাহিনী" বেশ লেখা হইতেছে। "ফোকলা দিগম্বরের" সমালোচনা আমাদের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এডুকেশন গেজেট, ৩রা শ্রাবণ, ১৩০৮।

"সর্ব্বত্র পরিচিত সুলিখিত মাসিক পত্র। "হুগলী কাহিনী" উপাদেয় হইতেছে।" বিকাশ, ৭ই শ্রাবণ, ১৩০৮।

"আমরা স্থানান্তরে পূর্ণিমা নামক মাসিক পত্র হইতে 'দুইজন কর্ত্তা', শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম। আগামীবারে অপরার্দ্ধ উদ্ধৃত করিব। লেখক মহাশয়ের ভাষা যেমন সুন্দর, বর্ণনা কৌশলও তেমনি বিষয়োপযোগী। 'পূর্ণিমায়' যে সমস্ত সমালোচনা বাহির হয় তাহা ওস্তাদী হাতের লেখা। প্রবন্ধ গৌরবে পূর্ণিমা একখানি উৎকৃষ্ট সুলিখিত মাসিক পত্র। আমরা পূর্ণিমার ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।" বসুমতী, ৬ই ভাদ্র, ১৩০৮।

"নির্ব্বাচিত প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য।" মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি, ২১শে চৈত্র, ১৩০৮।

"পূর্ণিমা" ভাল মাসিক পত্রিকা। নয় বৎসর কাল ধীরে ধীরে ইহার প্রচার চলিতেছে। ইহার জয়ডঙ্কা নাই; স্পর্দ্ধা মেঘাড়ম্বর নাই; বেশ নিস্তব্ধে নিরীহ ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে। বঙ্গবাসী, ৫ই মাঘ, ১৩০৮।

"সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লিখিত "সাগর" কবিতা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।" বঙ্গবাসী, ১১ই আশ্বিন, ১৩০৯।

পূর্ণিমা

(পুরাতন)

বিশেষ সুবিধা।

সন ১৩০৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯ সালের পূর্ণিমা কয়েক খণ্ড মাত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। বৈশাখ মাসের মধ্যে একত্রে সাত বর্ষের পূর্ণিমা লইলে, সুলভ সংস্করণ কেবল মাত্র পাঁচ টাকা মূল্যে এবং পৃথক লইলে প্রতি খণ্ড ৸০ বার আনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। ডাকমাশুল সতন্ত্র লাগিবে। সন ১৩০০।১।২ সালের পূর্ণিমা সমুদায় নিঃশেষ হইয়াছে।

পূর্ণিমা কার্য্যালয়,
বাঁশবেড়িয়া।

পূর্ণিমা কার্য্যাধ্যক্ষ,
বাঁশবেড়িয়া।

পূর্ণিমা

দশম বৎসরের লেখকগণের নাম।

(সন ১৩০৯ সাল)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
,, অখিলচন্দ্র পালিত।
,, আনন্দময় শর্ম্মা।
,, আবদুল করিম।
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, উমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।
,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল।
,, নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্ন।
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।
,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এল।
,, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম এ, বি এল।
,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ।
,, মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
,, মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, যদুনাথ কাঞ্জিলাল, বি, এল।
,, রজনীকান্ত ভক্তিবিনোদ।
,, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
,, হেমচন্দ্র গোস্বামী।
,, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম এ, এম আর এ এস্।



বঙ্গেশ্বর সার্ জন্ উড্‌বরণ, এম, এ: কে, সি, এস, আই।
(বিগত ৪ঠা চৈত্র, ১৩০৮ সাল বাঁশবেড়িয়ায় শুভাগমন করিয়াছিলেন।)

বৈশাখ, ১ম সংখ্যা।

প্রতিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দশম বর্ষ।

সন ১৩০৯ সাল।

নব বর্ষাগমে।

ছিল গুরো কৃপাহি কেবলম্। দেব আপনার কৃপায় কত রোগ শোক, বাধা বিপদ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। চলিতে চলিতে আজি ১৩০৮ সালের সীমা অতিক্রম করিয়া নূতন রাজ্যে, নূতন অধিকারে পড়িলাম। কেমন থাকিব, কেমন রাখিবেন, তাহা আপনিই জানেন। এ কার্য্যে আর রাখিছেন কি না তাহারও কর্ত্তা আপনি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বাধা করি আমি। মা গুরুচরণে আত্ম সমর্পণ করিবার ক্ষমতা দাও। তরুঞ্চনের সহিত যেন গাহিতে পারি—

রাগিণী ইমন। তাল তিওট।

মা, তব চরণ দুখানি, শোভে বিচিত্র তরণী,
দুস্তর ভবার্ণবে হইতে গো পার।
মনন স্মরণ, এ তরণীর বাহকগণ,
শ্রীগুরু চরণ তাহে ভবকর্ণধার॥

যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ়মন,
অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার।
ভবান্ধকূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনা গতি নাহি আর॥

দেওয়ান মহাশয়ের এই কথা—"কৃপা বিনা গতি নাহি আর"। এই কথা তোমার গাত্রে তপ্তমুদ্রায় লিখিয়া লও। কেন আমার হিয়া অধিকার প্রবেশ দ্বারে দুরু দুরু করিতেছে, কি অজানিত শঙ্কা আ মন উদ্বেলিত করিতেছে? রোগ শোক পেলেগ দুর্ভিক্ষ এ সব ত এখন নি সহচর। যেমন বছরের পর বছর আসিয়া থাকে, সেইরূপই আসিয়াছে কর—দুইটা বিপদ হইবে, দুইটা সম্পদের সমাচার শুনিবে, দশ জন মি দুই জন জন্মাইবে—এইরূপই হইবে। তাহাতে আর ভয় ভাবনা কে হাসিকান্না ত এক সূত্রে গ্রথিত। কবি বলেন—

"সম্মুখেতে আছে জানি যুগ যুগান্তর।
আসে যায় নরনারী বাঁধে খেলাঘর॥
দূর কর আবরণ,
কর দেখি উন্মোচন,
কত হাসি কত গান এনেছ এবার;
অথবা হে ভবিষ্যত সব অন্ধকার॥"

এইরূপই হয়—এইরূপই হইবে। আমার মন তুমি কেন রামপ্রসাদের সুর মিলাইয়া গাওনা—

মন কেন রে ভাবিস এত।
যেন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয় এযে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয় হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত।
(মন) মা আছে যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখ দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি হবে রে তোর তেম্নি মত॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন কর রে মনের মত।
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥

গুরু কৃপায় পরকালের রাজা রাণীর যুগল পদ কমলে লুণ্ঠিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ—অধিকার পরিচালন কর। আর তারপর ভূমণ্ডলে সেই রাজা রাণীর প্রতিরূ ইংলণ্ডেশ্বর ও তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর যুগল চরণে প্রণিপাত কর। জগদম্বার কাছে প্রার্থনা কর যেন দিল্লীতে এ বৎসর অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

আবার এক বৎসরের জন্য, এইরূপে শক্তিসম্পন্ন হইয়া ও রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া, তাই বলি মন, সারসত্যের আলোচনা কর। বূয়র যুদ্ধ সেইরূপই চলিতেছে, সংবাদ দিয়া লাভ নাই। পেলেগ দুর্ভিক্ষ এখনও গেল না বলিয়া দুঃখ করিয়া ফল নাই। পেলেগ আরও বাড়ুক পুন পুন কষাঘাতে বঙ্গবাসীর একদিন চৈতন্য হইতে পারিবে, এ আশা করিয়াও কাজ নাই। ভগবানে মন স্থির রাখিয়া সকলের আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাই না ধেয়? কর্ত্তব্য কি, কে বলিয়া দিবে?

১৩০৫ সালের আত্মকথায় লিখিয়াছিলাম "যে দিন বঙ্গের সেই কয়েক জন কৃতীসন্তান একযোগ হইয়া বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন, বাঙ্গালির সেই একদিন, আর বাঙ্গালির আজ এই এক দিন, কেহ কখনও কি মনে করিয়াছিল যে বঙ্গদর্শন অদর্শন হইবে?—না বাঙ্গালি তাহার অদর্শন বিরহ সহ্য করিতে পারিবে?" বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সাময়িক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাদিগেরও উল্লেখ করিয়াছিলাম। এখন নূতন সংবাদ পাঠক পাইয়াছেন। দেখিয়াছেন বঙ্গদর্শন আবার পুনপ্রকাশিত হইয়াছে; শুনিয়াছেন যে বান্ধবের পুনপ্রচার হইবে। বান্ধবেরও পুন প্রচার দেখিয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে অর্থাৎ "লোটানিয়া ফকীরের হাটে" এ সংবাদ গুরুতর। আমরা সংবাদমাত্র দিলাম। তবে বঙ্গদর্শন বান্ধব আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিবেন, কি যুগধর্ম্মে মোহিত হইয়া দশটার একটা হইবেন, এখন তাহা কে বলিতে পারে? তাহা অবশ্যই ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত। কিন্তু ভরসা করি সকলে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে সচেষ্ট হইবেন। বলিলেও করিবেন, না বলিলেও করিবেন, তবে আমাদের

বলা-টা কেবল ভালবাসার আশঙ্কা। বিলাতের বর্ত্তমান স্পেক্টেটর দেখিয়া অনেকের আডিসনের স্পেক্টেটর মনে পড়ে।

এখন আমাদের কর্ত্তব্যটা কি—এ প্রশ্ন পূর্ব্বেই উপস্থাপিত করিয়াছি। ভবেরহাটে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মাথায় একটা করিয়া কর্ত্তব্যের পসরা আছে, তাহা আমরা জানি। আমাদের মনে হয় সেটা স্বীয় স্বীয় স্বার্থ। পরার্থের কথাও একটুকু রাখিতে হয়। এখন সকলেই একটি পুরাণ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। সেটি এই; যে ভারতের উন্নতি সুতরাং বাঙ্গালার উন্নতি সংঘটন করিবার একটি মাত্র উপায় আছে অর্থাৎ এক বই আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সেটি হইতেছে ধর্ম্মবল সঞ্চয়। এই ধর্ম্ম সঞ্চয় ব্যতিরেকে যখন আমাদের ভাবী মঙ্গল হইবেই না, তখন সকলের উচিৎ এ বিষয়ে সাহায্য করা, দেশের কৃতী সন্তানের উচিৎ কোমর বাঁধিয়া লাগা। সাহিত্য-স্রোতে এই উপায়-শক্তি প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিবে।

উপপত্তির মেঘরাজ্য ত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রের পাদগম্য প্রান্তরে প দিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এই কার্য্য করিতে হইবে আপাতত জন ব্যক্তিকে—একজন ধর্ম্মপ্রচারক, অন্যজন সমাজসংস্কারক। অবশ্য দুই জনেরই কার্য্য অতীব কঠিন—আজিকার ঘোর দুর্দ্দিনে, ইহাদের প নিতান্তই বন্ধুর ও পিচ্ছল অনুভব হইবে। যখন পাপরূপ মেঘ আপনা স্তবকে স্তবকে সাজাইতেছে, যখন নাস্তিকতার বিদ্যুৎ মনাকাশের দিবে দিকে নানা আকারে চমকাইতেছে, তর্কের প্রবল ঝড়ে বিশ্বাস উড়িয়া যাইব তেছে, যখন ঘোর বিড়ম্বনা বর্ষণের সুযোগ অনুভব করিয়া মায়াবী ধর্ম্মধ্বজী ভেকগণ আপনাদের স্বার্থসুরে উপহাসের মক মক ধ্বনি করিতেছে, তখন গুরুরূপ ছত্র আশ্রয় না করিলে কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবেন না. গুরু প্রসাদে সেই ধর্ম্মসংস্কারকের, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথায়, চাপ্‌রাশ থাকা চাই। চাপ্‌রাশ থাকিলে আর কোন ভয় নাই—তাঁহার পথ সর্ব্বত্র সরল। কিন্তু যাঁহার চাপ্‌রাশ নাই, তিনি যেন এ পথে না আসেন। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? যিনি কামনার দাস, যিনি রিপুকদম্বের ক্রীড়াপুত্তলী, তিনি যেন আপনার অভিনয়ে আপনিই যবনিকা পতন করাইয়া দেন, নহিলে সকলের পক্ষেই ঘোর অমঙ্গল সংঘটন সম্ভাবনা। যিনি চাপ্‌রাশ-ওয়ালা তাঁহার একদিনের উপদেশে একটি বিবেকানন্দ বা

নববিধানের কেশব জন্মাইতে পারে। তাঁহার উপদেশবাণী সহস্র মুখে সহস্র হৃদয় দলিত করিয়া শান্তিসাগরসঙ্গমে নিমজ্জিত হইবে।

যিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, তাঁহার পিছনেও একজন বেহালা বাজাইবার লোক চাই—নহিলে সুর ঠিক থাকিবে কেন? ভক্তি উদারনীতির নূতন আমদানী মাল একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিতে হইবে—আগে আপনার ঘর গুছাইতে হইবে। ডাক বলিয়াছেন "যাকে রাখ সেই রাখে"। ভাই সমাজসংস্কারক, তোমাকে সব বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। তোমার দধীচীর ইচ্ছা চাই, কর্ণের মত সহ্যশক্তি চাই, একলব্যের প্রতিজ্ঞা চাই। ভাইরে তোমার একদিকে যেমন খড়্গ মুণ্ড থাকিবে, তোমার অপরদিকে তেমনি বর অভয় থাকা চাই। তরুর সহিষ্ণুতা, তৃণের সুনীচতা আবার তোমার নিজের থাকা চাই। তবে ত বিশ্বাসের বন্যায় দুকুল প্লাবিত হইবে, তবে ত সহস্র লোকের প্রেমের সহস্র শাখানদী তোমার বিশ্বাসস্রোতে আসিয়া আত্মহারা হইবে, তবে ত তুমি তাহাদিগকে সাদর আলিঙ্গনে পরার্থপরতার সঞ্জীবনীশক্তির তড়িৎবেগে অভিষিক্ত করিতে পারিবে, তবে ত তাহারা প্রেমভক্তির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারিবে এবং লোকশিক্ষার তীব্র সাধনার তপ সঞ্চয়ে, লোকে জগদম্বা, আবার সেই জগদম্বায়—সেই লোক-দর্পণে—জন্মভূমিরূপ আর এক জগদম্বার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবে। বুঝিবে জন্মভূমি, লোক, জগদম্বা সবই এক। আরও দেখিবে ভক্ত ভাগবত ভগবান এক হইয়া যাইবে। তখন সভাসমিতি ক্লুব কিছুই করিতে হইবে না। তখন আত্ম-প্রসাদ হ্রদের অমিয় অবগাহন হইতে উত্থিত হইয়া, হৃদয় আকাশের নীলচন্দ্রাতপের অংশবিশেষে দৃষ্টি সংযোজন করিয়া, ভাবে ভোর হইয়া দেখিবে, যেন ত্রিকোণ ভারতবর্ষের শীর্ষদেশে তুঙ্গহিমাচলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে দণ্ডায়মানা আলুলায়িতকেশা দলিতাঞ্জননিভাননী বরাভয় প্রদায়িনী অথচ অসিমুণ্ডমালিনী, শবশিবহৃদয়বিলাসিনী আনন্দময়ী শিবসুন্দরী। তুমি দেখিবে বুঝিবে মরমে মরিবে, মজিবে কাঁদিবে হাসিবে, আর সঙ্কেতে ছুটিয়া কোলে যাইবার কালে তারস্বরে বলিবে সোঽহং। তখন তুমি বুঝিবে সমাজ কি, সমাজ বুঝিবে তুমি কি। তখন তুমি আর সমাজসংস্কারের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। যার সমাজ তাকে দিয়াই তুমি নিশ্চিন্ত হইবে।

হিমালয় দর্শন।

বাল্যে পিতৃদেবের চরণতলে বসিয়া যে ভাবের আভাস পাইয়াছিলাম, আজ তাহা কিয়ৎ পরিমাণে স্ফূর্ত্তিলাভ করিল। মহাকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব যখন প্রথম তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করি, তখন আমার বয়স অতি অল্প, কিন্তু কতক মহাকবির রচণাচাতুর্য্যে, কতক পিতৃদেবের ব্যাখ্যানৈপুণ্যে সেই সময় হইতে হিমালয় যে অতি সুন্দর স্থান, বুঝি জগতে এমত সুন্দর স্থান আর নাই—এরূপ একটা ধারণা হয়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে, কতক পুস্তক পাঠে, কতক লোকমুখে বর্ণনা শুনিয়া, নগাধি রাজের অগাধ সৌন্দর্য্য মনোমধ্যে ক্রমশঃই দৃঢ়তর হইতে লাগিল। কেবল ধারণা লইয়া কতদিন থাকা যায়, ধারণা হইতে ক্রমশঃ দর্শনস্পৃহা হইতে লাগিল, তাহার পর যখন হিমালয়ের নিকটস্থ, নিম্নতলস্থ স্থান মধ্যে দুই একটি স্থানে গমনের সুবিধা আছে শুনিলাম, তখন আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কেহ দার্জ্জিলিং, কেহ সিমলা প্রভৃতি ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বত্য উপনিবেশে যাইয়া থাকেন, সহজেই যাতায়াত করেন,—সেই সকল স্থান হিমালয়ের অন্তর্গত যদিও হিমালয় উচ্চশৃঙ্গের সহিত তুলনায় কিছুই নহে, তবুও তথায় গিয়া হিমালয়ের সৌন্দর্য্য অনেকটা অনুধাবন করা যায়। তাই ভাবিয়া ক্রমশঃ আমারও হিমালয় গমনের স্পৃহা জন্মে। তাহার আর একটী কারণও আছে। আশৈশব পুরাণোক্ত আখ্যায়িকা শুনিয়া শুনিয়া মনে এমনি একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, অথবা সন্দেহ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। জগন্মাতা দুর্গা হিমালয়গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, হিমালয়ের কন্যারূপে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, হিমালয়ের সহিত আমাদের মাতামহ সম্বন্ধ। সেই মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে কাহার না বাসনা জন্মে। এই সকল নানা কারণে এবার গ্রীষ্মের প্রথম ভাগেই হিমালয় দর্শনার্থ দার্জ্জিলিং গিয়াছিলাম। মাতামহের ক্রোড়ে উঠিতে না পারি, মাতামহ নিজসন্তান পরিত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় অপবিত্র দৌহিত্রকে ক্রোড়ে বা করিবেন কেন, তবুও মাতামহের চরণ স্পর্শ করিয়াছি। শিশু

যেমন তাহার মাতামহের পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার জানুদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া তদবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া পরমানন্দিত হয়, আমিও আমার এই মাতামহের জানুদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ও সময়ে সময়ে তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া সেইরূপ কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমার কয়েকটী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার আবার দার্জ্জিলিং যাওয়া কেন, তাহার এই মাত্র কৈফিয়ৎ।

কলিকাতা হইতে অপরাহ্ণে যাত্রা করি। কষ্টে বাষ্পীয়যানে দিবার বাকি অংশ ও রাত্রিটা যাপন করি। যেমন প্রভাত হইল, মনোমধ্যে যে কি একটা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা বলা যায় না। গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামিয়া উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম, হিমালয় দেখা যায় কি না। এমনি মনে হইতে লাগিল, যেমন পাহাড় দূর হইতে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়, সেইরূপ একবার দেখিতে পাইলেও উৎকণ্ঠা কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে। কিন্তু তাহা শীঘ্র হয় নাই। এই সময়টা বড় কষ্টেই কাটাইতে হইয়াছিল। এ ভাবটা সকলেই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কোন একটা আকাঙ্ক্ষিত শুভ ঘটনা যাহা নিশ্চয়ই অল্পকাল মধ্যে সংঘটিত হইবে, তাহার অপেক্ষায় যেমন মন উৎকণ্ঠিত হয়, সময় যেন কাটিতে চাহে না, আমারও তাহাই হইয়াছিল। কবিগণ ইহা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য কত উদাহরণ দিয়া থাকেন। পরিণয়ের দিন স্থির হইলে পর বরকন্যার উৎকণ্ঠার কথা সকল কবিতেই বলিয়া থাকেন। যাহা হউক ঐ রকম একটা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আমার মনের সাময়িক শান্তি বিনষ্ট করিতেছিল। কিন্তু সময় কাহারও চেষ্টায় শীঘ্র যায় না, দেরিও করে না। কালের ন্যায় অপক্ষপাতী বোধ হয় আর কেহই নাই। অল্পক্ষণ পরেই পর্ব্বততলস্থ ভূভাগে যে সকল চা-বাগান হইয়াছে, তাহা নয়নগোচর হইল। গাছগুলি কেমন সুন্দর কাটা ছাঁটা, কেমন গোছানগাছান, কেমন সুন্দররূপে সাজান, সেগুলি দেখিতে দেখিতে কতকটা মনের উদ্বেগ দূর হইল। এই গাছগুলি দেখিয়া যেন পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু যাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা দেখা পাই, সর্ব্বদাই সাজিয়াগুজিয়া প্রত্যহ কর্ম্মস্থলে আসিতে দৃষ্টি করি, তাহাকে আজ যেন সহসা স্বাভাবিকভাবে স্বগৃহে দর্শনলাভ করিলাম, সেইরূপ মনে হইল। যাহার সহিত আমার

পূর্ব্বপরিচয় ছিল, আজ তাহাকে তাহার প্রাকৃতিক অবস্থায় জন্মস্থানে স্বচ্ছন্দাবস্থায় দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। কিন্তু সে আনন্দ অতি অল্পকাল স্থায়ী মাত্র। কারণ অনতিবিলম্বে ক্রমশই সেই চির আকাঙ্ক্ষিত হিমালয়ের চরণদেশে উপস্থিত হইলাম। কতক পথ গাড়ী সোজাপথে দুই ধারে জঙ্গল মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বে অনেক জঙ্গল দেখিয়াছি, শাল, পিয়ালাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ পরিপূর্ণ অনেকানেক বন দেখিয়াছি, সুতরাং এই জঙ্গলময় স্থান দেখিয়া মনে বড় একটা কিছু আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তাহার পর ক্রমেই পর্ব্বতের উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইলাম। গাড়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দুইপার্শ্বে বহুতর অতি প্রাচীন বৃক্ষাবলি। এই সকল বৃক্ষের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই পরিচিত, কতক বৃক্ষ, কতক লতা, কতক গুল্ম। কতকগুলি বৃক্ষ আগাগোড়া শৈবালপূর্ণ হওয়ায় তাহাদের রং প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিতেছে। কত বৃক্ষ লতা কত প্রকার শ্বেত লোহিতাদি পুষ্প ও পত্র নিচয়ে সুশোভিত হইয়া চারিদিক আলো করিয়া রহিয়াছে। কোথাও রাস্তার একধারে পর্ব্বতের উচ্চস্থান, একধারে গভীর গর্ত্ত; গাড়ী একটু স্খলিত হইলে, কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহা ঠিক করা যায় না। যখন গাড়ী এই প্রকার রাস্তা দিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, মনে এক প্রকার আনন্দের উচ্ছ্বাস হইল, ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিবার আকাঙ্খা হইল। উর্দ্ধে উঠিবার জন্য কি ভয়ানক লালসা, উন্নতির কি বিষম বাসনা। উন্নতির সময় মানুষের মনে কি আবেগময় আনন্দ হয়! অনেকে এই সময় মনের আবেগে ও আনন্দে মাথা ঠিক রাখিতে পারে না। বাস্তবিক পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ, তাহার উপর শৃঙ্গ, তাহার উপর শৃঙ্গ দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়। এই সময় মাথা ঠিক রাখিয়া আস্তে আস্তে একমনে গন্তব্য পথে, পরিচিত পথ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে, পদস্খলন হইয়া গভীর গর্ত্তে পড়িতে হয় না। একটু অন্যমনস্ক হইলে বড় বিপদ। খাদে পড়িলে আর উপায় নাই। উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। চিরদিনের জন্য অনন্ত গহ্বরে নিপতিত হইতে হইবে। বড় সাবধানে চলা আবশ্যক। কিন্তু অবতরণকালে মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, সে সময় মনের মধ্যে কেমন একটা হতাশ ভাবের আবির্ভাব হয়। আমি কি যেন একটা পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি কিন্তু তাহাতে আমার যেন

কোন হাত নাই। আমি যেন কি একটা সুখসম্পদ হারাইতেছি, এমনি একটা নিরুৎসাহভাবে মন কালিমাময় হয়। আর সে প্রফুল্লতা থাকে না, সে আনন্দের বিভোরভাব থাকে না। আবার এদিকে উঠিতে যে কষ্ট, নামিতে সে কষ্ট নাই। উপরে উঠা বড় কষ্টকর কিন্তু নীচে নামা বড় সহজ। উন্নতির পথ দুর্গম, অবনতির পথ সুগম। উপরে বলিয়াছি, তৈয়ারি পরিচিত পথে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে পদবিক্ষেপ না করিলে উপরে উঠা যায় না। অবতরণপক্ষেও প্রায় সেই নিয়ম। পরিচিত পথ ব্যতীত নীচে নামাও কঠিন। উপরে উঠিতে যত কষ্ট, নীচে নামিতে যদিও তত কষ্ট নাই তবুও সমতল পথে চলা অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্ট। নির্জ্জীব পদার্থকে ফেলিয়া দিলেই নীচে অক্লেশে চলিয়া যায়। আমরা যদি সেইরূপভাবে গাভাসান দিয়া অবনতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে নামিতে নামিতেই পথে প্রাণ হারাইব। কিন্তু যদি প্রাণ রক্ষা করিয়া অবতরণের ইচ্ছা থাকে, উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের উপদেশ অবহেলা করা উচিত নহে। আমার একবার যাহা ঘটিয়াছিল বলিতেছি। কর্ম্মসূত্রে একদা মানভূম জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহকুমায় গিয়াছিলাম। তথায় চারি দিকে পাহাড় দেখিয়া মনে বড় আনন্দ লাভ করি। পাহাড়ের উপর উঠিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। একদিন প্রভাতে জনৈক ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া এবং পথপ্রদর্শক একজন স্থানীয় লোককে লইয়া নিকটস্থ চাক্ষী নামক পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। পাহাড় তত উচ্চ নয়, কিন্তু খুব লম্বা। প্রথম পাহাড় আমাদের আবাস স্থান হইতে নিকট বোধ হইতেছিল, যত যাইতে লাগিলাম ততই যেন তাহার দূরতা বাড়িতে লাগিল। অবশেষে পাহাড়ে উঠিলাম। পাহাড়ের গায়ে ও উপরে বড় জঙ্গল। ছোট ছোট গাছগাছড়ার জঙ্গল। যেমন পাহাড় তাহার উপর তেমনি আকারের গাছের জঙ্গল। ভগবানের অনুপাত জ্ঞান সর্ব্বথাই অভ্রান্ত। পাহাড়ের উপরে উঠিয়া কিছুক্ষণ পরে নামিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু নামিবার রাস্তা খুঁজিয়া পাইলাম না। পথ দেখাইবার জন্য যে কালোয়ার জাতীয় একটী বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, সে অনবরত আগে যাইতে বলিতেছিল। ক্রমশঃ নামিবার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। কালোয়ার যতই আগে পথ আছে বলিতে লাগিল ততই মনে বিরক্তি হইতে লাগিল। এমন সময় একটী সোজা পথ পাইলাম। পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নতল পর্য্যন্ত

একটী সোজা পথ। বোধ হইল যেন বাঁধারাস্তা পাইলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক অনেক নিষেধ করিল, আমরা মানিলাম না, সেই পথেই নামিব মনস্থ করিলাম। প্রথমে আস্তে আস্তে নামিতে লাগিলাম। পথ কেবল ছোট ছোট প্রস্তরে পরিপূর্ণ। ক্রমশঃ বড় বিপদ বোধ হইতে লাগিল, ঐ সকল পাথরের উপর জুতা স্খলিত হইতে লাগিল। এইরূপ দুই একবার পদস্খলনের পর আমরা আত্মহারা হইলাম। আমরা আর নিজের ক্ষমতাধীন নহি। আর গতিরোধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত রহিল না। পার্শ্বস্থ দুই একটী গাছের ডাল ধরিয়া একবার দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, গাছ ভাঙ্গিয়া গেল, সুতরাং স্বভাবের গতিতে কেবল সৌভাগ্যক্রমে সেই ভাবেই বেগে নীচে নামিলাম। নীচে নামিয়া প্রায় দুই তিন রশী পথ দৌড়াইয়া বেগ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলাম। অতি কষ্টে বাসায় ফিরিলাম। পরে প্রায় সপ্তাহকাল গাত্রের বেদনায় কষ্ট পাই। তাই বলিতেছিলাম যে নীচে নামিবার সময়ও পরিচিত পথে যাওয়া ভাল। তাহা হইলে প্রাণ বজায় থাকিবে, আবার উঠিবার সুখভোগ করিবার আশা থাকিবে। এক কথা বলিতে অপর কথা আসিয়া পড়িল। উপরে উঠিবার সময় যে সুখবোধ হয়, তাহাতে মন মাতোয়ারা হইয়া উঠে, যতই উপরে উঠা যায়, তাহাতে আর মনে শান্তি বোধ হয় না। এই সময় যদি কেহ পরিচিত তৈয়ারি পথ ছাড়িয়া নিজ বুদ্ধিবলে সত্বর উপরে উঠিবার চেষ্টা করেন, তিনি নিশ্চয়ই অসিদ্ধমনস্কাম হইবেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে অবশ্যই নানা প্রকারে বিপদজালে জড়িত হইতে হইবে, জীবনেরও বিষম আশঙ্কা আছে। এইরূপ মনোমুগ্ধকারী কত কি ভাবনার সহিত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। পথের মাঝে দুই একটী ঝরণায় ঝর ঝর করিয়া উন্নত স্থান হইতে নিম্নতলে জল পড়িতেছে। তেমন বড় ঝরণা একটীও দেখিলাম না। শুনিলাম বর্ষাকালে ঐ সকল ঝরণাই প্রবল হয়। এই সকল ঝরণার জল একত্রিত হইয়াই সমতলক্ষেত্রে নদীর সৃষ্টি হয়। ক্রমে যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, একটু একটু শীতবোধ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ গরম পরিধেয় দরকার হইল। শীত ত একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুম নামক ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বোধ হইল যে কলিকাতায় পৌষ মাঘ মাসের বড় শীতের সময়ও ত এত শীত বোধ হয় না। তখন সহসা কালিদাসের সেই "হিমং ন

সৌভাগ্যবিলোপিজাতং" কথাটা মনে পড়িল। মহাকবিও যেন শীতটা হিমালয়ের সৌন্দর্য্যানুভবের পক্ষে একটা অন্তরায় মনে করিয়াছিলেন। চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় হিমালয়ের অসীম সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে শীতটা একটা বড় অসুখকর জিনিস। অনেকে এই শীতটা উপভোগ করিবার জন্য নাকি দার্জ্জিলিং যান। তাঁহাদের ভোগবাসনাকেও ধন্য, তাঁহাদের ভোগ্যবস্তুও ধন্য।

ইংরাজানুকরণে আমরা নির্ব্বিবাদে অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছি কিন্তু এই হিমালয়ের শীতকে ভোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাহা আমাদের প্রকৃত লাভ নহে, যাহা আমাদের প্রাকৃতিক ভাবের বিপরীত ভাবাপন্ন, তাহাকে আমাদের নিজের জিনিস বলিয়া কেমন করিয়া ভাল বাসিব। হিমালয়ের শীত সুতরাং কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। যেদিন একটু বর্ষার মত হয়, তাহার উপর শীলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু বহে, সে দিন যে কি কষ্টকর, যিনি আমার ন্যায় প্রকৃতি লইয়া সেখানে গিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন। আমি স্বভাবতঃই শীতে কাতর হই, তাহার উপর হিমালয়ের দারুণ অসহ্য শীত। গ্রীষ্মের এই শীতই এত কষ্টকর না জানি শীতকালে সেখানে জীব জগৎ কেমন করিয়া স্থির থাকে। সেই জন্যই বোধ হয় কালিদাস পার্ব্বতীয় তপস্যার কঠোরতা বুঝাইবার জন্য "সহস্ররাত্রিরুদবাস তৎপরা" পৌষ মাসের রাত্রিতে জলে নিমগ্না থাকার কথা বলিয়া কঠোরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। হিমালয়ের এই দারুণ শীতের কথা বলিতে বলিতে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের একটা অভ্যস্থ ধারণার বিষয় মনে আসিল। আমরা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে পদদ্বয় উষ্ণ ও মস্তক ঠাণ্ডা রাখিলে শরীর ভাল থাকে। একথা আমরা এতবার শুনিয়াছি, এত লোকের কাছে শুনিয়াছি, যে কথা না মানিয়া আর উপায় নাই। এমন সকল মহামান্য লোকের নিকট শুনিয়াছি যে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র করিতে সাহস হয় না। কিন্তু এবার আমার সে ধারণায় একটা গোলযোগ লাগিয়াছে। সেখানে দেখিলাম, সেখানকার অধিবাসীরা মাথায় কাপড় বাঁধে, কেহ পাগড়ী, কেহ টুপি ইত্যাদি ব্যবহার করে, খালিমাথায় প্রায় একজনকেও দেখিলাম না, কিন্তু খালিপায় বিস্তর লোক দেখিলাম। অধিকাংশ নরনারী বালকবালিকা নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের

শরীর আগাগোড়া কাপড়ে ঢাকা, মস্তক হইতে গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত। মূল্যবান না হউক যাহার যেমন অবস্থা গরম পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত। কিন্তু পায়ে জুতা অতি অল্প লোকেরই দেখিলাম। মনে হয় এই শীতে যাহারা নগ্নপদে বেড়াইতেছে, তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা এইভাবে কেবল বাঁচিয়া থাকে নহে, বেশ সুখে সচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকে, পীড়া কাহাকে বলে জানে না বলিলেই হয়। ইহার কিন্তু একটা উত্তর আছে, আশৈশব যেমন অভ্যাস করিবে, তেমনি হইবে। কথাটা ঠিক কিন্তু আমরা যে অভ্যাস করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা কি নৈসর্গিক নিয়মের বিপরীত নয়? আমাদের মস্তক আজন্ম কেশাচ্ছাদিত এবং পদদ্বয় অনাবৃত। ভগবান আমাদের মাথা গরম রাখিবার জন্য কেশ দ্বারা আবৃত করিয়া এবং পদদ্বয়ে ঠাণ্ডা লাগিলে ক্ষতি নাই, তজ্জন্য বোধ হয় খালি রাখিয়াছেন। অনেক মানুষের সর্ব্বগাত্র লোমাবৃত। কিন্তু কাহারও কি পদতলে লোমরাজি কেহ কখন দর্শন করিয়াছেন? আমাদের বিচার আচার ব্যবহারও এইরূপ ছিল। আমাদের ভীষকগণও মস্তক গরম রাখিবার ও পদদ্বয় ঠাণ্ডা রাখিবার উপদেশ দিতেন। পূর্ব্বে আমাদের শিশুসন্তানগণকে সূতিকাগৃহে মস্তকে উত্তাপ দেওয়া হইত কিন্তু পা ঢাকিবার জন্য এত ব্যগ্রতা ছিল না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকেও ত দেখিয়াছি, তাঁহারা শীতকালে মাথা ভাল করিয়া আচ্ছাদিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন। অধিক দিনের কথা নয়, এই সেদিন পর্য্যন্ত আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে পৌষ মাঘ মাসের শীতের সময় প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নগ্নপদে মস্তক ও গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া পুষ্পচয়নে যাইতে দেখিয়াছি। তিনি যখন পুষ্পচয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন দেখিতাম, তাঁহার পদদ্বয় তৃণাদির উপর পতিত নিশার শিশিরসিক্ত, তাহার উপর রাস্তার ধূলা বালি আশ্রয় করিয়া চরণকমল শোভিত করিয়াছে। বাটীতে আসিয়াই আবার ঠাণ্ডা জলে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিতেন, কৈ তাহাতে তাঁহার ত একদিনও মাথা পর্য্যন্ত ধরিত না। আর এখন আমার পরম হিতৈষী চিকিৎসক বন্ধু ও আত্মীয়গণের অনুরোধে পরিবারস্থ বালকবালিকাগণকে শীতকালে শয্যাত্যাগের সময় হইতে বিশেষ করিয়া জুতা মোজা দিয়া পদদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখি। তবুও তাহাদের পীড়ার সীমা নাই। সর্দ্দি কাসী লাগিয়াই

আছে, মধ্যে মধ্যে ভীষক সুহৃদগণের নিকট ভীষণ সংবাদ পাই, ইহার হইয়াছে ব্রনকাইটিশ, উহার টন্‌সিলাইটিশ ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে ভুগিবার জন্য সম্পূর্ণ অধিকার থাকিলেও আলোচনা করিবার আমার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা না করাই ভাল।

হিমালয় বাস্তবিকই হিমালয় বা শীতালয়। দার্জিলিঙ্গের উচ্চতা ৭০০০ ফিটের কিঞ্চিৎ কম আর উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ২৯০০০ ফিট অর্থাৎ মোটামুটি ধরিলে দার্জিলিঙ্গের উচ্চতার চারিগুণ বেশী। হিমালয়কে মানবদেহ বলিয়া কল্পনা করিলে দার্জিলিঙ্গ তাহার হাঁটুদেশ হইবে অনুমান করিলে বোধ হয় বড় ভুল হয় না। এখন ভাবুন দেখি দারর্জিলিঙ্গে গ্রীষ্মকালে এই শীত প্রায় গড়ে ৫৫ ডিক্রি ফারনহিট, শীতকালে উচ্চতম শৃঙ্গে কি ভয়ানক ব্যাপার। ইহা কল্পনার অতীত, অনুপাতে অননুমেয়। এখন বুঝিলেন কি যে এই মহান পর্ব্বতরাজের এত অনন্ত ঐশ্বর্য্য, এত অসীম সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া কেন নাম হইয়াছে, হিমালয়। যাহার যেটা মন্দ, যাহার যেটাকে বেশী ভয় হয়, যাহার যেটা ভাল লাগে না, তাহার সেইটাই বেশী মনোযোগের বিষয় হয়, সেই জন্য চন্দ্র—শশধর এবং এই পর্ব্বতরাজের নাম হিমালয়। সেইজন্যই বোধ হয় হিমালয়ের শীতের কথাটা আগে মনে পড়িল। নূতন যাইয়া মেঘের সহিত প্রথম সংসর্গেই একটা মনে বড় হর্ষ হয়। যে মেঘ আমরা চিরদিন কত উপরে দেখিয়া আসিতেছি, যে মেঘের সহিত অনেক সময় আকাশের অনৈক্যধারণা করা কঠিন হয়, যে মেঘ কত সময় কত উচ্চে আছে, তাহার ঠিক করা যায় না বলিয়া মনে হয়, সেই মেঘের মধ্য দিয়া যখন যাতায়াত করিতেছি, মেঘ আমাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে, ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে, আবার সে মেঘকে যখন আমাদের অপেক্ষা নিম্নস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে দেখি, তখন এক অভাবনীয়ভাবের উদয় হয়। যাহারা চিরদিন আমাদিগকে নীচে রাখিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদের সহিত একত্র বিচরণ করিতেছি, এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেককে ছাড়াইয়া উঠিয়াছি ভাবিয়া মনে আনন্দের উদয় হয় না কি? আনন্দ বটে, কিন্তু আনন্দের অন্তরালে একটু গর্ব্ব রহিয়াছে। বাল্যকালে যাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করিতাম, পরে ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়া যাহা ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, আজ যদি তাঁহাদের অনুগ্রহে বা

আশীর্ব্বাদে, প্রাপ্তেতু ষোড়শেবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ বৎ কিছু একটা ভাবিয়া তাঁহারা আমাদিগকে সমভিব্যাহারী করেন, তাহা হইলে আমরা কি সেই ভয় ও ভক্তি ত্যাগ করিয়া, স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহাদের সমান বা তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হইয়াছি মনে করিতে পারি, না মনে করা উচিত। সে যাহা হউক বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, পাহাড়ের গায়ে শালবন আছে, মেঘ তথায় শালপাতা খাইতে যায়। এখন মেঘকে শালবনের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভাবিলাম, হবেই বা, মেঘ হয় ত শালপাতা খাইতে যাইতেছে। মেঘ কেমন করিয়া শালপাতা খায় দেখিবার জন্য শালবনে গিয়া দেখি, মেঘ শালপাতা খায় না, মেঘ যে জলকণার ভার আনিয়াছে, তাহা দ্বারা শাল-পাতা ধৌত করিতেছে, শালমূলে মেঘ জল সিঞ্চন করিতেছে, মেঘ শালপাতা খায় না, বরং শালপাতা ও শালগাছ মেঘ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। মেঘ জিনিষটা কি সে কথা বহুদিন হইতে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি। মেঘ জলকণার সমষ্টি মাত্র জানিতাম। কিন্তু না দেখিলে কোন দ্রব্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না, আমরা যাহাকে কুজ্ঝটিকা বলি, মেঘ তাহাই, তবে কুজ্ঝটিকা অপেক্ষা যেন মেঘের জলকণা একটু স্থূলতর, আর কুজ্ঝটিকার সঙ্গে আর একটু প্রভেদ এই, কুজ্ঝটিকা একস্থানে স্থির থাকে, কুজ্ঝটিকাকে নড়িতে চড়িতে দেখা যায় না, কিন্তু মেঘ নড়িয়া বেড়ায়। মেঘ আসিতেছে, যাইতেছে দেখা যায়, এই মাত্র প্রভেদ।

হিমালয়ের মধ্যে মধ্যে যে নিম্নস্থান বা গহ্বর আছে, উহা হইতে তাহার ভিতর কেবল যেন ধোঁয়া জমিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যত উর্দ্ধে উঠা যায় নিম্ন দিকটা ততই ধোঁয়ার মত দেখায়। এই ধোঁয়ার মত জিনিসটা বাষ্প ও মেঘ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মহাকবি বলিয়াছেন, যেন দিবাভাগে উলুকের ন্যায় অন্ধকার এই সকল গুহায় আশ্রয় লাভ করে। বাস্তবিকই নিম্নদিকে উপর হইতে দেখিলে সর্ব্বদাই যেন কেমন একটা অন্ধকারময় দেখায়। অতীতের স্মৃতির ন্যায় কেমন এক রকম ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায়।

আমরা আপনা আপনি সহজ জ্ঞানে স্বর্গের এক প্রকার ধারণা করিয়া লইয়া থাকি। আর সেই স্বর্গ উর্দ্ধে অবস্থিত, ইহা এক প্রকার সার্ব্বজনিক ধারণা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ ধারণা যে কেবল হিন্দুর আছে তাহা নহে, অনেক খৃষ্টান ছবি দেখিয়াছি, ভক্ত উর্দ্ধমুখে উপরের দিকে তাকাইয়া

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। সকলেই স্বর্গের কথা হইলে, দেবতার কথা হইলে উপরের দিক দেখাইয়া দেয়। হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী যাহারা এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী, তাহারা বোধ হয়, হিন্দুর নিকট হইতে এই ধারণা পাইয়াছে। আর হিন্দুর এই ধারণা বোধ হয়, হিমালয় হইতেই হইয়াছে। যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহারা মর্ত্তের দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন না, তাঁহারা স্বর্গের সুখসচ্ছন্দ উপভোগ করেন। সর্ব্বদা নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্পাদি নিসৃত সদ্গন্ধ পরিপূর্ণ নির্ম্মল পবিত্র বায়ু সেবন করেন। নয়নাভি-রাম নানাবিধ অনায়াসজাত সুন্দর সুন্দর কত রঙ্গের পুষ্পপত্রাদি দেখেন। হিমালয়ের ন্যায় পর্ব্বতের খনিজ ঐশ্বর্য্যের কথা আমি আর কি বলিব। উদ্ভিদ্ জগত যে পর্ব্বতরাজের নিকট এত আশ্রয় পাইয়াছে, ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাকবি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে হিমালয়ে এমন এক ওষধি আছে, যাহা হইতে রাত্রিতে আপনা আপনি আলোক নির্গত হয়। এ প্রকার কোন উদ্ভিদ আছে কি না জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হওয়ায়, তথায় বহুদিন প্রবাসী একজন আমার সুপরিচিত রাজকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে এক প্রকার কাষ্ঠ আছে, যাহা হইতে রাত্রিতে আলোক নিসৃত হয়। বর্ষাকালে এই কাষ্ঠ কখন কখন পাওয়া যায়। তিনি ইহা Phosphoresence বলিয়া বর্ণনা করিলেন। হিমালয়ে একটু কষ্টের মধ্যে জলকষ্ট। যেখানে সেখানে মনে করিলে কূপ বা তড়াগ হইবার নহে। জলের জন্য নিতান্তই পর্ব্বতরাজের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। যেখানে নির্ঝর আছে, সেই স্থান হইতেই জল সংগ্রহ করিতে হইবে। জলের কথা বলিতে আমার এক দিনের নিজের কষ্টের কথা মনে পড়িল। আমার একটু গঙ্গাজলের আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে পাইয়াছিলাম, পাইলে পর মনে হইল, এটা কি আমার বাতুলতা নয়? যেখানে গঙ্গার উৎপত্তি সেখানে সকল জলই গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র নয় কি? হিমালয়ের উপর গঙ্গাজলের অধিকতর আদর হওয়া উচিত কি না? কিন্তু আবার মনে হইল, সে কথা ঠিক বটে কিন্তু পিতার পাঁচটী পুত্র কন্যা থাকিলেও যেটী সকলের বড়, যেটী হইতে পিতার নাম যশ অধিক হয়, যেটীর জন্য পিতার গৌরব বৃদ্ধি হয়, সেটীর যে একটু বেশি আদর হইবে, ইহা লৌকিক আচারের সহিত তুলনায় অস্বাভাবিক বলা যায় না। মায়ের

কাছে পুত্র কন্যা সবই সমান। সেখানে কৃতী অকৃতী, ভালমন্দ বিচার নাই। বরং কৃতী অপেক্ষা অকৃতী সন্তানকে সুন্দর অপেক্ষা কুৎসিতকে মা বেশি আদর করেন, অধিক স্নেহ করেন। কিন্তু পিতার কাছে তাহা হয় না। সেই জন্যই আমার মনে হইল, গঙ্গার জল হিমালয়েও অধিক আদরের সামগ্রী। আদুরে মেয়েকে আদর করিলে বাপ বেশি সন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়াই তারপর গঙ্গার জলে আমার যেন একটু বেশি প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল।

হিমালয় দেবতার স্থান। ইহার উচ্চ শৃঙ্গে দেবতারা বাস করেন বলিয়া আমার চিরন্তন ধারণা। সেই জন্যই আমরা চিরকাল দেবতাদিগের উদ্দেশে ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া থাকি। দেবতারা আমাদের ন্যায় শরীর ধারণ করেন না। তাঁহারা বোধ হয় হিম শীতে একেবারেই কাতর নন, তাঁহারা সুতরাং অক্লেশে হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে চিরদিন সুখে সচ্ছন্দে বিহার করেন। দেবতা ও মানুষের মাঝামাঝি অনেক রকম জীব আছে। কাব্যে পুরাণে যে সকল রাক্ষস, যক্ষ, অপ্সর, কিন্নর প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাদের কতক কতক যেন আমরা দার্জিলিঙ্গে দেখিতে পাই মনে হয়। দার্জিলিঙ্গে পাহাড়িয়া, ভুটিয়া প্রভৃতি পার্ব্বতীয় নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কতকটা ঐ সকল জাতীয় বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ আমাদের কবিগণের বর্ণনা পাঠে আমরা তাহাদের আকার প্রকার, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহাদের সহিত অনেকটা মিল আছে বলিয়া মনে হয়। তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতেছি। বিলাসিতা ইহাদের প্রধান লক্ষণ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের ভিতর বিলাসিতা কিছু বেশীপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যাহার যেমন ক্ষমতা বেশভূষার পারিপাট্যসাধনে সতত মনোযোগী। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত পরিপাটী যে আমাদের ধনীলোকের স্ত্রীলোকেরা তদ্রূপ নহেন। একজন স্ত্রীলোকের চারি পাঁচ খানি বস্ত্র একান্তই চাই। পরিধেয় বস্ত্র, তাহার উপর জামা। জামার উপর চক্ষের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বৃহৎ একখানি চাদরের ন্যায় বস্ত্র তাহার উপর একখানি মস্তক হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত আচ্ছাদন হয় এমত একখানি বস্ত্র। এই শেষোক্ত বস্ত্রখানি কাজকর্ম্ম করিবার সময় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। এই সকল বস্ত্র যাহার যেমন ক্ষমতা মূল্যবান বস্ত্রই ব্যবহার করে। অনেকেরই কাল মখমলের উপর ফুলকাটা জামা এবং বিলাতি র‍্যাপার

দেখিলাম। এই সকল বস্ত্রাচ্ছাদন ছাড়া তাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার যথাসাধ্য ব্যবহার করে। স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কার তত সুন্দর গঠন না হইলেও সমস্ত খাঁটী সোনারূপার তৈয়ারি। যাহার স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই, সে সতত শঙ্খাদি নির্ম্মিত অলঙ্কারে আপনাদের অঙ্গ বিভূষিত করিবে। ইহাদের বিলাসিতার দৃষ্টান্ত যে কেবল বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহারেই জানিতে পারা যায় তাহা নহে। ইহারা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ প্রায় সকলেই ধূম পানে সর্ব্বদা আসক্ত। সিগারেট ব্যবহার ইহাদের ভিতর এত অধিক যে আমি ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমি এতদঞ্চলে সিগারেট ব্যবহার অল্পদিনে বড় বেশী হইয়াছে মনে করিতাম কিন্তু সেখানে দেখিয়া আমার সে ধারণা দূর হইয়াছে। সর্ব্বদাই ইহারা সিগারেটের ধূম পান করিতেছে। সিগারেটের ধূমপানের কথা এত করিয়া বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, ইহাদের পানদোষটা কেবল সিগারেটেই আবদ্ধ। ইহারা সকলেই কি না জানি না অধিকাংশই পানদোষে দূষিত। সুরাপানটা যে দোষের বিষয় তাহা ইহারা বড় মনে করে না। কোন কালে করিত বলিয়াও আমার মনে হয় না, তবে এখন ইহারা আর সে "পুষ্পাসবঘূর্ণিত নেত্র" নহে, এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আবকারি বিভাগের প্রসাদাৎ প্রাপ্তাসবসেবী হইয়াছে। এই মাত্র প্রভেদ। ইহাদের বস্ত্রালঙ্কারের বিলাস বিভ্রমের কথা বলিতে একটা কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। ইহারা বনপুষ্পে আপনাদিগকে সুশোভিত করিতে বড় ভালবাসে। মাথার উপর চুড়ার মত করিয়া, বিশেষ বালকেরা বনপুষ্প ধারণে বড় প্রয়াসী। এই সকল পার্ব্বতীয়গণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। অঙ্গসৌষ্ঠব যে সকলেরই ভাল তাহা নহে বরং নত নাসিকা, ক্ষুদ্রাবয়ব কুঞ্চিত ললাট এক শ্রেণীর লোক আছে। তবে বর্ণ সকলেরই খুব পরিষ্কার, যাহাকে আমরা বলি টক্‌টকে-ফরশা রং। এমন সুন্দর গৌরবর্ণ গিরিরাজভবন ভিন্ন আর কোথাও বোধ হয় দেখা যায় না। ইহাদের বাহ্যিক ব্যাপারের কথাই এতক্ষণ বলিলাম, ইহাদের স্বভাবের কথা দুই একটা এক্ষণে বলিতেছি। ইহারা সর্ব্বদাই আমোদপ্রিয়, যেখানে দুই চারিজন একত্র হইয়াছে, সেই খানেই তাহারা গল্পগুজব করিতেছে, হাস্য পরিহাস করিতেছে, আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। কর্ম্মস্থলেই হউক, আর হাটবাজারেই হউক ইহাদের

পরস্পরের ভিতর সর্ব্বদা বেশ সদ্ভাব লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের এখানকার স্ত্রীলোকদিগের সহিত এই সকল স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবগত কি বিষম প্রভেদ। আমি প্রায় অষ্টাহকাল দার্জিলিঙ্গে ছিলাম, এই সকল স্ত্রীলোকদের একত্র সমাবেশ অনেক স্থলে দেখিয়াছি কিন্তু কলহ করিতে একদিনও কোথাও দেখিলাম না। এখানে এমন দৃশ্য অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। দশজন নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়াছে অথচ কথান্তর মাত্র নাই। কেবল পরস্পর হাস্যপরিহাস হইতেছে। এমন কি যে যত মোট তুলিতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক মোট তাহার পৃষ্ঠে দেওয়া হইলে, সে হাসিতে হাসিতে বলে আমি পারিতেছি না। কিন্তু ঝগড়া করে না। চৌর্য্য-বৃত্তি ইহাদের ভিতর একেবারেই নাই। আমি ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনিসন্ধিৎসু হইয়া জনৈক পুলিসকর্ম্মচারিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যে ইহাদের ভিতর ফৌজদারি মোকর্দ্দামা অতি কম। ইহারা স্বভাবতঃই খুন, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, চুরি, ডাকাতি এ সকলে অনভ্যস্ত। তবে ইহাদের ভিতর স্ত্রীলোক ঘটিত দুই একটি মোকর্দ্দামা হয় মাত্র। এই শেষোক্ত প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে যাহা বুঝিলাম, সেটা কেবল তাঁহাদের সামাজিক নিয়মানুসারে বৈবাহিক সম্বন্ধে শিথিলতা নিবন্ধন। এরূপ সমাজের লোকের জন্য পিনালকোডের ঐ সকল ধারা হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু যখন ইহাদের ভিতর বিবাহের তেমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, এবং তাহা না থাকার জন্য কোন প্রকার গুরুতর অপরাধ হয় না, তখন ঐ সকল অপরাধ পিনালকোডের ভিতর আনা উচিত কি না সন্দেহ হয়। মোটের উপর ইহাদের জীবন আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণে সুখময়। সুখ দুঃখ নিজের মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে, যখন ইহারা নিরানন্দ নয়, যে যেমন লোক আপনারা সুখে আছে মনে কর, তখন ইহারা সুখী নয় ত কি?

ইহাদের ভিতর ভূতের ভয়টা বড় বেশী, ইহারা রোগাদি সকলই সেই সকল উপদেবতার কুদৃষ্টি জনিত বলিয়া মনে করে। যাহার যে কিছু অমঙ্গল হয়, যাহার যে কোন পীড়া হয়, সমস্তই ভৌতিক ক্রিয়া বলিয়া ইহাদের ধারণা। এই সকল উপদেবতাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে মন্ত্রঃপূত ছিন্নবস্ত্রখণ্ড কাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া গৃহের নিকট রাখিয়া দেয়। ঐ সকল বস্ত্রখণ্ড বায়ুতে উড্ডিন হইলে সে দিকে কোন উপদেবতার ভয় থাকে

না। কাহার কোন কঠিন পীড়া হইলে, চিকিৎসক অপেক্ষা ইহারা রোজার বন্দোবস্তই করিয়া থাকে। রোজারা কঠিন পীড়া দেখিলে বড় শক্ত ভূত বলিয়া জবাব দিয়া যায়। আমার জনৈক চিকিৎসক-বন্ধু বলিয়াছেন, রোজা এইরূপে জবাব দিয়া গেলে চারি দিকে ক্রন্দনরোল উঠে। তিনি আপনা হইতে গিয়া এরূপ অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। নূতন কোন স্থানে যাইলে, আমাদের একটা প্রায়ই জানিতে ইচ্ছা হয়, সেখানে কোন দেবদেবীর মন্দির বা আলয় আছে কি না? অনুসন্ধানে দুই তিনটি আধুনিক স্থাপিত দেবালয় ছাড়া এবং দুর্জ্জয় লিঙ্গ ভিন্ন অপর কোন দেবতার আলয় খুঁজিয়া পাইলাম না। এই দুর্জ্জয় লিঙ্গ, Observatory Hill নামক শৃঙ্গের উপর এক অনাবৃত বেদীর উপর অবস্থিত। ইনি শিবের কোন মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল। কয়েক খণ্ড প্রস্তর ও কয়েকটী ত্রিশূল দেখিয়া ইহাকে শিব বলিয়াই মনে করিলাম। স্থানীয় পাহাড়ীরা ইহাকে "মহাকাল" বলে। ইহার নিকট সকল মতাবলম্বী হিন্দুই পূজারি হইয়া আইসে। শিখেরা, জৈনেরা, এমন কি বৌদ্ধেরা পর্য্যন্ত ইহাকে পূজা করিয়া থাকেন। এই শিবলিঙ্গকে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই পূজা করিতেছে দেখিয়া "নৃণাং ত্বমে কোগম্যঃ পয়সামর্ণব ইব" শ্লোকটী মনে আসিল। দেবাদিদেব মহাদেব যে সকলেরই পূজ্য, সকলেরই আরাধ্য তাহাতে আর সংশয় কি?

দুর্জয়লিঙ্গ দর্শন করিতে যাইয়া একদিন কয়েকটি বৌদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়, তাঁহারাও পূজার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূজোপকরণ ও পূজা পদ্ধতি দেখিয়া, তান্ত্রিক বলিয়া মনে হইল, তারপর জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, ঐ যে উত্তর পশ্চিম দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতেছেন, ঐ স্থানে যে দেবতা আছেন, তিনিই আমাদের অভীষ্টদেবতা, ইনি (দুর্জ্জয় লিঙ্গ) তাঁহার দ্বারপাল মাত্র। তাহাতে পীঠ দেবতা ও তাঁহার ভৈরবের কথা মনে আসিল।

আর দুই একটি বৌদ্ধ দেবমন্দির ভুটিয়াবস্তি নামক স্থানে দেখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে কিডং গুম্বাই উল্লেখযোগ্য। এই গুম্বা বা মন্দির দেখিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের যেরূপ বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা কতকটা প্রত্যক্ষ করিলাম মনে হইল। মন্দিরটী তত পুরাতন বোধ হইল না। মন্দির মধ্যে প্রথমত জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ করিতে আশঙ্কা হইল, একজন বৌদ্ধ লামা

তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। তিনি আমাকে দয়া করিয়া মন্দির দেখাইতে-ছিলেন, তিনি অনুমতি করায় ভিতরে গিয়া দেখি, মন্দিরটী সুন্দর বটে কিন্তু তাহার ভিতর কত যে কি রহিয়াছে তাহার সীমা নাই। মধ্যস্থলে একটি ঘৃতপ্রদীপ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। অনেকগুলি পুঁথি দুই ধারে স্তূপাকার রহিয়াছে। এগুলি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত, বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক। ঠিক মধ্য-স্থলে একটী সুসজ্জিত বেদিকা। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে ছবি যে কত রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তন্মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র ছবির বিষয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে এক একজন লামার মৃত্যুর পর তিনি যতদিন নির্ব্বাণ লাভ না করেন বা বৌদ্ধ হইয়া অবতীর্ণ না হন; ততদিন তিনি যে যে আকার ধারণ করেন, বৌদ্ধ জ্যোতি-র্ব্বিৎগণ তাহার ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের জ্যোতিষীগণ যেমন মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ফলাফল গণনা করেন, বৌদ্ধ জ্যোতিষীগণ মৃত্যুর সময় হইতে মৃত্যু সময়ের গ্রহাদির অবস্থান ধরিয়া আত্মার পারলৌকিক অবস্থা অবধারণ করেন। মন্দিরের বহির্ভাগে একটী বৃহৎ prayer-wheel বা জপের কল রহিয়াছে, একব্যক্তি একটী হাতল ধরিয়া নাড়িতেছে আর সেই বৃহৎ গোলাকার বস্তুটী অনবরত ঘুরিতেছে। এই গোলাকার চক্কার ন্যায় বৃহৎ পদার্থটীর উপরিভাগে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত স্তোত্রাবলি। ছোট ছোট স্তোত্র কল বাজারে বিক্রীত হয়। এমত সস্তা পুণ্য সঞ্চয় করার উপায় বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। ছোট ছোট কলগুলিতে তিব্বতী ভাষায় "ওঁ মনিপদ্মায় হুঁ" এই মন্ত্রটী লেখা আছে বলিয়া চলিত ভাষায় এই সকল কলকে "মনি" বলিয়া থাকে।

বিশেষ পুরাতন মন্দির বা কোন প্রকার চিহ্ন কিছুই পাইলাম না, যদি একখানি পুরাতন ইষ্টকলিপি বা তাম্রশাসন না হউক, প্রস্তরশাসন পাইতাম, তাহা হইলে বড় আহ্লাদসহকারে আপনাদের নিকট আজ উপ-স্থিত করিয়া আপনাদের মধ্যে অনেক প্রত্নতত্ত্বপীপাসুর বিশেষ আদরের পাত্র হইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এই দুর্জ্জয় লিঙ্গ যে অনাবৃত স্থানে অধিষ্ঠিত তাহার ঠিক কয়েক হস্ত নিম্নে একটী গহ্বর আছে। এটী দেখিলেই বোধ হয়, পুরাকালে এটী কাহারও হয়ত তপস্যার

স্থান ছিল, সেখানকার লোকে বলে, সেই গহ্বর দিয়া বরাবর তিব্বত পর্য্যন্ত যাইবার একটী সুড়ঙ্গ পথ আছে। আমি একাকী তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সাহসী হই নাই।

আমার এই সামান্য কথা লইয়া প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে, এক্ষণে শেষ করা আবশ্যক। দার্জিলিং হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে কাঞ্চন জঙ্ঘা ও ধবলা গিরি অবস্থিত। সর্ব্বদা এই দুই মহা পবিত্র উচ্চতম শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দিন প্রভাতে মেঘ থাকে না, আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, সেই দিন ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময় এই সকল শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। যে দিন রাত্রিতে একটু বেশী বৃষ্টি হইয়া যায়, তাহার পর দিন প্রাতে প্রায়ই দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। যে দিন প্রথম এই দুই মহোচ্চ শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিলাম, সেই দিন মনে হইল, আমার নয়ন সার্থক হইল, জীবন চরিতার্থ হইল। দুইটা বড় গিরিশৃঙ্গ দর্শন করিলাম বলিয়া যে আমি এত আনন্দিত হইলাম, তাহা নহে, ইহাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে যে আমি এত আনন্দিত হইলাম তাহাও নহে। আমি বহুদিন হইতে হিমালয় দেবতাদের আবাসভূমি বলিয়া মনে করিতাম। আমার দৃঢ় ধারণা দেবতারা হিমালয়ে বাস করেন। হিমালয়ই স্বর্গ। স্বর্গবাসী দেবগণ স্বর্গ ছাড়িয়া কোথা যাইবেন। তাঁহারা আজও স্বর্গেই আছেন, হিমালয়েই বাস করিতেছেন। কিন্তু হিমালয়ের কোন্ স্থানে আছেন। অনেক স্থানে ত মানুষ যাইতে পারিয়াছে, দেবতারা সেই সকল স্থানে আছেন কি না? অনেকে বলেন যে তাঁহারা হিমালয়ের উচ্চ স্থানে অনেক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, করিবার কথা বটে, সিদ্ধ-গণ নীচেও আইসেন দরকার হইলে মানুষের অগম্য স্থানেও যান। দেব-তারা চিরদিন দানব ভয়ে স্বর্গেই বাস করেন, দানব ও মানব একই জীব, স্বভাব গুণে নামের বৈলক্ষণ্য মাত্র। এই মানব ও দানবগণের সংস্পর্শ ছাড়াইবার জন্য তাঁহারা এমন স্থানে বাস করিতেছেন, যেখানে মানুষ যতই চেষ্টা করুক, জড় জগতের বিজ্ঞান, জড় জগতের কৌশল যতই শিক্ষা করুক, সেখানে কিছুতেই পঁহুছিতে পারিবে না। এক ঐশী শক্তি ও ভগবৎ কৃপা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই সেখানে পঁহুছিবার যো নাই। মহর্ষী ব্যাস-দেব পঞ্চ পাণ্ডব ও পাঞ্চালির মধ্যে কেবল এক চির কৃষ্ণগত প্রাণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়াছিলেন লিখিয়াছেন। তাই আমার মনে হয় এই কাঞ্চন

জজ্ঝা ধবলা গিরি প্রভৃতি শৃঙ্গই সেই দেবতাগণের অধিষ্ঠান স্থান—স্বর্গবাসী-গণের রাজধানী—তাঁহারা দুর্ভেদ্য অজেয় নৈশর্গিক চিরতুষার বেষ্টিত গড়ের ভিতর নিরাপদে বাস করিতেছেন। আরও মনে হয় যে তাঁহারা যে উর্দ্ধ স্থানে রহিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত পৃথিবীই দেখিতেছেন। বিশেষ ভারতবাসী-গণ সর্ব্বদা তাঁহাদের নয়নের সমক্ষে রহিয়াছে, আমাদের কার্য্যাকার্য্য, পাপ পুণ্য, সুখদুঃখ সকলই তাঁহারা ঐ উচ্চশৃঙ্গ হইতে স্বর্গে বসিয়া দেখিতেছেন। যাহারা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া মানেন, তাহাদের কার্য্যাকার্য্যও দেখি-তেছেন, যাহারা না মানেন তাহাদেরও দেখিতেছেন। আমাদের সুখদুঃখও তাঁহারা দেখিতেছেন। তাঁহাদের দিব্যচক্ষু দূরত্বে ও উচ্চতায় ক্ষীণবল হয় না। এই ভাবনায় একটু ভয়ও আছে, একটু ভরসাও আছে। ভয় যে আমাদের কৃত দুষ্কর্ম্ম সকলই তাঁহারা দেখিতেছেন, ভরসা যে তাঁহারা আমা-দের দেবতা, আমাদের দারুণ কষ্ট দেখিয়া, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি বা না চিনি, মানি বা না মানি, কষ্টের পরাকাষ্ঠা হইলেই উদ্ধার করিবেন। আমরা আজও দেবতার দৃষ্টির উপর আছি।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

রাজরাজেশ্বরী।

রাজবিদ্যা রাজগৃহ্য তুমি মা জননী।
ষোড়শী রূপসী বামা অবিদ্যা-নাশিনী॥
হৃদয়ের গুহামাঝে মহাভূত পঞ্চ।
শিরোপরে ধরিয়াছে মহাব্যোম-মঞ্চ॥
যে মঞ্চে শায়িত হের তত্ত্ব অহংকার।
বাঁকানালে পদ্ম এক নাভিকূপে তাঁর॥
প্রেম-মধু হৃদে ধরি মত্ত কমলিনী।
স্বামী সঙ্গে রতি তরে হ'ল পাগলিনী॥
জগত ঈশ্বর দেব পুরুষ প্রধান।
কর্ণিকা মধুতে তেজ করিল আধান॥
জ্যোতিবিন্দু সেই বীজ মধু সঙ্গে মিশি।
উৎপাদিল কন্যা সদ্য ষোড়শী রূপসী॥
সাধক দেখিয়া ভাবে একি চমৎকার।
অনুপম হেরি মাগো এরূপ তোমার॥

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

মহাযাত্রা।*

প্রথম সর্গ।

পঙ্কজবাসিনী দেবী, উৎকল ভারতি
সারলে, কি কৈলা কহ, কুরুচূড়ামণি,(১)
শুনিলা যেকালে বীর বার্ত্তাবহ মুখে
প্রভাসেতে যাদবের জ্ঞাতিক্ষয়কারী(২)
মহাহব, ধীরমণি ধৈর্য্য ধরি আহা,
কেমনে শুনিলা সেই দারুণ বারতা?
কি কৈলা, শুনিয়া বীর যাদব-বান্ধব
যদুবংশ অবতংস যাদবপতির
ত্রিদিব প্রয়াণ বার্ত্তা কহ কৃপা করি।
যদুবংশ ধ্বংস শুনি কুরুচূড়ামণি
যুধিষ্ঠির, কিরীটীরে কহিলা সম্বোধি
হে বীর দুস্তর কুরু সমরসাগরে
(তিমি তিমিঙ্গিলরূপে ভ্রমিলা ভৈরবে
যথা মহা রথীপতি ভীষ্ম দ্রোণ আদি)(৩)
যে মহা পুরুষ নিজ কৃপা তরণীতে
পার কৈলা পাণ্ডবেরে কর্ণধাররূপে,
চ'লেছিল অবিরত যাঁহার শ্রীকরে
ক্রীড়ার পুত্তলীবৎ কোটী কোটী প্রাণী,
গেলা মর্ত্ত্যধাম ত্যজি নিজধামে সেই
কেশব, কি সুখে আর রহিব সংসারে!
সংসারের লীলাখেলা ফুরাইল মম,
সংসার বিষয়বিষে জর জর হ'য়ে
সারতত্ত্ব পাশরিয়া ক্ষেপিলাম আয়ু,
দুঃখময় এই ভব, মহা সুখ বলি
বলয়ে জগত যারে, জড়িত সে সদা
মহাদুঃখে, আলোক সে জড়িত তমসে;
হত হৈলা সুযোধন কুরুক্ষেত্র রণে (৪)
বিজয় লভিয়া মোরা জীবন্তে মরিনু;
পুত্রমিত্র রক্তস্রোতে সন্তরি সন্তাপে,
সন্তাপের সিংহাসন কেবল লভিনু;
ভঙ্গুর ভবের, ভাই, সুখ এইমত!
ধন্য সেই আত্মচেতা ঋষিবৃন্দভবে

*উৎকল কবিগুরু বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইনেস্‌পেক্টর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর মহাশয় প্রণীত উৎকল কাব্য "মহাযাত্রা" হইতে অনুবাদিত। লেখিকা।

(১)সারলা দেবীর মন্দির মহানদীর অদূরবর্ত্তী ঝঙ্কর গ্রামে অবস্থিত উড়িষ্যা প্রদেশে এই দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত।

(২)প্রভাস—দ্বারকার অদূরবর্ত্তী সমুদ্রকুলস্থিত তীর্থ। ঋষি-অভিশপ্ত যদুবংশীয়গণ এই স্থানে সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল।

(৩)ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীর প্রধানগণ দুর্য্যোধন পক্ষে থাকা প্রযুক্ত রণসমুদ্রের তিমি তিমিঙ্গিলরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

(৪)সুযোধন—দুর্য্যোধন।

বিষয় বিমুখ হ'য়ে সাধেন সতত
সুখ বৃদ্ধি তৃষ্ণা ক্ষয়ে, তৃষ্ণালয়ে পুনঃ
সীমাতীত সুখরাজ্যে বিচরেন সদা,
কাল-অপেক্ষায় র'ন নিরুদ্বেগে বসি,
এ জীবন নহে স্থির মৃত্যু স্থির শুধু
নিশ্চয় এ মৃৎঘট মিশিবে মাটিতে,
সর্ব্বহর কাল মহা বলী হ'তে বলী!
কঠোর এ ধনু তোর, কঠোর ভীমের—
মহাগদা, গ্রাসয়ে সে পক্ক রম্ভাসম,
লাগায়ে রেখেছ ফাঁস সারা বিশ্বগলে,
কি রাজা, কি প্রজা, কিবা বীর কিবা
ভীরু, গুণী গুণহীন, কিবা সুন্দর,
কুৎসিত, প্রবল দুর্ব্বল আর কি নির্ধনধনী
তার গুপ্তফাঁসে কেহ না লভে মুকতি।
জন্মিবার আগে সেই ফাঁস পরি গলে
হয়ত ভূমিষ্ঠ জীব মাতৃগর্ভ হ'তে।
নিজ দিন ক্ষণ বুঝি দুরন্ত সংহারী
অতর্কিতে সংহারিবে সে ফাঁস টানিয়া,
কারো অপেক্ষায় কাল না রহে বসিয়া
পাসরিলে তারে সেত কভু না পাসরে।
অদ্ভুত সে চোর তারে তোরণ রোধিলে
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পুরে পশে অনায়াসে,
তালাবদ্ধ গৃহে গিয়া পশে অকুণ্ঠিতে—
না ভাঙিয়া সেই তালা, দস্যুচূড়ামণি।
সে আসিয়া অন্বেষণ করিবার আগে
এ ভবের মায়া পাশ ছেদন করিয়া
চল হে বীরেন্দ্র মোরা খুঁজিব কালেরে।
কহিলা কিরীটী তবে অগ্রজ চরণে—
হে রাজন, কাল কারে' না দিবে ছাড়িয়া
সবাকারে যথাকালে লবে সে অন্বেষি,
তবে এসংসারে আর প্রয়োজন কিবা?
আমিও তোমার সাথে গিয়া হে নৃমণি
খুঁজিব তাহারে প্রভু, এ বাসনা মনে।
ভীম, মাদ্রীপুত্রদ্বয় কিরীটী বচনে
জানাইলা অভিমতি পরম আগ্রহে,
হিমাদ্রী প্রয়ানে সবে করিলা বাসনা।
শুনি এ সঙ্কল্প দেবী দ্রুপদনন্দিনী
সহচরীরূপে যাত্রা করিবার তরে
করিলা বিনয় বহু ভূপতিচরণে।
কাঁদিয়া কহিলা দেবী গদ গদ ভাষে
পাণ্ডবের বন্ধু বলি উড়াইলা ধ্বজা
ভুবনে যে মহা প্রভু সে প্রভু বিহনে
পাণ্ডবের প্রয়োজন কিবা এ সংসারে?
কি সুখ সংসারে থাকি পাণ্ডব বিহনে
পাণ্ডব-শরণা দীনা দ্রুপদবালার?
কি সুখ হে পাণ্ডুনাথ, এ দগ্ধ পরাণে
গৃহে থাকি, থাক্ গৃহ গৃহসুখ ল'য়ে,
রাজ্য রাজ্যসুখ লয়ে, এ দুয়েরে ছাড়ি'
ছায়াপ্রায় বিচরিব বনে তব সাথে,
সুখী ছিনু বনে, দুঃখী হনু সিংহাসনে।
দুঃখী কোথা পায় স্থান ভব-কোলাহলে?
দুঃখী খোঁজে নিরজন, দুঃখীর নয়নে
সংসার সম্পদ হায় মহাবিড়ম্বনা
নলিনী নয়নে, নাথ, চন্দ্রিকা যেমতি।
সম্পদ দুঃখীর দুঃখ না পারে মিটাতে,
বিছায় কেবল মাত্র কণ্টক সে পথে
সমবেদনার নাথ, এই তার রীতি।
ভেদাভেদ বাছিবার প্রাসাদ কুটীরে

গিয়াছে সে দিন মোর চিরদিন লাগি,
নহি প্রভু শুধু আমি সম্পদ সঙ্গিনী
পাণ্ডবের, পূর্ব্বে যথা সেবিতাম বনে
চরণে তোমার, এবে সেবিব তেমতি
এই ভিক্ষা মাগে দাসী তোমার চরণে!
বিজ্ঞমণি যুধিষ্ঠির যাজ্ঞসেনী বাণী
শুনিয়া সঙ্গিনী হ'তে দিলা অনুমতি।
তবে রাজসিংহাসনে অভিমন্যুসুতে
অভিষিক্ত যথাবিধি করি নরমণি
বৈশ্যগর্ভজাত শান্ত ধৃতরাষ্ট্রসুত
যুযুৎসুরে নিয়োজিলা প্রতিনিধি পদে
শৈশবে সাম্রাজ্য তাঁর শাসনের তরে।
তবে বৃদ্ধা সুভদ্রারে আনিয়া আহ্বানি
কহিলা "এ শিশু দেবি, মোর অন্তে হবে
দণ্ডধর, হস্তিনার রাজসিংহাসনে,
একমাত্র কুলাঙ্কুর, এই কুরুকুলে!
একটি প্রসূন, আহা বিশ্বে বিশ্বগ্রাসী
কাল দাবানলে মুক্ত কুরুবংশ বনে।(৫)
ভবতলে জীবন্ত এ করুণার ছবি
কালদর্পহারী ভক্তবৎসল হরির।
পতি পিতৃ ভ্রাতৃশোকে আতুরা উত্তরা
অশ্বত্থামা অস্ত্রানলে ত্রস্ত চিত্তে যবে
বিকলে শরণ নিলা শরণবৎসল-
পাদপদ্মে, চক্রায়ুধ চক্র অন্তরালে
দুঃখিনীর সেই গর্ভ আচ্ছাদি ঝটিতে
রক্ষিলা শিশুর প্রাণ জননীর সহ।
পালিও শিশুরে দেবী পরম যতনে
গৃহাশ্রমে মোর এই অন্তিম আদেশে।"
সুভদ্রারে এই মতে আদেশি নৃমণি
আচরিলা শ্রাদ্ধবিধি মাতুলবংশের,
উগ্রসেন, বসুদেব, আদি গুরুজনে
বিহিত বিধানে দিয়া প্রেত জলাঞ্জলি;
অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য-পিতা ভরদ্বাজ;
বদরিকাশ্রমবাসী ঋষি দ্বৈপায়ন
(ভারত-ভারতী যাঁর রসনা নর্ত্তকী)
সূর্য্যশিষ্য যাজ্ঞবল্ক সংহিতা প্রণেতা
যজ্ঞরত জনকের গুরু পুরাতন,
মার্কণ্ডেয় কল্পজীবি, দেবর্ষি নারদ
অনন্তে অনন্ত নাম কীর্ত্তন রসিক
যে সঙ্গীতে প্রেমোল্লাসে প্রস্ফুরণচ্ছলে
লোমাঞ্চ লভয়ে নভে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
জ্ঞানেন্দ্র বাদরায়ণি আদি মুণিগণে
নানাদান দিলা রাজা আদরে আহ্বানি
গো, ভূমি, কাঞ্চন, বস্ত্র আভরণ রাশি
গজ, বাজী, সমুজ্জ্বল স্যন্দনাদি করি
স্বর্গত শারঙ্গপাণি কেশব উদ্দেশে।
কুলগুরু কৃপাচার্য্যপদে পরীক্ষিতে
সমর্পি কহিলা, গুরো! দাস অনুদাস
এ তোমার, বাল্যে যথা দয়া করি মোরে
শিখাইলে ধনুর্ব্বেদ, তেমনি বালকে
শিখাইবে, এই ভিক্ষা মাগি শ্রীচরণে।
ওহে রণবিশারদ সর্ব্বসেনাপতি
তোমাদের বাহুছায়ে বাড়ুক এ শিশু
উজ্জ্বলিতে হস্তিনার শূন্যসিংহাসনে

(৫)যুদ্ধে সমস্ত নিহত হইয়া একমাত্র পরীক্ষিত উত্তরাধিকারী ছিলেন।

মহাহবে তোমাদের অগ্রগামী হ'য়ে
কাঁপাইলা রণক্ষেত্র যেই বীর মণি
লঙ্ঘিয়া সমরধর্ম্ম দ্রোণ সেনাপতি
নিধন সাধিলা যার অসম সমরে,
কুরুসেনা বিমর্দ্দন পরব্যূহভেদী
সেই বীর অভিমন্যু-হৃদি-রক্তসদা
বহিছে এ শিশুদেহে, ইহা না বিস্মরি
রক্ষিবে শিশুরে নিজ দেহ আবরণে
নেত্রে নেত্র পত্র যথা রাখয়ে সঙ্কটে।
সাঙ্গ হ'ল আজি হ'তে রাজকার্য্য মম,
বিদায় সবারে যাচি করযোড়ি এবে
বনে ভ্রমি আচরিব আরণ্যক ব্রত।
ব্যথিত হইলা সবে একথা শুনিয়া
রাজ্য ত্যজি যাইবেন কাননে নৃমণি
এ দারুণ শোকবার্ত্তা ব্যাপি রাজপুরে
রাজপুর হ'তে দ্রুত নগরে প্রসরি
প্রতি জনপদে পুনঃ হ'য়ে বিঘোষিত
ডুবাইল শোকোচ্ছ্বাসে সমগ্র মেদিনী।
বলাবলি কৈলা লোকে যাঁর ছত্রতলে
রাজদণ্ড আছে বলি জানিতনা লোকে
দোষী দেখি না করিয়া সংহার তাহারে
দোষের সংস্কার মাত্র সাধিত যতনে
করুণা কোমল কায় যাঁর এ জগতে,
ত্রিলোকেতে পুণ্যশ্লোক সেই কুরুমণি
যাবেন মোদের ত্যজি, হা ধিক্ বিধাতা
সত্য কি সাধিল বাদ বিধি এতদিনে!
হে ধর্ম্ম হে সত্য আজি অনাথ হইলা
কে আর নিষ্কামে ধন প্রাণ মায়া ত্যজি
তোমারে, তোমার তরে ভজিবে এভবে
দয়া ক্ষমা এবে দোঁহে হইলে অধীরা
বিধবা মা বসুন্ধরা, বিধবা সন্ততি
হ'ল হায় এতদিনে দীনহীন প্রজা।
চৌদিক হইতে প্রজা আসি দলে দলে
(চৌদিকের হ্রদমুখে গিরিস্রোত যথা)
নগর প্রাঙ্গন প্লাবি নয়ন আসারে
নৃমণি চরণে কৈলা রহিতে মিনতি
ভবের ভঙ্গুর ভাব বুঝি কুরুমণি
দিয়াছিলা আত্মদান সুচেতা শাশ্বতে
তাই প্রজাদের মায়া পারিলা ছেদিতে।
সমাদরে যথাবিধি আমন্ত্রি ভূপতি
সামন্ত রাজন্য দলে, পৌর, জানপদে,
সজ্জীভূত হইলা মহাপ্রস্থানের লাগি।
চারি ভাই কৃষ্ণাসহ ত্যজিলা আগ্রহে
রত্নময় শিরস্ত্রাণ, সারসন ভূষা,
বসন ভাস্বর যেন গড়া সৌরকরে।
পিন্ধিলা বল্কল রায় ভীম সব্যসাচী
যমজ সোদর দোঁহে, মহা পাটেশ্বরী
দ্রুপদনন্দিনী পদ্মপলাশলোচনা।
বল্কলী রাজারে দেখি সবে হৃষ্ট মনে
সাজিলা মুহূর্ত্তে সবে আরণ্যক বেশে।
পূর্ব্বে দ্যূতে পরাজিত হয়ে পঞ্চ ভাই
কৃষ্ণাসহ যেই বেশে ত্যজেছিলা পুরী
পুরনারীবৃন্দ পুনঃ হায় সেই বেশে
দেখি সবে, জর জর হইলা মহাশোকে।
মর্ম্মভেদী হাহাকারে পুরিল নগরী;
নহিলা যাত্রীকগণ ভাগী এ বিষাদে
যেন রেখেছিলা চিত্ত মায়ামোহ পারে
তামস প্রপঞ্চাতীত অনাময় ধামে।

আচরিয়া কালোচিত যজ্ঞ পাণ্ডুসুতে
শোভনা হস্তিনা রৌপ্য রসনা জাহ্নবী
জলে, যজ্ঞানল তথা জলসাত করি,
কৃষ্ণা সঙ্গে পঞ্চ ভাই তেয়াগিলা পুরী;
হইল হস্তিনা যেন অনাথা অবীরা
বিকলা, যেমতি রাহুগ্রস্ত শশীকলা;
মহা শোকোচ্ছ্বাস হায় উঠিল চৌদিকে
উদ্বোলত সিন্ধু প্রায় লক্ষ লক্ষ প্রজা
গলদশ্রু নেত্রে মরি! দীনহীন বেশে
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি সবে চলিলা পশ্চাতে,
পাদচারী বল্কলিনী নেহারি কৃষ্ণারে
বক্ষে করাঘাত করি কাঁদে পুরাঙ্গনা
অলিন্দে, গবাক্ষে, দ্বারে, প্রাসাদশিখরে
চারি সহোদর সাথে দ্রুপদ কুমারী
চলিলা রাজেন্দ্র ত্যজি কুলরাজধানী।
স্নেহগুণে বদ্ধ শ্বনে চলিলা পশ্চাতে
চলিলা রাজেন্দ্র সহ লক্ষ লক্ষ প্রজা,
পাত্রমিত্র সভাসদ পুরজন আদি;
বহুদূর গিয়া গৃহে ফিরিবার তরে
রাজার বিনয়বাণী শুনি পুনঃ পুনঃ
"আরো কিছু দূর প্রভু আরো কিছু দূরে
দেহ অনুমতি মোরা যাই তব সাথে"
এইমতে প্রজাবৃন্দ করিলা মিনতি
বাষ্পাকুল নেত্রে, বাষ্পগদ্গদ বচনে।
ফিরিবে পাণ্ডব, আশা পুষেছিলা বুকে
কুরুপুরে, বৃথা আশা, আসে কি ফিরিয়া
সিন্ধুগামী স্রোত কিবা মেঘচ্যুত ধারা!
নেহারি দীনেশে সবে অস্তাচল চূড়ে,
কৃপ, যুযুৎসুর সাথে বাহুড়িলা সবে
মহাশোকে, রাজশূন্য পুরে পুরবাসী।
উলূপী নাগেন্দ্রকন্যা জহ্নুসুতা-স্রোতে
ঝাঁপিয়া করিলা গতি অতল পাতালে।
বাহুড়িলা পতিশোকে বিধুরাসুন্দরী
চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে নিজ দলবলে।

ইতি প্রথম সর্গ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

মৃত্যুর পর।

(৩১)

পাঠক মহাশয়কে দর্শন ও পুরাণের কথা অতি সংক্ষেপে শুনাইলাম। এক্ষণে মানবদেহের স্বরূপ বুঝাইব। এই শরীরকে তন্ত্রে মহাদেব কর্ম্মস্বরূপ দেহ বলিয়াছেন। শাক্তানন্দতরঙ্গিনী প্রথম উল্লাস দেখুন—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শরীরং কর্ম্মরূপিণম্।
রজস্বলা চ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে,
পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে,
ভগলিঙ্গসমাযোগান্মৈথুনং স্যাত্তথা তয়োঃ।

অন্যোঽন্যস্পর্শনাদ্দেবি জায়তে চ মহৎ সুখম্।
ক্ষরতে চ তদা রেতঃ প্রাণাপানবিসংশ্রিতেঃ॥ ইত্যাদি।

এই সময় মানবশরীরের রক্ত ও শুক্র মধ্যে পঞ্চ তত্ত্বের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। সেই সময় পূর্ব্বোক্ত শোণিত ও রেত বায়ু দ্বারা স্ত্রীর নাভিরন্ধ্রে তাড়িত হয়। ঐ বায়ু ঐ মিশ্রিত রক্তবীজ হইতেই, কুম্ভকার যেমন চক্রের উপর রাখিয়া মৃত্তিকার নানারূপ গঠন করে, প্রাণিদেহ গঠন করে। ঐ রক্তবীজ প্রথম রাত্রিতে কললাকার হয় ও পঞ্চম রাত্রে বুদ্বুদ, দশম রাত্রে উহাতে শোণিত সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশ চতুর্দ্দশ রাত্রিতে মাংসপিণ্ড হয়। এই বীজই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অঙ্কুর, ইহার অভ্যন্তরে কঙ্কালদণ্ড সুমেরুরূপে প্রকাশিত হয় ইহারই মধ্যে যাবতীয় ভূত ও দেবাদির আবাস আছে। প্রাণীর হৃদয়ে "জীব" অবস্থিত করে—আকৃতি দীপকলিকার ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গুণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট। এই জীব পরিবারগণ পরিবৃত হইয়া বাস করে। পরিবার কাহারা? দুই চক্ষু, দুই নাসা, দুই কর্ণ, জিহ্বা, দুই হস্ত, দুই পদ, গুহ্য, উপস্থ, নাভি, মন, আর জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা—ইহারাই জীবের পরিবার। কিন্তু মনই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক—সারথি, মনই পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম করাইয়া আত্মার বন্ধন সংঘটন করে, জীব তখন সৎসঙ্গে সৎকার্য্য ও অসৎসঙ্গে অসৎকার্য্য করে। এই জীব তখন শুদ্ধ সত্তাত্মক ও সদসৎকার্য্য রহিত অবস্থাপন্ন হইয়াও কেবল মনের সংযোগ বশত ক্রিয়া করিতে থাকেন। দুই মাস অতিক্রম করিলে জীবের দেহে মেদ সঞ্চার হয়, তিন মাসে অস্থি ও মজ্জা ও চতুর্থ মাসে ত্বক ও কেশ এবং পঞ্চম মাসে চক্ষু কর্ণ নাসিকা মুখ ও উদর উদ্ভব হয়। ক্রমে শুক্র হইতে রক্ত ও রক্ত হইতে বিন্দু; প্রাণ হইতে বায়ু; অপান হইতে কালাগ্নি হয়। শুক্র হইতে নাড়ী ও অগ্নি, মাংস হইতে মল ও মজ্জা, বায়ু হইতে প্রাণ, অপান হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আবার শুক্র হইতে প্রাণীর নাসিকা ও জিহ্বা, রক্ত হইতে নেত্রদ্বয় এবং প্রাণ হইতে নাসারন্ধ্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ছয় মাস পূর্ণ হইলে মুখ ও পদ। সপ্তমে সর্ব্বাঙ্গ হয়, সমস্ত সন্ধিস্থান অষ্টম মাসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। "অণ্ডাধার কঙ্কাল ও গুদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দ্বাত্রিংশৎ গ্রন্থি আছে, উহা জ্ঞানগম্য, তন্মধ্যে সমস্ত নাড়ী অবস্থিত।"

জীবদেহে প্রধান নাড়ী দশটি, যথা. ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু, শঙ্খিনী। সমস্ত ক্ষুদ্র নাড়ীর সংখ্যা ৭২০০০। দেহের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্না, বাম চক্ষে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষে হস্তিজিহ্বা, বামকর্ণে যশস্বিনী, দক্ষিণ কর্ণে পুষা, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহু এবং মাথার উপরিভাগে শঙ্খিনী নাড়ী। শরীরের সমস্ত দ্বার এই দশ নাড়ী দ্বারা আবৃত হইয়াছে।

পঞ্চতত্ত্ব লইয়া বহির্জগৎ আর পঞ্চতত্ত্ব লইয়াই অন্তর্জগৎ। পঞ্চতত্ত্ব হইতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ। পৃথিবীর গুণ হইতেছে—অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, রোম, মাংস। জলের গুণে হইতেছে—মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা, শোণিত। তেজের গুণে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ, কান্তি। বায়ুর গুণ—বিরোধ, আক্ষেপণ, আকুঞ্চন, ধারণ, তৃপ্তি। আকাশের গুণ—রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভয়, লজ্জা। বায়ু দশটি—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়। "হৃদয়ে প্রাণ, গুদে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান, সর্ব্বশরীরে ব্যান। এই পঞ্চ বায়ুই প্রধান বলিয়া পরিগণিত।"

এই শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, এই মানবশরীরে তৎসমস্তই বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন আছে—সপ্তস্বর্গ বা লোক ও সপ্ত পাতাল। নাভিতে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবোলোক, কণ্ঠে স্বর্লোক, দুই চক্ষে মহোর্লোক, চক্ষুর্দ্বয়ের উর্দ্ধদেশে জনলোক, কপালে তপোলোক আর সর্ব্বশেষ মস্তকে সত্যলোক। এইবার সপ্ত পাতাল। পদের অধোদেশ অতল, তাহারই উপর অংশ বিতল, দুই জানুতে সুতল, জানুসন্ধিতে তল, গুল্ফ মধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল, কটিদেশে পাতাল। ব্রহ্মাণ্ডে যেমন সপ্তকুল পর্ব্বত, সপ্তদ্বীপ এবং সপ্ত সমুদ্র আছে, দেহ-ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ আছে। মূত্রে লবণসমুদ্র, শুক্রে ক্ষীর, মজ্জাতে দধি, চর্ম্মে ঘৃত, রসে জল, কটিরক্তে ইক্ষু এবং শোণিতে সুরা সাগর বর্ত্তমান। ত্রিকোণাকার শরীর মধ্যে মেরু, রুদ্রলোকে মন্দর, দক্ষিণ কোণে কৈলাস, বামকোণে হিমালয় এবং তাহার উর্দ্ধদেশে বিন্ধ্য ও বিষ্ণু এই সকল পর্ব্বত আছে। অস্থিতে জম্বুদ্বীপ, মাংসে কুশদ্বীপ, শিরায় ক্রৌঞ্চ, রক্তে শাক, সর্ব্বসন্ধিস্থানে শাল্মলী, লোমে প্লক্ষ, নাভিতে পুষ্কর আছে। এই শরীরে আবার গ্রহগণ

আছেন। নাদচক্রে সূর্য্য, বিন্দুচক্রে চন্দ্র, লোচনে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে গুরু, শুক্রে শুক্র, নাভিচক্রে শনি, মুখে রাহু এবং পদে ও নাভিতে কেতু বর্ত্তমান।

নবম মাসে গর্ভস্থ জীব পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্য স্মরণ করিতে সমর্থ হয়, আর কর্ম্মফল যে অবশ্য ভুগিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারে, তখন গর্ভের ঘোর অন্ধকারে ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে সুখদুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া বাস করিতে থাকে। মাতার নাভিতে মুখ দিয়া জননীর ভুক্তবস্তুর রস গ্রহণ করিয়া জীব জীবিত থাকে। রস গ্রহণ করিতে অপারগ হইলে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। গর্ভবাস ক্লেশ অনুভব করিয়া জীব তখন মনে করে, এবার জন্মিয়া আর পাপ করিব না কেবল সাধনা করিব ও যোগসাধন করিয়া মুক্ত হইব। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা কতক্ষণ? যতক্ষণ না গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। প্রসব বায়ুর প্রবল তাড়নায় ও যোনিরন্ধ্রের নিদারুণ নিষ্পীড়নে জীব সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ভূপতিত হয়; এমন কি বুঝিতেও পারে না যে গর্ভ হইতে পতিত হইয়াছে। মহামায়ার মায়াবশে সমস্তই ভুলিয়া যায়, কেবল একমাত্র ক্ষুধার তাড়নায় জননীকে অন্বেষণ করে এবং কাঁদিয়া উঠে। গভীর দুঃখে ভক্ত দাশরথী গাহিয়াছেন—

আমি আছি মা তারিণী ঋণী তব রাঙ্গা পায়।
মা আমার অনুপায়॥
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে বল্লাম, এবার পূজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লাম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ওমা ত্রিপত্র দিব তোমার শ্রীপদে;
ওমা ধরাতে পতিত হয়ে, আছি মা পতিত হয়ে,
পতিত পাবনী ভুলে মা তোমায়।

স্ত্রীপুরুষ সংযোগ সময়ে যদি পিতার শুক্র বেশী হয় তবে পুত্র জন্মায়, মাতার আর্ত্তব রক্ত অধিক হইলে কন্যা জন্মায় আর উভয়ের পরিমাণ সমান হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। মহাদেব বলিয়াছেন—

পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ।
আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ॥

গর্ভস্থ জীবের এই কয়টি বিষয় নিশ্চয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে—পরমায়ু, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা এবং মৃত্যু। তবেই জাত বালক এই কয়টি বিষয় লইয়াই

পৃথিবীতে বিচরণ করে। আমি কতদিন বাঁচিব, আমি ভবে আসিয়া কি কর্ম্ম করিব, আমার ধন সম্পত্তি কিরূপ হইবে, আমার কি বিদ্যালাভ হইবে ও আমার মৃত্যু কিরূপে সংঘটিত হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ঠিক করিয়া আসিয়াছি—বিধাতা যে সনন্দ আমায় দিয়াছেন, তাহা আর নড়চড় হইবে না, তাহা তাঁহার দেওয়া নহে, তাহা আমার চাহিয়া লওয়া, যেহেতু তাহা আমারই কর্ম্মফল। সুতরাং বুঝিতে হইবে আমার ভাগ্য-বিধাতা আমি নিজে—তজ্জন্য কাহাকেও দোষী করিবার উপায় নাই। এই কথা জানা থাকিলে জগতে অনেক বিড়ম্বনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। বুঝিতে পারিবেন কেন রামশ্যাম দুই ভ্রাতার মধ্যে—পিতামাতার উভয়ের উপর সমান যত্ন থাকা সত্ত্বেও, সমান সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ ভাবে সমান ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াও একজন কুশাগ্রধী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহা মহোপাধ্যায় হইলেন আর কেন একজন ঘোর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বেশ্যাসক্ত মদ্যপ মহামুর্খ সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য যে অমাবস্যার দিনকে পূর্ণিমা বলিয়া রাজ সভায় প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কেন আজ ইংলণ্ডের মহানুভব সপ্তম এডবার্ড ধরাধামে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট আর কেন আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর কেন ঐ কাঙ্গালিনী শতচ্ছিদ্র শতগ্রন্থি দুর্গন্ধময় কাপড় পড়িয়া কাতরস্বরে দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছে, দেখিলে অশ্রুসংবরণ কঠিন হইয়া উঠে? আর্য্যঋষিগণ এই কথা বুঝিয়াই জাতিভেদ প্রথা প্রচার করিয়া ভারতের পরম মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাহার কল্যাণে আজ শত শত বৎসরের দৈব দুর্ব্বিপাকে ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সমাজ আজ মাথা উঁচু করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। আর জাতিভেদ প্রথা না থাকায়, পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফলের কথা না জানায়, য়ুরোপ আমেরিকায় কি ভয়ানক বিষময় অনর্থপাত ঘটিয়াছে দেখিয়াছেন কি? ভারতের লোকে বুঝে যে নেপালেশ্বর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলেই আজি ধরাধামে রাজত্ব করিতেছেন আর সেই কর্ম্মফল কষাঘাতেই ঐ কাঙ্গালিনী ভিক্ষালব্ধ অন্নে কোনক্রমে জীবযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সে বুঝে যেমন দিয়াছি তেমনি পাইব, দিই নাই এ জন্মে পাইব কেন? অনর্থক পরের ভাল দেখিয়া চক্ষু টাটাইলে কোন ফল নাই। বরং ভগবানকে ডাকি পরজন্মে আমার ভাল হইতে পারে। কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকার লোক সে কথা মানে না, সে কথা জানে না, সে কথা বুঝে না। য়ুরোপের লোক বলে

রাজারও দুই হাত দুই পা, আমারও দুই হাত দুই পা, সেও মানুষ আমিও মানুষ, কেন সে রাজা হবে আর কেন আমি কাঙ্গালি হব, কেন সে স্বর্ণথালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন আহার করিবে আর কেন আমি অনশনে দিনযাপন করিব? সমান হইব সমান করিব, ধরাধামে রাজা রাখিব না, রাজাকে হত্যা করিব, মন্ত্রীকে হত্যা করিব, ধনীকে হত্যা করিব, রাজাপ্রজা থাকিবে না, সকলে জমী সমানভাবে ভাগ করিয়া লইব সকলে সমান হইব। এই কথা বলিয়া এই মন্ত্র লইয়া তাহারা সাধনা আরম্ভ করিয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, গুপ্ত সভাসমিতি করিয়াছে, সংবাদ পত্র বাহির করিয়াছে, পুস্তক ছাপাইয়াছে, শপথ লইয়া লোকহত্যাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের হাতে প্রাণ দিয়াছেন, রুষের জার, ইতালীর রাজা, অষ্ট্রীয়ার রাণী, বিলাতের মন্ত্রী, ফরাশি ও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট। এই সকল লোকের ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়াছে। দলের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে, নাম হইয়াছে—নিহিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, কমুনিষ্ট ইত্যাদি। য়ুরোপ আমেরিকা এই দারুণ সমাজবিপ্লবে এই নির্ম্মম সমাজদ্রোহিতায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সমাজ, শান্তি, সভ্যতা বড় লোকের প্রাণ, যায় যায়। পাশ্চাত্য সমাজে, সভ্যজগতে মহা প্রলয় উপস্থিত, ভারতেও সেই তরঙ্গের আঘাত লাগিবে না একথা কে বলিতে পারে? যাহাতে এই মহাপাপ ভারতে না প্রবিষ্ট হইতে পারে সমাজের নেতাগণের তাহা সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য। হিন্দুর চক্ষে রাজা ভগবানের অবতার।

কথার পিঠে কথা আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাহৌক এখন জাতবালক পূর্ণ মনুষ্যপরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছে মনে করিলে তাহাকে কি কি অবস্থা অতিক্রম করিতে হইবে দেখা যাউক। মনুষ্যের পূর্ণ পরমায়ু ১২০ বৎসর। এই ১২০ বৎসর দশ অবস্থায় বিভাগ হইয়াছে, এই জন্য প্রচলিত কথায় বলে পুরুষের দশদশা। এই দশটি অবস্থা হইতেছে শিশু, পৌগণ্ড, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, অতিপ্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, পলিত এবং মরণ।

ক্রমশঃ।

জীবন-সন্ধ্যা।

Where falls not hail nor rain nor any snow.

ব্রজের খেলা সাঙ্গ হোলো
সন্ধ্যা হোলো নীল গগনে
এখন যেতে হবে এক অজানা দেশে
নামটীও তার নাহিক মনে।

কোন্ দিকে সে কেমন ধারা
আলো আছে না আঁধার ভরা
জানা শোনা চেনা দেখা
কেউ বুঝি নাই তেমন থানে।

ভালবাসে হৃদয় পূরে
ছেড়ে যাব তাদের দূরে
অচেনা সেই অজানা ঠাঁই
কেউ চাবে না আমার পানে।

রাঙ্গা রবির মোহন ছবি
চাঁদের আলোর লহর লীলা
সেথা নাহিক নদী শিশির কণা
ঘাস পাতা গাছ শ্যামল শিলা।

সেথা গায়না পাখী মধুর সুরে
বয়না বায়ু চুপে চুপে
এলোকেশে আর হাসিমুখে
চায়না নারী অরূপ রূপে।

নাহি অট্টহাসি শিশুর খেলা
ধুলা মাখা দুইটি বেলা
চোখে চোখে তাড়িত লীলা
ব্রজবালার মোহন মেলা।

চরবে না আর ব্রজে ধেনু
বাজবে না আর মোহন বেণু
সাঙ্গ হোলো ব্রজের খেলা
সন্ধ্যা হোলো নীল গগনে
এখন যেতে হবে সেই অজানা দেশে
নামটীও তার নাহিক মনে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

সাহিত্য, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। "হিমারণ্যে" একস্থানে দেখিলাম "আমার জীবনদাতা পরমসহায় অজ্ঞান তিমির নাশক গুরুদেবের কৃপাকণা সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছে, আমার যাহা কিছু হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে, তাহা একমাত্র গুরুপ্রসাদের ফল। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিব্বতের হিমারণ্য ভ্রমণ করিতেছি, পর্ব্বত প্রমাণ বিপদ তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে। আমি দুর্ব্বল, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত শরীরের বল হারাইয়াছি, অনেক কাল নষ্ট করিবার পর জাগরিত হইয়াছি বলিয়া যোগবল সঞ্চয় করিতে পারি নাই। অর্থবলের পরিচয় কৌপীন, জ্ঞানবল একেবারে নাই, তবে গুরুবল ও দেহবলের উপর বিশ্বাস করিয়া এই তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। আমি আমার পরবর্ত্তী ভ্রমণকারীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, যে কোন উপাসকসম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, তাঁহারা যেন স্বীয় উপাস্যের উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাত্রা করেন, তাহা হইলে অনায়াসে হিমারণ্য উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।" কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হওয়া উচিৎ। লেখক ভারতী মহাশয় কৈলাস পর্ব্বতে একটি নিশানযুক্ত শ্মশান দর্শন করেন। সঙ্গীমুখে শুনেন যে যখন কাহারও মৃত্যু হয়, তখন লামারা আসিয়া গণনা করিয়া দেখেন, ইহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিরূপ করিতে হইবে, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, 'মৃত্যুচিহ্ন দেখিয়া সেইরূপ স্থির করা হয়।' * * কাহারও কাহারও দেহ পর্ব্বতে অক্ষুণ্ণভাবে রাখা হয়। কাহারও হস্তপদ কাটিয়া অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। কাহারও শরীরের মাংস পক্ষীদিগকে বিতরণ করা হয়। কাহারও হস্তপদ ও মাথা কাটিয়া মঠে রাখা হয়; তারপর মাংস গুলি শুষ্ক হইলে, নরকপাল দেবালয়ে স্থাপিত করা হয়। হস্ত ও পদের নলি পরিষ্কার করিয়া তাহা দ্বারা দেবালয়ে বাদ্য হইয়া থাকে। হস্ত ও পদের নলি শঙ্খের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, ইহার শব্দ শঙ্খ হইতেও গভীর ও মধুর। যাহাদের অদৃষ্ট মন্দ যাহারা পাপী, তাহাদের দেহকে কোন প্রকার বিকৃত করা হয় না। ঐ পাহাড়ের উপরই রাখিয়া দেওয়া হয় এবং কোন পশু বা পক্ষী স্পর্শও করে না।" এই দেশে মৃতদেহ ভস্মীভূত বা সমাহিত হয় না। সাধুগণের উত্তরাখণ্ডের উপর প্রগাঢ় মমতা কেন তাহা এখন বেশ বুঝা গেল। আরও হিন্দুধর্ম্ম কি বুঝিতে হইলে তিব্বৎ যাওয়া উচিৎ। কার্ত্তিকের চিত্রশালায় "প্রেমের সুপ্তি" ও "প্রেমের জাগরণ" মনোজ্ঞ। অগ্রহায়ণের সাহিত্যে কংগ্রেসের সভাপতিগণের প্রতিকৃতি আছে ও 'কংগ্রেস' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। লেখক বলিয়াছেন "কংগ্রেস ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনের সঞ্চার করিয়াছে, কংগ্রেস হইতে আমরা অনেক আশা করি।" আমাদের মতে কংগ্রেসের সংস্কার হওয়া উচিৎ। এবারকার হিমারণ্যে কৈলাস পর্ব্বত পরিক্রমণ ও গৌরীকুণ্ড যাত্রার কথা আছে। শুনিলাম লেখক ভারতী মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। দুঃখের কথা। সাহিত্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে।

ভারতী, কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন ১৩০৮। ভারতী বর্ত্তমান সম্পাদিকার হস্তে অনেক প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রধান গুণ এই যে ঠিক নিয়মিত সময়ে বাহির হয়। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার পক্ষে ইহা নিতান্ত গৌরবের কথা। "সেরামালী" আনন্দময়। "ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস" লেখকের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। "ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য নাম করিবার উপায় আরও সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে পুনরাগমন করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে তান্ত্রিকধর্ম্মে পরিণত হইল এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্ম্মের সারমর্ম্ম স্বীয় ধর্ম্মে গ্রহণ করিয়া যে অত্যুদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ভারত হইতে "বৌদ্ধ" এই নাম লুপ্ত হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণগণ মতলব করিয়া কোন কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। কোন প্রমাণ থাকিলে লেখকের তাহা প্রদর্শন করা উচিৎ ছিল। অল্পকাল পরেই ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিল, "বুদ্ধ" কি "বৌদ্ধ" কি, আর বৌদ্ধ বুঝিয়াছিল ব্রাহ্মণ কি ও তাঁহার শাস্ত্র কি। যখন বুঝিল, কেবল কথা লইয়া বিবাদ ভাবে ঠিক আছে, তখন উভয়ে কোলাকুলি করিয়াছিল এবং উভয়ের বলে উভয়ে বলী হইয়াছিল। লেখক বলিয়াছেন "এই তান্ত্রিক ব্যাপার সমূহ অতীব ভীষণ। কেহ কেহ বলেন ঐ ক্রিয়া সমূহের আধ্যাত্মিক অর্থ অতীব উচ্চ। উহাদের আভ্যন্তরিণ তাৎপর্য্য যতই মহৎ হৌক না কেন, উহাদের বাহ্যভাব সমূহ নিতান্ত নিন্দনীয়। তন্ত্রশাস্ত্রের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, সে রহস্য এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই।" যিনি সে রহস্য উদ্ঘাটন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা অন্যায়। যিনি সে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন তিনি জগদম্বার পাদপদ্মে মনভৃঙ্গকে প্রাণভরিয়া মধুপান করাইতেছেন, তাঁহার আর গুণ গুণ শব্দ নাই। কুশাগ্রধী ভক্তিমান ধর্ম্মভীরু আস্তিক মহাত্মাগণ, যাঁহারা কেবল পরকাল লইয়াই ব্যস্ত, কেন 'নিন্দনীয়' তন্ত্রশাস্ত্রে আস্থাবান এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাপ ঘুচিয়া যায়। ব্যাস বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্য্যন্ত যে তন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে মজিয়াছেন, তাহাতে নিন্দার কিছুই নাই বুঝিতে হইবে। জগদম্বার কৃপায় এমন একদিন আসিবে যখন লোকে তন্ত্রের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিবে, ইহা ধ্রুব সত্য। আর সেই দিন হইতে ভারতের প্রকৃত মঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। ইহাও ধ্রুব সত্য।

ভারতীর উড়িষ্যা চিত্রগুলি একটু একঘেয়ে দাঁড়াইয়াছে। "মাহাত্ত শৈসা"র জীবনীতে শিখিবার কথা অনেক আছে। হিন্দুসমাজের শান্তি শীলতা" বেশ। "সচ্চরিত্র" রসভঙ্গ হইয়াছে। ভারতীতে চতুর্দ্দশ ভুবন প্রবন্ধে সপ্ত দেবলোকের সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভূর্লোক—ভারতবর্ষ। ভুব—"ভারতের পশ্চিম দিকে অপগস্থান পারস্য ও বাহ্লিকসনাথ স্বাধীন তাতার। স্ব বা স্বর্গ হইতেছে, ইলাবৃত বর্ষ, বর্ত্তমান আলটাই পর্ব্বত সনাথ মঙ্গোলিয়া। মহর্লোক শাইবিরিয়া ও চীন দেশের মধ্যে অভ্যন্তর ভাগে বিদ্যমান স্থান বিশেষ। জনলোক—চীন দেশ। তপলোক—সম্ভবতঃ

কোরিয়া ও সাইবিরিয়ার কিয়দংশ। সত্যলোক—বা ব্রহ্মলোক উত্তর মহা সাগরের দক্ষিণ বেলা পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। লেখকের মতে আফ্রিকা তখন সমুদ্রগর্ভে আর আমেরিকায় সপ্ত পাতাল। লেখক বলিয়াছেন বেদে য়ুরোপের নাম আছে, তাহা এই "হরিযূ-পীয়া"। চৈত্রের ভারতী দপ্তরী মহাশয়ের অত্যাচারে সম্পূর্ণ পাই নাই। একই ফর্ম্মা দুই তিনবার গাঁথিয়া দিয়াছেন। "শান্তি ও সংগ্রামে" দেখিলাম "সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এই দুই দেশেরই (চীন ও ভারত) প্রাচীন শান্তি প্রবণতা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সংগ্রামশীলতা অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যে সকল প্রাচীন রীতিনীতি তাহার অন্তরায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।" একথা কি সকলে স্বীকার করিবেন? ভারতীর অপর একজন লেখক—হিন্দুর ভাবি দশা লেখক বলিতেছেন "হিন্দুর যাহাতে পতন, তাহাতেই উত্থান"। * * "আইস আমরা আবার ধর্ম্মবলে বলীয়ান হই"। যাহাহৌক "হিন্দুর ভাবী দশা"র একস্থানে দেখিলাম "যাঁহারা বলেন, আবার হিন্দুরাজত্ব স্থাপিত হইবে, আবার সমস্ত ভারত—সমস্ত জগৎ হিন্দুময় হইয়া উঠিবে, তাঁহারা তাঁহাদের কথার কোন প্রমাণ দিতে পারেন না"। কাঁহারা এ কথা বলেন তাহা আমাদের জানা নাই। লেখক খুলিয়া বলিলে ভাল হইত। "যাঁহারা বলেন হিন্দুরা লাখে লাখে বাড়িতেছে, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত।" আমাদের পক্ষে ইহাও নূতন সংবাদ। ভারতী বেশ চলিতেছে। ভরষা করি ভারতী আপনার সুরের "জান্" বজায় রাখিবেন।

বীরভূমি, ভাদ্র ও আশ্বিন একত্রে, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ একত্রে আর পৌষের সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বীরভূমি বেশ চলিতেছে। পরিচালকগণের যত্নের ও পরিশ্রমের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক সুপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। আমরা "ফুল ও ফলের ভাষা" হইতে একটু তুলিয়া দিলাম—

যে ফুল যে ভাব পরিস্ফুট করে, সেই ফুলটিকে উল্টাইয়া ধরিলে, অর্থাৎ বোঁটাধার উপর করিয়া ধরিলে, ঠিক্ তাহার বিপরীত ভাব বিজ্ঞাপিত হয়। পত্র ও কণ্টকসহ গোলাপ কোরক প্রেরিত হইলে, বুঝিতে হইবে, যে আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে, কিন্তু আশাও করিতে পারি; কোরকটি উন্নতানত করিয়া প্রেরিত হইলে "তোমার আশা বা শঙ্কা কিছুই করিবার দরকার নাই।" আবার কোরকটি কণ্টক বিবর্জ্জিত করিলে, 'আশা করিবার বিশেষ

কারণ রহিয়াছে' ('There is everything to hope') এইরূপ এবং পত্র শূন্য করিলে শঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে (There is everything to fear) এইরূপ বুঝিতে হইবে। কোন এক প্রকার ফুল (Pausy) সোজাভাবে ধরিলে 'হৃদয়ের শান্তি' (Heart's ease) এবং উচ্চভাবে ধরিলে তাহার বিপরীত অর্থ বুঝায়। আবার এই ফুল যখন কাহাকেও হাতে হাতে সোজাভাবে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়, তখন সে ব্যক্তি' আমায় মনে রেখো।('Think of me') এইরূপ এবং উল্টাভাবে প্রদত্ত হইলে 'আমায় ভুলিয়া যাও' (Forget me), এইরূপ বুঝে। Amaryllis নামক এক প্রকার ফুল, অহঙ্কারের সংজ্ঞা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; পূর্ব্বোক্ত প্রথা অনুসারে 'my pride is humbled', 'your pride is checked' এই দুই ভাব ঊর্দ্ধাধঃ এবং বামদক্ষিণ দিকে নত করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। Wall-flower দুর্ভাগ্যের সময় অনুরক্ত থাকার চিহ্ন (Fidility in misfortune) বোঁটা ধরে উন্নত করিয়া কাহাকেও প্রদান করিলে, সেই ব্যক্তি দুঃখের সময় অবিশ্বাসের (unfaithful in trouble) কার্য্য করিয়াছিল, এইরূপ সূচিত হয়। আবার mary gold Flower হস্তে রাখিলে 'মনের কষ্ট (Trouble of mind) হৃদয়ে ধারণ করিলে বিপত্তি অথবা প্রীতি '(trouble or love) এবং বক্ষে ধারণ করিলে ক্লান্তি (weariness) বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

A, An এবং The এই তিনটি ইংরাজী (Article) শব্দ এক, দুই ও তিন শাখা বিশিষ্ট লতাগ্র ভাগ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবারও সহজ উপায় আছে। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা, যথাক্রমে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যক পত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এগার হইতে ঊনবিংশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বুঝাইতে হইলে, দশটি পাতায় অতিরিক্ত ফল সংযুক্ত করিতে হয়; যথা ১৩ তের বুঝাইতে হইলে, দশটি পত্রযুক্ত শাখায় তিনটি ফল সংযুক্ত করিতে হয়। ২০ হইতে ৯৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত ভিন্ন নিয়ম; যত দশক হইবে, দশ সংখ্যা পত্র বিশিষ্ট শাখায় ততটি যুক্ত পত্র সংলগ্ন করিতে হয়, বক্রী সংখ্যা ফলের দ্বারা জ্ঞাপিত করিতে হয়। যথা,

৫৫ বুঝাইতে হইলে, দশ পত্র বিশিষ্ট শাখার অগ্রভাগে পাঁচটি যুক্তপত্র সংশ্লিষ্ট করিলে পঞ্চাশ হইল, তাহাতে পূর্ব্বকার মত পাঁচটি ফলযুক্ত করিলে সর্ব্ব সমেত ৫৫ হইল। একশত হইলে দশটি দশপত্র বিশিষ্ট শাখা একটি বৃহৎ শাখায় সংযুক্ত থাকে, তাহাতে আবার যতটি পৃথক পত্র থাকিবে, তত শত বুঝিতে হইবে। খুচরা সংখ্যার নিয়ম পূর্ব্বকার মত। এই প্রকারে এক শত হইতে নয় শত নিরনব্বই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দশটি ফারণ পত্র থাকিলে সহস্র এবং তাহাতে যতটি অপর অপর পত্র সংলগ্ন থাকিবে, ততগুণ সহস্র বুঝিয়া লইতে হয়। এইরূপ ফল ও পত্রের দ্বারা, বয়স, জন্ম তারিখ প্রভৃতি অনায়াসেই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

কোন প্রণয়ী নিজ প্রণয়িনীর অষ্টাদশ জন্মোৎসবে পুষ্প ও পত্রের দ্বারা কিরূপ মনের অস্ফুটভাব, জলন্ত ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। একটি চির সবুজ (চির ভালবাসার নিদর্শন) পত্রে, মাল্যের ভিতর দশটি পত্র বিশিষ্ট শাখায় আটটি ফল সন্নিবেশিত করিয়া (অষ্টাদশ প্রণয়িনীর বয়ঃক্রম), তাহাতে একটি লাল গোলাপ কোরক (নির্ম্মল এবং সুন্দর) অথবা শ্বেত-পদ্ম (পবিত্র ও বিনীত) স্থাপিত করিবে; ইচ্ছা হইলে তাহাতে আরও পাঁচমুকুল (=আমি তোমার বন্দি), কারণ (=সরলতা) প্রদান করা যাইতে পারে।

সপ্তাহের সপ্ত বার ও বৎসরের দ্বাদশ মাস জ্ঞাপক করিবার ভিন্ন ব্যবস্থা আছে; সপ্তাহ যথা, সোমবারঃ—পদ্ম পত্র; সোমবার হইতে সৃষ্টির আরম্ভ, পদ্মপত্র সূর্য্যোদয়ে দিবারম্ভে প্রস্ফুটিত হয়।

মঙ্গলবারঃ—অর্দ্ধ শুভ্র ও অর্দ্ধ নীল বর্ণ পত্র; শুভ্রভাগ স্বর্গ এবং নীল অংশ সমুদ্রের চিহ্ন। সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

বুধবারঃ—ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পত্র; শুভ্রাংশে স্বর্গ, নীলাংশে জল এবং হরিতাংশে পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় দিবসে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

বৃহস্পতিবারঃ—হরিদ্বর্ণ পত্রের উপর একটি পুষ্প; কারণ সৃষ্টির চতুর্থ দিবসের কার্য্য Luminary.

শুক্রবারঃ—একটি কীট অধিষ্ঠিত একটি পত্র, শুক্রবার হইতে জীবের সৃষ্টি।

শনিবারঃ—ফলযুক্ত পত্র; শনিবার দিবস শাক্‌সব্‌জী ও ফলমূলের সৃষ্টি হয়।

রবিবারঃ—একটি অলিভ (Olive) পত্র; বিশ্রাম ও পবিত্রতার চিহ্ন।

পন্থা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক একত্রে ও অগ্রহায়ণ পাইয়াছি। পন্থা পূর্ব্বের ন্যায় ধীরে ধীরে ভ্রমণকারীকে আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতেছেন, ধীরে ধীরে জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ভরষা করি সম্পাদকযুগল প্রবন্ধ নির্ব্বাচন কার্য্যে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিবেন। "ক্রমশ" প্রবন্ধের এত ছড়াছড়িও কিছু নয়।

সাহিত্য-সংহিতা, আশ্বিন। সংহিতা আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া "ভারতে দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়" চিন্তা করিতেছেন, কুকীজাতির সংবাদ দিতেছেন, জাতীয় সাহিত্যের বাদ প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছেন, ধুরন্ধর কাঞ্জিলালের উপাখ্যান শুনাইতেছেন, আকাশে উঠিয়া ধূমকেতুর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন এবং মর্ত্ত্যে বিধবার বিবাহের কথাও ভাবিতেছেন। "বেদান্তদর্শনের সাধারণ প্রতিপাদ্য" ও "একাদশী"র রজ্জু কাটিয়া স্বাধীনতা দিলে সংহিতাকে আর কোন ক্রমে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না ও চিনিতে পারা যাইত না। ভরষা করি সম্পাদক মহাশয় সংহিতা প্রচারের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইবেন না, সংহিতা আমাদের আদরের বস্তু সংহিতার নিকট আমরা আমাদের পুরাতন কথা শুনিতেই ইচ্ছা করি। নূতনের অনেক লোক আছে, পুরাতনের যে কেহই নাই।

বঙ্গদর্শন, পৌষ হইতে ফাল্গুন, তিন সংখ্যা। "সারসত্যের আলোচনা" "কয়েকখানি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, "বঙ্গদর্শন দশটার একটা"—এ কথা আমরা সহ্য করিতে পারি না। তাই সম্পাদক মহাশয়কে আর একবার ইঙ্গিত করিতেছি।



গাজী দরাক—ত্রিবেণী।

Photo for the Purnima
by Major G.E. Weigall R.A.

(চৈত্রের পূর্ণিমা "বশিষ্ঠগঙ্গা ও দরাক খাঁ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)



ফকিরুদ্দিনের সমাধিস্থান।

Photo for the Purnima
by Major G.E. Weigall R.A.

মন্থুগ্রাম।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আর্য্য ঋষিগণ জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবনকে নানা প্রকারে সংস্কৃত করিকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই কয়টি হিন্দুর পক্ষে নূতন নহে—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন বা সাবিত্রীদীক্ষা, বিবাহ, গুরুদীক্ষা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির সকল প্রকার সংস্কার বিধেয় নহে। আবার উচ্চবর্ণের চারিটি আশ্রম আছে, ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। কখন সময় পাই ত এই সকল সম্বন্ধে কিছু বলিব, নহিলে এই পর্য্যন্ত।

এইরূপে আশ্রম বিশেষ অবলম্বন করিয়া সদসৎ কার্য্য করিতে করিতে জীব একদিন সেই দিনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, যখন "এ চরণ আর চল্‌বে না, এ রসনা আর বল্‌বে না, এ নয়ন আর দেখ্‌বে না, এ শ্রবণ আর শুন্‌বে না"। সেই দিন জীবের সে জন্মের মত শেষ দিন—সেই দিন তাহার মৃত্যু। সেই দিন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, প্রাণপাখী পলাইবে, লিঙ্গশরীর স্থূল হইতে পলাইবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই মনুষ্য আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়—তাহার নাম আতিবাহিক দেহ। মনুষ্যেতর জন্তুর কিন্তু এই আতিবাহিক দেহ নাই। মানব কিন্তু পরে প্রেত দেহ ধারণ করে। এক বৎসর কাল এই প্রেতদেহ থাকিবার নিয়ম। মৃতের সপিণ্ডীকরণ দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে, সে তাহার পর অন্য দেহ ধারণ করে, তখন সেই দেহ সাহায্যে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে এবং আবার স্বীয় কর্ম্মফলে, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, কৃমিত্ব, বা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষি আদি সকলকেই সংসারে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হয়, সুতরাং কর্ম্মই প্রাণী উৎপন্ন করে এবং কর্ম্মের দ্বারাই প্রাণী বিলীন হয়। মাতা পিতা পরমগুরু পর্য্যন্ত কর্ম্মাত্মক এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কর্ম্ম দ্বারাই স্বর্গ নরক ভোগ হইয়া থাকে। মহাদেব বলিয়াছেন—আহার নিদ্রা মৈথুন পশু ও মনুষ্যের উভয়েরই সমান। প্রভেদ এই যে মনুষ্যের জ্ঞান আছে, পশুর জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান হইয়াছে সে, পরমায়ুকে তড়িতের ন্যায়, সম্পদকে স্বপ্নের ন্যায় ও

যৌবনকে প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় মনে করে এবং সংসারকে সকল দুঃখের আগার বলিয়া বুঝিতে পারে। সকল দুঃখের আগার সংসার; ইহাকে যত্ন-পূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। বুঝিতে হইবে, যে কাল পৃথিবীকে দগ্ধ করে, সুমেরুকে শীর্ণ করে, সাগরের জলকেও শুষ্ক করে, সেই কালই মানবকে ব্যাঘ্রের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি স্ত্রী ধন প্রভৃতি সংসারের আসক্তিরূপ রজ্জুতে আর বদ্ধ থাকিতে চাহে না—সে পাশমুক্ত হইতে চায়। সে বুঝিতে পারে, যিনি সংসারী তিনিই দুঃখী আর যিনি সর্ব্বতোভাবে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সুখী। যে ব্যক্তি শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা ফল কামনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই মুক্ত হন।

মহামায়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। দেবগণ এই মহামায়ার মায়ায় বিমোহিত, মনুষ্য ত ছার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও নিস্তার নাই, তাঁহারাও এই মায়া দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে এই মহামায়াই তাহার জ্ঞান নষ্ট করেন, কেবল পূর্ব্ব সংস্কার বশত সে খাইতে চায়, নিদ্রা যায় ইত্যাদি। এই মহামায়া দ্বিবিধা বিদ্যা ও অবিদ্যা, যিনি মুক্তির কারণ তিনিই বিদ্যা আর যিনি সংসারসাগরে জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার কারণ তিনিই অবিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই মায়াসম্ভূতা। যিনি বিদ্যা তাঁহারই সেবা করিবে। যিনি অবিদ্যা কদাপি তাঁহার সেবা করিবে না। রুদ্রযামলে উল্লেখ আছে যে, বিদ্যা সুখদা মোক্ষদা ও নিত্যা এবং তিনি সকল ভূতেই আছেন; সেই জগন্মাতা বিদ্যা যখন তুষ্টা হয়েন, তখনই জীবের সিদ্ধিলাভ হয়; ইহাকে বন্দনা করিবে, স্তুতি করিবে ও সর্ব্বদা নিত্যা বলিয়া জানিবে; পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও দ্যূৎক্রিয়া আদি দ্বারা সময়ক্ষেপ করেন না, প্রত্যুত দেবতাপূজা জপ ও স্তবাদি দ্বারাই সময়ক্ষেপ করেন। গুরুদীক্ষা ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই। "যোগ ব্যতীত মন্ত্র ও মন্ত্র ব্যতীত যোগ সিদ্ধ হয় না" অন্ধকার ঘরমধ্যস্থ ঘট যেমন দীপাদি আলোক দ্বারা প্রকাশিত হয় তেমনি মায়া-পরিবেষ্টিত আত্মাও মন্ত্রের দ্বারায় প্রকাশিত হয়েন।

এখন মানবকে এই মুক্তির অধিকারী হইতে হইলে, কায় মন ও বাক্য দ্বারা সাধনা করিতে হইবে। অপরাপর সাধনার মধ্যে যোগ সাধনা একটি উৎকৃষ্ট উপায়। যোগ বুঝিতে হইলে মানব প্রকৃতি ও মানব শরীর কি

ব্যাপার তাহা একটু বুঝিতে হইবে। শুধু আর্য্য ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিলে চলিবে না; অর্থাৎ যাহা শীর্ণ হয় তাহা শরীর, যাহার পরিণাম ক্ষয় তাহাই শরীর এইটুকু বুঝিলে চলিবে না। ন্যায় দর্শনের "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং" চরক সংহিতার "তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকারসমুদায়াত্মকং" এইটুকু বুঝিলে হইবে না। প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের বা বাতপিত্তশ্লেষ্মার সাম্যাবস্থা শুধু এইটুকু বুঝিলে চলিবে না। বর্ত্তমান সভ্যজগৎ শরীরকে কি চক্ষে দেখেন কিরূপে বিভাগ করেন, তাহাও জানিতে হইবে—তবে অতি সংক্ষেপে।

প্রথমেই একটি কথা বলা উচিৎ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আর্য্যঋষিগণের শরীরতত্ত্ব জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা কেবল মাত্র স্থূল শরীরই জ্ঞাত আছেন। আর আমরা স্থূল সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ ও কারণ ত্রিবিধ শরীরতত্ত্ব জ্ঞাত আছি। বেদান্তে আত্মার পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে, অন্নময়কোশ, প্রাণময়, মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। অন্নময় কোষই স্থূলশরীর; প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিনটি লইয়া লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর হইয়াছে; আর আনন্দময় কোষই কারণশরীর। গুণ বিচারে অন্নময় কোষ, তামস বা তমোগুণ প্রধান; প্রাণময় কোষ রাজস বা রজোগুণ প্রধান আর মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষ ইহারা সাত্ত্বিক বা সত্ত্বগুণ প্রধান। কিন্তু আরও সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে হইলে মনোময় কোষ তম মিশ্রিত সত্ত্ব, প্রাণময় কোষ রজ মিশ্রিত সত্ত্ব আর আনন্দময়কোষ সত্ত্ব মিশ্রিত সত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ mind শব্দে যাহা বুঝেন, তাহা এই মনোময়কোষ। প্রাণময়কোষের ভিতরে মনোময়কোষ অবস্থিত বলিয়া চৈতন্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহাতে চৈতন্যের অধিকতর স্ফূর্ত্তি এই জন্য ইহাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু মন বা চিত্ত আত্মা নহে। আর্য্য ঋষিগণ যোগ বলে সমাধি অবস্থায় আত্মা দর্শন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সমাধি ও যোগ জানা নাই বলিয়াই আমরা জানি সুতরাং আত্মা দর্শন তাঁহাদের ঘটে নাই, তাহারা মাইও লইয়াই বিব্রত।

আরও একটি কথা, মায়া বা প্রকৃতি হইতে জীব উৎপত্তির কথা। কিরূপে সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়ও পরে স্থূলভূত হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীবাত্মা হইতেছেন চিৎ শক্তি আর ভূত বা ভূতের শক্তির সমষ্টি। পূর্ব্বে ইহাও বলা

হইয়াছে যে সাংখ্য মতে লিঙ্গদেহের সপ্তদশ অবয়ব। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত এবং বুদ্ধি, এই লইয়াই লিঙ্গদেহ গঠিত হয়। এই লিঙ্গদেহে "চিৎ" প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট হইলেই "জীব" (অহং)। এই লিঙ্গদেহ যখন স্থূল শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না, তখনই জীবের মৃত্যু হয়। এই লিঙ্গদেহেই জীবের স্বর্গ নরক ভোগ হয়, সুখ দুঃখ ভোগ হয়। এই লিঙ্গশরীরের ভেদ বশতই 'আমি' ও 'তুমি'। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, লিঙ্গ শরীর সেইরূপ সংস্কার প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে লিঙ্গশরীর সেই সংস্কার লইয়া যায় আবার জন্মিবার সময় সেই সংস্কার লইয়া আসে। জীবের কর্ম্মই সকলের মূল, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই লিঙ্গ শরীর বুঝেন না তবে ষ্টুয়ার্ট ডেকার্ট এবং লিবনিজ এই কথা বলেন, অন্ধকারে এইটুকুমাত্র অনুভব করিয়াছেন, যে মানব কতকগুলি সংস্কার লইয়াই জন্মে। কেবল মাত্র রিচমণ্ড সাহেব তাহার রিলিজন অব্ ষ্টার্স পুস্তকে লিঙ্গশরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে এখনও অনেক দিন অনেক কথা আর্য্য ঋষিগণের নিকট শিখিতে হইবে। পাশ্চাত্য মতের সূক্ষ্মদেহের এইরূপ অনুভব দেখাইয়া আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের স্থূলদেহের অনুভব বা নর-শরীর সংস্থানের কথা বলিব। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন আমরা যোগ কি সমাধি কি বুঝি না—কেন বুঝেন না তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা জীবাত্মার সূক্ষ্ম শরীর বুঝেন না, তাহার মধ্যে স্থিত চিৎ বা আত্মা বুঝেন না তবে যোগ বুঝিবেন কি করিয়া? আত্মাদর্শনই যে যোগের কার্য্য।

---

(৩২)

মানবদেহ তিন অংশে বিভক্ত, (১) মস্তক, (২) ধড় বা মধ্যদেহ এবং (৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা হাত পা। অস্থি ও উপাস্থির উপর দৃষ্টি রাখিয়া এই বিভাগ। যাহা এখনও অস্থি হয় নাই আর অথচ মাংস অপেক্ষা শক্ত তাহাই উপাস্থি বা কোমলাস্থি যেমন নাসিকার হাড়। ইংরেজী নাম কার্টিলেজ মানবদেহ প্রতিমার ন্যায় গঠিত, বাঁশ, খড়, কাদা—হাড় মাস ত্বক।

(১) মস্তক। মুখ ও মাথার খুলি এই দুইটি লইয়াই মানব-মস্তক। ইহা গ্রীবা দ্বারা মধ্যদেহসহযুক্ত। গ্রীবা মাংসময় বন্ধনী। মাথার খুলিতে

পরস্পর সংলগ্ন ৮ খানি হাড় আর মুখে ১৪ খানি হাড় আছে, তার মধ্যে ১৩ খানি পরস্পর সংলগ্ন। মস্তকে অনেকগুলি গহ্বর আছে, মাথার খুলির গহ্বরে মস্তিষ্ক আছে। তদ্ব্যতীত চক্ষু গহ্বর, নাসা গহ্বর, মুখ, কর্ণ।

(২) ধড় বা মধ্যদেহ। পৃষ্ঠবংশটি ৩২ খানি অস্থি দ্বারা গঠিত, প্রত্যেকের নাম কশেরুকা (ইং ভার্টিব্রি) মাথার দিকে সাত খানির নাম গলদেশীয়, তার নীচে বার খানির নাম পৃষ্ঠদেশীয় তারপর পাঁচ খানির নাম কটিদেশীয় এই চব্বিশ খানি চিরজীবন নরম থাকে, নোয়ান যায়। বাকি নয় খানি বয়সের সঙ্গে কঠিন ও পৃথক হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একটিতে পাঁচ খানি "পঞ্চ কশেরুকাস্থি" আর একটিতে চারি খানি "মূলাধানাস্থি"। প্রৌঢ় দেহের পৃষ্ঠবংশে সুতরাং ২৪+২=২৬ খানি মাত্র অস্থি দৃষ্ট হয়। এই সকল হাড়ের এমনভাবে সংস্থান যে মস্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বরাবর একটি ছিদ্র থাকিয়া যায়। এই ছিদ্রের মধ্যে মজ্জা আছে, তাহার নাম পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা, ইংরেজী নাম স্পাইনাল কর্ড বা ম্যারো। যে সকল দেহীর মেরুদণ্ড আছে, তাহাদের দেহে দুইটি গহ্বর আছে। একটিতে স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড এই দুইটিই স্নায়ুকেন্দ্র। প্রথম গহ্বরটির ইংরেজী নাম নার্ভস টিউব পৃষ্ঠদেশে বলিয়া আর এক নাম ডর্সাল টিউব। আর দ্বিতীয়টি মেরুদণ্ডর সম্মুখ হইতে আরম্ভ আর পাঁজর, বুকের হাড় আর উদর দ্বারা আবরিত। এই গহ্বরে সুতরাং অবস্থিত ফুস্‌ফুস, হৃদয়, পরিপাকযন্ত্র, মূত্রাশয়, মলনিঃসরণ যন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়। দেহমধ্যভাগ দুইভাগে বিভক্ত করিলে আমরা দুইটি গহ্বর দেখিতে পাই—(ক) বক্ষগহ্বর, (খ) উদরগহ্বর। এই দুইটি গহ্বরের মধ্যস্থানে কতকগুলি পেশী একটি স্তর রচনা করিয়াছে ও উক্ত দুইটি গহ্বরকে পৃথক করিতেছে। ইহার ইংরেজী নাম "ডায়াফ্রাম" ইহা উঠে নামে ও ইহার উঠা নামায় নিশ্বাস প্রশ্বাস কালে বক্ষঃগহ্বর ছোট ও বড় হয়।

(ক) বক্ষগহ্বর। ইং থোরাক্স, ইহার চতুঃসীমা এই, পশ্চাতে পৃষ্ঠবংশ দুই পার্শ্বে পাঁজর আর সুমুখে বুকের হাড় (নাম ষ্টার্ণম)। প্রত্যেক দিকে বার খানি পাঁজরের হাড় থাকায় ২৪ খানি পাঁজর হাড় (রিব) ১২ খানি কসেরুকাকে যুক্ত করিতেছে। তবেই বক্ষঃগহ্বরে আমরা ১২ পৃষ্ঠবংশীয় কসেরুকা, ২৪ খানি পঞ্জরাস্থি ও ৩ খানি বুকের হাড় দেখিতে পাইতেছি।

এই সীমার অন্তর্গত যে গহ্বর তাহাতে অবস্থিত আছে এই যন্ত্রগুলি ১ হৃদয় (ইং হার্ট), ২ ফুস্‌ফুস্ (লংস), ৩ বায়ুনালী, ৪ কণ্ঠনালী (যথাক্রমে উইণ্ডপাইপ ফুডপাইপ)। ১। হৃদয়। বক্ষগহ্বরের দুই পাশে দুইটি ফুস্‌ফুস্ ইহার মধ্যস্থলে হইতেছে হৃদয়। হৃদয়ের আকার প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় হস্তমুষ্টির মত। ইহার একভাগ বক্ষসীমার শেষ পর্য্যন্ত ও অপরদেশ বক্ষঃগহ্বরের নিম্ন শেষ স্থান স্পর্শ করিয়াছে। বাকি স্থান ফুস্‌ফুস্ বেষ্টন করিয়া আছে। এই সকল স্থান লইয়া ইহা হস্তীশুণ্ডের মত অবস্থিত। হৃদপিণ্ড যে মসৃণ সূক্ষ্ম জাল জাল ত্বক বা ঝিল্লী দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহার ইং নাম পেরি কার্ডিয়াম। হৃদপিণ্ড রক্তভাণ্ডার। ২। ফুস্‌ফুস্। হৃদপিণ্ডের দুই পার্শ্বে ফুস্‌ফুস্। ইহাও সূক্ষ্ম মসৃণ ত্বক দ্বারা আচ্ছাদিত, ইং নাম প্লুরা। ফুস্‌ফুস্ ছোট বড় হইতে পারে, ইহার কার্য্য রক্ত পরিষ্কার করা। ৩। বায়ুনালী। নাসা ও মুখের গর্ত্তের পিছন হইতে আরম্ভ ও ফুস্‌ফুস্ পর্য্যন্ত বিস্তার। ইং আর একটি নাম ট্রেকিয়া। বায়ু নালিটি বক্ষঃগহ্বরে পড়িয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ বাম ফুসফুসে ও অপর ভাগ দক্ষ ফুসফুসে গিয়াছে। এই দুইটি অংশের ইং নাম ব্রঙ্কি। সুতরাং ফুসফুসে বায়ু প্রবেশের পথের কতকাংশের নাম ট্রেকিয়া ও অবশিষ্টাংশের নাম ব্রঙ্কি। আমাদের কণ্ঠস্বরও ট্রেকিয়া হইতে নির্গত হয়। ৪। কণ্ঠনালী বা খাদ্যনালী। মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই পথে চর্ব্বণের পর খাদ্য পাকস্থলীতে যায়। ইং নাম গলেট বা ফুডপাইপ বা ইসোফেগস্। পূর্ব্বকথিত যন্ত্রগুলিতে বক্ষঃগহ্বর পূর্ণ। (খ) উদরগহ্বর, ইং নাম এবডোমেন। নিম্নে পেলভিস, পশ্চাতে কসেরুকা ও চতুর্দ্দিকে পেশী, এইরূপে উদর অবস্থিত। পেলভিসের চতুর্দ্দিকে কেবল অস্থি; মূলাধান, পঞ্চ কশেরুকা (ইং সেক্রম) আর দুই খানি উরু অস্থি। আকার কটিবন্ধের ন্যায়। উদরের নিম্নদেশ সুতরাং পেলভিস দ্বারা বেষ্টিত, এইজন্য ইহার নাম পেলভিস-গহ্বর। এই গহ্বর এবং সমস্ত উদর ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় যন্ত্র সূক্ষ্ম ঝিল্লী দ্বারা আবৃত ইং নাম পেরিটোনিয়ম। উদরগহ্বরে এই সকল যন্ত্র আছে, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটি অন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ, ক্লোম, মূত্রযন্ত্র, মূত্রাধার ও গুহ্যদেশ।

পাকস্থলী। কণ্ঠনালী বা খাদ্যনালী ডায়াফ্রাম পেশী ভেদ করিয়া পাকস্থলীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। যে স্থানে শেষ হইয়াছে সেইখানে

পাকস্থলীতে একটি ছিদ্র আছে ইং কার্ডিয়াক ছিদ্র। পাকস্থলী সুতরাং ডায়াফ্রামের নীচে ও উদরের বামদিকে হইল। পাকস্থলীর আর একটি ছিদ্র (ইং পিলোরম ছিদ্র) ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। পাকস্থলীতে ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয়।

অন্ত্রদ্বয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎভাবে দুইটি। বৃহদ্ অন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্রের চারিদিক ঘেরিয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র ক্রমে বৃহৎ হইয়াছে। পিলোরস ছিদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্র নিম্নদিকে গিয়াছে। ইহা ভাঁজে ভাঁজে জড়ান থাকে, জড়ান খুলিলে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ হাত দেখা যায়। আর বৃহদ্ অন্ত্র গুহ্যদেশ লইয়া প্রায় ১০ হাত দীর্ঘ। ক্ষুদ্রান্ত্রের যথাক্রমে উচ্চ, মধ্য ও নিম্নদেশের তিনটি পৃথক নাম আছে (ইং ডুডিনম, জেজুনম, ইলিয়ম) ক্ষুদ্রান্ত্র যেখানে বৃহৎ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেখানে একটি নাম আছে। (ইং সিকম)। দক্ষিণ কুচকী হইতে বৃহৎ অন্ত্র আরম্ভ হইয়া, সিকম হইয়া, উদরের দক্ষিণ দিকে যকৃৎ পর্য্যন্ত গিয়া আবার উদরের বামভাগে গিয়া সরলভাগে মলদ্বারে আসিয়াছে। ইহারই নিম্নদিকে শেষভাগের নাম (পরিমাণ ৯ইঞ্চি) গুহ্যদেশ ইং রেকটম। সিকম হইতে রেকটম পর্য্যন্ত স্থানের একটি নাম আছে, ইং কোলন। ইহা উর্দ্ধ, মধ্য বা তির্য্যক ও অধ বা নিম্ন তিন ভাগে বিভক্ত।

যকৃৎ। উদরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ইহার দীর্ঘ ও প্রস্থ যথাক্রমে ১২ ও ৬ ইঞ্চি এবং ওজনে প্রায় দুই সের। যকৃৎ নিজে নীলাভ কিন্তু ইহা হইতে যে রস নির্গত হয়, যাহা দ্বারা পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়া হয় তাহার বর্ণ সবুজ। এই রস যকৃতের মধ্যেই একটি থলিতে (ইং গল-বাডার) সঞ্চিত হয় ও পরে ক্ষুদ্রান্ত্র হইয়া পাকস্থলীতে যায়।

প্লীহা। উদরের বামভাগেস্থিত। লম্বা ৪ ইঞ্চি চওড়া ৩ ও পুরু ২ ইঃ। বর্ণ লাল। মানবদেহে প্লীহার কি কার্য্য ডাক্তারেরা জানে না। তবে জ্বরে ইহা বাড়ে।

ক্লোম। পাকস্থলীর নিম্নে। ইহার সুমুখে তির্য্যক কোলন, ইহা হইতে রস নির্গত হইয়া পরিপাক কার্য্যে সাহায্য করে। লম্বা ৬ ইঃ, আকার কুকুরের জিবের ন্যায় ও বর্ণ ফ্যাকাশে লাল।

মূত্রযন্ত্র। (ইং কিডনীস)। বাম ও দক্ষিণ ভেদে দুইটি, একটি যকৃতের ও অপরটি প্লীহার নিম্নে। সীসের মত ৪×২ ইঃ চর্ব্বি দ্বারা আবৃত। ইহার

কার্য্য রক্ত পরিষ্কার করা—রক্তের বিষ নষ্ট করা; বিষের ইং নাম ইউরিয়া। ইহা হইতে দুইটি নল গিয়া মিশিয়াছে—

মূত্রাধারে। ইউরিয়া নল দিয়া যখন মূত্রাধারে যায়, তখনই ইহা প্রস্রাব। মূত্রাধার পেলভিক গহ্বরে স্থিত এবং রেকটম বা গুহ্য দেশের উপর।

গুহ্যদেশ বা রেকটম। বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। মলদ্বারের ইং নাম এনস্।

(৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা হাত পা। হাতকে উচ্চ ও পা-কে নিম্ন অঙ্গ বলে। দুই হাত দুই পা ধড়ের সঙ্গে মাংস দ্বারা গ্রথিত। মাথা যেমন ধড়ের সঙ্গে মাংস দ্বারা গ্রথিত এও সেইরূপ। যে মাংস দ্বারা যুক্ত তাহার নাম মহাস্নায়ু ইং লিগামেণ্ট বা টেণ্ডন।

হস্ত। হস্ত তিন ভাগে বিভক্ত—অগ্রবাহু, প্রকোষ্ঠ, পাণি; যথাক্রমে স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত; কনুই হইতে কব্‌জি; ও কব্‌জি হইতে আঙ্গুলের মাথা পর্য্যন্ত (ইং আর্ম, ফোর আর্ম, হাণ্ড)। কাঁধে দুই খানি হাড় (ইং ক্লাভিকল ও স্কাপুলা) একখানির প্রথমের আকার "এফ্"এর মত, স্কাপুলার আকার ত্রিভুজ, ইহা চেপ্টা।

স্কাপুলা হাড় ধড়ের সঙ্গে যুক্ত নহে, কেবল ক্লাভিকল হাড়ের এক ধারে যুক্ত। ইহার অবস্থান বক্ষগহ্বরের উপরে অথচ পিছন দিকে। আর ক্লাভিকলের একদিক যেমন স্কাপুলার সহিত যুক্ত অপর দিক তেমনি বক্ষাস্থির উপরে কণ্ঠের নিম্নভাগের অস্থির সহিত যুক্ত। হাতের হাড়ের নাম হিউমারস্, ইহার একদিক স্কাপুলায় যুক্ত অপর দিক কনুই পর্য্যন্ত। কনুই হইতে কব্‌জি পর্য্যন্ত দুইখানি হাড়। ইহাদের একপ্রান্ত হিউসারস হাড়ে যুক্ত, অপর প্রান্ত কব্‌জি পর্য্যন্ত ইহাদের ইং নাম রেডিয়স ও অল্‌না। প্রথমটি দ্বিতীয়খানির চতুর্দ্দিকে খানিকটা ঘুরিতে পারে বলিয়াই আমরা এই অংশ ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারি। অলনার কনুই-প্রান্ত গজালের মত সূক্ষ্ম আর অপর প্রান্ত কড়ে আঙ্গুলের দিকে; রেডিয়াসের এই প্রান্ত বুড় আঙ্গুলের দিকে গিয়াছে; এই দুইটি প্রান্ত পাণির সহিত মিলিত। পাণির ও তিনটি ভাগ ও তিনটী নাম মণিবন্ধ (কব্‌জি), করতল ও অঙ্গুলি যথাক্রমে (ইং রিষ্ট, পাম, ফিংগার্স) কব্‌জিতে দুই শ্রেণীর হাড় আছে, সংখ্যা আট খানি।

করতলে পাঁচখানি হাড় আর আঙ্গুলগুলির হাড় ছোট ছোট শলার মত আর মাংস দ্বারা সংলগ্ন। হাত বা উপর অঙ্গের অস্থি সংস্থান এইরূপ। এইবার পা বা অধ অঙ্গের বিবরণ। ইহা চারি ভাগ হইতেছে—উরুসন্ধি, উরু, জঙ্ঘা, পাদ; যথাক্রমে ইং হিপ, থাই, লেগ, ফুট। উরু সন্ধির দুই খানি হাড়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পেলভিস নামক অস্থিময় কটিবন্ধের একাংশ। ইং নাম হিপ বা হঞ্চ বোণ। উরুতে একখানি খুব শক্ত ও লম্বা হাড় আছে (ইং ফিমার)। জঙ্ঘায় দুইখানি অস্থি, একখানি উপরে (ইং ফিবুলা) ও অপর খানি ভিতরে (ইং টিবিয়া) উরুর হাড়ের শেষাংশ বা নিম্নাংশ টিবিয়ার উপর ভাগে আসিয়া যুক্ত হইয়া জানুসন্ধি গঠন করিয়াছে। এই সন্ধির উপর এক খানি অস্থি আছে, সেইখানি হাঁটুর মালাইচাকি (ইং পেটেলা) তারপর বরাবর চলিয়া গিয়া জঙ্ঘার হাড় দুইখানিই শেষপ্রান্তে গুল্‌ফের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ গঠন করিয়াছে ও আর একখানি হাতের সহিত (ইং আষ্টাগেল্‌স্) যুক্ত হইয়া গুল্‌ফসন্ধি সৃষ্টি করিয়াছে। গুল্‌ফে সর্ব্বশুদ্ধ সাতখানি অস্থি। সাত খানির ইং নাম টার্সস্। পদতলের পাঁচখানি দীর্ঘ অস্থির উভয় প্রান্তই একটু বাঁকা। পায়ের বুড় আঙ্গুলে দুইখানি হাড় (ফালাংস)। বাকি অঙ্গুলির প্রত্যেকটিতে তিনখানি করিয়া হাড় ইং ফালাংস। মনে রাখিবেন পদতলে যেমন পাঁচখানি হাড় করতলেও সেইরূপ পাঁচখানি হাড়। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন, মানুষ হস্ত ও হস্তাঙ্গুলি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য করিতে পারে, পাদ ও পাদাঙ্গুলি দ্বারাও ঠিক সেই সমস্ত কার্য্য এমন কি সীবন চিত্রাঙ্কন পর্য্যন্তও করিতে পারে। পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতিরা একথা না বুঝিয়া মুখসরু জুতা পায়ে দিয়া পাদের এই গুণ নষ্ট করিতেছেন এবং কোন কোন স্থলে নষ্ট করিয়াছেন। স্বভাবের বশে পিতা যে গুণ হারাইয়াছেন, পুত্র সে গুণ আর কখনও পাইবেন না।

দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ॥ অভিনববিষবল্লীপাদ-পদ্মস্য বিষ্ণোর্মর্দনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা। জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মা ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু। যত্তত্তালতমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতাচ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্। গন্ধর্ব্বা-মরসিদ্ধকিন্নরবধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥ গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্॥ ত্রিপুরারি-শির-শ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥ পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি। ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি। বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ। ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ। গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয়তঃ প্রভাতে বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ। প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষ-পঙ্কমাশু মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥

ইতি শ্রীবাল্মীকিবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

পাঠক মহাশয়কে দরাফ খাঁ কৃত গঙ্গাষ্টক উপহার দিলাম। আশা করি কৃতার্থ হইবেন। তুলনায় সমালোচন জন্য দেব শঙ্করাচার্য্য ও বাল্মীকি মুনি কর্ত্তৃক স্তব দুইটিও দিলাম। ভরষা করি প্রীতি পাইবেন।

গদাই পুরুত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নর্ম্মদা তীরে।

(বক্তা গদাই।)

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। বাসাবাটীর সকলেই নিদ্রিত। আস্তে আস্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শয্যাগৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরবাটীতে আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া একেবারে সদর রাস্তায় পড়িলাম। হৃদয় ও উরু দুরু দুরু করিতেছে। যেন স্বপ্নাবস্থায় কোন মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াই চলিতেছি। কি করিতেছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কি

ফিরিবার সামর্থ্য নাই—সম্মুখদিকেই চলিতেছি। পরিধেয় বস্ত্র মাত্র সঙ্গে আর সম্বলের মধ্যে গাম্‌চা জুতাজোড়াটি পর্য্যন্ত লই নাই।

সদর রাস্তায় আসিয়া একবার মনে মনে আমার আশ্রয়দাতাকে প্রণাম করিলাম, শুধু আশ্রয়দাতা নহেন—অন্নদাতাও বটেন, চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিলাম বটে কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি, এখনও পূর্ণমাত্রায় কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়কোরক অধিকার করিয়া আছে। প্রাতঃকালে কি মনে করিবেন, কথাটা একবার মনে আসিল কিন্তু চাপা দিলাম। হু হু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে স্থান ত্যাগ করিলাম তাহার নাম নাই বলিলাম। তাহার নাম দিলাম ম——।

রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম যে স্থান শত লোকের কোলাহলে দিবাভাগে এবং কতক রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, সে স্থান এখন প্রান্তরস্থিত নির্ব্বাত নিষ্কম্প তড়াগসম—শব্দ মাত্র নাই, ঘর দ্বার বিপণি রাস্তাটি পর্য্যন্ত যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পূর্ণচন্দ্রের কৌমুদী স্ফাটিকত্ব প্রদান করায় মহানন্দে তাহারা যেন সুষুপ্তিভোগ করিতেছে। স্বভাব আপনার শোভায় আপনি ভোর। পরশ্রী কাতর পাংলা মেঘগুলা হিংসাপ্রণোদিত হইয়া দলে দলে আসিয়া শশধরকে আবরণ করিতেছে কিন্তু বায়ু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পশ্চাতের মেঘের দল রণবেশে অগ্রসর হইতেছে, আবার বিতাড়িত হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে আমি নগর ত্যাগ করিয়া প্রান্তর পথে পড়িলাম। সেখানে ত নিস্তব্ধতার পূর্ণ অধিকার, কেবল কোথাও একটা শৃগাল উচ্চ ভূমিতে থাকিয়া আমাকে সমালোচন করিতেছে, কোথাও নক্তঞ্চর পক্ষীর পক্ষসঞ্চালন শব্দ, কোথাও ঝিঁ ঝিঁ অন্য মনে একবার মাত্র ডাকিয়া প্রকৃতির পবিত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী জ্ঞান করিয়া ভয়ে ম্রিয়মাণ হইতেছে—এইমাত্র বৈষম্য। স্বভাবের শোভা দেখিবার অবসর না থাকিলেও উষ্ণ মস্তিষ্কের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইলেও দারুণ চিন্তাজ্বরে অভিভূত ও অন্ধ হইলেও থাকিতে পারিতেছি না, এক একবার আহা বলিতে হইতেছে দেখিতেও হইতেছে।

দুই দিন ক্রমাগত চলিতেছি কিন্তু অনাহারে। যখন চরণ আর চলে না, যখন ক্ষুধার জ্বালায় একান্ত বিবশ তখন একজন সন্ন্যাসী দেখিলাম।

দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ॥ অভিনববিষবল্লীপাদ-পদ্মস্য বিষ্ণোর্মর্দনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা। জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মা ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু। যত্তত্তালতমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতাচ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্। গন্ধর্ব্ব-মরসিদ্ধকিন্নরবধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥ গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্॥ ত্রিপুরারি-শির-শ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥ পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি। ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি। বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ। ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ। গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয়তঃ প্রভাতে বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ। প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষ-পঙ্কমাশু মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥

ইতি শ্রীবাল্মীকিবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

পাঠক মহাশয়কে দরাফ খাঁ কৃত গঙ্গাষ্টক উপহার দিলাম। আশা করি কৃতার্থ হইবেন। তুলনায় সমালোচন জন্য দেব শঙ্করাচার্য্য ও বাল্মীকি মুনি কর্ত্তৃক স্তব দুইটিও দিলাম। ভরষা করি প্রীতি পাইবেন।

গদাই পুরুত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নর্ম্মদা তীরে।

(বক্তা গদাই।)

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। বাসাবাটীর সকলেই নিদ্রিত। আস্তে আস্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শয্যাগৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরবাটীতে আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া একেবারে সদর রাস্তায় পড়িলাম। হৃদয় ও উরু দুরু দুরু করিতেছে। যেন স্বপ্নাবস্থায় কোন মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াই চলিতেছি। কি করিতেছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কি

ফিরিবার সামর্থ্য নাই—সম্মুখদিকেই চলিতেছি। পরিধেয় বস্ত্র মাত্র সঙ্গে আর সম্বলের মধ্যে গাম্‌চা জুতাজোড়াটি পর্য্যন্ত লই নাই।

সদর রাস্তায় আসিয়া একবার মনে মনে আমার আশ্রয়দাতাকে প্রণাম করিলাম, শুধু আশ্রয়দাতা নহেন—অন্নদাতাও বটেন, চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিলাম বটে কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি, এখনও পূর্ণমাত্রায় কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়কোরক অধিকার করিয়া আছে। প্রাতঃকালে কি মনে করিবেন, কথাটা একবার মনে আসিল কিন্তু চাপা দিলাম। হু হু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে স্থান ত্যাগ করিলাম তাহার নাম নাই বলিলাম। তাহার নাম দিলাম ম——।

রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম যে স্থান শত লোকের কোলাহলে দিবাভাগে এবং কতক রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, সে স্থান এখন প্রান্তরস্থিত নির্ব্বাত নিষ্কম্প তড়াগসম—শব্দ মাত্র নাই, ঘর দ্বার বিপণি রাস্তাটি পর্য্যন্ত যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পূর্ণচন্দ্রের কৌমুদী স্ফাটিকত্ব প্রদান করায় মহানন্দে তাহারা যেন সুষুপ্তিভোগ করিতেছে। স্বভাব আপনার শোভায় আপনি ভোর। পরশ্রী কাতর পাংলা মেঘগুলা হিংসাপ্রণোদিত হইয়া দলে দলে আসিয়া শশধরকে আবরণ করিতেছে কিন্তু বায়ু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পশ্চাতের মেঘের দল রণবেশে অগ্রসর হইতেছে, আবার বিতাড়িত হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে আমি নগর ত্যাগ করিয়া প্রান্তর পথে পড়িলাম। সেখানে ত নিস্তব্ধতার পূর্ণ অধিকার, কেবল কোথাও একটা শৃগাল উচ্চ ভূমিতে থাকিয়া আমাকে সমালোচন করিতেছে, কোথাও নক্তঞ্চর পক্ষীর পক্ষসঞ্চালন শব্দ, কোথাও ঝিঁ ঝিঁ অন্য মনে একবার মাত্র ডাকিয়া প্রকৃতির পবিত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী জ্ঞান করিয়া ভয়ে ম্রিয়মাণ হইতেছে—এইমাত্র বৈষম্য। স্বভাবের শোভা দেখিবার অবসর না থাকিলেও উষ্ণ মস্তিষ্কের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইলেও দারুণ চিন্তাজ্বরে অভিভূত ও অন্ধ হইলেও থাকিতে পারিতেছি না, এক একবার আহা বলিতে হইতেছে দেখিতেও হইতেছে।

দুই দিন ক্রমাগত চলিতেছি কিন্তু অনাহারে। যখন চরণ আর চলে না, যখন ক্ষুধার জ্বালায় একান্ত বিবশ তখন একজন সন্ন্যাসী দেখিলাম।

তিনি আধখানি রুটি আর কিছু ফলমূল দিলেন, তাঁহার নিজের খাদ্যের অংশ দিলেন। ভাবিলাম ন দেবঃস্থষ্টি নাশকঃ। সেখান হইতে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম শুনিয়াছিলাম, নর্ম্মদাতীরে মেলা উপলক্ষে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইবে তাই নর্ম্মদাতীর উদ্দেশে চলিতেছিলাম। ক্রমে দুঃখের অবসান হইল, নর্ম্মদাতীর সত্য সত্যই দেখিতে পাইলাম। সাধু সন্ন্যাসীও দেখিলাম। আমি তীরে পঁহুছিয়া শয়ন করিলাম ও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসী দর্শনের পর আবার দুই দিন আহার হয় নাই। নর্ম্মদার যে স্থানে পঁহুছিয়াছিলাম, সেই স্থান জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থান।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন রাত্রি। কত রাত্রি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। কত কি ভাবিতেছি, আকাশ পাতাল কিন্তু সকল ছাপাইয়া ভাসিয়া উঠিতেছে, ক্ষুধার যন্ত্রণা। কিন্তু করি কি উপায় নাই। এমন সময় সহসা দেখিলাম পাহাড়ের গাত্র হইতে কি একটা নামিতেছে। নামিয়া আসিয়া নর্ম্মদার জলে পড়িল। ভয়ানক দ্রুতবেগে নামিল—আমার প্রথমে মনে হইয়াছিল কোন প্রকার পশু বা জন্তু। কিন্তু পরে দেখিলাম সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী স্নান করিয়া হাঁটিয়া নর্ম্মদা পার হইতে লাগিলেন। কোন এক অনির্দ্দিষ্ট শক্তি বলে আমিও উঠিলাম আমিও সবেগে জলে পড়িলাম, স্নান করিলাম, আমিও সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিলাম, কতক্ষণ চলিলাম মনে নাই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও কি করিয়া যে চলিলাম—চলিতে পারিলাম তাহা জানি না। সম্বলের মধ্যে ভগবানের নাম। সেই নাম—সেই হরিনাম ভুলি নাই, ঘন ঘন নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম, এইটাই এখন মনে পড়ে। যাহাহৌক আমি নাছোড়বান্দার ন্যায় সন্ন্যাসীর পন্থানুসরণ করিলাম। পলায়িত অপরাধীর সন্ধান পাওয়ার পর, অপরাধী আবার যখন পলায় আর রাজপুরুষ পশ্চাদ্ধাবমান করে, তখন যেরূপ ব্যাপার ঘটে এখন ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিল। যাহাহৌক অতি কষ্টে হাত পা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া অঙ্গুলি আদি চূর্ণ করিয়া শেষ সন্ন্যাসীসহ গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলাম। সন্ন্যাসী আসিয়াই আশ্রমের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়াই ধ্যানমগ্ন হইলেন। আমি দূরে বসিলাম—বসিয়াই রহিলাম। কেন বসিয়া রহিলাম তাহা জানি না।

ক্রমে রাত্রি ফরসা হইয়া আসিল। নক্তঞ্চর জন্তুগণ আপন আপন বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পক্ষীগণ সভয়ে জানাইতে লাগিল যে প্রভাতের আর বড় বিলম্ব নাই। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের বায়ু তাড়াতাড়ি সর্ সর্ করিয়া বহিয়া চলিল। যাইবার সময় সহৃদয় বায়ু রোগী, শোকী ও অনিদ্রিতের গণ্ড চুম্বন করিয়া চলিয়া গেল। আমি উহাদের মধ্যে একজন ছিলাম, আমার তাহাতে বড় সুখ হইল। আপনাকে কি কখন দুঃখের দিনে প্রভাতবায়ু চুম্বন করে নাই?—না করিয়া থাকে ত আপনি দুর্ভাগ্য।

ক্রমে ধীরে ধীরে পূর্ব্বাসার দ্বারে উষা আসিয়া দেখা দিলেন। দিক্ সকল পক্ষীকূজনে মুখরিত হইয়া উঠিল। দলে দলে সন্ন্যাসী নর্ম্মদাস্নান করিবার জন্য নামিতেছেন, উপরে বসিয়া দেখিতেছি। তাঁহারাও আপনা আপনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া কি বলিতেছিলেন। ক্রমে আলো, ক্রমে পূর্ব্বদিক লোহিতমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ক্রমে রবির রাঙ্গা ছবিখানি লোকলোচনের গোচরীভূত হইল। স্নান করিয়া দুই একজন সন্ন্যাসী আমাদের নিকট আসিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি করিয়া গেলেন। আমার একটু অহঙ্কার হইল। যেন সন্ন্যাসীটি বড় সন্ন্যাসীও যেন আমার।

সন্ন্যাসী কিন্তু ধ্যানমগ্ন আজিও মগ্ন কালিও মগ্ন। আমি আর থাকিতে না পারিয়া ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম, সুন্দর পাঠক সুন্দরি পাঠিকা হাসিবেন না, সহরে বাস করেন, অজীর্ণে ভুগিতেছেন, চিরকাল অক্ষুধায় খাইতেছেন, ইহার মর্ম্ম কি বুঝিবেন? আমি সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিলাম। যেমন কাঁদিলাম অমনি সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। আমার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন, বলিলেন, অন্যায় হইয়াছে, ভাল, আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ কর, একটা গর্ত্ত এক খণ্ড মসৃণ প্রস্তর দিয়া চাপা আছে, উঠাইয়া ফল ও কন্দ আন আনিয়া খাও ও আমাকেও দাও, বলিতে না বলিতে লম্ফ—যতটা সম্ভব—দিয়া উঠিলাম, ফল ও কন্দ আনিয়া দিলাম, প্রাপ্ত মাত্রেন, আর কি বলিব, উদরগহ্বরে নামাইয়া দিলাম। আঃ বাঁচিলাম, তখন রাত্রি, বলিলেন কাল তোমায় ভাত দিব। রাত্রিকালে পড়িয়া ঘুমাইলাম। তিনি জপে কাটাইলেন। পরদিন উভয়ে

স্নান করিয়া আসিলাম, সন্ন্যাসী কিন্তু আর জপে বসিলেন না, ভাত রাঁধার যোগাড় হইতে লাগিল। আশ্রম ত ভারি, গোটাকত লম্বা ডালের উপর কতকগুলা শুক্‌না পাতা জড় করিয়া দেওয়া এই মাত্র। যাহাহৌক ভাত রাঁধিলেন, আর একজন সন্ন্যাসী আসিলেন, তিনিই সব জোগাড় করিয়া দিলেন। আহারের পর মেলা স্থান হইতে অনেক সন্ন্যাসী ধ্যানভঙ্গ সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন সন্ন্যাসী তাঁহাদের সহিত কথোপকথন ও হাস্যপরিহাসে কাটাইলেন। রাত্রি হইলে সন্ন্যাসীরা গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন কাল আর ভাত হইবে না। যদি না ধ্যান ভাঙ্গে তুমি আপনি ফল লইয়া খাইও। পরদিন ধ্যান ভাঙ্গিল না। ফল খাইয়া রহিলাম। এইরূপে দিন চারি পাঁচ গত হইলে, সন্ন্যাসী বলিলেন আমি দক্ষিণ যাইব, তুমি আপনার গন্তব্য স্থানে যাও। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া জানাইলাম যে আমিও যাইব। প্রথমে স্বীকার করেন নাই, তারপর পদকমলযুগল ধারণ করিয়া কাতরে অভিযোগ করিলে শেষে কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে সঙ্গে যাইবার অনুমতি দিলেন। একদিন প্রত্যুষে আমরা নর্ম্মদাতীর ত্যাগ করিয়া খাড়া দক্ষিণ যাইতে লাগিলাম। আমি সঙ্গে যাইতে পাইলাম—আমি কৃতার্থ হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বগ্রামে।

বক্তা গদাইয়ের পিতা।

আমার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কোন লোকের কথা আমি কানে পুরি নাই, বিবাহ করিব না বলিয়াই স্থিরসঙ্কল্প হইলাম। তবে যে শেষে উপযুক্ত পুত্র থাকিতেও পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলাম, সে কেবল রাজারাম মুখোর অনুরোধে—সে অনুরোধ আমার উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, এ কথা সকলেই জানেন।

তোমরা এখন আমার দোষ দিতেছ কিন্তু বিবাহের পর কয়েক বৎসর কই সংসারে ত অশান্তি হয় নাই। গদাইয়ের পরিবার ও আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুসুমকামিনী যেন দুইটি ভগ্নীর মত ঘর করিত, কোন্দল ঝগড়া

করিত না। কি জানি কেমন করিয়া কুসুমের মন খারাপ হইল, কেন সে গদাইয়ের উপর চটিয়া গেল?

আচ্ছা বিমাতার সঙ্গে একসংসারে বাস যদি অসম্ভবই হইয়াছিল, সে কেন পৃথক্ হইয়া সংসার করিল না, সে এমন করিয়া নিরুদ্দেশ হইল কেন? আমার দুঃখ কি কাল্পনিক বলিয়া তোমাদের মনে হয়?

না, না, দুঃখ কাল্পনিক নয়, আমার হৃদয়ের ভিতর কে যেন বিষের ছুরির আঘাত করিতেছে। গদাইকে আমি এত ভালবাসিতাম, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। পিতা, না হয় দোষই করিয়াছি, তা বলিয়া কি এমনই করিয়া আমাকে কাঁদাইতে হয়? তোমরা যদি গদাইকে না আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি কাশীবাসী হইব মনে করিয়াছি। আমার দেহ ও মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এ দেহ আর বেশীদিন থাকিবে না, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমার দোষই তোমরা বলিতেছ, আমি কি দোষ স্বীকার করিতেছি না? এতই বা কি করিয়াছি, একটিমাত্র চড় মারিয়াছিলাম বই ত নয়। সে চড় আমি নিজে মারিয়াছিলাম। সত্য বলিতেছি, কুসুম আমাকে চড় মারিতে বলে নাই, কুসুমের প্রতি একটু টান ছিল বটে কিন্তু একথা ঠিক যে সে আমাকে গদাইকে মারিতে বলে নাই। ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া লইয়া ব্যাপারটা হয়। তারপরই ভোর রাত্রে উঠিয়া কোথায় গেল। এত খুঁজিলাম কোথায়ও সন্ধান পাইলাম না। আজি পাঁচ বৎসর হইল গদাই আমার নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কিন্তু আর আমার সহ্য হয় না। গদাইয়ের স্ত্রীর যন্ত্রণা আর আমি দেখিতে পারি না। বলিয়াছিলাম ইচ্ছা হয় ত বাপের বাড়ী যাও শান্তি লাভের চেষ্টা কর। সে কথা সে শুনে না। গদাইয়ের সেই খড়মটি, চাদরখানি, নস্যদানি এইগুলি লইয়া দিবারাত্র উন্মাদিনীর ন্যায় বসিয়া আছে। তবে সংসারের কাজকর্ম্ম করে না—এ কথা আমি বলিতে পারি না। কাজকর্ম্ম সারিয়া অবসরক্রমে শোক প্রকাশ করে। বোধ হয় তুষের আগুণের ন্যায় তার হৃদয় ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে। আমার নিজের কষ্ট বরং আমি এক রকমে সহ্য করিতে পারি কিন্তু বৌমার দারুণ যন্ত্রণা আর আমি চক্ষে দেখিতে পারি না। আমারকৃত কার্য্যের দ্বারা বৌমার এইরূপ দারুণ যন্ত্রণা সংঘটিত হইয়াছে মনে হইলে আমাকে পাগল হইতে হয়। বৌমা

সতী সাক্ষাৎ সাবিত্রী সমান, তাঁর অভিশাপে, তাঁর নিশ্বাসে আমার পরকাল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইবে—এ আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

বারকত মনি অর্ডার করিয়া ভিন্ন নামে টাকা পাঠাইয়া দিল। বুঝিয়াছিলাম যে সে আর কেহ নয়, গদাই—আর চাকরী করিতেছে। পিতাকে ভুলে নাই। কিন্তু তারপর যখন শুনিলাম যে সেখান হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তখনই বুঝিলাম কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

আর তোমরা কুসুমের এখনকার ব্যবহার ত দেখিতেছ, সে কি অনুতাপ করিতেছে না? তোমরা আমার গদাইকে আনিয়া দাও। আত্মহত্যা মহাপাপ না হইলে এতদিন পাপ সংসারে থাকিতাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পথে।

(বক্তা গদাই।)

সন্ন্যাসীঠাকুর ঠিক সোজা চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি ত দেখিয়া অবাক্। কাঁটা জঙ্গল খাদ কিছুই বাছেন না—আমাকে কিন্তু ঘুরিয়া আসিতে হয়, আমি কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করিব? তিনি কিন্তু ইতি মধ্যে অনেকটা চলিয়া গেছেন। ক্রমাগত আমার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষ করিতে হইতে লাগিল। শেষে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আমার গলগ্রহ হইলে কেন? কোথা হইতে আসিয়া জুটিলে—তুমি যেখানে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও। আমি ত্যাগী সন্ন্যাসী তোমাকে লইয়া আমার আবার সংসার আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। ইন্দুর লইয়া এক সন্ন্যাসীর সংসার হইয়াছিল। হরিণ লইয়া ভরতমুনি আবার সংসার পাতিয়াছিলেন। তোমাকে লইয়া আমি কি করিব?"

আমি বলিলাম "আমি শরণাগত। প্রভু গ্রহণ করিয়া আশ্রয় দিয়া এখন ত্যাগ করিবেন না। আমার আর কেহই নাই, সংসারে ফিরিয়া যাইবার আমার আর কোন প্রকার টান নাই।" এই কথা বলিতে না বলিতে, সন্ন্যাসী এতক্ষণ চিন্তাযুক্ত ছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন

সন্ন্যাসী। তোমার আর কেহ নাই?

আমি। আজ্ঞা। মনে করিয়াছি যে প্রভু আপনার নিকট দীক্ষিত

হইয়া আপনার মন্ত্রশিষ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনার সেবায় চিরদিন কাটাইব। আমাকে বঞ্চিত করিবেন না, আমি বড় দুঃখী বলিতে কি আমার এমন মনে হইয়াছে যে আপনি আমাকে মন্ত্র দিবেন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী। আমি তোমাকে অতিথিভাবে দেখিয়াছিলাম। অতিথি ভাবে তোমার সেবা করিয়াছিলাম। এখনও অতিথি বলিয়াই মনে করিতেছি। মন্ত্র দেওয়া বড় কঠিন কার্য্য। অনেকদিন ভাবী শিষ্যের সঙ্গে একত্রে বাস করিয়া দেখিতে হয়, সে কি প্রকৃতির লোক, শিষ্য হইবার উপযুক্ত কি না, কিরূপভাবে আচ্ছন্ন, কিরূপ মন্ত্রের অধিকারী দেখিতে হয়।

আমি। তাই করুন। যতদিন ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন, যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিতে রাজি কিন্তু দয়াময় তাড়াইয়া দিবেন না এখন আমায় ত্যাগ করিবেন না। যদি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হই, তখন ত্যাগ করিবেন আমার ক্ষোভ থাকিবে না। কিন্তু এখন আমায় ত্যাগ করিবেন না।

এই বলিয়া আমি চরণোপান্তে পতিত হইলাম। ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীপদযুগল বক্ষে ধারণ করিলাম। আমার অশ্রু দেখিয়া সন্ন্যাসীর স্বভাবত দয়ালু হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি গলিয়া গেলেন। হাত ধরিয়া তুলিয়া স্নেহভরে আমার গাত্রধূলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন ও কি ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "তাহাই হোক। মানুষকে অবস্থার দাস হইতেই হইবে, উপায় নাই। কর্ম্মফলে আমি জড়িত হইতেছি।" আমি কথা শুনিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম আর পুন পুন শ্রীপদযুগল চুম্বন করিলাম।

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "উঠ"। আমি উঠিয়া বসিলাম। তিনি বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম না যে তিনি কোথা যাইতেছেন ও কেন যাইতেছেন। অনেকক্ষণ বিলম্ব হওয়াতে আমার বড় ভয় ও ভাবনা হইল। মনে করিতেছি, চাতুরী করিয়া আমায় ত্যাগ করিলেন না কি? এমন সময় সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমায় একটা শিকড় দিয়া বলিলেন "পায়ে বাঁধ"। তিনি অনেক মন্ত্র পাঠ করিলেন, আমার মনে হইল পা দুটা ভারি হইতেছে, ঠিক যেন জুতা পায়ে দিয়াছি সেইরূপ ভারী বোধ হইল।

তারপর আমিও সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঠিক সোজা হইয়াই যাইতে সক্ষম হইলাম। পায়ে আর কোন কষ্ট যন্ত্রণা নাই। উঃ মন্ত্রের কি শক্তি, কি বল!

অভিষেক-কথা।

ভারতসম্রাট সপ্তম এডবার্ড ইংরেজী ১৯০২ খৃঃ অব্দের ২৬শে জুন তারিখে গ্রেটবৃটন ও আয়র্লণ্ডর রাজসিংহাসনে নূতন মুকুট ধারণ করিয়া বসিবেন। এই অভিষেক কার্য্যের জন্য মহা মহোৎসব হইবে। গ্রেটবৃটনে ত মহোৎসব হইবেই। তদ্ব্যতীত ভূমণ্ডলের যেখানে যেখানে ইংরেজের অধিকার সেই সেই স্থানেও উৎসব হইবে। অষ্ট্রেলিয়া ভারত, কানেডা কেপরাজ্য কেবল স্থানীয় উৎসবে ক্ষান্ত থাকিবেন না। সম্রাটের আজ্ঞার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রতিনিধি ও সৈন্যাদি পাঠাইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে। ইংলণ্ডে কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং। কলিতে এরূপ রাজসূয় যজ্ঞ কখনও কোথাও হয় নাই এবং এরূপ রাজসূয় আর কখনও হইবে কি না সন্দেহ। বূয়র সমর শেষ হইয়াছে। ইংলণ্ড আজ রাহুমুক্ত দিবাকরের ন্যায় প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিয়া ধরাধামে কিরণানন্দ বিলাইতেছেন। জয় ইংলণ্ডের জয়, জয় সপ্তম এডবার্ডের জয়, জয় রাজকুমারের জয়, জয় রাজমহিষীগণের জয়। এতদিন যে অভিষেক হয় নাই তাহার কারণ শোক-প্রকাশ-সময় অতিবাহিত হয় নাই।

বূয়র সমর শেষ হইয়াছে। তেসরা জুন তাড়িতবার্ত্তা জগতে এই শুভ সুমঙ্গল সন্ধিসংবাদ ঘোষণা করিয়াছে। কি সর্ত্তে সন্ধি হইল, তাহার আলোচনা করিয়া আমাদের কোন লাভ নাই। ইংলণ্ডের লোক সন্ধিসংবাদ জ্ঞাত হইয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। করিবারই কথা, এক চক্ষে হাসি এক চক্ষে কান্না ত আর সম্ভব নয়। এদিকে সমর চলিতেছে, ইংলণ্ডের কৃতী সন্তান সমরক্ষেত্রে বিজয়যশাবৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন, ওদিকে তাহার মাতা, ভগ্নী, পিতা অভিষেকানন্দে যোগ দিয়া প্রাণের হাসি হাসিতেছেন,

এ ত হইতে পারে না, এ ত ভাল দেখায় না। তাই লোকেরা সন্ধি সংবাদ শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল। অভিষেকের রজনীতে জ্বালিবার জন্য যে সকল আলোকমালা স্থানে স্থানে সজ্জিত হইয়াছিল, সেগুলিকে জ্বালিয়া দিয়াছিল, ইংলণ্ড সন্ধিঘোষণার দিকে আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে। বিজয়-ব্যাণ্ড সেই আনন্দের তালে যোগ দিয়াছিল, পতাকা আরও শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছিল।

আমাদের ভাগ্যবিধাতা লর্ড কর্জ্জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁহার বিমল বুদ্ধিতে এই প্রতিভাত হইয়াছে যে আগামী ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী মোগল সম্রাটগণের ও তৎপূর্ব্বে হিন্দু ক্ষত্রিয় নরপতিগণের রাজধানী দিল্লী মহা নগরে এই অভিষেক কার্য্য ঘোষিত হওয়া উচিৎ। তাই ঐ দিনে ভারতে সম্রাটের অভিষেক ঘোষণা হইবে। জ্যেষ্ঠ সম্রাটকুমার সহধর্ম্মিণীসহ ভারতে আসিয়া শুভ কার্য্যে যোগদান করিবেন। দিল্লীতে ঐ উপলক্ষে আবার একটি রাজসূয় যজ্ঞ হইবে, অনেক রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া শুভ কার্য্যে যোগদান করিবেন ও রাজভক্তি প্রকাশ ও প্রচার করিবেন। দিল্লী নগরে উক্ত অভিষেক উপলক্ষে একটি শিল্পপ্রদর্শনী প্রদর্শিত হইবে। অনেক বিদেশীলোক আসিবেন কিনা? তাঁহারা উচ্চ অঙ্গের ভারতশিল্পের মর্ম্ম কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞেই যে কেবল ভারত নরপতিগণ যোগদান করিবেন এমন নহে। তাঁহাদিগকে অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ হইবে তাঁহাদিগকে ইংলণ্ড অভিষেকে যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ড যাইতে হইবে। অনেকে গমন করিয়াছেন। আমরা কেবল তন্মধ্য হইতে বীরকেশরী জয়পুরাধিপতির কথা উল্লেখ করিব। তিনি জগতে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের গুরু পুরোহিতের অনুমতি লইয়া, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নারায়ণশিলা সঙ্গে লইয়া হিন্দুমতে বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। ছয় মাস ব্যবহারোপযোগী গঙ্গাজল ও হিন্দুর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি জাহাজ ভরিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেখানকার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি একখানি জাহাজ দেড় লক্ষ টাকা দিয়া ভাড়া করিয়াছেন। সে জাহাজে আর কেহ যাইতে পারিবেন না, সে জাহাজের কর্ম্মচারী সাহেব ও নাবিকগণ পর্য্যন্ত জাহাজে মাংস

খাইতে পারিবে না। তিনি জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে যথাবিধি সমুদ্রপূজা করিয়াছেন। আপোলো-বন্দর একদিনের জন্য মঙ্গলময় শঙ্খ-ঘণ্টা নাদে পরিপূরিত হইয়াছিল। নূতন দৃশ্য বটে, নূতন ব্যাপার বটে! জয়পুরাধিপতি জগতে যে কীর্ত্তি রাখিলেন তাহা অতুলনীয়, ধন্য হিন্দুধর্ম্মের শক্তি! জয় হিন্দুধর্ম্মের জয়, জয় আর্য্যঋষিগণের জয়, জয় সমাজ শাসনের জয়, জয় জয়পুরাধিপতির নীতি-বিজয়ের জয়, জয় অভিষেকের জয়। নারায়ণশিলা জাহাজ হইতে অভিষেক দর্শন করিবেন। হয় ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মনে করিয়া কত কি ভাবিবেন।

মহাযাত্রা।

দ্বিতীয় সর্গ।

ত্যজি প্রপঞ্চের মায়া তবে পঞ্চ ভাই
পাঞ্চালী সহিত অগ্রে গেলা পূর্ব্বাঞ্চলে
তীর্থযাত্রা মহা ব্রত ইচ্ছিয়া মানসে,
ধর্ম্মেতে সতত তাঁরা একতান মতি
নশ্বরে বিমুখ সবে উন্মুখ শাশ্বতে,
ধর্ম্মবিশ্বাসেতে বলী ক্লেশে সুখ গণি
ভ্রমিলা অসংখ্য গিরি কান্তার কন্দরা
নদ নদী মহারণ্য, অগ্রে কুরুমণি
ধর্ম্মবীর সত্ত্বগুণী অগ্রণী জগতে,
বয়ঃজ্যেষ্ঠ, গুণজ্যেষ্ঠ, শিষ্ট শান্তমতি
তাঁর পাছে ভীম ভীম পাছে সব্যসাচী
ধনুষ্পানী, চিরপূর্ণ দিব্য তুণধারী,
যেন সেই সর্ব্বজয়ী ধনু তুণ মায়া
নারিয়া ত্যজিতে, সঙ্গে এনেছিলা বলী
সেই ধনু, সেই তুন, বৈরাগ্য বিরোধী,
চলিলা ফাল্গুনী পাছে যমজ দু'ভাই
তাঁদের পশ্চাতে কৃষ্ণা গজেন্দ্রগামিনী,
রমণীর শিরোমণি রামা মহীতলে,
স্নেহগুণে বদ্ধ শ্বান চলে সাথে সাথে
মথুরা কলুষ হরা চন্দ্রশালা হ'তে
দেখিত কৌতুকে যথা যাদবীযুবতী
ঘন নীল দ্যুতি চক্র বাকিনী যমুনা
সুবর্ণ জড়িত যেন অবনীর বেণী!
প্রয়াগ, পাবন গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে,
কল্পস্থায়ী কল্পবট ছায়াতে শীতল,
নাথের কুশল ভিক্ষা পতিপ্রাণাসীতা
করেছিলা যার মূলে বনযাত্রাকালে;
হরশূল শিখোপরি পুরী বারানসী
হরশৈলোপম যথা উচ্চ সৌধমালা
দেখিছে বিম্বিত মুখ জাহ্নবী-দর্পণে,

সরযুর স্রোতে পূত অযোধ্যানগরী
রঘুকুল রাজধানী ধন্যা ধন্যগীতে
বরেণ্য নৈমিষারণ্য পর্নাশনব্রতী
তত্ত্ববাদী যতীবৃন্দ অবিরত রত
যথা আধ্যাত্মিক যাগে, হৃদিবেদী যথা,
আত্মাযজমান, শ্রদ্ধাপত্নী স্বরূপিনী,
তপবহ্নি, কাম আজ্য, ক্রোধ যজ্ঞপশু,
ধৈর্য্যযুপ, ত্যাগ হোতা, বচন উদ্গাতা,
সোমরস সুমধুর ভক্তিপরাৎপরে।
গয়াপুরী প্রতিষ্ঠিত গয়াশূরশিরে
যথা বহে ফল্গু অন্তঃসলিলা তটিনী,
রাজগিরি বিরাজিত শত প্রস্রবণে(১)
জরাসন্ধে সংহারিলা গিরিদুর্গে যথা,
বায়ুসুত বৃকোদর কেশব-কৌশলে।
মহাশক্তি পিঠ পূত ভাগীরথীতীরে
বিরাজেন যথা দেবী নৃমুণ্ডমালিনী(২)
*লৌহিত্যাতরঙ্গে ধৌত প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরী,
লভেছে যে পূত শোভা কামাখ্যাপ্রসাদে,
পাণ্ডু জলারণ্য মধ্য কপিল আশ্রম(৩)
মহর্ষীর রোষানলে হ'য়ে ভস্মীভূত
সগর সন্ততি যথা লভিলা মুকুতি
ভগীরথ তপফলে অবনী প্রবণা
ত্রিলোক পাবনী গঙ্গা পাবন পরশে,
বর্গভীমা অধিষ্ঠিত মহী স্বর্গোপমা,
ইন্দ্রচাপ চারুপোত পতাকামালিনী
গঙ্গামুখে পোতধাত্রী তাম্রলিপ্তপুরী(৪)
বিপণি বীথিকা যার সমুজ্জ্বল সদা
দ্বীপান্তরাগত মণিমৌক্তিক প্রবালে।
পঞ্চালে কোশলে পুনঃ বিদেহে মগধে
অঙ্গে, বঙ্গে, এইমতে নানাস্থান ভ্রমি,
নানা তীর্থ সেবি সবে আসি উত্তরিলা
উৎকলের প্রাচ্যনীর প্রাচীর আকৃতি
নীল ফেনাকুল তুঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গুর
নীলাচল তটে যথা লোটে অম্বুস্বামী,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষি বিশ্বচরাচরে
গর্জ্জিতেছে নিজ বিষ জ্বালা আর্ত্তনাদে
ফণীন্দ্র বাসুকী যেন ফণাশ্রেণী তুলি!
অনন্ত নীলিমাময় সে জল কান্তারে(৫)
উত্তাল তরঙ্গলীলা হেরি কুতূহলে
বীরবৃন্দ, স্তব্ধ সবে হইলা বিস্ময়ে!
সহসা তরঙ্গ ভেদী উঠিলা সম্মুখে
দিব্য বপূধারী জ্বালামালা বিভূষিত
ভাস্বর পুরুষ এক, সাগর উদ্ভাসী,
যারে দেখি বেলাভূমি চারি মৃগযুথে
সচকিতে মহাত্রস্তে পলাইল দূরে।
মধ্যম পাণ্ডবে চাহি সে দিব্য পুরুষ
জিজ্ঞাসিলা "পার বীর চিনিতে আমারে?
দহিয়া খাণ্ডব বন বাসব পালিত
তুষি মোরে, লভেছিলা দেব দৈত্যনরে

(১)রাজগিরি বেহারের অন্তর্গত। এই স্থানে জরাসন্ধের গড় আছে, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। (২)কালীঘাট। *ব্রহ্মপুত্র। (৩)গঙ্গাসাগরদ্বীপ। (৪)তাম্রলিপ্ত—আধুনিক নাম তমলুখ। এই স্থানে বর্গভীমদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। (৫)কান্তার—অরণ্য।

দুর্জ্জয়, হে জিষ্ণু, এই বিশ্বজয়ী ধনু,
এ অক্ষয় তূনযুগ্ম, কর্ণরূপে যাহা
কর্ণধাররূপে তুমি ধরি বর ভুজে,
পাণ্ডবের আশাতরি পার কৈলা হেলে
অকূল অতুল কুরু সমর সাগরে;
প্রচেতা আয়ুধাগার হ'তে এই ধনু
দিছিনু আনিয়া তোমা অচ্যুত আদেশে
তূন সঙ্গে, যেই কার্য্যে, সাঙ্গ সে ভূতলে
এবে, মহাবাহু আর বহিবে কি লাগি
করে ইহা, সমুচিত ফিরে দিতে এবে,
ফেলে দাও পারাবারে তূন সঙ্গে ধনু"।
নমিলা অগ্নিরে সবে পয়োধিপুলিনে,
অগ্রজ সঙ্কেতে তবে পার্থ মহামতি
ফেলিলা সাগরে ধনু যুগ্ম তূনসহ,
আদরে নীলাম্বুস্বামী, প্রসারি অম্বরে
উত্তাল তরঙ্গবাহু, নিলা তা তখনি,
ডুবিল সলিলে সেই আভাময় ধনু,
মিশে যায় মেঘে যথা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত
শক্রচাপ, তড়িল্লতাসিঞ্জিনী সংযুত;
বিনয়ে অনলদেবে বিনয়ভূষণ
সুধিলা পাণ্ডবপতি কৃতাঞ্জলিপুটে
"হে দেব এ কোন্ স্থান? কিলাগি এ স্থানে
হৈল সিন্ধুগর্ভে এবে আবির্ভাব তব"!
উত্তরিলা অগ্নি "ইহা নীলাচলধাম
সৃষ্টি হ'তে অপ্রসিদ্ধ ছিল মহীতলে
থাকি আমি গুপ্ত যথা ভস্ম আবরণে,
যদুবংশ ধ্বংস হ'ল যে দিন প্রভাসে
চতুর্ভুজরূপ প্রভু ধরিলা সে কালে
যোগবলে যোগেশ্বর, সাঙ্গ দেখি ভবে
ভূভার হরণ ব্রত, হৈলা পুলকিত;
একমাত্র নিজকুলে প্রদ্যুম্নে নিরখি
জীবিত, ভকত বাক্য রক্ষিবার তরে
ক্ষেপিলা আয়ুধ তাঁর নিধন ইচ্ছিয়া,
সংহারি সম্বর রিপু আর না ফিরিল
শ্রীকরে তাঁহার চক্র, অম্বর উদ্ভাসী,
দিগপালে ব্যোমচরে হ'য়ে নমস্কৃত,
মহাবেগে আসিল সে রত্নাকর-কূলে
পূর্ব্বমুখে, হীনপ্রভ করি দিননাথে,
(হীনাংশু তাঁহার তেজে সুধাংশু যেমনি)
এই পূত দৃশ্য বিশ্ব বারেক দেখিলা
ত্রেতাযুগে বিশ্ববাসী, বিশ্বম্ভরাসূতা
সুন্দরী রমণী-মণি সতীশিরোমণি
(পূত হৈনু আমি যাঁর শ্রীঅঙ্গ পরশে(৬)
লঙ্কাপুরে) সীতাসনে যবে রঘুপতি
অযোধ্যায় গেলা চড়ি উজ্জ্বল পুষ্পকে
নীলাম্বরে, দিগ্বলয়প্লাবি প্রভাপুরে;
স্ফুলিঙ্গ তাঁহার মাত্র, আমি রাজর্ষি,
প্রচারিয়া ছিলা অগ্রে অশরীরী বাণী
দেবলোকে, কৃষ্ণকর হ'তে চক্র আদি
পড়িবে যে স্থলে তথা হবে কলিযুগে
ভাবগ্রাহী কেশবের ভাবী অবতার,
পতীতপাবন ধ্বজা উড়িবে ভূতলে;
অবতরি এই স্থানে তেজ কুলপতি
সুদর্শন বিশ্বদ্রোহী দনুজধর্ষন
সিন্ধুগর্ভে প্রবেশিলা সঙ্কোচি স্বরপু,
তথাচ নীলাম্বুস্বামী উথলি অস্থিরে
প্লাবিলা ভূখণ্ড খণ্ড প্রলয় আকারে,

(৬)লঙ্কাতে সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা এই উক্তির লক্ষ্য।

ঘোরনাদে, কাঁপাইয়া ত্রাসে বিশ্ববাসী
মহায়াসে পাশী সেই উচ্ছ্বসিত বারি
ফিরাইলা নিজরাজ্যে, রহি গেল যাহা
হ্রদাকারে পরিণত যুগ্মাদিকে এবে
নিম্নভূমে, সরঃ পুনঃ চিল্কানামধারী,(৭)
সেই হ'তে পুণ্যশ্লোক লোকে এই স্থানে
করিয়াছে অভিহিত চক্রতীর্থ নামে(৮)
সচেতন চক্রবর রহিবেন এবে
পাশীপাশে, অবতীর্ণ হইলে শ্রীপতি
আবার পূর্ব্বের মত সেবিবেন তাঁরে,
এসেছিনু প্রণমিতে শ্রীচক্র-চরণে
আজি আমি, তব সনে ভেট হ'ল ভাই,
ভাগ্যফলে আসি তুমি মিলিলা এস্থানে
পুণ্যতম এ সৈকত বিশ্ব চরাচরে,
লয়েছেন বাছি যাহা নিজে রমাপতি
পুনঃ মর্ত্তলীলা লাগি, অখিল ভারতে;
পর্ণদলে শ্রেষ্ঠ যথা প্রসূন ললিত,
শ্রেষ্ঠ এ উৎকলভূমি ওগো গরিয়সী,
যাম্যে যার ঋষিকুল্যা, কপিশা উত্তরে(৯)
পশ্চিমে ভার্গবাশ্রম মহেন্দ্রশিখরী(১০)
চির কোলাহলময় পূর্ব্বে পয়োনিধি,
কেশর যেমন শ্রেষ্ঠ পুষ্পের মাঝারে
তথা এ নীলাদ্রিধাম সমগ্র উৎকলে,(১১)
নিবসেন নানাস্থানে দেব দেবী যত
ভারত, ভারতখণ্ডে, আসি এ প্রদেশে
রহিবেন স্থানে স্থানে নিজ রুচি মতে,
হইবেন একত্রিত পুনঃ এ পুলিনে।
অখিল ভারত তীর্থ ভ্রমণ সুকৃতি
লভিবে কলিতে লোকে আসি এইস্থানে
চিত্তের কলুষরাশি যাবে অপসরি,
সোযোগে স্বর্গের যথা, এ তীর্থ সেবনে;
স্ফুরিবে অমল জ্ঞান, লভি পূর্ণাহুতি
হোমকুণ্ডে জ্বলি উঠে যথা মোরশিখা।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
চারিস্থলে, বিরাজিবে চারিক্ষেত্রবর(১২)
এ উৎকল কলেবরে এবে দেবাদেশে
এসেছেন; সুদর্শন শঙ্খ পদ্ম গদা,
রেখেছেন রত্নাকর মহাদরে যাহা(১৩)
দেবাদেশ মতে আমি গিয়া তাঁর পাশে
আনি, হে পাণ্ডবনাথ স্থাপিব উৎকলে,
ইচ্ছা যদি, মোর সাথে চল মহাবাহু,
দেখিব অশেষ তীর্থ, গিরি, নদ, নদী।
অগ্নির বচনে সবে প্রসন্ন মানসে
অবগাহি সিন্ধুজলে উদ্দেশে নমিলা
ভাবী মর্ত্তবৈকুণ্ঠেশ-রাতুল চরণে(১৪)
অহোরাত্র রহি তথা, ভাসিল যেকালে
উষার সীমন্তমণি প্রভাতী তারকা
প্রাচীমূলে ঊর্দ্ধশিরে (ছাড়ি দেয় যবে
মহিষ-রক্ষক নিজ পাল সিন্ধুতীরে
চরিবারে বর্ষাশূন্য বেণাপূর্ণ মাঠে
পুণ্যনীরা ভার্গবীর) নীলাচল ছাড়ি
চলিলা মহেন্দ্রমুখে অনল-সহিতে।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

(৭)পুরীর একপার্শ্বে চিলিকা অপর পার্শ্বে সমুদ্র অবস্থিত।
(৮)পুরীস্থিত স্বর্গদ্বারের অদূরবর্ত্তী। (৯)যাম্য = দক্ষিণ দিক, কপিশা, সুবর্ণরেখা। (১০)উৎকলের পশ্চিমাংশস্থিত পর্ব্বতমালার সাধারণ নাম মহেন্দ্র। মঞ্জুষাগড়ের নিকটে এই পর্ব্বতমালার সঙ্কুচি শৃঙ্গ অদ্যাপি মহেন্দ্র নামে অভিহিত। মহেন্দ্র পর্ব্বতে যামদগ্ন্যের আশ্রম ছিল। (১১)নিলাদ্রীধাম = শ্রীক্ষেত্র। (১২)পুরী শঙ্খক্ষেত্র, কোণার্ক পদ্মক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর চক্রক্ষেত্র, যাজপুর গদাক্ষেত্র। (১৩)রত্নাকর = আরব্যসাগর। (১৪)মর্ত্তবৈকুণ্ঠ = শ্রীক্ষেত্র।

হুগলী কাহিনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তগ্রাম মসজীদ।

নিম্নবঙ্গের রাজধানী, সমৃদ্ধিশোভমানা সপ্তগ্রাম মহানগরীর শেষ নিদ-র্শন একটি বহু পুরাতন মসজীদ ভিন্ন আর উল্লেখযোগ্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যেদিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই বন আর বন, গভীর হইতে গভীর-তর। মসজীদটিও সংস্কারাভাবে ধ্বংসাবশেষমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই মসজীদটি সৈয়দ ফকিরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জালালুদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন এক খণ্ড খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে সৈয়দ ফকিরুদ্দিন কাসপিয়ান হ্রদের তীরস্থ আমুল নামক নগর হইতে আগমন করিয়া এখানে অবস্থান করেন। মসজীদের দেওয়াল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ডে রচিত। প্রাচীরগাত্রে নয়ন তৃপ্তিকর লতা, গুল্ম, পত্রাদি আরব চিত্রকর কর্ত্তৃক সুন্দররূপে চিত্রিত। মধ্যস্থলের প্রাচীরগাত্রে খোদিত কুলঙ্গিটী অতি-শয় সুদৃশ্য কিন্তু পশ্চিম দিকের দেওয়ালস্থিত উপরের অংশ ভগ্ন হওয়ায় প্রস্তর এবং ভগ্নস্তূপ ভেদ করিয়া সমগ্র কুলঙ্গিটী নয়নগোচর হয় না। খিলান এবং গম্বুজগুলি অনেকটা আধুনিক পাঠান ধরণের। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রত্যেক দ্বারের উপর তুর্কীদিগের জাতীয় পতাকার অনুকরণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অঙ্কিত। এই মসজীদের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনে একটী প্রাচীর বেষ্টিত তিনটী সমাধিস্তম্ভ আছে, তাহার নিম্নে সৈয়দ ফকিরুদ্দিন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও খোজা চিরনিদ্রায় শয়ান আছেন। এই প্রাচীরটির অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উত্তরদিকের প্রাচীরের ভিতরদিকে দুইখানি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বক্রভাবে রক্ষিত হইয়াছে। একখানি চতুষ্কোন কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলক প্রাচীরগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। প্রস্তরফলকখানির মধ্যস্থল ভগ্ন হইয়াছে। ব্লকম্যান সাহেব ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই মসজীদটী দেখিয়াছিলেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এই প্রস্তরফলকগুলি কলিকাতা যাদুঘরে (মিউজিয়মে) রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তাব করেন কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।* এই প্রস্তরফলকগুলি কি প্রকার

*ব্লকম্যান সাহেব এই মসজীদ দেখিয়া যাওয়ার পর বিগত বত্রিশ বৎসরের মধ্যে মসজীদটির আর কেহ খোঁজখবর লইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

মসজীদের অভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুষ্কর। যখন সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর সাধারণ অট্টালিকাগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছিল সম্ভবতঃ সেই সময়ে কোনও ধার্ম্মিক লোক খোদিত লিপিগুলি উদ্ধার করিয়া ফকি-রুদ্দিনের মসজীদ এবং জাফর খাঁর মসজীদ ও সমাধিস্থলের ন্যায় পবিত্র স্থানে রক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং মসজীদ সংস্কারকালে কতকগুলি প্রস্তরফলক প্রাচীরগাত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া এই আস্তানা বা সমাধিস্থানগুলিকে মিউজিয়মে পরিণত করিয়াছেন। ফকিরুদ্দিনের সমাধিস্তম্ভের উপর প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ লিপি আছে কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে কোনক্রমে পাঠ করিতে পারা যায় না।

উপরোল্লিখিত কয়েকখানি প্রস্তরলিপির পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। প্রস্তরলিপি চারিখানির মধ্যে দুইখানি আমাদের আলোচ্য সপ্তগ্রাম মসজীদ সম্বন্ধে। দুইখানিই কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ, তন্মধ্যে একখানি বেশী লম্বা। সেখানি ফকিরুদ্দিনের সমাধিস্তম্ভের দেওয়ালে বক্রভাবে রক্ষিত। লিপিখানি আরবী ভাষায় লিখিত, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

(১)

পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যদি তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর তাহা হইলে শুক্র-বারে উপাসনা শব্দ শুনিবামাত্র ত্বরিতপদে ক্রয়বিক্রয় বন্দ করিয়া উপাসনায়

কারণ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে মসজীদের চতুর্দ্দিক এরূপ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল যে তথায় মনুষ্য দূরের কথা শ্বাপদগণেরও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। আমরা গত বৎসর যখন এই মসজীদটির বিষয় অবগত হইলাম, তখন ইহা কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইল। বহুকষ্টে স্থান নির্ণয় করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া তবে আমরা মসজিদটী আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই। এই মসজিদের চতুর্দ্দিকে কয়েক বিঘা লাখরাজ জমী মসজীদ ও সমাধিস্থান মেরামতে রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে বটে কিন্তু এ জনমানবশূন্য অরণ্যপূর্ণ স্থানে ভগ্ন মসজিদটী কে রক্ষা করিবে? তবে প্রস্তরফলকগুলি কলিকাতা মিউজিয়াম কিম্বা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর বাটীতে লইয়া গিয়া রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ফকিরুদ্দিনের প্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভের কারুকার্য্য অতি সুন্দর—অদ্যাপি প্রায় নূতন বলিয়া প্রতীতি হয়। বড় লাট কর্জ্জন মহোদয় বা প্রত্নতত্ত্ববিভাগ মনে করিলে, সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ ও প্রত্নবিদের আদরের সামগ্রীগুলি এখনও রক্ষিত হইতে পারে।

যোগদান করিতে যাইবে। যদি তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হইবে। দেবোত্তর দ্রব্য অপহরণ করিও না। মহাপুরুষ (ভগবৎ কৃপা তাঁহার উপর অক্ষুণ্ণ থাকুক) বলিয়াছেন "যখন তুমি বাটী হইতে বহির্গত হও, সেদিন যদি শুক্রবার হয় তাহা হইলে তুমি একজন মুহাজির (মহম্মদের পলায়নের সঙ্গী), আর যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তুমি উচ্চতম স্বর্গে গমন করিবে। মহাপুরুষ আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক মসজীদ এবং দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে সে স্বীয় দুহিতা মাতা এবং ভগ্নীগমনের পাপে পতিত হয়। মসজীদ সকল ভগবানের সম্পত্তি। * * (অস্পষ্ট)—তাঁহার মুখজ্যোতি পুনরুত্থানের দিবস পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইবে (পারস্য ভাষায়)। হাসেনের বংশধর হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান এবং আদর্শ সুলতান মোজাফার সুলতান নাস্‌রা সাহর রাজত্বকালে এই জুম্মা মসজীদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব বিধান করুন। ৯৩৬ হিজরী রামজান মাসে (মে, ১৫২৯ খৃঃ অঃ) আমুল নগর নিবাসী সৈয়দ ফকিরুদ্দিনের পুত্র, সৈয়দদিগের আশ্রয়স্বরূপ সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেন এই মসজীদ নির্ম্মাণ করেন। মোল্লা এবং জমীদারেরা দেবোত্তর অপহরণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করেন, সেজন্য যাহাতে এরূপ না ঘটে, শাসনকর্ত্তা এবং কাজিদিগে সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য তাহা হইলে পুনরুত্থানের দিবস তাঁহা এই কুকর্ম্মের সহায়তার জন্য দণ্ডিত হইবেন না।"

অপর প্রস্তরফলকখানিতে এইরূপ লিখিত আছে—

(২)

পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে এবং অন্তিম দিবসে বিশ্ব করে, দৈনিক উপাসনা করে এবং ধর্ম্মানুমোদিত দানধ্যান করে এ পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করে না, সেই ব্যক্তি ভগবদুদ্দেশে মসজী নির্ম্মাণ করিবার অধিকারী। যাহারা ভগবৎ কৃপায় চালিত কেবল তাহারা এই সকল কার্য্য করিতে পারে।

মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভগবানের জন্য ইহজগতে এ মসজীদ নির্ম্মাণ করে ভগবান তাহার জন্য স্বর্গে ৭০টী দুর্গ নির্ম্মাণ করি রাখেন। হাসেনের বংশধর, সুলতান হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান নৃ আবুল মোজাফার নাস্‌রা সাহ সুলতানের রাজত্বকালে টাহা বংশের গৌ

সৈয়দদিগের আশ্রয় স্বরূপ, আমুল নগর নিবাসী সৈয়দ ফকিরুদ্দিনের উপযুক্ত পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিন হাসেন কর্ত্তৃক ৯৩৬ হিজরী শুভ রমজান মাসে (মে, ১৫২৯ খৃঃ) এই জুম্মা মসজীদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখুন।

নিম্নে যে দুইখানি প্রস্তরলিপির অনুবাদ দেওয়া হইল তাহার একখানি ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং আর একখানি ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মসজীদ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। মসজীদ দুইটি কোন্ স্থানে ছিল তাহার উল্লেখ প্রস্তর ফলকে নাই এবং কি প্রকারে এগুলি ফকিরুদ্দিনের সমাধির নিকট স্থান পাইল, তাহা জানিবারও উপায় নাই।

(৩)

পরমেশ্বর বলিয়াছেন ইত্যাদি (২ দেখ)। যিনি নিজের গৌরবেই গৌরবান্বিত এবং যাঁহার পরহিতৈষিণা বিশ্বব্যাপী, তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন "মসজীদ সকল ভগবানের সম্পত্তি। ভগবান ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিও না। মহাপুরুষ (যাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন, যিনি ইহ জগতে ভগবানের উদ্দেশে মসজীদ নির্ম্মাণ করেন, স্বর্গে ভগবান তাঁহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। (এইস্থানে দুইটি ছত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এত অস্পষ্ট হইয়াছে যে পাঠ করা দুষ্কর।)

যিনি প্রমাণ এবং সাক্ষ্যের দ্বারা বলীয়ান, ইসলাম ধর্ম্ম এবং মুসলমানদিগের আশ্রয়স্বরূপ, সুলতান নাসিরুদ্দিন আবুল মোজাফার সাহ, ভগবান তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁহার পদগৌরব এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন। এই মসজীদ সেই মহামহিম মহিমান্বিত তরবিয়ৎ খাঁ উপাধিধারী খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ভগবান তাঁহার অপার করুণা দ্বারা তাঁহাকে অন্তিমকালের ক্লেশ হইতে রক্ষা করুন। ৮৬১ হিজরী বর্ষে (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে)। উপরোক্ত লিপি আরবী ভাষায় একখানি পাতলা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে খোদিত এবং ফকিরুদ্দিনের সমাধিস্তম্ভের উত্তরের দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট আছে।

(৪)

পরমেশ্বর বলিয়াছেন ইত্যাদি (পূর্ব্বের ন্যায়)। মহাপুরুষ (যাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ইহ-জগতে ভগবানের উদ্দেশে

মসজীদ নির্ম্মাণ করে, স্বর্গে ভগবান তাহার জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মান করিয়া রাখেন। সুলতান মামুদের পুত্র ন্যায়বান এবং সদাশয় নৃপতি জালালুদ্দিন আবুল মোজাফার ফাতসাহ সুলতানের রাজত্বকালে এই মসজীদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব বিধান করুন।

হাদিগড় জেলা ও মহলের (পরগণা?) শাসনকর্ত্তা এবং লাওবলা ও মিরবক্ থানার অধ্যক্ষ, সাজিলা মানকবাদ এবং সিমলাবাদ নামক সহরের শাসনকর্ত্তা এবং উজীর, অসি এবং লেখনীর অধিপতি উলুগ্ মজিলিস্নুর এই সুবৃহৎ মসজীদের নির্ম্মানকর্ত্তা। ভগবান তাঁহাকে ইহলোকে এবং পরলোকে রক্ষা করুন। তারিখ ৪ঠা মহরম ৮৯২ (১লা জানুয়ারী ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ)।

দাসানুদাস আখন্দ্ মালিক কর্ত্তৃক লিখিত।

একখানি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে আরবী ভাষায় এই লিপি অঙ্কিত। ইহাও ফকিরুদ্দিনের সমাধি স্থানের উত্তরের দেওয়ালের নিম্নে রক্ষিত।

এখন আমরা এই সংক্রান্ত দুই একটি কথার আলোচনা করিব।

১। জেলা সাজিলা মানকবাদ, ২। জেলা হাদিগড়, ৩। থানা লাওবলা ও মিরবাক্, ৪। সহর সিমলাবাদ। এই কয়েকটি স্থান নির্ণয় করা দুরূহ। থানা লাওবলা সম্ভবতঃ লাওপল্লা। ত্রিবেণীর পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বে ভাগীরথীর অপর পারে যমুনার নিকট লাওপল্লা নামক একটি স্থান আছে। লাওপল্লা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান।

প্রস্তরলিপিগুলিতে যে তিন নরপতির নাম আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বাঙ্গালার ইতিহাসে কোনও উল্লেখ আছে কি না দেখা কর্ত্তব্য।

১। নাসিরুদ্দিন আবুল মোজাফার হাসেন সা (৮৬১ হিজরী)।

২। মামুদের পুত্র জালালুদ্দিন আবুল মোজাফার ফাতসাহ (৮৯২ হিঃ)

৩। আলাউদ্দিন হাসেন সার পুত্র নাস্রা সাহ (৯৩৬ হিজরী)।

বঙ্গদেশের ইতিহাসে তৃতীয় মুসলমান নরপতি নাসির সাহের উল্লেখ আছে। তিনি ৮৩০ হইতে ৮৬২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ নাসিরুদ্দিন আবুল মোজাফার হাসেন সাহ ইতিহাসে নাসির সাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। নামের শেষ পদবী ধরিয়াই নৃপতিদিগের নামকরণ হওয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। ইতিহাসে নাসির সাহের নাম প্রথম হাসেন সাহ দেওয়া

উচিত ছিল। ইতিহাসে নাসরা সাহর পিতা আলাউদ্দিন হাসেন সাহর নাম আলাউদ্দিন বলিয়া উল্লেখ আছে বস্তুতঃ তাঁহার নাম দ্বিতীয় হাসেন সাহ দিলে এত গোল হইত না।

বঙ্গদেশের পঞ্চম মুসলমান নরপতি ফাতসাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। মার্সডেন্ এবং লেড্লী সাহেব বলেন, ফাতসাহ মামুদের পুত্র সুতরাং বারবাক্ সাহের ভ্রাতা। মার্সডেন্ সাহেব ৮৭৩ হিজরী বারবাক্ সাহের নামাঙ্কিত একটী মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বারবাক্ সাহ ৮৬২ হইতে ৮৭৯ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সামসুদ্দিন আবুল মোজাফার যুসুফ সাহ রাজত্ব করেন। গৌড়ের খোদিত লিপিতে ৮৮০ হইতে ৮৮৫ পর্য্যন্ত যুসুফ সাহর রাজত্বকাল নির্ণীত হইয়াছে। যুসুফের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় রাজবংশের সিকন্দার সাহ নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করেন। যুসুফ সাহর খুল্লতাত ফাত সাহ সিকন্দরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

লেড্লী সাহেব গৌড়ের খোদিত লিপি এবং যে দুইটী মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন* তাহাতে জানা যায় যে বঙ্গদেশে একই সময়ে দুইজন মুসলমান নরপতি রাজত্ব করিতেন। নাসরা সাহ এবং তাঁহার ভ্রাতা গায়েসুদ্দিন আবুল মোজাফার মামুদ সাহ। ডাক্তার ওল্ডহাম্† আজিমগড় জেলায় সিকন্দরপুর নামক গ্রামে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে টোগরা অক্ষরে খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে তত্রত্য একটী মসজীদ ২৭শে রাজব ৯৩৩ হিজরীতে নাস্রা সাহর রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। গৌড়ীয় লিপিতে ৯৩৬ হিজরীতে নাসরা সাহর উল্লেখ আছে এবং গৌড়ীয় মুদ্রায় ৯৩৩ হিজরীতে নাসরা সাহর ভ্রাতা গায়েসুদ্দিন আবুল মোজাফার মামুদ সাহর নাম অঙ্কিত আছে। এই সকল ব্যাপার স্পষ্টতঃই একই সময়ে দুইজন প্রতিদ্বন্দী নরপতির রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিতেছে।

*Journal As. Soc. for 1846 Pl. V Nos. 22 and 23, p332.

†Dr. W. Oldham C.S.

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

সাবিত্রী, স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা, ১৩০৮ ভাদ্র, আশ্বিন। নারীতত্ত্ব, স্ত্রী, কবিরা মুর্খ (পদ্য) এগুলি বেশ। "স্ত্রী" প্রবন্ধ হইতে একটু তুলিয়া দিলাম।

পতিব্রতা স্ত্রী গৃহস্থের একমাত্র গতি;—অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভের স্ত্রীই একমাত্র সোপান। পাণিগ্রহণানন্তর যে একটি সংস্কার হয়, অর্থাৎ জ্ঞান জন্মায়, সেই জ্ঞান অভিহিতা যে নারী, তাহার নাম স্ত্রী। এক্ষণে স্ত্রী এই শব্দটি প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়া ব্যুৎপত্তি লভ্য শব্দার্থ প্রকাশ হয়, তাহাই শাস্ত্রকার নির্ণয় করিতেছেন। শব্দার্থ ষ্ত্তৈ ধাতুর উত্তর ড্রট্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রী এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ —যে নারী পতিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়েতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য ধীরে ধীরে বলে, অর্থাৎ সৎ পরামর্শ দেয়, সেই যথার্থ স্ত্রী। কারণ ভার্য্যাই একমাত্র সুহৃদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহার সহিত পুরুষ সকল পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ করিতে পারেন। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে, ইহাও শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। কিম্বা ক্ষেপণার্থ "অর্স" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে এ প্রত্যয় করতঃ ঔনাদিক অকার লোপ করিয়া স্ত্রী পদটি নিষ্পন্ন হয়। অর্থ, যৎকর্ত্তৃক সাবিত্রীর ন্যায় পতি যমলোক হইতে উর্দ্ধলোক অর্থাৎ,—সৎলোকে উন্নীত হন, সেই স্ত্রী। যে স্ত্রী সংসারের মধ্যে পতিকে ধর্ম্মার্থে নিযুক্ত করে, এবং সংসার হইতে ত্রাণ করে, সেই পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী। অথবা উৎপত্ত্যর্থ "অস" ধাতু হইতে এ প্রত্যয় করিয়া (করণ বা অধিকরণবাচ্যে) স্ত্রী শব্দটি নিষ্পন্ন, এ বিষয়ের প্রমাণ শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহাতে পুনর্ব্বার জন্মাইতে হয়, তাহার নাম জায়া, এবং স্মৃতি বলেন, স্ত্রীকে শরীরের অর্দ্ধেক বলিয়া জানিবে। শান্তি পর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে বলিয়াছেন যে,—পিতা স্বয়ং আপনাকে পত্নীতে আধান করতঃ নিজকুল, চরিত্র, স্বভাব, এবং গোত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত, জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—পতি স্ত্রীর গর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাতে দশ মাস অবস্থিতি করতঃ পরে নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ের প্রমাণ বিরাট পর্ব্বেও আছে এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে, বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হইল। অমরকোষ অভিধানে ভার্য্যা, জায়া, দারা, স্ত্রী এ সকল এক পর্য্যায় মধ্যেই আছে।

অতএব সাবধানপূর্ব্বক পত্নীর সহিত একত্র হইয়া গৃহস্থোচিত কর্ম্ম করতঃ স্বীয় আশ্রমানুগত ধর্ম্ম আচরণ করিবে, শাস্ত্রে আছে সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়, মনুসংহিতায় কথিত আছে,—যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমস্তই জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি গৃহস্থ আশ্রমকে অবলম্বন করিয়া, সকল আশ্রমই অবস্থান করে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক, এই চারি আশ্রমই স্থিররূপে বর্ত্তমান থাকে। যে হেতু গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ ঐ তিন আশ্রমীদিগকে জ্ঞান অর্থাৎ বেদার্থ ব্যাখ্যান দ্বারা এবং অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করেন; এই হেতু গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ; গৃহীর স্ত্রী দ্বারায় সকল কার্য্য হয়; সুতরাং জগতে স্ত্রীই রত্নতুল্য। বিশেষতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলিয়াছেন যে—সমস্তই স্ত্রীজাতি ভগবতীর কলা অর্থাৎ অংশ স্বরূপা, অঙ্গের সহিত বর্ত্তমানা। শান্তি পর্ব্বেও স্পষ্ট আছে—দেবী ভগবতীর কামভাবে জনিত সকল স্ত্রী পুরুষ; অতএব এই চরাচর জগতে প্রকৃতি পুরুষরূপের কারণ, তৎভিন্ন অন্য কারণ যিনি কল্পনা করেন তিনি অতি নির্ব্বোধ। বস্তুতঃ ত্রিভুবনে পুং বাচক মাত্রেই শিব অংশ, এবং স্ত্রী বাচক যত জীব সমস্তই ভগবতী উমার অংশ জানিবে। শিবময় পুরুষ প্রকৃতি উভয় দেহই এক। এই দুই দেহ দ্বারা চরাচর জগতকে ব্যাপিয়া আছেন। অতএব শান্তিগুণ বিশিষ্ট শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অর্দ্ধেক পীতবর্ণ অর্দ্ধেক শ্বেতবর্ণ নারায়ণের শরীর; স্ত্রী-পুরুষরূপে বিরাজমান হরগৌরীরূপী ভগবান মহাদেবকে আমরা বারম্বার প্রণাম করি।

বামাবোধিনী, ১৩০৮ অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত পাইয়াছি। স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ৩৯ বৎসর কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছে। সকলের উচিৎ বামাবোধিনীর সাহায্য করা। "রামকৃষ্ণ কথামৃত" রীতিমত বাহির হইতেছে! একজন লেখক মধুপুরে বৈদ্যনাথে গিরিডিতে "বঙ্গীয় হিন্দুমহিলা"কে দল বাঁধিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, তাহাদের বর্ত্তমান পরিচ্ছদ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। পোষাক বদলাইতে বলিয়াছেন। বলেন "আমার বিবেচনায় বেড়াইতে হইলে ঘোমটার পরিবর্ত্তে ওড়নার ব্যবহার করা উচিৎ এবং শাটী কতকটা ব্রাহ্মিকাদের ধরণে পরাও দরকার।" * * "আর যদি পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে না চাও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি আমার এই নিবেদন

যে, কদাকার হাস্যোদ্দীপক বেশে আর বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে মধুপুরের বিশাল বটবৃক্ষ, গিরিডীর খাকো নদী ও বৈদ্যনাথের চন্দনপাহাড় দেখিতে পাঠাইও না, দোহাই তোমাদের।" আমরাও বলি তথাস্তু। ঈশ্বরের নামের তালিকা একটি ক্রমশ প্রদত্ত হইতেছে। বামাবোধিনী একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন। চরণদাসী নাম্নী এক বাঙ্গালী বৈষ্ণবী সুরাট সহরে গৌরাঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই মন্দির ও বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান। নাম "মায়ীজিকি আখ্‌ড়া"। সেই মন্দিরে ভক্তমাল গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। বামাবোধিনীতে কংগ্রেস কেন? তিব্বৎ ভ্রমণকারীর একটি তালিকা দেখিলাম। রোমান কাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ তিব্বত বেড়াইয়া ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। ১৭৪৪ সালে হেষ্টিংস্ বগ্‌লে সাহেবকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। হেষ্টিংস আর একজন ঊর্দ্ধবাহু হিন্দু সন্ন্যাসীকে প্রেরণ করেন, সে সংবাদ দেখিলাম না। তিনি (পুরাণপুরী) কলিকাতার নিকট ভোটবাগানে থাকিতেন ও পরে কাশীর নিকট আশাপুর গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হন। লোকে বলে হেষ্টিংস্ এই সন্ন্যাসীকে গুরু বলিয়া মানিতেন ও তাঁহারই পরামর্শে সকল কার্য্য করিতেন। ১৮১১ সালে লর্ড মিণ্টো ম্যানিং সাহেবকে তিব্বৎ পাঠান। ১৮৩২ সালে সোমা ডি করোস কয়েক বৎসর তিব্বৎবাসের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও তিব্বৎ ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪২ সালে পুনরায় তিব্বৎ যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে দুর্জ্জয়লিঙ্গে জ্বরে প্রাণ ত্যাগ করেন। হুক্ ও গর্ব্বে ১৮৪৪ সালে পিকিন হইয়া লাসা গমন করেন। চীন সম্রাট ইঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৮৬৪ সালে পণ্ডিত নয়নসিংহ নামক একজন শিখ ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তারপর একজন অজ্ঞাত নাম ভারতবাসী গমন করেন (লোকে ইঁহাকে একে বলে)। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র দাস সন্ন্যাসীবেশে তিব্বৎ ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৮৯৩ সালে কুমারী টেলর তিব্বৎ প্রবেশ করিতে গিয়া তাড়িত হন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন (রামানন্দ ভারতী) তিব্বৎ দেখিয়াছিলেন। ইনি সাহিত্য পত্রিকায় হিমারণ্য নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন, একথাটাও বলা চলিত। গত বৎসর সাভেজ ল্যাণ্ডর তিব্বৎ প্রবেশ করিতে গিয়া অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন

এ সংবাদও দেওয়া যাইতে পারিত, যাহাহৌক আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি যদি হিন্দুধর্ম্মের সজীব স্বরূপ অবস্থা দেখিতে চাও, যদি সিদ্ধযোগী দেখিতে চাও, যদি তিন জন্মের বিবরণ বলিয়া দিতে পারেন এমন জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিতে চাও তবে তিব্বৎ যাত্রা কর। আর যদি সদ্‌গুরু চাও যিনি তোমাকে ভবনদী পার করিয়া বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইবেন, তবে তিব্বতে অন্বেষণ কর।

অন্তঃপুর, সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরী, ১৩০৮ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ। গৃহস্থ আশ্রমের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রবন্ধাদি দেখিয়া যেমন সুখী হইলাম "জীবন-বীমা" দেখিয়া তেমনি দুঃখিত হইলাম। বীমা আফিসের কোন দালালের লেখা কি না জানি না। যাহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই তাহারাই জীবন বীমা করে, যাঁহারা হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম মানিবেন, তাঁহারা জীবন বীমা করিলে ধর্ম্মে পতিত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যে টাকা রাখিয়া যাইতেছেন তাহা যাহার জন্য রাখিতেছেন তাহার ভোগ হইবে কি না জানেন? কর্ম্ম ফল মানেন কি? অযোধ্যার নবাব কেন মুচিখোলায় আসিয়াছিল বলিতে পারেন। ইংলণ্ডের বণিক ভারতে আসিয়া কেন সাম্রাজ্য স্থাপন করিল বলিতে পারেন? বাড়াভাতে কোথা হইতে কোলা বেঙ্ লাফাইয়া পড়িয়া ভাতে প্রস্রাব করিয়া দেয় জানেন কি? বীমা আফিস ত ফেল হইতে পারে। বীমা আফিস ত মোকদ্দামা করিতে পারে, যে রোগ ছিল, গোপন করিয়াছিল, টাকা দিতে বাধ্য নহি। কতকগুলি বীমা আফিসের নাম করিয়া এখানে টাকা রাখ বলাতে আমাদের আরও ভয় হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র ত মনে করিতে পারে যে স্বামী কি পিতা মরিলে এই টাকাটা আমার হাতে আসিবে। যদি একদিনও একথাটা মনে হয়, তাহা হইলে রৌরব নরক নয় কি?

যাহাহৌক অন্তঃপুর এখন যেমন চলিতেছে, তাহাতে আমাদের মন উঠিতেছে না। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়ের দুইখানি ছবি আছে।

মুকুল, আশ্বিন হইতে ফাল্গুন ১৩০৮। এই কয় খণ্ড মুকুল নানাবিধ সরস সুখপাঠ্য প্রবন্ধে পরিপূর্ণ, পাঠ করিয়া বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই আনন্দ বোধ করিবেন। "পুনর্জ্জন্ম" বা মানুষ-বাঘের গল্প অতিশয় কৌতূহল উদ্দীপক। কাগপুরের মনোহর দাসের একটি ছেলে হঠাৎ হারাইয়া যায়।

অনেক দিন পরে শীকারীরা শিকার করিতে গিয়া একটি মানুষ বাঘ প্রাপ্ত হন। নেকড়ে বাঘে পালন করায় বালকটি নেকড়ে হইয়া গিয়াছিল। বাবুরা ধরিয়া আনিয়া তাহাকে মুরগি খাইতে দিতেন। সে বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া মুরগি খাইত। বাবুরা মনোহর দাসকে ডাকাইয়া একদিন সব কথা বলিলেন, বলিলেন যে হাতের বালায় লেখা ছিল "হীরালাল কাপুর ১৮৫৭ সাল" এই বালা মানুষ-বাঘের হাতে লাগিয়া গিয়াছিল। এই বালা দেখিয়া হীরালাল দোকানী ও পরে তাহার খাতা দেখিয়া মনোহর দাসকে ধরা গিয়াছিল। মনোহর আসিয়া ছেলের রূপ গুণ দেখে প্রথমে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। পরে মনোহর দাসের স্ত্রী ছেলে দেখিতে আসিলেন। এইবার লেখকের কথায় শুনুন আর মাতৃস্নেহের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া যাউন।

"তাঁর একান্ত ইচ্ছা, তিনি তার কাছে যান, আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে ক্ষান্ত রেখেছি। এইভাবে দু একদিন গেল, মনোহর দাসের স্ত্রী স্নানাহারের সময়টুকু ছাড়া প্রায় সমস্ত সময় সেই গরাদের ধারে দাঁড়িয়ে গান গাইতেন, ছেলেবেলাকার আদরের নাম ধরে ডাকতেন। এমনি একদিন পূর্ণিমার রাতে তিনি দাঁড়ায়ে গান গেয়ে তাকে শোনাচ্ছিলেন, এমন সময় ছেলেটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে, চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম, তার চোখ দুটি জলে ছল ছল করছে। এটা দেখে আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হল। তবে কি ওর মনের মধ্যে কোন স্মৃতির উদ্রেক হয়েছে? বন্দী আগে যেমন মানুষ দেখলে কোণায় গিয়ে লুকিয়ে বসত, এখন তার সে অভ্যাস চলে গিয়েছিল। সে যখনি তার মাকে দেখ্‌ত, কিম্বা তাঁর গান শুন্‌ত, তখনি দুয়ারের কাছে, গরাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। মনোহর দাসের স্ত্রী এই সময় অনেক করে তাঁর স্বামীকে বুঝিয়ে, তার ঘরের ভিতর যাবার অনুমতি নিয়েছিলেন। সে দিন পরিষ্কার চাঁদনি রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ নির্জ্জন, সেই সময় তিনি তাঁর সুমধুর মৃদু স্বরে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে তার ঘরের ভিতর গেলেন, চন্দ্রের আলোতে তাঁকে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল, তাঁর গানের মাধুর্য্যে বন্দী তাঁর হিংস্র স্বভাব ভুলে তাঁর কাছে এগিয়ে এল, আস্তে আস্তে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। তিনি হাঁটুগেড়ে বসে সেই ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে তাকে কোলে তুলে

নিয়ে, তার মুখটি বুকের উপর রাখলেন। মুখের উপর হতে তার অপরিষ্কার এলো থেলো চুল সব সরিয়ে দিয়ে, কত স্নেহের দুখানি হাত দিয়ে তাকে আদর করতে লাগলেন। কত দিনের পুরাতন স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠ্‌লো—সেই অতি শিশুকালে সে কেমন সুকুমার, সুকোমল, সুন্দর ছিল, কেমন মিষ্টি করে হাসত, কেমন করে তার কচি গলায় আধ আধ সুরে মা বলে ডাকত, হায় বিধাতা, এই তার একমাত্র সন্তান, আরত কিছু দিলে না, তারও এমন দুর্দ্দশা। এই মনে করে তিনি আর থাকতে পারলেন না, গদ-গদস্বরে কেঁদে উঠলেন। গানের আওয়াজ থেমে গিয়ে যেই কান্নার শব্দ শুন্‌লে, অমনি যেন তার চমক ভেঙ্গে গেল। সে যে শান্তশিষ্ট হয়ে বসেছিল সে সব ভুলে গিয়ে, আবার দারুণ হিংস্র হয়ে উঠল, আর একটু হলে তাঁর বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে তাঁকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলত, এমন সময় তিনি ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন, তাঁর চীৎকার শুনে বৃদ্ধ মনোহর দাস দৌড়ে এসে, একটি জলন্ত মশাল বন্দীর মুখের সম্মুখে ধর্‌লেন, আগুন দেখে সে যখন কোণে গিয়ে লুকিয়ে বস্‌ল, তখন তারা স্বামী স্ত্রীতে কোনও রূপে বাহিরে পালিয়ে এলেন। এই ঘটনার পর হয়ত তোমরা মনে করতে পার, মনোহর দাসের স্ত্রী বন্দীকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, আর তার কোনও সংবাদ নিতেন না, কিন্তু তা মোটেই নয়। মায়ের মনে সন্তানের জন্য কি অসীম স্নেহ সঞ্চিত থাকে! সে স্নেহের ইয়ত্তা করা কারো সাধ্য নয়। ষোল বৎসর কাল এই ছেলের জন্য তাঁর মন দিন রাত কেঁদেছে, ষোল বৎসর প্রতিদিন তিনি আশা করেছেন, তাকে হয়ত ফিরে পাবেন, আজ সেই সন্তানকে জীবিত ফিরে পেয়ে, তার স্বভাব বাঘের মতনই হোক, আর যেমনই হোক, কিছুতেই তিনি তাকে ছেড়ে যেতে পারলেন না। এরপর তিনি আর তার ঘরের ভিতর যাবার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু প্রতিদিন তার জন্যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে, গরাদের ভিতর দিয়ে রেখে আস্‌তেন। তিনি কখনও মাছ মাংস ছুঁইতেন না, এ সব জিনিস খাওয়া দূরে থাক, ছুঁলেও তাঁদের জাতি নষ্ট হয়। তবু তিনি প্রতিদিন মাংস রেঁধে তাকে খাবার জন্য দিতেন। রাঁধা মাংস খেয়ে, যেদিন হতে তাঁর ছেলে কাঁচা মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলে, সেদিন তাঁদের স্বামী স্ত্রীর আনন্দের আর পরিসীমা রইল না। একদিন মনোহর দাস দৌড়িতে দৌড়িতে আমাদের কাছে

এসে বল্লেন, "তিনি তাকে বশ করেছেন, তিনি তাকে বশ করেছেন।" আমরা কিছুনা বুঝতে পেরে দৌড়ে বন্দির ঘরের গরাদের সম্মুখে গেলাম সে ঘর শূন্য। অনুসন্ধান করে জানলাম, বন্দী তার মায়ের সঙ্গে আছে। মনোহর দাসের কথামত আমরা পাশের ঘরের জানালা দিয়ে দেখলাম, সে তার মায়ের কোলের কাছে বসে আছে, আর তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করছেন। সে তাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করছে না, বরং পোষা বিড়ালকে আদর করলে সে যেমন গর গর শব্দ করে, গায়ের কাছে ঘেঁসে বসে আনন্দ জানায়, সেও তেমনি করে আনন্দ প্রকাশ করছে। এর সপ্তাহকাল পরে সে তার মায়ের এম্নি বাধ্য আর বশ হয়েছিল, যে মনোহর দাস তাকে বাড়ী নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলেন। আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, পাছে বন্দি ছাড়াপেয়ে কখনও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, কারো অনিষ্ট করে, এই যা ভয় ছিল; তা মনোহর দাস বল্লেন, সে বিষয় কোন ভয় নাই, তিনি সে বিষয় খুব সতর্ক থাক্‌বেন। বন্দী আর তার মা একত্রে এক পাল্কীতে গেলেন, সে তাঁর এতই বশ হয়েছিল।

দশ বৎসর অতীত হয়ে গেল, আমি নানান জায়গা ঘুরে আবার কাণপুরে ফিরে এলাম। ফিরে এসে, আমি অনেককে বন্দীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কেহ কিছু বলতে পারলে না। আমাদের বন্ধু পুলিশ সাহেব, বন্দী তার মায়ের সঙ্গে যাবার কিছুদিন পরে, অন্যত্র বদলী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার কথা কিছু বলতে পারলেন না। আমি মনে করেছিলাম, বন্দী বনের স্বাধীনতা হারিয়ে বদ্ধ জীবনে বেশীদিন হয়ত বাঁচেনি। যাইহোক, তার একটা সংবাদ জানবার জন্যে অত্যন্ত কৌতুহল হয়েছিল। তাই আমি মনোহর দাসের বাড়ী গেলাম। যে সম্মুখের বারান্দায় মনোহর দাস আফীস করতেন, সেইখানে গিয়ে দেখলাম, একটি তরুণ বয়স্ক সুন্দর যুবক অনেক গুলি কেরাণী সঙ্গে করে বৈষয়িক কাজকর্ম্ম করছেন। তাঁর সৌম্য, প্রশান্ত মুখ, গম্ভীর, ভদ্র ব্যবহার দেখে অনায়াসে তাঁকে সেখানকার কর্ত্তা বলে বুঝতে পারলাম। তিনি আমাকে দেখে, উঠে এসে অভিবাদন করে নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "মহাশয়ের কি কাজ করব?"

আমি বল্লাম, "মনোহর দাস শেঠজীকে একবার দেখতে পাব কি?" এমন সময় বারান্দার অপর পাশ হতে ক্ষীণ স্বরে উত্তর এল, "আপনার দাস

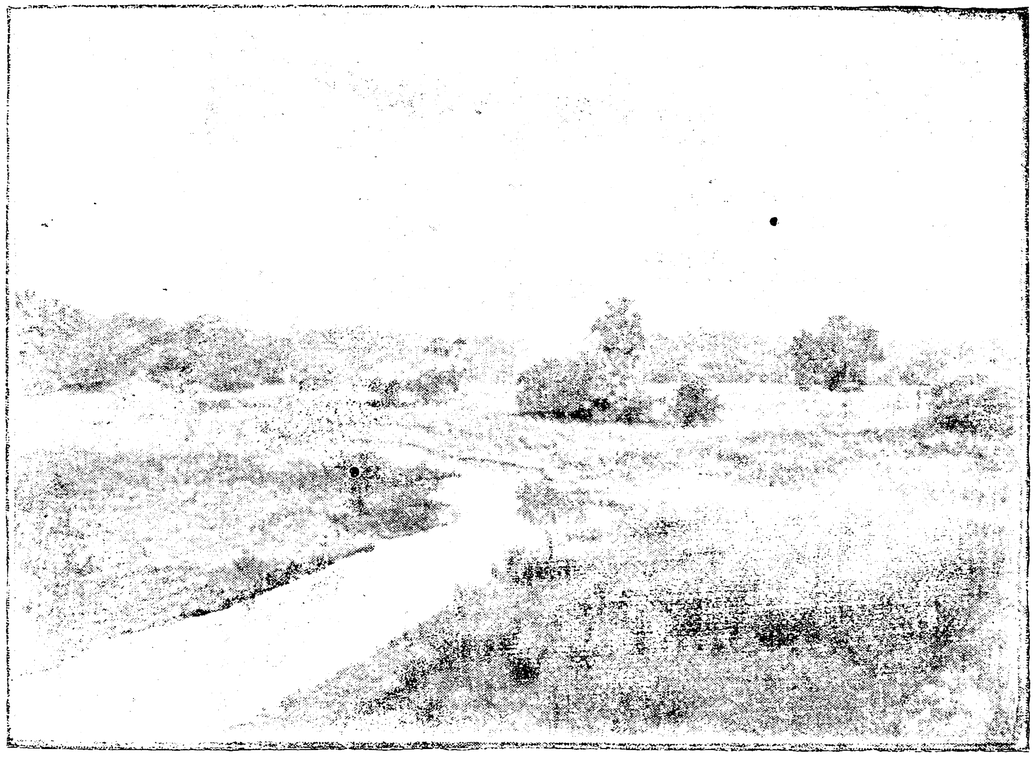
এখানেই উপস্থিত আছে।" ফিরে দেখলাম, বৃদ্ধ মনোহর দাস ফরাসের উপর অনেকগুলি তাকিয়া নিয়ে আরাম করে বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে উঠে এসে, আমার হাত ধরে সমাদর করে কাছে বসিয়ে বল্লেন, "আপনাকে কত কথা বলবার আছে, এ জীবনে এ আনন্দ যে আর হবে কখনো আশা করিনি। ভগবানের অসীম দয়া—বেয়াদবি মাপ কর্‌বেন—এই বলিয়া বৃদ্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরে মাথার উপর হাত রেখে কত আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। বসবার পর আমি বল্লাম, মনোহর দাস, তোমার ছেলে সেই বাঘটির খবর কি? তারে কি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছ?"

মনোহর দাস হেসে উঠে বল্লেন "সাহেব তাকেই তো তুমি বারান্দায় দেখে এলে। সে যে আমাদের জীবনের আনন্দ, আমাদের চোখের আলো, আমাদের জীবন; তুমি তাকেই বাঘ বলছ।" এই বলে আবার খুব হেসে উঠলেন। "সাহেব, যে এক সময় বাঘ ছিল, আজ সে একজন গণ্যমান্য লোক, যদি তুমি এ সহরের কারো কাছে তার জীবনের সেই ঘটনা বল তা' হলে পাগল বলে সকলে তোমাকে হেসে উড়িয়ে দেবে! কেহ সে বিষয় জানে না, দয়া করে সে বিষয় কাহাকেও বোলো না। আমার ছেলেরও ঐ সব কথা শুন্‌লে বড় কষ্ট হয়।" আমি মনোহর দাসকে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বলে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, শেঠজি, কেমন করে তাকে কথা কইতে, পড়তে, লিখতে শিখালে?"

মনোহর দাস বল্লেন "তার মা, তিনিই সব করেছেন—এ কাজের যত প্রশংসা, তাঁরই সব পাওয়া উচিত। তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, এত দিনে তার ফল লাভ হয়েছে। তাঁর মত সুখী মা আর একটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। ছেলে যে তাঁকে কত ভালবাসে, কত তাঁর অনুগত ও বাধ্য তা আর কি বলব?" ঠিক এই মুহূর্ত্তে মনোহর দাসের ছেলে এসে ঘরে প্রবেশ করলে, মনোহর দাস তাকে ডেকে বল্লেন "দেখ লছমন, এই সেই সাহেব যিনি তোমাকে বাঘের গর্ত্ত হতে নিয়ে এসেছিলেন, ইনিই তোমার সেই রক্ষাকর্ত্তা।" লছমনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে কথা কইতে চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে "সাহেব আমি আর কি বলবো, তোমার ঋণ কখনো পরিশোধ কর্‌তে পারব না, চির জীবনের জন্যে আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে রইলাম।"

মহাজন বন্ধু, ১৩০৮ পৌষ মাঘ। প্রথম বৎসর শেষ হইল। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি। চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা আরও ভাল চলিতে পারে। স্যর চার্লস রীড বলিয়াছেন হঠাৎ পসার হইলে মানুষ খারাপ হইয়া যায়। আঁটকুড়োর পুতের মত যেমন মহাজন বন্ধু আদর পাইয়াছিল অমনি একটু বেগড়াইয়াছেন। আমাদের একজন বন্ধু বলিতেন যেখান দিয়া মাড়োয়ারি মহাজনরা যায় সেইটাই রাস্তা। এই পত্রের শিরো-বচন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" "পন্থার"ও তাই। আমরা নূতন বিদ্যালাভ করিয়া জাপানী ভাষায় বলিতেছি "মিচিও ওগিয়েটে কুডাসাই" (আমাকে রাস্তাটা বলে দেবেন)। এ পত্রে আবার সমালোচন কেন? শর্করা-বিজ্ঞান, মিছিরির কারখানা, গুটিপোকা, তন্তুবয়ন যন্ত্র, দোকানদারী কথা। এই সব-ই ভাল নয়? মাসে অমাবস্যা যতবার, পূর্ণিমা ততবার। জিজ্ঞাসা মতে উত্তর দিলাম। সম্ভবামি যুগে যুগে।

জন্মভূমি, ১৩০৮ অগ্রহায়ণ। ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত থিয়সফির উপর বক্র কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা না বলিলেও চলে তাহাও বলিয়াছেন। "থিয়সফির আধিপত্য প্রতিপত্তি বাড়িলে নানারূপ সামাজিক বিভ্রাট ঘটিবে কি না; তাহা আলোচ্য।" আলোচ্য অনেক, বিবেচ্যও অনেক। পরের ছেলেকে গালি না দিয়া আপনার ছেলেকে সামলাইলেই চলে। আমাদের মনে হয়, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, থিয়সফি সকলেই সাহায্য করিয়াছেন। আরও করিবেন কিনা ইহাই বিবেচ্য। "৺রিও-ডি-জেনিরো" ঐ নামের জাহাজ আর ধরাধামে নাই, জলমগ্ন হইয়াছে তাই ৺ [ঈশ্বর বাচক চিহ্ন] দেওয়া হইয়াছে। লেখক [যিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন] দিতে পারেন কিন্তু জন্মভূমির পরিচালকগণ কি করিলেন? লেখাটা কেবল অস্পষ্ট চিন্তাকণিকা বুঝিলাম কিন্তু তিনখানি পুস্তকের সমালোচনার তূর্য্যনাদ বুঝিলাম না অথচ কর্ণ বধির হইয়া গেল।



বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম—সরস্বতী-তীর।

Photo for the Purnima
by Major G.E. Weigall R.A.

সাগর।

(পুরীধাম।)

কিসের এ ব্যাকুলতা? কিসের এ আকুলতা?
দিবানিশি কেন কর আথাল পাথাল?
সদা দীর্ঘ-শ্বাস বয়, সদাই হুতাশময়,
কখন বিরাম নাই সকাল বিকাল।

তুলিয়া সহস্র ফণ কর মহা গরজন,
তখনই নোয়াইয়ে শির কেন হে লুটাও?
মুহূর্ত্তে গরব তব, পরক্ষণে পরাভব,
আছাড় কাছাড় করি ধরণী কাঁপাও।

কেন এত আস্ফালন? কেনই বা গরজন?
গোঁ গোঁ করি কেন কাঁদ গুমরি গুমরি?
বিপরীত ভাব হেন ভীষণে করুণা কেন?
গর্জ্জন ক্রন্দন তব কাহারে সমরি?

গভীর গভীর জলে, গহ্বরে গুহার তলে,
প্রবাল মুকুতা কত লুকায়ে রেখেছ,
আর, বালু বেলা ভূমে আস্ফালিয়া মহাধূমে
ভাঙ্গা শুক্তি, কাঁটা, কড়ি বিলাতে লেগেছ!

সাগর কৃপণ তুমি, হাঁস কাঁদ গুমি গুমি,
বিশাল বক্ষেতে তাই অনন্ত তুফান;
লুকাইতে ধন রত্ন নিয়ত করিছ যত্ন,
সদাই চঞ্চল, তাই সদা আন্‌চান।

ধন মদে ফুলি উঠ, পরক্ষণে ভূমি লুঠ,
রত্নক্ষয় আশঙ্কায় সদাই কাতর.

গর্ব্বে কর আস্ফালন, ভয়ে কর গরজন,
গোঁ গোঁ গোঁয়াইয়া কাঁপিছে অন্তর।

সুস্নিগ্ধ পাদপ মূলে বসিব তোমার কূলে,
শুনিব তোমার রব বিভোর শ্রবণে,
তোমার নীলিম কান্তি তোমার অসীম শান্তি
হেরিয়া, ভুঞ্জিয়া, রব আপনার মনে—

উপরে অনন্ত ভূমি, নীচেতে সাগর তুমি,
অনন্তে অনন্ত মিল করিব দর্শন,
এ দুই অনন্ত সাথ, বুঝিব অনন্তনাথ,
ইহলোকে পরলোক হইবে মিলন—

যুবা শিশুকাল হতে, কত সাধ ওই মতে,
ধরিয়াছি, পুষিয়াছি, ভাবিয়া তোমায়,
সে সাধে বিষাদ পুঞ্জ ছায়িল হৃদয় কুঞ্জ,
তুমি আমি তারস্বরে বলি হায় হায় !!

নাহিক শীতল ছায়া, তরুশূন্য মরুকায়া
মত বেলা, উড়ে তায় বালুকা শীকর,
সীসার গুলির প্রায় লাগিতেছে সর্ব্বকায়,
কাণে ভোঁ ভোঁ রবে বায়ু কাঁপায় অন্তর।

তরলের ফাঁপাফাঁপি, চঞ্চলের লাফালাফি,
ধড়াস ধড়াস সদা কান ঝালাপালা,
কোথায় সে শান্তিক্ষেত্র? হেরিয়া জুড়াবে নেত্র
শান্তিতে প্রশান্ত হবে জীবনের জ্বালা।

অহো তা ত হইল না, পূরিল না সে কামনা,
আলোড়ন বিলোড়নে কাঁপিছে অন্তর,
শোঁও শোঁও গোঁ গোঁ রব, শ্মশানের মহোৎসব,
রাক্ষসী পুতনা করে করুণার স্বর।

তিলার্দ্ধ নহত শান্ত, সদা শ্রান্ত, সদা ক্লান্ত,
বক্ষে করি যক্ষধন কেবল গোঁয়াও,
মাতালের আস্ফালনে, বাচালের প্রলম্ফনে,
কৃপণের হৃৎকম্পে জীবন কাটাও।

হেরিব না তব নীর— একদণ্ড নহে স্থির,
তরু-শূন্য মরু-প্রায় তটে নমস্কার,
এস সিন্ধু মম সাথে, হেরিবে ঐ জগন্নাথে,
জুড়াবে তোমার জ্বালা, হৃদয় আমার।

ঊর্দ্ধে মঠ অভ্রভেদী, তলে তার রত্নবেদী,
উপেক্ষি গর্জ্জনে তব করিছে ভ্রূকুটি,
গর্ভে তার জগন্নাথ বলভদ্র ভদ্রা সাথ
সেথানে করিবে চল পদে লুটালুটি।

লহ রত্ন রত্নাকর, তরঙ্গ অঞ্জলি কর,
কৃষ্ণায় অর্পণমন্ত্র বল বল বল,
সার্থক হইবে যত্ন, সার্থক হইবে রত্ন,
কার্পণ্য কলঙ্ক ঘুচে হইবে উজ্জ্বল।

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

গদাই পুরুত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র তীরে।

বক্তা গদাই।

চলিলাম, চলিলাম; কতই যে চলিলাম, তাহা বলিতে পারি না। যেন আমি স্বপ্নসঞ্চরণমুগ্ধ—যেন কোন ঐশী শক্তির বলে আমি পরিচালিত, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কে যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মনে রাখিবেন আমরা যাইতেছি কিন্তু ঠিক সোজা।

কতদিনে পঁহুছিলাম তাহা আমার ঠিক মনে নাই—কি করিয়া পঁহুছিলাম তাহাও বলিতে পারি না; পূর্ব্বেই বলিয়াছি যেন স্বপ্নমুগ্ধ ছিলাম; যখন ভ্রমণ শেষ হইল, তখন যেন নেশা কাটিয়া গেল, তখন যেন বুদ্ধি স্মৃতি শক্তি ফিরিয়া পাইলাম; তখন একবার মনে হইয়াছিল যে নর্ম্মদাতীর হইতে এখানে আসিলাম কি করিয়া। যে হিপনটিস্‌ম্ য়ুরোপ আমেরিকায় এখন সায়ান্স (বিজ্ঞান) ইহা কি সেই হিপনটিসম্; না, মেসমেরিস্‌ম্ (বশীকরণ)? একটু ভয় হইল—যদি ভেড়া করিয়া রাখেন। একটু আনন্দ হইল, এমন শক্তিমান্ পুরুষ কৃপা করিয়াছেন। যখন বিচার করিয়া মনে বুঝিলাম যে এ প্রদেশ কামরূপ কামাখ্যা নয় আর সন্ন্যাসী ঠাকুর স্ত্রীলোক নহেন তখন ভেড়া করিবার ভয়টা ক্রমশ তিরোহিত হইল। রহিল কেবল আনন্দটুকু।

আসিয়াছি একেবারে সমুদ্রতীরে। তীরদেশে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মূলে আমাদের আসন হইয়াছে। সমুদ্র কখন দেখি নাই—এই দেখিলাম, বেলাভূমি কখন দেখি নাই—এই দেখিলাম। যতদূর দৃষ্টি যাইতেছে কেবল অগাধ নীলজল রাশি—দূরে, অতি দূরে নীল আকাশ নীল সাগরজলকে চুম্বন করিতেছে। বায়ু সে রঙ্গ দেখিয়া আমোদে ছুটাছুটি করিতেছে আর সমুদ্রের গাত্র কণ্ডুয়ন করিয়া দিতেছে, সাগর কণ্ডুয়নে বিবশ হইয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। আমার বার বার মনে হইতেছে এই কি সে সমুদ্র, যে সমুদ্রকে একদিন দেবদানবে মন্দরকে মন্থনদণ্ড করিয়া বাসুকীকে রজ্জু করিয়া মন্থন করিয়াছিলেন। যে মন্থনের ফলে লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন, সুধা উঠিয়াছিল, ঐরাবত উচ্চৈশ্রবা উঠিয়াছিল আর সর্ব্বশেষ গরল উঠিয়াছিল। সেই সমুদ্র উদ্ভূত গরলরাশি যখন পৃথিবী দগ্ধ করিতেছিল তখন আর কেহ নয় সেই করুণাসাগর ব্যোমকেশ সৃষ্টি রক্ষার জন্য স্বয়ং ধারণ করিয়া কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন আর সেই অবধি নীলকণ্ঠ নামে জগতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। যাহারা আমার এই গল্পে নায়ক নায়িকা খুঁজিবেন, তাঁহারা যেন সমুদ্রকে নায়িকা ও আকাশকে নায়ক মনে করেন। রঘুনাথ যখন সীতা উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী তখন এই সমুদ্রের গলায় শীলাহার পরাইয়াছিলেন। যাহাদের তমালীতালী বনরাজিলীলা কি, দেখিলাম, ধরানিবদ্ধ-কলঙ্ক রেখা কি তাহাও বুঝিলাম। তিন দিন তথা বাস করিয়া আমরা উপরে চলিলাম। উপরে ক্ষুদ্র শৈলশিখরে গুহা মধ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে।

বক্তা গদাই।

শৈলশিখরে উঠিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম, আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী কিছু বলিলেন না, ভাবিতে সময় দিলেন, আমি ভাবিতে লাগিলাম।

স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল, বাল্যকালের ছবি। মাতার সঙ্গে যখন স্নান করিতে যাইতাম, তখন খেলুড়ীকে ডাকিয়া লইতাম। সেই অকারণ উচ্চ হাস্য মনে পড়িল। যাইতেছি স্নান করিতে কিন্তু ফড়িং ধরিতে কত সময়ই কাটিয়া গেল। শেষে মাতা আসিয়া যখন গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন তখন চৈতন্য হইল। জলে পড়িয়া আবার কত মাতামাতি, কুমুদফুল তুলিতে কত যত্ন, কত মতলব, কত কুমীর লাফান। শেষে মার খাইয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বাড়ী আসিতাম মনে পড়িল। তেমন করিয়া মার মত আর কেহ কখন খাওয়াইল না—কেহ কখন তেমন করিয়া মারিল না—আবার তেমন করিয়া আদর করিল না। জননীর সবই অলৌকিক, অলৌকিক বটে কিন্তু স্বর্গীয়। বাল্যে সেই স্নেহময়ী জননী চলিয়া গিয়াছেন, আমায় ভালবাসিতেন তবে চলিয়া গেলেন কেন? যখন বাক্‌রোধ হইয়াছে, যখন ওষ্ঠাধরে ফেনা কাটিতেছে, যখন আর কাহার কথার এমন কি পিতার কথারও উত্তর দিতেছেন না, তখনও ত মা এই হতভাগার কথার জবাব দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেন, জবাব ত দিয়াছিলেন? যখন আমি সেজ ঠান্ দিদির মুখে শুনিলাম মা কেমন হইয়া গিয়াছেন, তখন ছুটিয়া আসিয়া উচ্চৈস্বরে "মা"—"ও-মা" বলিয়া তাঁহার পবিত্র বক্ষে, একটা কি অজানিত বিপদ হইতেছে মনে করিয়া, পড়িয়াছিলাম, তখন ত মা "উঁ" বলিয়া তুমি জবাব দিয়াছিলে, একবারের জন্যও চক্ষু মেলিয়াছিলে। হায় সেই মুখ, হায় পিতার সেই গলদশ্রুলোচন, প্রতিবেশী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের সেই কথা, আর কেন মুখে গঙ্গাজল দাও, নাম শুনাও—সেই কথা, মাতার সেই আলুলায়িত কেশরাশি, সেই ছবি, সেই দৃশ্য শিশুহৃদয় যাহা অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিল, সেই ছবি আবার এখন দেখিতেছি যে। তারপর মাতার শ্রাদ্ধ,

সপিণ্ডকরণ, আমার টোলে অধ্যয়ন, পিতার দ্বিতীয়বার দরপরিগ্রহ, বিমাতার আগমন, তারপর পিতার সেই ব্যবহার। যাক্। তারপর চাকরী-স্থান, নর্ম্মদাতীর—সমুদ্রতীর, তারপর এইখানে আসিয়াছি। করুণাময় সন্ন্যাসীর দয়ায় কথা সকলই স্মৃতিপটে প্রকটিত হইল। এখন ভরষা গুরু-দেবের পাদপদ্ম—মনে মনে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছি। চিন্তা এই পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এমন সময় সন্ন্যাসী গুহার বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'বৎস, উঠ, কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইবে; এই কুঠার গ্রহণ কর। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলাম—বসিলাম—বিমনা হইয়াই কুঠার গ্রহণ করিলাম। শৈলশিখরে একটা ঘুঘু আমাকে যেন উপদেশের জন্য বৈরাগ্যের গান শুনাইতেছিল। শৈলশিখরের আতা ও বেলগাছগুলি যেন আমায় বলিতেছিল, পুরাণ কথা ভুলিয়া যাও, সম্মুখদিকে দৃষ্টি কর, পশ্চাতে দেখিও না। চতুর্দ্দিকে চাহিলাম, দূর বহুদূর দৃষ্টিগোচর হইতেছে। স্বভাব দেবী বলিতেছে, ছি, এখানে ওচিন্তা কেন? দৃঢ় করিয়া গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর, উঠ, কর্ত্তব্যকর্ম্ম কর, মঙ্গল হইবে। পশুপক্ষী সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তুমি ত মানব।

উঠিলাম। কাষ্ঠ আহরণ করিলাম, আহারাদি শেষ করিয়া পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া কত কথা কহিলাম। সন্ন্যাসী আমার জীবনবৃত্তান্ত আগা-গোড়া শুনিলেন। আমি বলিলাম আমাকে দীক্ষা দিন। সন্ন্যাসী বলিলেন ছয় মাস পরে দেখিব।

কতদিন গেল, দিন আসিতেছে, দিন যাইতেছে। আমি সন্ন্যাসীর উপদেশ মত কার্য্য করিতেছি, অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছি। গল্পচ্ছলে সময় শাস্ত্রকথা শুনিয়াছি। আমার জ্ঞান হইয়াছে। কখন কখন আশ্রমে অপর সন্ন্যাসী আসিলে আমি কাহারও কাহারও সহিত তর্ক করি। সন্ন্যাসী শুনিয়া হাসেন। পিতার কথা কিন্তু ভুলিতে পারি নাই।

ছয় মাস পরে দীক্ষিত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিন্তায়।

বক্তা সন্ন্যাসী।

একদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে গদাইকে কাষ্ঠ আহরণার্থে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তখন দীক্ষা হয় নাই। গদাই ছুটিয়া আসিয়া বলিয়াছিল যে সে ব্যাঘ্র দেখিয়াছে।

দীক্ষার পর যে দিন প্রথম মন্ত্রজপ করিতে বসিল, সহসা, একটু জপের পরই লাফাইয়া উঠিল—মুখ ভয়ে ম্লান—দারুণ ভয়ে অভিভূত। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসায় বলিল যে সে দেখিল সুমুখে বাঘ বদন ব্যাদান করিয়া তাহাকে গিলিতে আসিতেছে, আমি মনে করিলাম বীজ উগ্র হইয়াছে। কিছুদিন জপ বন্দ রাখিয়া ঠাণ্ডা করিতে বলিলাম, দুইবার তিনবার স্নান করিতে বলিলাম, আপাতত মন্ত্রজপ বন্দ রহিল।

তিন মাস পরে একদিন আবার মন্ত্রজপ করিতে বসিল। সেদিনও ঐ ব্যাপার। আবার জপ করিতে নিষেধ করিলাম। এবার ছয় মাস জপ বন্দ রহিল। ছয় মাস পরে গদাই আবার একদিন জপ করিতে বসিল, সে দিনও সেই ব্যাপার। অধিকন্তু সে দিন লাফাইয়া উঠিয়া গদাই একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। মুখে জল দিয়া চৈতন্য করিলাম আর জপ একেবারে নিষেধ করিয়া দিলাম। কিন্তু ভাবনা হইল যে একি ব্যাপার, এমনটি ত কখন দেখি নাই। ইহার কারণ কি! ভাবিতে লাগিলাম, আকাশপাতাল কতই কি ভাবিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতেছি এমন সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার পরিচিত, মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। শুনিয়া গম্ভীরভাবে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন; করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আগন্তুকের গল্প।

বক্তা আগন্তুক।

"একদা একজন শক্তিমান সন্ন্যাসী নিদাঘের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া একজন দোকানীর নিকট উপস্থিত হইয়া অতিথি

হইলেন। দোকানী পরম সমাদরে তাঁহাকে সেবা করিল, সেবায় পরিতৃপ্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসা শান্তির পর সন্ন্যাসী এক বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন। সন্ন্যাসীর গাত্র অবরণ বস্ত্রখানি শতছিদ্রময় হইয়াছিল সুতরাং মশকের দংশনে উপর্য্যুপরি কয়েকরাত্রি সন্ন্যাসী বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে নিদ্রিত দেখিয়া দোকানী সন্ন্যাসীর গাত্রবস্ত্রখানির জীর্ণসংস্কার করিয়া দিল। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ সুষুপ্তিসুখ উপভোগ করিয়া জাগরিত হইয়া দোকানীর কার্য্য দেখিলেন। একে সেবায় তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার উপর গাত্রবস্ত্রের জীর্ণ সংস্কার দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন "দোকানী আমি তোমার উপর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে আমি তাহাই দিব, অধিক কি মন্ত্রবলে এখনি তোমার দেহত্যাগ করাইয়া রথ সাহায্যে বিষ্ণু লোকে প্রেরণ করিতে পারি। মন ঠিক কর, এই দণ্ডে তোমাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করি।"

দোকানী কৃতার্থ হইল। করযোড়ে বলিল "মহাপুরুষ আপনি সকলই করিতে পারেন। আমার সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি ও সেবা করিতে পাইয়াছি। প্রভো আমার বৈকুণ্ঠ গমনই ঠিক—তবে কিছু দিন বিলম্ব করিতে হইবে। আমার দুইটি পুত্র, ইহাদের বিবাহ দিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। বিবাহ না দিয়া স্বর্গে গমন করিলেও আমার সুখ হইবে না। অতএব প্রভো দুই বৎসর পরে আসিবেন, আমি সেই সময় বর গ্রহণ করিব ও বিষ্ণুলোকে যাইব। যদি দয়া করিয়াছেন, তখন আর একটু কৃপা করুন। এই বিনীত নিবেদন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, তথাস্তু পরে চলিয়া গেলেন।

দুই বৎসর পরে সন্ন্যাসী সেই দোকানের নিকট আগমন করিলেন দেখিলেন দোকানে একজন যুবক বসিয়া কেনাবেচা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন দোকানীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা দুই ভাই চাষ ও দোকান করে। তাহাদের উভয়ের বিবাহ দিয়া পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী শুনিয়া বসিলেন, বলিলেন আজি আমি এখানে অতিথি সন্ন্যাসী ধ্যানে বসিয়া কি বুঝিয়া গরুর গোহালে প্রবেশ করিয়া কমণ্ডলু জল লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া একটি বৃষের মস্তকে দিলেন, বলিলেন চল, আ কেন? বৃষ প্রণাম করিয়া বলিল, আপনি আসিয়াছেন দেখিয়াছি কি

ছেলেদের বিবাহ দিয়া জমীজমাগুলা গুছাইয়া দিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ মৃত্যু হইল। ছেলেরা ছেলেমানুষ দেখিয়া এইখানেই বৃষরূপে জন্মিয়াছি। ইচ্ছা জমীগুলা চসে দিয়া কিছু ধানের মরাই বাঁধিয়া দিই। আমার গতর দিয়া অনেকটা হইবে, সেইজন্য দেখিতেছি আমার এখনও আপনার সঙ্গে বা বৈকুণ্ঠ যাওয়া হইতে পারে না—ছেলেরা আতান্তরে পড়িবে। আপনি না হয় দেড় বৎসর পরে আসিবেন তখন ওজর না করিয়া বৈকুণ্ঠ যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

আবার যথা সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া দেখিলেন যে দোকান ঘরটি নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন, দুই ভাই পৃথক হইয়া দুইখানি ভিন্ন ঘরে কিন্তু একই ভিটায় বাস করিতেছে। সন্ন্যাসী যেমন একের বাড়ীতে ঢুকিতে যাইবেন অমনি কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড বড় কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল—পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল, বাড়ীতে যাইতে দিবে না। সন্ন্যাসী কি মনে করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া কমণ্ডলুর জল কুকুরের মস্তকে দিলেন। কুকুর তৎক্ষণাৎ বলিল, প্রণাম, আসিয়াছেন দেখ্‌ছি কিন্তু এবারও ত যাইতে পারিতেছি না, আমি হঠাৎ মরিয়া যাওয়ায় চাসের সুবিধা হয় নাই। জমীদার নালিস করাতে বিশেষ দুঃখ পাইতে হইয়াছিল, হতভাগা ছেলে দুটা আবার ভিন্ন হইয়াছে। আবার অত্যন্ত দুঃখে পড়িয়াছে, আমার কিছু গুপ্তধন ছিল, সেটা মৃত্যুকালে বলিয়া যাইতে পারি নাই। সেই ধনটা রক্ষা করিবার জন্য কুকুর হইয়া রহিয়াছি। ধনটা ছেলেদের হস্তগত হইলেই হইল, তখনি আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব।

সন্ন্যাসী। ভাল কথা, ছেলেদের ডাকিয়া ধন দেখাইয়া দি। তারপর আমার প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাকে বৈকুণ্ঠধামে পাঠাইয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিতে যাই। কি বল?

কুকুর। প্রভো ছেলেদের এখনও রক্ত গরম। টাকা হাতে পড়িলে ব্যবহার করিতে পারিবে না, লাভে এই হইবে যে ডিক্রীদার টাকাটা ক্রোক দিয়া ফেলিবে। ডিক্রিটা তামাদিকাল পর্য্যন্ত কিম্বা ছেলেদের একটু পাকা বুদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত আমায় অপেক্ষা করিতেই হইবে। যাহাহোক এবার আপনি একটু দেরি করিয়া আসিবেন। আমি মায়াটা মিটাইয়া রাখিব।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে আবার সন্ন্যাসী আসিল। এবার ছোট ছেলে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া লগুড়হস্তে মারিতে আসিল। বলিল তোমা হইতেই আমাদের এত বিপদ। যে অবধি তুমি আসিতে আরম্ভ করিয়াছ, সেই অবধি আমরা কষ্ট পাইতেছি, পিতা গেছেন, বাড়ী ঘর দ্বার সব গেছে। এখন কুঁড়ে করিয়া ভাই ভাই পৃথক্ হইয়া মরিয়া রহিয়াছি, অন্ন জুটে না। তুমি ফের যদি বাড়ীতে পা দিবে, তোমার হাড় গুঁড়া করিয়া দিব। এই বেলা ভাল চাও ত সরিয়া পড়।

সন্ন্যাসী হাঁসিয়া বলিলেন "একথা সত্য যে আমার আসা হইতেই তোমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাতে আমি দোষী নহি। বিধাতার ইচ্ছা। আমার উপর রাগ কেন কর? যদি ধন চাও ত দিতে পারি।

ছেলে। (ধনের লোভে অন্ধ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া করপুটে বলিল) আপনি মহাপুরুষ সব করিতে পারেন। বাবা সর্ব্বদা আপনার কথা বলিতেন।

সন্ন্যাসী। ভাল, কুকুরটা কোথা, গতবারে যেটাকে দেখিয়াছিলাম।

ছেলে। সেটাকে চোরে কাটিয়া গিয়াছে।

স। কোন জীবজন্তু পোষ নাই।

ছেলে। না, তবে একটা নেউল বা বেঁজি পুষিব মনে করিতেছি একটা জাত সাপ মধ্যে মধ্যে ঐ ভিটাটায় দেখিতে পাই।

স। একটু পরে তোমার ভাইকে সঙ্গে করে এস, টাকা দিব। ছোট ছেলে চলিয়া গেল, সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ হইয়া সর্প কোথায় ও কে বুঝিয়া লইলেন।

ক্ষণকাল পরে দুই ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধু স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, এইখানটা খোঁড় টাকা পাইবে। দুই ভাই শাবল কোদাল লইয়া খুঁড়িতে লাগিল। তিনি দূরে বসিয়া মহামায়ার মায়ার বিচিত্র গতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা ছোট ছেলে লাঠি লইয়া সাধুর দিকে ছুটিয়া আসিল—লাঠি আস্ফালন করিয়া মারে আর কি, এমন সময় সাধু দৃঢ়মুষ্টিতে লাঠি ধরিয়া বলিলেন—কি হইয়াছে? মারিতে চাও কেন?

ছেলে। তোর মতলব ভাল নয়। তুই বেটা ভণ্ড। বেদে বেটা

নিজে কেন সাপ ধরিলি না? টাকা দেব বলে খোঁড়াচ্চিস আর এখন ডঙ্ক ধরে সাপ উঠেছে, এখনই আমায় কামড়ে ছিল। পাজিবেটা বেদে।

স। চল দেখিগে।

দেখিয়া বলিলেন "তোরা ত বড় মূর্খ। দেখচ্চিস্ না একটা ঘড়া পোঁতা রয়েছে। ঐ ঘড়ায় ধন আছে। তবে সাপটারও বাসা এইখানে বটে। সাপটা মেরেফেলে টাকা নে না। সাপটা ঘড়া আগলাচ্চে দেখছ না?

তখন দুই ভাই নানা উপায়ে সাপটাকে মারিল, একটু প্রাণ থাকিতে দূরে ফেলিয়া দিল, মতলব পরে পোড়াইবে। ছেলেরা সাপ ফেলিয়া দিয়া, টাকার ঘড়া তুলিতে ব্যগ্র ও অন্যমনস্ক হইল। সাধু দ্রুতপদে সর্পের নিকট গিয়া মস্তকে মন্ত্রপূত জল দিলেন। সর্প কি বলিতে যাইতেছিল। তিনি নিবারণ করিয়া সর্পের আত্মাটি বাহির করিয়া নিজের জটায় রাখিয়া মরিয়া পড়িলেন। কিন্তু তথাপি আত্মা বৈকুণ্ঠে যাইতে চায় নাই। ভোগ বাকি আছে, বলিল। সাধু ষোল বৎসর রাজপুত্ররূপে রাখিয়া রাজভোগ দিয়াছিলেন। তারপর তাহাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেন। মায়ার শক্তি অতিক্রম সোজা ব্যাপার নহে।"

আমি আগন্তুক সন্ন্যাসীর এই কথাগুলিতে একটা বিষয় বুঝিতে পারিলাম। একটা অন্ধকার কাটিয়া গেল। মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে গদাইয়ের এই বাঘ দেখা ব্যাপারে একটা গুরুতর রহস্য আছে। সম্ভবত সে রহস্য মায়া-ঘটিত। এই চিন্তাই ক্রমে বলবতী হইল, আগন্তুকও সেই কথা বলিলেন। আগন্তুক চলিয়া গেলে একদিন গদাইকে ভয়ের ব্যাপার ও তাহার সাংসারিক ব্যাপারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তথ্য জানিলাম।

কবি হারি পণ্ডিত।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে পণ্ডিতাখ্যাধারী কতকগুলি শিক্ষিত লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। মুসলমানের মধ্যেই এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক ছিল(১)। অদ্যাবধি মুসলমান সমাজে এই পণ্ডিত নামধেয় লোকের অভাব নাই। তৎকাল প্রচলিত পুঁথির ব্যাখ্যা করিতে এবং নিজেদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ সংস্কৃত, বাঙ্গালা শ্লোক ও হেঁয়ালী ও পারস্য বয়েত আওড়াইতে, মায় কালিকষা হইতে তমসুক, কবালা প্রভৃতি দলিল পত্রের মুসাবিদা করিতে, চাই কি, সাফ্ (fair) করিয়া লিখিয়া দেওয়াটী পর্য্যন্ত তাঁহারা যেমন পারিতেন, মুন্সীগণ ছাড়া সাধারণের মধ্যে তেমন আর কেহই পারিত না। বলিতে কি, লেখা পড়ার যত কিছু কাজ, সকলই তাঁহাদেরই আয়ত্তীভূত থাকায়, বড় ছোট, ধনী নির্ধন সকলেই তাঁহাদের সম্মান করিত। তোষামোদপ্রিয় মুসলমানগণ উক্ত প্রকার গুণান্বিত লোকদিগকে 'পণ্ডিত' উপাধি দিয়া তাঁহাদের গুণের পুরস্কার প্রদান এবং স্বীয় কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিত। কেবল এই উপাধি ব্যতীত, তাঁহাদের অন্যরূপ সম্মানেরও অধিকার ছিল। কেহ কেহ বা পাঠশালা বা মক্তবের গুরুগিরী করিয়া 'গুরুঠাকুর' নামে পরিচিত হইতেন। এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে আবার প্রাচীন সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তখন এই দগ্ধ ভারতে অন্যান্য নানাবিধ সুকুমার বিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত ও বাদ্য ও অন্যান্য কলা ও সুকুমার বিদ্যার বিশেষ সমাদর ও চর্চ্চা ছিল। কেবল ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত শিক্ষা ও অনুশীলনের উপরই এ সকল বিদ্যা আবদ্ধ ছিল, এমন নহে, পক্ষান্তরে, নানাবিধ গায়কের ও বাদকের দল বিদ্যমান থাকিয়া তাহার চর্চ্চা করিত। এখন এ জীবন-সঙ্কটের দুর্দ্দিনে এ সকল আমোদপ্রমোদ লোপ পাইতে বসিয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুসলমানদের মধ্যে পুঁথিগান করিবার

(১)হিন্দুর মধ্যে ইহাদের সংখ্যা যে অত্যধিক ছিল, বলাই বাহুল্য। তবে কি না, তাঁহারা সকলে পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন না। ইহাদের ন্যায় লোকের রচিত বহুল 'চৌতিশা' আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধুনা চৌতিশা সাহিত্যে বিশেষ গুণবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইবে না, সত্য বটে কিন্তু এককালে এই চৌতিশাই বঙ্গভাষা প্রচারের প্রধান সহায়ভূত ছিল, অস্বীকার করিবার যো নাই।

যে অত্যধিক ঔৎসুক্য ছিল, তাহা ত অবনতির শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন শত মুখে আমাদের দীনা বঙ্গভাষার অর্চ্চনা হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যাত্রাগান, কবিরদল, কুলপাটের গান, বাইয়ের দল, গাজীর গান এবং অসংখ্য হাড়ির তোবাদারি গানের দলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। হাড়িদিগের এক এক দলে চব্বিশ জন লোক থাকে। এই দলকে এই দেশে 'তোবা' বলে। এই 'তোবা'র এক এক জন ওস্তাদ থাকে। আমাদের কথিত পণ্ডিতেরা অনেক সময় এই তোবার ওস্তাদি করিয়া 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করিতেন। প্রত্যেক পল্লীতেই এই রকম দুই একজন পণ্ডিত থাকিতেন। বিবাহাদি উপলক্ষে হাড়িগণ ঢোলবাদ্য করিতে আসিলে, গ্রামস্থ পণ্ডিতকে প্রথমতঃ তাহাদের মানাইতে হইত। এই মানান কি, পাঠকগণ হয়ত কেহই এখন সে কথা অবগত নহেন। তোবার সর্দ্দার সদলবলে বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইতে বাজাইতে পণ্ডিতের বাড়ীতে যাইয়া পণ্ডিতকে ভক্তিভরে প্রণাম করিত। ইহাতেই পণ্ডিতবর মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভোগীর ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতেন। নচেৎ, এই পণ্ডিতাধ্যুষিত গ্রাম হইতে সম্মান লইয়া তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন কঠিন হইত। কেন না, পণ্ডিতেরা আসিয়া 'অমুক তাল বাজাও', 'অমুক রাগ গাও', ইত্যাকার বিবিধ ধূয়া ধরিয়া তোবাদারের পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিত। তাহাতে অনেক সময় ইজ্জৎ ও পূর্ব্বার্জ্জিত যশোহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত। আমাদের সমালোচ্য মহম্মদ হারি পণ্ডিতও কতকটা এ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। অস্মদ্দেশে এই সকল পণ্ডিতেরাই গানবাজনার ও রাগরাগিণীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলন বা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাহা এ দেশে রাগনামা ও তালনামা নামেই পরিচিত, যাহা এখন ভদ্রলোকের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া হাড়িদিগের ন্যায় ইতর লোকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই সকল লোকদের মধ্যে অনেকে বেশ সেকেলে লেখাপড়া জানিতেন। বলিয়াছি ত, তাঁহারাই তখন দেশের শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও, মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। এই ভাষানুরাগ হইতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিও গাঢ়তর ছিল। হিন্দুমুসলমানের আচার ব্যবহার প্রায় এক হইয়া গিয়াছিল। আধুনিক কালের মত হিন্দুমুসলমানে এমন ভেদনীতি

প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাফের বিদ্বেষী মুসলমানগণ হিন্দুর দেবদেবীকে পর্য্যন্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ। ইহা ছাড়া, মুসলমান সাহিত্যসেবীরা হিন্দুর বিষয়কে তাঁহাদের কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় করিতে কোথাও দ্বিধা বোধ করেন নাই। আলাওল ও দৌলত কাজীর রচিত গ্রন্থদ্বয়(২) ইহার পোষকতা করিতেছে। সাহিত্য-চর্চ্চার আমোদ উপভোগ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রধানতঃ বিজাতীয় বিদ্বেষও ভুলিয়া যাইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। এখন আমরা শিক্ষিত হইয়া বিজাতীয় বিদ্বেষজ্বরে জর্জ্জরিত হইতেছি। হিন্দুত্বের কোন কথা শুনিলে কানে হাত দিতে যাই। পূর্ব্বে কি সুখের দিনই না আমাদের ছিল? এই দেখুন না, মুসলমান কবি হাসিম সাহিত্যের খাতিরে জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া, স্বীয় ধর্ম্মগণ্ডির সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, হিন্দুর আরাধ্যা রাধিকার বার মাস ও অপর একজন নিমাইর বারমাস রাখিয়া গিয়াছেন।

"আইল চৈত্রল মাস, পূরিল বার মাস,
হীন হাসিমের বাণী।
গেলা প্রাণনাথ, করিয়া অনাথ,
ফিরি না আসিলা পুনি॥"

"সন্ন্যাসী না হৈও নিমাই বৈরাগী না হৈও।
অভাগী মায়ের চিত্ত সদায় না জ্বালাইও॥"

একই মায়ের দুই সন্তান, হিন্দু মুসলমান, আবার সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মায়ের পূজায় রত হইবে কি?

গ্রামের লেখক ও পাঠকের পদে সমাসীন থাকিয়াই আমাদের কবি পণ্ডিতগণ ক্ষান্ত ছিলেন না; অনেকে দুই একটি সঙ্গীত বা বারমাস রচনা করিয়া দেশপ্রচলিত সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনামূলক বহি লিখিতেন। রচনার অপারগ হইলে অন্যের রচিত গান, বারমাস প্রভৃতি সংগ্রহ বিদ্যানুরাগ মিটাইতেন। তাই আমরা দেখিতেছি যে, হারি পণ্ডি গুণের বারমাস গাহিয়া এবং তৎপুত্র বক্‌সা আলি উক্ত বারমাস সহ নানাবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়া স্বীয় অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগের পরিচ

(২)পদ্মাবতী ও লোরচন্দ্রানী।

গিয়াছেন।(৩) নিম্নে হারি পণ্ডিতের কিঞ্চিৎ বিবরণ সহ জয়গুণের বারমাস পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি। বারমাসটী সুরক্ষিত হইবে, ইহাও এখানে উদ্ধৃতির অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য।

হারি পণ্ডিত চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তঃপাতী ভিঙ্গ্‌রোল গ্রামে ন্যূনাধিক সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। এই গ্রাম বহু মুসলমান ভদ্রলোকের বসতিস্থান। এই গ্রামের এক ঘর মুসলমান চট্টগ্রামময় প্রসিদ্ধ ও অতীব সম্মানিত। অদ্যাপি হারি পণ্ডিতের বংশ বিদ্যমান আছে। এক কালে এই বংশ বেশ স্বচ্ছল ও সম্পন্ন ছিল। প্রকৃতিরাজ্যে কেহই নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্পদ্ ভোগের অধিকারী নহে। এই বংশ সম্বন্ধেও এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার বংশ আছে,—কিন্তু সে কেমন থাকা? নানাবিধ আনন্দোৎসব মুখরিত অসংখ্য জনমানব সঙ্কুল নগরীর ধ্বংশ সাধন করিলে, নগরী যে অবস্থাপন্ন হয়, অথবা গৃহদাহের পরও যেমন ক্বচিৎ কোথাও দগ্ধাবশিষ্ট দুএকটী কাষ্ঠখণ্ড হইতে ক্ষীণতেজ নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির সত্তা উপলব্ধি করা যায়, এও তেমন। হারি পণ্ডিতের পুকুর নামে পরিচিত একটী জলাশয় অদ্যাবধি সংসারে হারি পণ্ডিতের নাম বিঘোষিত করিতেছে। এই পুকুর ভিঙ্গরোল ও ডুমুরিয়ার মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরে,

(৩)আমার নিকট কোন বক্‌সা আলির ভণিতিযুক্ত একটী গীত আছে। ইনি কোন্ বক্‌সা আলি, জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, গীতটি এখানে তুলিয়া দিলাম।

হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি।
ডুবাইলা শ্যাম অবলার জাতি॥ ধ্রু।
হৃদেতে কালী রাখিয়া শ্যাম!
মুখে মিছা মায়া দিয়া পূরাইলা মনস্কাম।
লোকের বৈরী মোরে করি ছাড়ি গেলা কুমতি॥
আমার এখন একূল ঐকূল দোন কূল ডুবাইলা।
কোন্ কামিনীর কান্দে গেলা ওনাগর কানাই!
আমার এই মনের বেদনা কহিমু কারে!
কি জন্যে নিদয়া জানি হইলা আমারে!
নিদয়া হইয়া কালা না পূরাইলা আরতি॥
হীন বক্‌সা আলির বচন * *।
* * *

লোকালয়ের বাহিরে, পটীয়া আনোয়ারা রাস্তার পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। হারি পণ্ডিতের পিতার নাম মাহাছম, পুত্রের নাম বক্‌সা আলি। এখন এই বক্‌সা আলির পৌত্র বর্ত্তমান। সুতরাং বর্ত্তমান বংশধর হারি পণ্ডিতের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ।

যে হস্তলিপি আমাদের গবেষণার প্রধান সহায়, তাহা বক্‌সা আলির নিজ হস্তলিখিত। ১১৭৭ মঘীতে অর্থাৎ ১২২২ বঙ্গাব্দে উহা লিখিত হয়। বক্‌সা আলি নিজ পিতৃ নাম উল্লেখ করিতে তাঁহাকে 'মৃত' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ১১৭৭ মঘীতে হারি পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি, পিতা ও পুত্র উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া কালকবলিত হইয়াছিলেন। তৎসময়ে বক্‌সা আলির বয়স ৪০।৪৫ কল্পনা করিয়া হারি পণ্ডিতের বয়স ৭০ ধরিলে ১১০৭ মঘীতে হারি পণ্ডিতের জন্ম হয়, অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত আলির অন্যতম পুত্র মহম্মদ হানিফার বিরহকালে এই বারমাস কল্পিত হয়।

"মাধবী মাসেত মন্মথ মহীরাজ।
মহোৎপল দণ্ডরুচি মধুসেনা সাজ॥
মধুব্রতকুল মধুমত্ত, তমঃনাথ(১)
মধুরস ফুটয় পরভৃত কুহুনাদ॥
মনোরম্য বনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মনে বিরহে আকুল॥ ১।
জ্যৈষ্ঠেত জ্বলনা যেন উষ্ণরশ্মি চণ্ড।(২)
জীমূত জীবনহীন ধরিত্রী বিখণ্ড॥
জম্পতী তরকে জল যেন জলাতঙ্গ।
জায়া নব যৌবনী কলোল কেলিরঙ্গ॥(৩)
যোষিত যৌবন রত্ন বিরহ গরল।(৪)
জপিতে জীবন-নাথ নয়ান সজল॥ ২।

(১)তমনাথ = সূর্য্য বা চন্দ্র; সম্ভবতঃ এই শব্দটী 'তমোনুদ' হইবে।
(২)জ্বলনা = জ্বলন, অগ্নি। চণ্ড = প্রচণ্ড। উষ্ণরশ্মি = সূর্য্য।
(৩)কলোল = কল্লোল, (এখানে) আনন্দ।
(৪)যোষিত = যোষিৎ, স্ত্রী। শব্দটী 'জড়িত' হইলে অর্থ বেশ পরিষ্কার হয়।

আষাঢ়ে অঘোর পুরী অভ্র(৫) অন্ধকার।
অবিরত অবনী আচ্ছন্ন জলধর॥
অম্বুদ নির্ঘোষে ঘন দামিনী ছটকে।
উল্লাসে শালূর সব আছে মত্ত ভোগে॥
অঙ্গনা আনন্দ অতি কান্ত নিশি কোল।
অশ্রু পড়ে নয়ানে বিরহিনী শোকাকুল॥ ৩।
শ্রাবণে স্রবয় জল ঘন রস অহনিশ।
শিখরে সুনাদ শিখা শিখিনী হরিষ॥(৭)
শক্র শরাসন রচি গগন মণ্ডল।
সীমন্তিনী সুখশয্যা মদন মঙ্গল॥
সারস বিয়োগ শব্দ চাতক শুভধ্বনি।
শুনি ধনী পিউনাদ চমকিত প্রাণি॥ ৪।
ভাদ্র মাসে ভর্ত্তা বিনু শর্ব্বরী ভীষণ।
ভীম ভের॰মুদির যে ভৈরব গর্জ্জণ॥(৮)
ভেবে সুখ খঞ্জরীট ক্রীড়য়ে সানন্দে।(৯)
ভীরু ভর্ত্তা করুণা মিলয়ে অনুবন্ধে॥(১০)
ভাগ্যবতী কান্তকোরে সুখ অবিস্মরে। (১১)
ভবেশ্বরে ভাবিনী বিলোল অনিবারে॥
আশ্বিনে শরদ ঋতু হাসে তমঃনাশে।
অতি জ্যোতির্ম্ময় অজ উজ্জ্বল আকাশে॥
উড়ুগণ[১২] অমল কমল নীলোৎপল।
অতি শুচি দহদিশ যামিনী ধবল॥[১৩]

(৫)অভ্র = আকাশ। (৬)শালূর = ভেক
(৭)সম্ভবতঃ কবি 'শিখা'কে ময়ূর অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।
(৮)ভের = ভেরী, দুন্দুভি। মুদির = মেঘ, ভেক। অথবা মন্দির = মন্দিরা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
(৯)ভেবে = ভাবিয়া। খঞ্জরীট = খঞ্জনপক্ষী।
(১০)ভীরু = স্ত্রী। অনুবন্ধে = অবিচ্ছেদে।
(১১)অবিস্মরে = বিস্মৃত হয় না।
[১২]উড়ুগণ = নক্ষত্রগণ। [১৩]দহদিশ = দশদিক্।

আত্মভূ পূজয়ে বালা উল্লাস মানসে।
অবলা সুভাগ্যহীনী পহু পরদেশে ॥[১৪] ৬।
কার্ত্তিকে কুসুম কঞ্জ বিশদ বিকাশ।[১৫]
কন্দর্প সুকৃতি কিবা ভুবন প্রকাশ ॥
কুবলয় কুরবক ফুলিত প্রচুর।
কমলিনী কোরে কিরে কোকহংস জোড় ॥[১৬]
কান্তব্রত করে রঙ্গে কুমারী সকল।
কান্ত বিনে কামকান্তা কেবল আকুল ॥ ৭।
অগ্রাণে অচলা অনন্ত নব খেতি।
আমোদ সুস্বর গন্ধ সঞ্চরয় নিতি ॥
উপজিতে নব শীত নবীন নিচোল।[১৭]
অধিক আনন্দ ক্রিয়া কাকলী কলোল ॥
আনন্দিতে দম্পতী মকরধ্বজ পূজে।
উতাপিত চির বিরহিনী অনুশোচে ॥ ৮।
পৌষেত প্রবল শীতে পৃথিবী পূরিল।
পদ্মবৃন্দ পয়োধর শিশিরে নাশিল ॥[১৮]
প্রভিন্ন যামিনী কুহা মলিন পুষ্কর।[১৯]
প্রভাহীন ভাস্কর বাসর ক্ষীণতর ॥
পতি পত্নী প্রমোদিত পুষ্পকেতু রসে।
প্রমদা প্রমাদ বিনে পহু পরদেশে ॥[২০] ৯।
মাঘ মাসে হিমে মহী মরম পীড়িত।
মেদিনীমণ্ডল যেন তুষার মণ্ডিত ॥

[১৪]আত্মভূ=কামদেব। পহু পরদেশে=প্রভু বা স্বামী বিদেশে। [১৫]কঞ্জ=[কম্ জলে জন্মে যে] পদ্ম। [১৬]কোক=চক্রবাক। [১৭]নিচোল=প্রচ্ছদপট, আচ্ছাদনবস্ত্র।

[১৮]পয়োধর—মেঘ।

[১৯]প্রভিন্ন—প্রকাশিত; কুহা—কুজ্ঝটিকা। পুষ্কর—আকাশ। কুজ্ঝটিকার প্রাবল্য বশতঃ আকাশ মলিন দেখাইতেছে।

[২০]পরদেশে—পরদেশী, প্রবাসী।

মারুত অসীম হিম রামা কান্তকোল।
মধু হোতে মধুর মথন কান্তকোল ॥
মঙ্গল পঞ্চমী মহোৎসব মহাসুখ।
মৃত্যুবত বিরহ মরমে মোর দুখ ॥ ১০।
ফাল্গুনে পরব ফাউ ক্রতু মনোরঙ্গে।
ফাউরেণু লোভিত শোভিত সর্ব্ব অঙ্গে ॥[২১]
ফাল্গুন পবনে প্রফুল্লিত ফুল যত।
ফুটিল পল্লব সব পাদপ সমর্থ ॥
ফুলশরে পীড়িত প্রমদা পতিবশ।
ফাটয় বিরহীচিত্ত ফাঁফর মানস ॥ ১১।
মধুমাসে মধু ঋতু মধুরি মধুর।
মাধবী মালতী মল্লি বিকাশে প্রচুর ॥
মলয়া পবন বহয় অতি মন্দ।[২২]
মধুকর ঝঙ্কারে পিয়য় মকরন্দ ॥
মর্ম্মকেতু মদন পতিত সর্ব্বদেশ।
মরিমু গরল ভক্ষি বৎসরের শেষ ॥
মরণ বিফল সতী যদি কবে মিলে।
অচিরে মিলিবে প্রভু হারি পণ্ডিত বলে ॥ ১২।

ইতি বারমাস সমাপ্ত। সন ১১৭৭ মঘীতে হেওল্ সাহেবের জরিপেতে কুলচন্দ্র মুগল আমিনে এই মৌজা মাপিছে।”

পাঠক দেখিবেন, সামান্য লেখাপড়া জানা হারি পণ্ডিতের বঙ্গভাষায় কতদূর জ্ঞান ছিল! বঙ্গভাষার শৈশবে সামান্য শিক্ষিত একজন কৃষিজীবী মুসলমান এই রকম বিশুদ্ধ, দুরুহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া একটা বারমাস লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, জানিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। ইহা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দীনা বঙ্গভাষাতরুর অঙ্কুরোদ্গম-কালেই তন্মূলে এমন শুভানুধ্যায়ী জলসেচনকারী ছিল। এই সৌভাগ্য

[২১]লোভিত—‘লোভিত’ না হইয়া ‘লেপিত’ হইবে, বোধ হয়।

[২২]মলয়া পবন পরিমল বহে মন্দ। পাঠান্তর।

ছিল বলিয়াই, আজ বঙ্গভারতীর এই অবস্থা! গাঢ় অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন সুদূর পল্লীর উদাসীন মুসলমানগৃহে পর্য্যন্ত বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা হইয়াছিল, জানিয়া কাহার না হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হয়? সেই তামসযুগে, সেই শিক্ষাহীনতার দিনে লেখক কোথা হইতে এই শব্দসম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন জানিতে কৌতূহল হয় বৈ কি? আমি এ কথা অস্বীকার করিতেছি না যে, লেখক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে যতদূর উৎসুক হইয়াছেন, কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদানে ততদূর আগ্রহান্বিত হয়েন নাই। লেখকের কবিত্বের মৃদুল ধ্বনি শব্দাড়ম্বরের বৃথা আস্ফালন ও কোলাহলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাই লেখকের কবিত্বকে পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার শব্দচ্ছটাই আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফেলে।

এ কথাও আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বিবক্ষিত বিষয়ে আর কি মহতী কবিত্বও আমরা লেখকের নিকট আশা করিতে পারি? বাঙ্গালার আশৈশব অতি বড় কবি হইতে অতি ছোট কবি পর্য্যন্ত সকলেই 'বারমাস্যা সাহিত্য' চর্ব্বণ করিতে করিতে অস্থিসার করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় সমধিক সমাদর করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, সমালোচ্য বারমাসটী স্বজাতীয় কবিতার অনুসৃত পথের এক পদও বাহিরে যায় নাই। সমশ্রেণীর প্রকাশিত কবিতা সকল সাহিত্য সমাজে আদরের আসন লাভ করিয়াছে, আশা আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ এই মুসলমান কবির সন্দর্ভটীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন না। তিনি উচ্চ শ্রেণীর কবি না হইলেও, বঙ্গভাষার প্রাচীন কবি বলিয়া আমাদের সম্মানার্হ।

হারি পণ্ডিত আর কিছু লিখিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। চট্টগ্রামে যে মুদ্রিত বারমাসের পুঁথি দেখা যায়, তাহাতে মেহের নেগারের বারমাসের প্রথমেই এই দুই ছত্র দেখা যায়—

আব্বাছি রাবির পদে করজোড় করি।
বিরহবিরাগ গাহে জ্ঞানহীন হারি॥

ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, মেহের নেগারের বারমাসটীও হারি নামক ব্যক্তির লেখা। এই 'হারি' এবং আমাদের সমালোচ্য 'হারি পণ্ডিত' অভিন্ন ব্যক্তি কি না, স্থির করিবার উপায় নাই। এই কৌতূহল চরিতার্থ

করিবার পূর্ব্বেই উক্ত বারমাসের ভণিতা দেখিয়া আমাদিগকে বিমূঢ় হইতে হইয়াছে। তাহা এই—

মহম্মদ আকবরে কহে সে হইবে পতি।
অবশ্য মিলাইবে বিধি ধৈর্য্য কর মতি॥

বলিতে লজ্জা হয় যে, সংগ্রাহক মহম্মদ আকবর লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অন্যের রচিত কবিতায় স্বনামটি বসাইয়া দিয়া মুসলমান সমাজে যশঃপ্রার্থী হইয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র বারমাস দুই জন লোকে লিখিয়াছিল, কে বিশ্বাস করিবে? প্রাচীন সাহিত্যের কুক্ষিগত হইয়া এমন কত পরধনাপহারীই আজ লোকচক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। এমন পাপিষ্ঠকে অর্দ্ধচন্দ্র বিনা অন্য কি সম্মান দেওয়া যাইতে পারে? কবিতাটি যাঁহারই হউক না কেন, উহার স্থানে স্থানে কিছু সৌন্দর্য্য আছে।

জ্যৈষ্ঠেতে প্রচণ্ড দিন শ্রবয় আনল।
জীবন বিহনে দগধয় ভূমণ্ডল॥
শ্রাবণ সময় মেঘে বরিষয় নীর।
নয়ানের স্রোতজলে ডুবিল শরীর॥
শ্রাবণে সম্পূর্ণ জল টলমল করে।
না জানি পাপিষ্ঠ জলে কারে ডুবাই মারে॥
শুনিতে না পারি আমি চাতকের নাদ।
এ ছার জীবনে মোর আর নাহি সাধ॥
পৌষ— দণ্ডেকে দিবস যায় মাসেকে বৎসর।
তথাপি না আইল দুষ্ট মুগধের খবর॥

উপসংহারে একটী হাস্যকর রহস্যের উল্লেখ করিব। প্রাগুক্ত মুদ্রিত বারমাসের পুঁথিতে হারি পণ্ডিতের 'জয়গুণ বারমাস' মুদ্রিত হইয়াছে। মুসলমান প্রকাশকগণ ভিন্ন "যার কাজ তারে সাজে, অন্যের নামে ঠেঙ্গা বাজে" এই বাক্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিবে না। সামান্য ভাষাজ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা কেন পুস্তক-প্রকাশকের গুরুতর দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া হাস্যস্পদ হয়, বুঝিতে পারি না। মুদ্রিত জয়গুন কি ভয়ানক বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে, নিম্নের কয়েক ছত্র হইতে পাঠক দেখুন। মূর্খ প্রকাশকেরা বুঝিতে না পারিয়া এবং প্রাচীনকালের জটিল হস্তলিপি

পাঠ করিতে না পারিয়া মনের মত যা তা ছাপাইয়া মুসলমান করিবে সুন্দর লেখাগুলি এইরূপ কদর্য্য ও অবোধ্য করিয়া রাখিয়াছে।

মধুব্রতা কুল মধু মত্ত ভুমি নদি।
মধুরসে পুটয় প্রভিক্ত কহ নদী॥
জ্যৈষ্ঠেত জলনা যেন উষ্টরুষ্টি আছয়।
জীবন হীন ধরাতি বিখণ্ড পতি হয়॥
রিমপতি তারাক জলে জোলা লালা ভঙ্গ।
জায়া জাইয়া নবজে কৈল্লান কিলি রঙ্গ।
অমল নীরস মন দামনে চটগে।
উল্লাস নিলনা মিন্তে আপ মত্ত ভোগে॥

বাবাজী যে পড়িয়াছিল, সকল কাবল ভুসি ভুসি সে কাবল [সকল কারণ তুমি তুমি সে কারণ] ইহা তাহারও উপর গিয়াছে।

শ্রীআবদুল করিম।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পেশী ও স্নায়ু।

মানবদেহের রচনার কৌশল চিন্তা করিলে একেবারে বিস্ময় সাগরে তলমগ্ন হইয়া যাইতে হয়। একদা একজন সাধুমুখে শুনিয়াছিলাম যে ভগবানের এই নরশরীর নির্ম্মাণ কৌশল চিন্তা করিলেই যথেষ্ট আর স্বতন্ত্র সাধনা করিতে হয় না। যাহাহৌক স্থূলত কথাটা বুঝিতে হইলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মানবদেহ প্রতিমা গঠনের ন্যায় গঠিত হইয়াছে। প্রতিমার বংশদণ্ড, খড়, মৃত্তিকা, রং যেমন পরে পরে সাজান হইয়াছে, মানবদেহেও সেইরূপ অস্থি, মাংস, পেশী, স্নায়ু, ত্বক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু নরশরীর বিজ্ঞানশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থানগুলি এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অস্থি সংস্থান; পেশীসংস্থান; স্নায়ুমণ্ডলী; পরিপাক প্রণালী; শোনিত সঞ্চালন; জনন যন্ত্র ও মূত্র যন্ত্র। অনেকানেক যন্ত্র লইয়া এক একটি সংস্থান

গঠিত হইয়াছে। এই সকল যন্ত্র আবার পেশী দ্বারা গঠিত ও আচ্ছাদিত। এই সকল পেশীর ইংরাজী নাম টীসু (পেশী উপাদান সূত্র)। পেশী যখন টীসু নাম ধারণ করে, তখন কতকগুলি মাংসময় সূত্র গুচ্ছের সমষ্টি। একটি একটি গুচ্ছ আবার সূক্ষ্মতর সূত্র গুচ্ছে নির্ম্মিত, সূক্ষ্মতর সূত্রগুচ্ছ আবার কতকগুলি সূক্ষ্মতম সূত্রগুচ্ছে নির্ম্মিত। শেষোক্ত সূক্ষ্মতম সূত্র আর কিছুই নহে, কেবল কতকগুলি দূরবীক্ষণযোগ্য চেপ্টা অথচ গোল বিন্দুর সমষ্টি যেন একটির পর একটি দিয়া গাঁথিয়া কণ্ঠমালা গাছটি হইয়াছে। এই যে চৈতন্য বিশিষ্ট উপাদানবিন্দু ইহারই ইং নাম সেল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সেলের সংজ্ঞা আছে অর্থাৎ ইহা প্রোটোপ্লাজমের স্বতন্ত্রীকৃত মূর্ত্ত সূক্ষ্মতম রাশি। এই প্রোটোপ্লাজম একরকম স্বচ্ছ, পেঁপের আটাবৎ চটচটে সঙ্কোচপ্রবণ পদার্থ। মূর্ত্ত পদার্থের এই-ই শেষ সীমা, বিজ্ঞান ইহার পর আর যাইতে পারেন নাই। সে যাহাহৌক এই সেল্ হইতেই শেষে পেশী বা মাংস নির্ম্মিত হইয়াছে। "মাংসাবয়বসংঘাতঃ পরস্পরং বিভক্তঃ পেশী ইত্যুচ্যতে।" পেশী মানবদেহের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, ইহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন হয় এবং আমার ইচ্ছামত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা ও কার্য্য করিতে পারি অর্থাৎ দাঁড়াইতে পারি, ছুটিতে পারি, লাফাইতে পারি, বসিতে পারি, উঠিতে পারি, হাত দিয়া মৃত্তিকা হইতে বস্তু উত্তোলন করিতে পারি ইত্যাদি। পক্ষাঘাত গ্রস্থ হস্তে পেশীর কার্য্য নাই বলিয়া হাত তোলা যায় না। শবদেহে পেশীর কার্য্য নাই বলিয়া শব পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না আর সম্মুখে ও পশ্চাতে মস্তক নাড়িতে পারে না। স্থিতিবিজ্ঞান শাস্ত্রে "লিভার" যন্ত্রের উল্লেখ আছে। হস্ত উত্তোলন, পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান ও সম্মুখ পশ্চাতে মুখ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা কেবল পেশী সাহায্যেই হয় আর মানবশরীরে পেশীর সাহায্যেই এই তিন প্রকার লিভারের কার্য্য অস্থি সাহায্যে সংঘটন হইতেছে। পেশী না থাকিলে হাড় খেলিত না। এই পেশী প্রধানত দুই প্রকার, অধীন ও স্বাধীন (যথাক্রমে ইং নাম ভলেণ্টারী ও ইনভলেণ্টারী)। অধীন বা ইচ্ছাধীন পেশী সাহায্যে আমরা ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন ও সঙ্কোচ ও বিকাশ সাধন করিতে পারি। পেশীর হয় এক দিক না হয় দুই দিক অস্থিতে সংলগ্ন থাকে। পেশীর সাহায্যে যাহার গতি হইতে পারে না এমন অস্থিরও গতি সম্ভব হয়। যে পেশী দুই অস্থিকে যুক্ত

করে তাহার ইং নাম টেণ্ডন। কোন কোন পেশী আবার আকুঞ্চন ও প্রসারণের সময় নিজে ছোট বড় হয়। টীসুর সঙ্কোচ প্রসারই ইহার কারণ। টীসু কি পেশী সকলই এক প্রকার জালবৎ পদার্থ দ্বারা আবৃত, তাহার নাম ঝিল্লি (মেম্ব্রেন)। মানবদেহে ইচ্ছাধীন বা অধীন পেশীরই সংখ্যা অধিক। মানবের ইচ্ছার স্থান মস্তকের মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কে ইচ্ছা সঞ্জাত হইলেই স্নায়ুর সাহায্যে শরীরব্যাপী টীসু সূত্র দ্বারা মনোনীত স্থানে ঐ ইচ্ছার উত্তেজনা-শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আবশ্যকমত আকুঞ্চন বা সম্প্রসারণের কার্য্য করে। পেশীর প্রত্যেক সূত্র অসংখ্য স্নায়ু দ্বারা আবরিত। পেশী ও স্নায়ুর গ্রন্থ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে একখানি জাল মনে করিতে হইবে। স্নায়ু বা স্নায়ুরজ্জুর (নার্ভ) ক্রিয়া না থাকিলে পেশী অচল ও জড়। পেশী রজ ও স্নায়ু সত্ত্বপ্রধান। মস্তকস্থিত মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড উভয়ই স্নায়ু কেন্দ্র পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বাধীন পেশী আমাদের কথা শুনে না, আমাদের ইচ্ছানুসারে ইহাদের আকুঞ্চন প্রসারণ ঘটে না। এই সকল পেশীর শেষ উপাদান সেলগুলির আকার ইচ্ছাধীন পেশীর সেলের আকারের মত নহে। স্বাধীন পেশীর উপাদান সেলগুলি ভিন্ন ধর্ম্মের আকারে দীর্ঘ এবং উভয় প্রান্তে তীক্ষ্ণাগ্র। যে সকল শীরার কার্য্য শোণিত বহন সেই সকল শীরাতেই এই পেশীগুলি আছে। তদ্ভিন্ন এই স্বাধীন পেশীগুলিই মানবদেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের আবরণ স্বরূপ। যন্ত্র কি কি? এই সকল আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক সপ্ত বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রক্তসঞ্চালন যন্ত্র, শ্বাস, পরিপাক, জনন, ত্যাগ, পেশীসংস্থান ও স্নায়ুসংস্থান। এই সকল যন্ত্র ক্রিয়া অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

শরীর রক্ষার জন্য আমরা কি করিয়া থাকি? আহার গ্রহণ করিয়া থাকি। জল ও কয়লা না দিলে কি কল চলে? আহারের বস্তু দেহ মধ্যে নীত হইয়া কতকটা রক্তরূপে দেহে সঞ্চালিত হইয়া দেহে পোষণ করে আর কতকটা মলমূত্ররূপে ত্যাগ করিতে হয়। শরীরের সুতরাং তিন ক্রিয়া—গ্রহণ, পোষণ ও ত্যাগ। এই তিন ক্রিয়ার জন্য শরীরের যন্ত্র সংস্থান ও তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথমত আহার গ্রহণের জ্ঞান বা ইচ্ছা চাই। ইহা স্নায়ুর কার্য্য সুতরাং স্নায়ু সংস্থান যন্ত্রের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত আহার গ্রহণ জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চণ প্রসারণ বা এক কথায় পরিচালন আবশ্যক।

ইহা পেশীর কার্য্য সুতরাং পেশী-সংস্থান যন্ত্রের প্রয়োজন। তৃতীয়ত আহারীয় বস্তু হইতে শরীর পোষণ উপযোগী পদার্থ চাই ও অনাবশ্যকীয় পদার্থ শরীর হইতে ত্যাগ করা চাই সুতরাং এই সমস্ত কার্য্যের জন্য কতকগুলি যন্ত্রের আবশ্যক তাহাদের সাধারণ নাম পোষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। সে সকল যন্ত্র হইতেছে—শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র, রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র আর ত্যাগ যন্ত্র। এখন এই তিন শ্রেণীর যন্ত্রের ক্রিয়ার জন্য যে তিন প্রকার শক্তির প্রয়োজন—জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পোষণশক্তি, ইহারা কোথা হইতে আসিতেছে। ইহারা সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের বৈষম্য হইতে উদ্ভুত, আয়ুর্ব্বেদ মতে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা শক্তি দ্বারা সম্পন্ন। আর অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ প্রভৃতি কোষগুলির কোন্‌টি সত্ব প্রধান, কোন্‌টি রজপ্রধান, কোন্‌টি তমপ্রধান তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক লোকের ত্রিবিধ আহারের কথা বলিয়াছেন। শরীর রক্ষার্থ আহারের প্রয়োজন। আহারের কথা আমি পরে বলিব।

যাহাহৌক পেশীগুলিতে আরও কপর ভাবে শ্রেণীবিভক্ত হইতে দেখা যায় এরূপ আভাস দিয়াছি। বাহ্য-পরিচালক পেশী ও আভ্যন্তরিক-পরিচালক পেশী এই দুইটি সেই বিভাগ (যথা ক্রমে ইং muscles of external movement and internal movement). বাহ্য-পরিচালক পেশীগুলি অস্থির সহিত যুক্ত আর আভ্যন্তরিক-পরিচালক পেশীগুলি মানবের উদরনিহিত আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের প্রাচীর বা আবরণ প্রস্তুত করে। বাহ্য-পরিচালকগুলি হইতেছে ইচ্ছাধীন ও আভ্যন্তরিক-পরিচালকগুলি হইতেছে তদ্বিপরীত স্বাধীন পেশী। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জল, লবণ, প্রোটীড, কার্ব্বো হাইড্রেট ও যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থ লইয়াই পেশী নির্ম্মিত হইয়াছে। পেশীর অপরাপর ধর্ম্ম ও আকারানুসারে যে আরও শ্রেণীবিভাগ আছে তাহার আলোচনার আর আবশ্যকতা নাই। পেশী দীর্ঘ হইলে রজ্জু বলা যায়। যেমন বাহু ও পদের পেশী রজ্জু।

স্নায়ু সংস্থান সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিতে হইবে। বেদে স্নায়ুর উল্লেখ আছে। ঋক্‌বেদ ও অথর্ব্ববেদে সূক্ষ্ম নাড়ীকে স্নায়ু নামে অভিহিত করা

হইয়াছে। ইংরেজী নার্ভ আর স্নায়ু যে একই পদার্থ তৈত্তিরিয় আরণ্যক পাঠে তাহা জানা যায়। শাস্ত্র বলেন আমাদের দেহের নাড়ীর সংখ্যা হয় না।

সেল বা কোষ হইতে পেশীরও উৎপত্তি আর সেল বা কোষ হইতে স্নায়ুরও উৎপত্তি। প্রয়োজন অনুসারে সেল বা কোষ ভিন্ন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। স্নায়ুর দ্বারা শরীরের সূক্ষ্ম কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। হাঁসি কান্না হাই হাঁচি, স্নায়ু না থাকিলে এসব কার্য্য কিছুতেই হইত না। প্রধানত স্নায়ু স্থান হইতেছে পৃষ্ঠবংশে ও মস্তিষ্কে। মধ্যদেহ সহিত মস্তক গ্রীবা দ্বারা যোজিত এবং মস্তকের স্থান মেরুদণ্ডের উপরিভাগে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে পৃষ্ঠবংশ ছাব্বিশ খানি যুগ্ম ভার্ট্রিব্রি বা কশেরুকাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। এই মেরুদণ্ডের ভিতরে সমস্ত স্থান ব্যপিয়া যে মজ্জা আছে, তাহার আকার মোটা দড়ির ন্যায়। এই মজ্জা স্নায়ু রজ্জু ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই স্নায়ু রজ্জুই কাশেরুক মজ্জা মস্তকের মধ্যে গিয়া স্ফীত হইয়া মস্তিষ্ক হইয়াছে। নবজাত শুলের ডাঁটা মনে করিলে কথাটা বুঝিতে পারিবেন। পৃষ্ঠবংশের স্নায়ু রজ্জুর নাম কাশেরুক মজ্জা আর মস্তক বা করোটি মধ্যে পঁহুছিয়া ইহারই নাম মস্তিষ্ক (ইং ব্রেণ)। মস্তিষ্ক য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা কখন চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কখন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নিম্ন মধ্য ও উর্দ্ধ মস্তিষ্ক এই তিন ভাগ। আর মেডুলা অব্‌লংগেটা, পন্স-ভেরোলী, সেরিব্রম (বৃহৎ মস্তিষ্ক), সেরিবেলম (ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক) এই হইল চারি ভাগ, পৃষ্ঠ হইতে উত্তরোত্তর উপরদিকে গিয়াছে। মস্তিষ্ক উপরি উপরি তিনটি ঝিল্লী বা মেম্ব্রেণ দ্বারা আবৃত।

স্নায়ু নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। অণুবীক্ষণ সাহায্যে যেরূপ দেখা যায়, সেই আকৃতি ধরিয়া শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, শুভ্র ও ধূসর কিম্বা মেদময় ও মেদবিহীন। উৎপত্তি স্থান অনুসারেও দুইটি বিভাগ হইয়াছে—মস্তিষ্ক-কশেরুকামজ্জা-স্থানীয় ও সমবেদক (যথাক্রমে ইং সেরিব্রো-স্পাইনল ও সিম্‌পাথেটিক)। স্নায়ু ও স্নায়ু-রজ্জুর ক্রিয়া অনুসারে যে বিভাগ তাহার নাম কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্র-বিমুখ (ইং সেণ্ট্রিপিটেল-সেণ্ট্রিফিউগাল)। স্নায়ুসংস্থানও দুইভাগে বিভক্ত। মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা ও সমবেদক গ্রন্থিগুলি লইয়া একটি সংস্থানের নাম হইয়াছে, কেন্দ্র-সম্বন্ধীয় (সেণ্ট্রাল) সংস্থান। আর একটির নাম পরিধি সম্বন্ধীয় সংস্থান (পেরিফেরাল)। এই সকল স্নায়ু দ্বারা

শরীরের অপর যন্ত্রাদির সহিত পূর্ব্বকথিত মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা ও সমবেদক গ্রন্থিগুলির সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয়মজ্জা এই দুইটি স্নায়ুর প্রধান স্থান। মস্তকে মাথার খুলির গহ্বরে অবস্থিত মস্তিষ্ক হইতে মস্তিষ্ক-স্নায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে (ইং ক্রেনিয়াল বা সেরিব্রেল)। কোন মতে এই স্নায়ু নবজোড়া, কোন মতে বারজোড়া।

ক্রমশঃ।

মহাযাত্রা।*

তৃতীয় সর্গ।

হেম গৌর বপু যুবা বিপ্রবেশধারী
অগ্নিসহ, পঞ্চ ভাই গিয়া বায়ু কোণে
মহেন্দ্র কান্তার পথে মিলিলা বঁটতে(১)
কল্লোলিনী কুলেশ্বরী মহানদীকূলে;
গগন পরশি দুই দিগে তুঙ্গভৃগু
সঙ্কটে শঙ্কোচি বপু বাহিরায় যথা
পুন পূর্ব্বাকারে স্রোত পূর্ব্বসিন্ধুগামী,(২)
বিজন ভীষণ স্থলী, বনগজরাজি
কণ্ডুল কপোল পিণ্ড ঘর্ষণে কম্পিত
তরুদেহ হ'তে যথা ঝরে ক্ষণে ক্ষণে

*বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত মহাযাত্রার ২৪ পৃষ্ঠার ৪৫ পংক্তির পর নিম্নোক্ত লাইনটি ভ্রমক্রমে দেওয়া হয় নাই। যথা,—

কি কাজ আমার অশ্রুসিক্ত রাজভোগে।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত দ্বিতীয় সর্গে ৬৪ পৃষ্ঠার ৪৬ পংক্তির পর নিম্নোক্ত লাইন কয়টি দেওয়া হয় নাই। যথা—

বিশ্বেতেজ সারচক্র আলোক সেকালে,
আলোকিত হইল ক্ষণ সৃষ্টিসীমাপারে,
রবি, শশি, গ্রহ, তারা, আমি আদি করি,
আদিম তমসগর্ভ, তেজরূপী যত,
হইলাম অন্ধ সবে সেই তেজ পুরে। লেখিকা।

(১)মহেন্দ্র কান্তার উড়িষ্যা প্রদেশস্থ গড় জাতের মহারণ্য।

(২)উড়িষ্যাস্থ সাতকুশিয়ার পূর্ব্বসীমানা বড় মূলঘাটি, দশপল্লা রাজ্যের অন্তর্গত, সাতকোশিয়া অংশত দশপল্লায় অবস্থিত এরূপ ভীষণ দৃশ্য উৎকলে বিরল, এ স্থানে মহানদীর শয্যা উভয়পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতমালা দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

সুরভি অরণ্যপুষ্প পুঞ্জ পুঞ্জ স্রোতে,
কাননদেবীর সে কি অর্ঘ্য লাজাঞ্জলি!
না যাইতে দিবা তথা মহা শৈলছায়া
ব্যাপি জলে, স্থলে, নদী-পুলিনে, কাননে,
উপজায় হৃদে সন্ধ্যা আগমের ভ্রম।
ক্ষণে কে যে টুটে দেখি দূরে পৃষ্ঠভাগে
(অসুখীর আহা পূর্ব্ব সুখস্মৃতিসম!)
অস্তাতপে উদ্ভাসিত তুঙ্গ শৃঙ্গাবলী;(৩)
পর্ণশেষে তথা নিশা যাপি বটমূলে
(যে নামে সে স্থান আজো বিখ্যাত জগতে)
পশিলেন সবে সেই বিকট সঙ্কটে
ছায়াময়, অনুক্ষণ পূর্ণ ঝিল্লিরবে,
কুজ্ঝটিতে নীলবর্ণ ভৃগুমান গিরি(৪)
এক পরে এক, শ্রেণীবদ্ধ দুই তীরে
শিখা তুলি করিছে কি গগনের সীমা?
দিগ্‌বারণ শুণ্ডাকারে কোথাও বা নীরে
শ্যামশৈল কোটী আসি মিশেছে তীর্য্যকে(৫)
ছায়ালোকে সুশোভিত হ'য়ে স্থানে স্থানে,
কোথা কল কল স্বরে গিরি-নির্ঝরিণী
(সৃষ্টি হ'তে পড়ে নাই সৌরকর যথা)
সুচিক্কণ কৃষ্ণশীলা সোপান শ্রেণীতে
তমোময় গুহা হ'তে আসয়ে নামিয়া
অপ্রগল্‌ভে অপ্রগল্‌ভে দীন সাধু যথা
সাধে পরহিত হ'য়ে বৃতস্পৃহ বশে;
নিবীড় কিচককুঞ্জে কৃষ্ণাঞ্জনরুচি
তিমিরে আচ্ছন্ন মহাঘোর শৈলখোলে
লুকি' একাকিনী কোথা ঝুরিছে করুণে
কপোতী, কি দুঃখে তাহা জানে সে দুঃখিনী।
থরে থরে সুসজ্জিত সেই গিরিতটে
বনদেবী-সৌধাকৃতি বনস্পতি শাখে
পুরীষে বিজন বীণাজিত কণ্ঠরবে
গাহিছে সুতানে "বউকথাকও" পাখী
নদীকুলবন্ধু, শ্যামা, পাপিয়া, সারিকা।
ক্রমে গিয়া সেই রম্য ভীষণ সঙ্কটে
বিস্ময়ে উৎফুল্ল নেত্র পাণ্ডুপুত্রে দেখি,
দেব বৈশ্বানর তবে কহিলা সস্মিতে,
"হে রাজন দেখ হেথা বহেন কেমনে
মহানদী নামে পূর্ব্ব সাগর গামিনী
হরমৌলিমালা দেবী ত্রি-স্রোতাজাহ্নবী
সুকান্তি মহর্ষীতপে পতিতপাবনী(৬)
তুষ্ট হ'য়ে এই মুখে আসিলা যেকালে,
অর্দ্ধ পথে গতি তাঁর রোধিল এস্থলে
নিরন্ধ্র প্রাচীরাকৃতি এই মহা গিরি,

(৩)পথিকের পৃষ্ঠভাগস্থ অস্তকরোজ্জ্বল শৃঙ্গ দর্শনের সহিত অসুখী ব্যক্তির পূর্ব্বসুখ স্মৃতির উপমা। (৪)ভৃগুমান=অতটযুক্ত। (৫)পর্ব্বতের নাসিকাকৃতি কোটী উহা দূর হইতে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় দেখায়। (৬)সুকান্তি ঋষির তপঃপ্রভাবে গঙ্গা মহানদীরূপে মধ্যভারতবর্ষ হইতে উৎকলে আসিবার কিম্বদন্তী আছে।

তবে কুলিশিরে ঋষি তোষি তপোবলে
এ বর্ত্ম ছেদন লাগি কৈলা অনুরোধ,
বজ্র করে অবতরি এই শৈল চুড়ে
ছেদিয়া এ শৈল, বজ্রী রচিলা কৌশলে
উৎকলের মুক্তিদ্বাররূপী এ তোরণ,
সপ্তক্রোশ ব্যাপি, শৈলকুঞ্জে আন্ধারিত
ছিন্ন শিলাপুঞ্জ যার, বিষমি একালে
নদীশয্যা, উপমায় অসংখ্য প্রপাত
স্থানে স্থানে, কলরবে পুরায়ে অটবী;
মহেন্দ্রের অধিষ্ঠান হেতু এ শিখরি
মহেন্দ্র নামেতে খ্যাত কুলাচল কুলে,
পরম পবিত্র গিরি সেবেন আদরে
দেব, ঋষি, সিদ্ধ যার শৃঙ্গ অগণিত,—
মেঘাসন মেঘাসন মঘবা বাঞ্ছিত[৭]
সুচারু চপলা লাস্যে ভাস্বর সদাই,
সদা মুখরিত কেকীকুল কেকারবে;
পূত বৈতরিণীস্রোত-প্রভবা গোনাসা[৮]
ঋষিসভা মধ্যে যথা ভার্গব বদনে
ঝরে পূততর পুণ্যশ্লোক কথামৃত,
গিরি মাল্যবান গিরিমালে মধ্যমণি[৯]
স্কন্ধে শুভ্রঝরনীর উত্তরীয় ধারী;
মৈনাক পিনাকপাণি প্রিয়া-প্রিয়স্থলি; [১০]
ঝরউপবিতধারী, কপর্দি সেবিত
কপিলাস অভ্রগর্ভ অভ্রংকষগিরি,[১১]
পঞ্চধার জলদের কেলিমঞ্চরূপী[১২]
কেতকনিকুঞ্জে যার ঝরয়ে অদূরে
তপ্তপূত প্রস্রবণ রুদ্র অধিষ্ঠানে;
এ আদি বিশাল শৃঙ্গ কুলে বিভ্রাজিত
উৎকল কলিঙ্গ বপূ মণ্ডিছে শিখরী,
মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে, এই দেবখাতে।
অগ্নির বচনে সবে সেই পূতনীরে
অবগাহি ভক্তিভাবে, দিলা জলাঞ্জলি
পিতৃলোকে, সে সঙ্কট হইতে বাহিরি
চলিলা গন্তব্যপথে পশ্চিমাশামুখে।
দেখিলা কৌতুকে সবে সে কান্তারপথে,
অনন্ত বৈচিত্রময়ী অরণ্য প্রকৃতি
কিবা সেই মার্গরেখা গৈরিকে অরুণ—
বনদেবী সীমন্তে কি সিন্দূরের রেখা!
কোথা ঊর্দ্ধে উঠি মার্গ মিশেছে আকাশে
(যথা চক্রাকারে ভায় বনাবৃত ধরা)

[৭]মেঘাসন শৃঙ্গ ময়ূরভঞ্জে অবস্থিত। [৮]গোনাসা কেন্দুঝরে অবস্থিত বৈতরণীর প্রভব স্থান। এই পর্ব্বতের পাদদেশে "ঋষিসভা" নামক প্রস্তরময় স্থল বৈতরণীর স্রোত দ্বারা ধৌত হইয়াছে। এই স্থানে ভগবন্ ভার্গবের আশ্রম থাকিবার কিম্বদন্তী আছে। [৯]মাল্যবান গিরি ইহার বিশাল নীলদেহে শুভ্রনীরাস্তরণ দূর হইতে অতি মনোহর দেখায়। ইহা রামায়ণোক্ত মাল্যবন্ত গিরি নহে। [১০]মৈনাক=রণপুর অন্তর্গত দুর্গাদেবীর অধিষ্ঠিত পর্ব্বত। রণপুর রাজধানী ইহার পাদদেশে অবস্থিত। [১১]কপিলাস=উড়িষ্যাস্থ ঢেকানালের অন্তর্গত ঝরণা এবং অভ্রের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যায় ইহা প্রসিদ্ধ শিবক্ষেত্র। [১২]পঞ্চধার আঠমল্লিকের অন্তর্গত। ইহার অদূরে "দেউলঝর" নামক তপ্ত প্রস্রবণ অবস্থিত।

(চৌদিকে, বারিধি প্রায় দিগন্ত
বিস্তারি)
কোথাও বা নিম্নে গিয়া মিশেছে
পাতালে;
এরূপে আসিতে পথে নানাদৃশ্যরাজি
পথিকগণের হৈল নয়ন-অতিথি!
নীল বনস্থলী মধ্য দূর প্রসারিত
সৌরকরোদ্ভাসী শুভ্র নদী-বালি-রেখা,
স্নিগ্ধ ছায়া দ্রুমবতী ভীম মহাটবী,
ঢাকিয়াছে মহী, নভো, নিবীড়পল্লবে,
শোনা যায় নাই স্তব্ধ গর্ভে যার কভু
সৃষ্টি হ'তে কাষ্ঠজীবি কুঠারের ধ্বনি
কোথা মুখরিতস্থলী শ্বাপদ নির্ঘোষে
প্রতি ঘোষে প্রতি বাণী দিতেছে যা'
শুনি
প্রতিধ্বনি, গিরিগুহা-ক্রোড়-প্রণয়িণী।
শিলাশয্যা প্রবাহিনী শৈলস্রোতস্বতী,
পাষাণে স্খলিত হ'য়ে যার বারিধারা
মিশায় ঝর্ঝর রব ঘোর ঝিল্লিরবে।
প্রপাত মণ্ডিত ইন্দ্র কোদণ্ড কিরীটে,
বাতে ফর ফর রূপা জরীর উত্তরী
সম; যাহা শোভে পর্ণশ্যাম শৈলদেহে,
ভৃঙ্গ হ'তে ভৃঙ্গ পরে লাফায়ে গর্জ্জনে;
গিরি দরপণরূপী গিরিপাদদেশে
সচ্ছ হ্রদ, অলঙ্কৃত ফুল্ল কোকনদে,
স্নিগ্ধ গন্ধ সৌগন্ধিকে, কুমুদে, কহ্লারে,
পাণিকৌড়ি চক্রবাক, মরাল সরালী
আদি জল বিহঙ্গমে ঝঙ্কারিত সদা
নিরাতঙ্কে যুথে যুথে চরে যার তীরে
শৃঙ্গধর কৃষ্ণসার সঙ্গে কুরঙ্গিণী;
ধরণী সীমান্ত সেতু সম উচ্চ ভূমি
দিগন্তে শ্যামায়মান বিশাল আভোগে,
দন্তুর রেখায় যার পৃষ্ঠে দিগপটে
তুলিয়াছে নীল শিখা দূর গিরিমালা
শ্যামল মেদুর নব মেঘাঙ্কুর ছবি,
কোথাও বা শিশুশৈল আবরে আড়ালে
পৃষ্ঠে সুবিশাল গিরি, জীবনে যেমতি
উপস্থিত দুঃখ, আহা, আবরে নয়নে
ভাবী ঘোরতর দুঃখ করাল মুরতি।
ধূপ লাগি হত হ'য়ে বন্যজাতি করে
দীনবেশে দাঁড়াইয়া কোথা শৈলতটে
সুবিশাল শালতরু কঙ্কালের মালা;
বাতে তরঙ্গিত শস্য শ্যামল প্রান্তর
মধ্যে শোভে মঞ্চ যথা জাগি নিশাযোগে
শস্যরক্ষী জর জর নিদারুণ শীতে,
বরাহ শম্বর করী আদি শস্যহারী
জীবে, তাড়াইছে ক্ষেত্র হ'তে তীব্রস্বরে
সশর কামান ধারী কোথা গোপশিশু
রক্ষিতেছে ধেনুপাল বিজন প্রান্তরে;
কোথা শস্য কাটি কাটি ক্ষেত্রে কৃষিজীবে
ভালে কর দিয়া দূরে দেখিছে কৌতুকে,
শিরে বহি কাষ্ঠবোঝা কোথাও বা নারী
গুঞ্জামালে বিভূষিত কিরাতসুন্দরী
আসিতেছে দলে দলে আলাপি মধুরে
এইরূপে নানাদেশ, বন, জনপদ
তীর্থাশ্রম গিরিপূর্ণ মহানদী শ্রোণী[১৩]

[১৩]শ্রোণী = উপত্যকা।

ক্রমে ক্রমে অতিক্রমি প্রবেশিলা সবে
দক্ষিণা পথের দ্বার দেহলিরূপিণী
মালভূমি, তিন মহা স্রোতের প্রসূতী
(১৪)
ঝর প্রস্রবণে পূর্ণ যথা প্রবাহিত
বহু শৈলস্রোত হ'তে বারিকরগ্রহি,
উত্তরে বহিয়া শোন্ মিশে গঙ্গাদেহে,
পশ্চিমে বহয়ে রেবা পূর্ব্বে মহানদী;
(১৫)
স্থানে স্থানে গিরিপদে কুঞ্চিত গতিতে
(তরুদেহে পুঞ্জীভূত পারাবত ছবি)
উঠিছে ত্রেতাগ্নিধূম তপস্বি আশ্রমে;(১৬)
দুর্ব্বাদলে, দেবার্চ্চন কুসুমে, অক্ষতে
স্থলে স্থলে বিচ্ছুরিত নদীর সিকতা;
বিচরিছে মৃগশিশু নিরুদ্বেগে বনে
বনে দলে, কুশাঙ্কুর কবল লালসী;
বিরাজিত স্থানে স্থানে ছায়া তরুমূলে
শিলাখণ্ড মসৃনিত ইঙ্গুদি তইলে;(১৭)
কোথা বনস্পতিশাখে বালাতপভাতি
জলার্দ্র বল্কল দোলে মৃদুবনবাতে;
পাহগণে কৌতূহলী বুঝি বিভাবসু
কহিলা সম্বোধি তবে "মহাস্থলী এই
মহিমা ইহার জানি, বসেন এদেশে
নানাস্থানে ঋষিবৃন্দ; ত্রেতায় এ পথে,
চিত্রকূট হ'তে যেতে পঞ্চবটীমুখে
পর্ণশালা রচি হেথা ছিলা দাশরথি,(১৮)
প্রস্তরে অঙ্কিত তাঁর পদাঙ্ক এ বনে
বনপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজয়ে কিরাতে,
শিখিপুচ্ছ তালবৃন্ত ঢালি ভক্তিভাবে;
দাশরথি শরে হত হ'য়ে এই স্থলে
বিরাধ লভিয়া মুক্তি গেল দিব্যলোকে
(১৯)
অশোক, মাধবী, নাগকেশর বল্লরী
দোলায় দোলয়ে হেথা নিভৃতে অপ্সরা
মধুমাসে, রামায়ণ গাহি মধুতানে,
ফাগুখেলা রচি বন প্রসূন পরাগে।
নব কিশলয়ে দেখ বিরাজে কেমনে
ঝিকে চৌদিকে অরণ্যভূমি দিগন্ত ব্যাপিনী;
বি থিলি সুন্দরী যবে তুলেছিলা হেথা
বনপুষ্প, ঝরি তাঁর শ্রীকর-আলতা
রঞ্জিল কি তরু লতা এ মঞ্জুলরাগে!
তাঁর বরে সেই হ'তে আছে মোর মান।
দাবানলরূপে হেথা বিচরণ তরে।
দয়াবতী মৈথিলীর শ্রীহস্ত লালিত
অদ্যাপি এ বনে আছে কৃষ্ণসারগুলি
জরাজীর্ণ, শুনি যারা জলদ আগমে
সুগম্ভীর ঘনঘোষ, স্মরয়ে বিষাদে
ব্রহ্মাণ্ড বিবর ব্যাপি কোদণ্ড টঙ্কার

(১৪)মালভূমি = উচ্চভূমি। (১৫)রেবা = নর্ম্মদা। রেবা, মহানদী এবং শোন্ ইহারা এক উচ্চভূমি হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত। (১৬)ত্রেতাগ্নি = দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয় এই তিন অগ্নি। (১৭)ইঙ্গুদি = তপস্বীদিগের জটা পরিস্কৃত করিবার তৈল বিশেষ। (১৮)চিত্রকূট প্রয়াগের দক্ষিণে অবস্থিত মন্দাকিনী নদী এই স্থানে প্রবাহিতা। বনযাত্রা সময়ে রামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থান করিয়াছিলেন। (১৯)বিরাধ বৃত্তান্ত রামায়ণে অনুসন্ধেয়।

লঙ্কাপতি অরাতির, তৃণাহার ত্যজি
অশ্রুফেলে একধ্যানে অনিমিখেচেয়ে;"
এই কথা শুনি তবে পঞ্চ পাণ্ডুসুতে
পাঞ্চালি সহিত ভ্রমি আশ্রমে আশ্রমে
ঋষি ঋষিপত্নীপদ বন্দিলা আদরে,
তবে পথ অতিবাহি, রাখি বাম ভাগে
নিষধ, বিদর্ভদেশ, চলিলা পশ্চিমে[২০]
লঙ্ঘি পথে ইন্দ্রজাদ্রি যার তট বনে[২১]
ভবানী ভবন ভায় মহাশক্তি পীঠে,
কতদিন অন্তে সবে মিলিলা প্রদোষে
তপতী তটিনীতটে অগ্নিদেবসনে;[২২]
তপতীর পূতস্রোতে তর্পণ করিয়া
বসিলে পাণ্ডবগণ, অগ্নিদেব তবে
কহিলা বারুণীদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশি,
"সন্ধ্যাভ্রে অরুণ এই বারুণী অম্বরে
সন্ধ্যাতারা চুম্বে যার নীলোজ্জ্বলশিখা
বলয়ে শহ্যাদ্রি এরে অচল সমাজে,[২৩]
মহা প্রভাবন্ত গিরি দক্ষিণা পথের
পশ্চিম প্রাচীররূপে রাজে মহীতলে,
মিশেছে দক্ষিণে ইহা সেতুবন্ধে গিয়া
এর দেহে বহি, তিনি মহা প্রবাহিনী
পূর্ব্বে গিয়া মিশিয়াছে পূর্ব্বপারাবারে,
জনস্থান দ্রুমরাজি ধাত্রিস্বরূপিনী[২৪]
সরিদ্বরা গোদাবরী, কৃষ্ণা-কৃষ্ণবেণী[২৫]
মলয় বলয়রূপা বিমলা কাবেরী[২৬]
চন্দনকানন যার চারু তীরভূমে
সমুজ্জ্বল কুম্ভযোনী মুনি প্রণয়িণী
সতীশিরোমণিধনী লোপামুদ্রারূপে,
এই গিরিপ্রান্ত বনে ল'য়েছিল হরি'
রক্ষো ভাগ্য-বনরাজি-দাবানল শিখা
সীতারে ত্রেতায়, ছলি রামে রামানুজে,
ত্রিদশবীর্য্য নিকষ নৈকষেয়বলী,
সুগ্রীব প্রমুখ পঞ্চবীর অধ্যাসিত,
এই গিরিপাদ গিরিশৈল ঋষ্যমুকে[২৭]
ফেলিলা আকুলে দেবী নিদর্শনতরে
তখন, আকাশগামী পুষ্পরথ হ'তে
তড়িল্লতা তারাপুঞ্জ গঞ্জিবাস ভূষা।
লোটেন এ গিরিপাদে নীল রত্নাকর[২৮]
যাব নিজ কার্য্যে আমি তাঁহার সদনে,
প্রভাতে বায়ব্যমুখে দ্বারাবতীপুরে
যাবে তুমি হেথা হ'তে; কালি হ'তে
আর তব সনে ভেট মম না হবে মরতে
দ্বাপরের শেষ আজি, এই নিশাযোগে
আসিবে সদলবলে কলি ভবধামে,
দেবমানবের ভেট নিষিদ্ধ কলিতে,
ইচ্ছা যদি, মোর সনে চল কুরুমণি
এই শৈলশৃঙ্গে বসি দেখিবে কৌতুকে
ভবে কলি অবতার মম দিব্যালোকে,
সত্ত্বগুণোজ্জ্বল একা তোমার লোচনে,
সহিবে সে দিব্যজ্যোতি চল ত্বরা করি'

ইতি তৃতীয় সর্গ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

[২০] নিষধ এবং বিদর্ভদেশ মধ্য ভারতবর্ষে অবস্থিত ছিল। বিদর্ভের আধুনিক নাম বেদর। [২১] ইন্দ্রজাদ্রি = অন্য নাম সাতপুরা পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের উপত্যকায় খণ্ডবা নামক স্থানে ভবাণী দেবীর মন্দির অবস্থিত। খণ্ডবা ভারতবর্ষের অন্যতর শক্তিপিঠ। [২২]তপতী এই নদী পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া আরব্য সাগরে পতীত হইয়াছে। [২৩]শহ্যাদ্রি = পশ্চিমঘাট পর্ব্বত গোদাবরী নদী। ইহা হইতে প্রবাহিতা। [২৪]জনস্থান = দণ্ডকারণ্যের অংশ বিশেষ। গোদাবরী জনস্থান মধ্যে প্রবাহিতা। [২৫]কৃষ্ণবেণী = স্বনাম প্রসিদ্ধ নদী, পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মহোদধিতে পতীত হইয়াছে, আধুনিক নাম কৃষ্ণা। [২৬]কাবেরী মলয়পর্ব্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা— অগস্ত্যাশ্রম এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। লোপামুদ্রা অগস্তপত্নী। মলয়পর্ব্বত চন্দনের জন্য প্রসিদ্ধ। অভস্ত্য কলসী হইতে জাত হইয়াছিলেন, এইরূপ পৌরাণিক কিম্বদন্তী আছে। [২৭]শহ্যাদ্রিরপাদ পর্ব্বত, পম্পা সরোবরের সন্নিহিত। সুগ্রীবাদি পঞ্চ মহাবীর বালির ভয়ে এই পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। [২৮]রত্নাকর = আরব্যসাগর।

গ্রন্থ সমালোচনা।

অমিয়গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। অমিয় বঙ্গের অমিয় ভাষায় অমিয় গাথার সম্ভব। অন্য দেশের কবি কবিতা লিখিতে গিয়া প্রধানতঃ প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাব ও ভাষায় তাহারই আভা ফুটিয়া উঠে। এ দেশের কবিরাও প্রতিভার সাধক ছিলেন। বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস সকলেই মনীষাসম্পন্ন কবি—জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে সকলেরই হৃদয় প্রদীপ্ত। যিনি কবি হইতেন, তিনি আবার তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি অথবা ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। তাঁহাদের ভাষা দেবভাষা ক্ষুদ্র মানবের আয়ত্বাধীন নহে। তাঁহাদের ভাব গভীর হইতেও গভীরতম—সামান্য মানবের বোধগম্য নহে। সে কবিতার আস্বাদ পাইতে হইলে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। সে উন্নত প্রদেশে অধিরোহণ [illegible]পেক্ষ। তাঁহাদের কবিতা প্রতিভারাজ্যে ফুটিয়াছে, নন্দনকাননের [illegible]ত কয়জনে দেখিতে বা বুঝিতে পায়? শুভক্ষণে এই বঙ্গভূমিতে অজয় নদের তীরে বসিয়া এক নূতন কবি প্রেম অশ্রুর মাহাত্ম্যে প্রতিভার রাজ্য হইতে কবিতাদেবীকে অবতারণ করিয়া স্বীয় হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। সেই দিন হইতে মানবের হৃদয় কবিতার পীঠস্থান হইল। নূতন কবি দেবভাষায় যে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহা অমিয় ভাষায় পরিণত হইল।

প্রেমের অশ্রুতে ভাষার কঠোরতা ক্ষালিত হইল, ভাবের সৌরভ দিগন্ত বহিল, আনন্দের উচ্ছ্বাস বঙ্গভূমিকে টলমল করিল। কবির হৃদয়ে নূতন অজয় বহিল। সকলেই আসিয়া দেখিল, প্রাণভরিয়া পিপাসা মিটাইল জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিল। নন্দনকাননের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া বৃন্দাবনের মাধুরী, সকলের নয়নপথে আসিয়া দাঁড়াইল—বঙ্গে অমৃতস্রোত বহিতে লাগিল। তপোবন কুঞ্জবন হইল, গঙ্গা যমুনায় মিশিল, শাল্মলী তমালে পরিণত হইয়া ফলফুলে শোভিত হইল। কোকিলের কূজনে কুঞ্জকুটির পরিপূরিত হইল, মলয়মারুত বহিয়া বহিয়া প্রাণ শীতল করিল, নদ নদী তড়াগে প্রেমের স্রোত খরতর বহিল। আলোক দেখিয়া আঁধার পলাইল, কোমলতার ক্রোড়ে কঠোরতা হাসিয়া উঠিল, ভীষণ যাহা ছিল তাহা মধুরতাহ্রদে নিমজ্জিত হইল। মরুপ্রান্তে ফুল ফুটিল, তপ্তবালুকায় চন্দনবৃষ্টি হইল, নিরাশার পশ্চাতে আশার ও আনন্দের মুরলি বাজিয়া উঠিল। সেই দৃশ্যে প্রমত্ত হইয়া, সেই সুরে স্বর মিলাইয়া কত কবি গাহিলেন, হৃদয়-ভাণ্ডারের কত সুধা বিলাইলেন। তাঁহাদের ভাব প্রেমময়, ভাষা অমৃতময়। তাঁহাদের কবিতা হৃদয়ের অনন্ত উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছে। প্রতিভার স্রোত যাহা পূর্ব্বে বহিত, তাহা সে প্লাবনে কোথায় লীন হইয়া গিয়াছে। ইহাই বঙ্গদেশের কবিতার বিশেষত্ব।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা তাঁহার অমিয়গাথায় এই বিশেষত্ব সমুজ্জ্বলভাবে দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভাব অমিয়, তাঁহার ভাষা অমিয়। তিনি বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় হৃদয়ের কবিতা সকলকে শুনাইয়াছেন। এই অমিয়গাথায় সৌন্দর্য্যের তিনটি কমনীয় ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়পটে যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাই সযত্নে তুলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বালোর হাসি, যৌবনের গাঢ়তা, পরিণত বয়সের প্রবীণতা—সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত কিরূপ হাসিতে হয়, প্রেমের সহিত কিরূপে মিশিতে হয় এবং সমাধিমন্দিরে কিরূপে ধ্যানধারণা শিখিতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি মানবজীবনের ত্রিবিধ রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন। কবিতার তিনটী স্রোত কোথায় কিভাবে বহিয়া যায়, তাহা দেখাইয়াছেন। সৌন্দর্য্যহ্রদে ফুলটি ফুটিল, দেখিতে দেখিতে চাঁদ আসিয়া তাহার হাসিতে হাসি মিশাইল, মধুকর আসিয়া তাহার মধু পান করিল—শেষে চাঁদ লুকাইল,

মধুকর উড়িয়া গেল, ফুল আর কোন্ প্রাণে একা রহিবে, তাই ভাবে বিভোর হইয়া সেই বিশাল হ্রদে ডুবিল। অমিয়গাথার কবি চাঁদের হাসি দেখিয়া শেষে কহিতেছেন—

হেরিয়া চাঁদের মধুর হাসি
শিশুরা নাচিছে মধুর তানে,
কবির হৃদয়ে স্বভাব সুখে
ঝলকে ঝলকে অমিয়া ঢালে।
হাস হাস চাঁদ এমনি ক'রে,
মধুর মধুর মধুর পারা,
মোর আঁখি জল যাউক ভেসে
তোমাতে হ'য়ে আপনা হারা।

কিন্তু এই প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের তৃষ্ণা হইতে ক্রমে প্রেমসৌন্দর্য্যের তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তখন প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া হৃদয়ে কি জানি কি ধারণ করিতে বাসনা হয়। হৃদয়ের দেবতা আসিয়া তখন উপনীত হয়েন, অমনি কত কি উচ্ছ্বাস বহিয়া যায়—

আমার দেবতা,—
কত স্নেহে ঢল ঢল,
তোরা কি জানিবি বল,
কি জানিবি কেন আমি এত আত্মহারা।
যত সে বদন চাই,
তত নূতনত্ব পাই,
দেখিতে দেখিতে আমি হ'য়ে যাই সারা।
ভাবি এ দুর্লভধন রাখিব গো কোথা।

আমার দেবতা,—
দেখেছি বসন্তকালে,
গোলাপ দুলিতে ডালে,
কতটুকু হাসি তাহে, কত মূল্য তার?
যা কিছু সুন্দর আছে
তাহাই—আসিয়া কাছে—

লুটিছে চরণতলে মোর দেবতার!
সাধে কি এ পরাণের এত উন্মত্ততা !!

আমার দেবতা,—
কবিত্ব কল্পনাখনি,
মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী,
তাঁর পদধূলে জাগে জীবনী আমার।
আমার দেবতা সব,
তিনি বিনা আমি শব,
আমার দেবতা তিনি প্রীতি প্রতিমার !!
তাঁরি ছায়ে ভুলিয়াছি নিজ নশ্বরতা!

আমার দেবতা,—
কোটী কোটী তপস্যার,
তুমি গো দেবতা যার,
কোন লাজে অন্যদেবে সে চাহিবে আর।
মা বাপ যে দেব-করে,
অরপিলা সমাদরে,
সাধিতে সাধনা তাঁরি বাসনা আমার।
আমি চাই—ও চরণে পেতে তন্ময়তা।

কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অনুধ্যান করিতে করিতে প্রেম-সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া প্রাণের দেবতাকে পাইলেন। এতদিন সৌন্দর্য্য বহির্জগতে বিন্যস্ত ছিল, এখন অন্তর্জগতে তাহার বিকাশ হইল। ক্রমে চিন্ময়-সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। ইহাই সৌন্দর্য্যের শেষ পরণতি। এই অবস্থায় ভিতর ও বাহিরের একাকার হইয়া যায়। তখন হৃদিবৃন্দাবনে প্রেমকদম্বতলে শ্যামের বাঁশরী বাজিয়া উঠে। কবি তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না, তিনি উন্মাদিনী—পাগলিনী রাই হইয়া মনের আবেগে কত কি কহিতেছেন—

আমি পাগলিনী রাই,
তব ভালবাসা, নাহি করি আশ',
কেবল দেখিতে চাই।

বসায়ে হৃদয়ে, পূজিব প্রণয়ে,
অন্য কোন সাধ নাই।
আমি পাগলিনী রাই,
ভরি প্রাণ মন, পিরীতি বীজন,
সতত করিতে চাই।
এই আশা মোর, পূর মনচোর,
অন্য কোন সাধ নাই।

প্রেমরাজ্যে পাগলিনী রাই অপেক্ষা মধুর দৃশ্য আর কি আছে। কবি অমিয়ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম সার্থক হইয়াছে। অমিয়গাথার অমিয় দেখাইবার বা বুঝাইবার জিনিস নহে, নিজে পান না করিলে ইহার মাধুর্য্যের অনুভূতি হইবার নহে। ইহার প্রতি স্তরে স্তরে কবিত্ব অভিষিঞ্চিত, ভাবের লীলাতরঙ্গ সম্প্রসারিত এবং সৌন্দর্য্যের শোভা সমাকীর্ণ। ইহাতে পূর্ব্বরাগ, মিলন, ও বিরহ এই তিন ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখান হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব কবিদের কবিত্বে আত্মহারা হইয়া যান, তাঁহারা সমাদরে এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা প্রেম-সরোবরে কবিত্বের ফুল দেখিতে চান, হৃদয়বৃন্দাবনে প্রেমবাঁশরী শুনিয়া প্রেমের দেবতার উদ্দেশে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া থাকেন, তাঁহারা এই কবিত্বের মাধুর্য্য অনুধাবন করিতে পারিবেন। যাঁহারা পাগলিনী রাইর প্রেমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, সরলতার সৌরভে আমোদিত হইয়া উল্লাস-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে হৃদয়ের নিভৃতপ্রদেশ হইতে শ্যামের বাঁশরী শুনিতে পান, তাঁহারা এই অমিয়গাথার অমিয় আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন এবং এই প্রেমিকা কবির উন্নত হৃদয়ের উন্নত কবিত্বের শত শত প্রশংসা করিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

পূর্ণিমার নিয়মাবলী।

১। পূর্ণিমার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। এক সংখ্যার মূল্য ।৹ চারি আনা। সুলভ সংস্করণ ১৷৷৹ টাকা। এক সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পূর্ণিমা পাঠান হয় না।

২। পূর্ণিমা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। যদি কেহ কোনও মাসে কাগজ না পান, পর মাসে ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে, তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। গ্রাহকগণ পত্রের উত্তর পাইবার ইচ্ছা করিলে টিকিট পাঠাইবেন; নতুবা উত্তর পাইবেন না। বেয়ারিং বা ইন্‌সফিস্যেণ্ট পত্র গ্রহণ করা হয় না।

৪। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন। কাগজের মোড়কে যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক-নম্বর।

৫। পূর্ণিমায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি, বিনিময়ের সংবাদ পত্রাদি ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিলি করিবার অনিয়ম ঘটিলে বা পূর্ণিমা সংক্রান্ত অন্য কোনও বিষয়ে জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিতে হয়।

৭। পূর্ণিমায় বিজ্ঞাপন দিবার হার কভারে প্রতি পৃষ্ঠা বার্ষিক ৩০৲ কভার ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা বার্ষিক ১৮৲ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলে এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিশেষ সুবিধা।

সন ১৩০৩।৪।৫।৬।৭।৮ সালের পূর্ণিমা কয়েক খণ্ড মাত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। একত্রে ছয় বর্ষের পূর্ণিমা লইলে, কেবল মাত্র ছয় টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবে। ডাকমাশুল সতন্ত্র লাগিবে। সন ১৩০০।০১।০২ সালের পূর্ণিমা সমুদায় নিঃশেষ হইয়াছে।

পূর্ণিমা কার্য্যালয়,
বাঁশবেড়িয়া।

পূর্ণিমা কার্য্যাধ্যক্ষ,
বাঁশবেড়িয়া।

কথা।

অভিষেক কথা। ২৬শে জুন ভারত সম্রাটের মুকুট ধারণ ও রাজ্যাভিষেক হইবে ঘোষণা হইয়াছিল। কিন্তু অভিষেক হয় নাই। একদিন পূর্ব্বে বাড়িতবার্ত্তা ভারতে সংবাদ আনিল যে সম্রাটের অন্ত্রদেশে বিস্ফোটক হইয়াছে; ফোড়া অস্ত্র করিতে হইবে সুতরাং অভিষেক-কার্য্য স্থগিত হইবে। এই সংবাদ শুনিয়া পৃথিবীর লোক একেবারে স্তব্ধ, অবাক্ ও হতাশ। ইংলণ্ডের লোক ত ভয়ে আশঙ্কায় মনোভঙ্গে একেবারে উন্মত্ত। ভারতের লোক বলিতে লাগিল, এ যে আবার রামের রাজ্যাভিষেক, কোথা রাজা হইবেন কোথা বনে গমন। এমনই হইয়া থাকে।

এই দেখ বরকন্যা নববিবাহিত
কার্ত্তিক পুরুষ আর সোণার প্রতিমা
বিনামেঘে বজ্রাঘাত বাসরে বিধবা
রাত্রিশেষে বিসূচিকা কালকবলিত।

যাহাহৌক জয় বিজ্ঞানের জয়! জয় অস্ত্রচিকিৎসার জয়! ছয় জন বড় ডাক্তার ক্লোরোফরম সাহায্যে সম্রাটকে অজ্ঞান করিয়া ফোড়া কাটিয়াছেন। রাজা হু হু করিয়া সারিয়া উঠিতেছেন। আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই সকলেই বলিতেছেন।

যখন অভিষেক বন্দ হইল, তখন সম্রাট বুঝিতে পারিলেন যে ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর হইল। লোকের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না। সহৃদয় সম্রাট বলিলেন যে ইংলণ্ডে কাঙ্গালীভোজন যেন বন্দ না হয়। যথাসময়ে কাঙ্গালীভোজন হইয়া গিয়াছে। সকলে দুহাত তুলিয়া সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ভারতেও কাঙ্গালীভোজন বন্দ হয় নাই। আফিষ আদির ছুটীও বন্দ হয় নাই। সম্রাট একটু সারিয়া উঠিলে ইংলণ্ডের লোক পাহাড়ের মাথায় বড় বড় অগ্নিকাণ্ড করিয়া ও আজুভুজু করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। বেলফোর এই অগ্নিক্রীড়ার অধ্যক্ষ ছিলেন। অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তিনিই বড় মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। চেম্বারল্যানের হাতে ভুমাথাই সার হল—বুরযুদ্ধ শেষ ত হল। কিন্তু বড় সাধের মহামন্ত্রীত্ব ত মিল না। অদৃষ্টের ফের। তিনি গাহিতেছেন—

"আশার আশা ভবে আসা আসামাত্র হল।
চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রইল॥"

ঈশ্বর কৃপায় এখন সম্রাট আরোগ্য হইয়াছেন। আগষ্ট মাসের [illegible] অভিষেক কার্য্য হইয়া গিয়াছে। ভারতেও আগামী ১লা জানুয়ারি অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হইবে। রাজপুত্র সস্ত্রীক আসিয়া শুভ কার্য্যে যোগদান করিবেন।

ইংলণ্ডে যে সকল রাজা ভারত হইতে গিয়াছেন, তাঁহারা অভিষেক দেখিয়া ফিরিবেন না। জয়পুরের মহারাজা অনেক দানধ্যান করিতেছেন কিং হাঁসপাতালে প্রায় ৭৫০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। জয়পুর মহারাজার খুব সুখ্যাতি হইয়াছে। সেদিন একটা ভোজে তাঁহার নিম্ন হইয়াছিল। আহারাদির পর জয়পুর মহারাজ সভায় যোগদান করেন। করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়, জয়পুর তাহা দেখাইলেন। সেদিন এরো ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলেন। অপর রাজাদের সেখানে আহারের কষ্ট হয় নাই কিন্তু জয়পুরের জলযোগের জন্য একটু স্পর্শ রহিত স্থান খুঁজি পাওয়া যায় নাই। বলাই বাহুল্য জলযোগের সামগ্রী ব্রাহ্মণে সঙ্গে ছিল। ইংলণ্ডের লোক জয়পুর মহারাজের গাভীগুলি দেখিয়া ও তাহা যত্ন ও আদর ও পূজা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। যখন তাঁহার [illegible] আরতি হয় শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে থাকে, তখন ইংলণ্ডের লোকে অবাক্ দূর হইতে দেখে। যাহাহৌক ইংলণ্ডের লোক জয়পুর মহারাজকে বড় বাসিয়াছেন। দুই একজন লোক এই সুযোগে দুপয়সা রোজগারের উপায় করিতেছেন। জয়পুর মুক্তহস্ত কি না? আমরা বিলাত যাবার পক্ষপাতী নহি।

খরচের কথা। সে যাহাহৌক একটা কথা শুনিয়া পাঠক মহাশয় হয় দুঃখিত হইবেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া নিজের খরচ করিয়া খায়—ইহা কখনও শুনিয়াছেন কি? কিন্তু তাই হইতেছে ভারতের যত লোক ইংলণ্ডে অভিষেক উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের খরচা দিতে হইবে ভারতবর্ষকে। অপরাপর উপনিবেশ হইতে যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের খরচ দিবেন ইংলণ্ড, কিন্তু ভারতবর্ষের অপর ব্যবস্থা। "দুয়োর কড়ি হাটে যায় তুলো কাবাস মাগ্‌গি হয়।"

অভিষেক—করিয়াছেন নিমন্ত্রণ—কিন্তু খরচ দিতে হইবে ভারতকে অর্থাৎ প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে। এ সম্বন্ধ ইংরেজী সম্পাদকগণও লণ্ডকে নিন্দা করিতেছেন। ইংলিসম্যান এংলো ইণ্ডিয়ানদলের মুখপত্র বলিতেছেন, তাঁহার নিজের কথায় শ্রবণ করা উচিৎ—

We heartily endorse the spirited protest of the *Pioneer* against the almost insane meanness which characterises the British attitude towards India on every occasion which can possibly he made to lend itself to petty exaction. The latest instance is thoroughly typical. The Colonial representatives now in England on account of the Coronation are being entertained at the expense of the British nation. The Indian representatives present for a precisely similar reason, are being entertained at their own, or, at least, at India's expense. The historic function at the India Office, too, * * means an expenditure of a large sum of money, all of which will come from the pocket of the Indian taxpayer. This was remarked upon at the time by a native contemporary and the same idea has now occurred to the *Pioneer*. "When, asks our contemporary; will the Treasury see that these petty economies at the expense of India do much harm politically". * * The inwardness of the protest will be very much missed if it is assumed to be merely a formal expression of chronic discontent. It reveals a genuine sense of shock and disappointment. * * One contemporary has spoken of the political harm which this ill-timed shabbiness will produce and we are obliged to admit that the effect will probably be injurious out of all proportion to the cause. It marks the climax of an ascending series

of meanesses. * * Why are their economies so often effected at the expense of India? It is a question which is difficult to answer when propounded at the centres of native thought; and as a rule, the European, who ought to be spokesman for British rule in all its aspects is too much disgusted to be ready with any convincing reply.

বড়লোকের কথা বড়লোক বলিতেছেন, আপনাদের কথা আপনারা বলিতেছেন, দেখিতে শুনিতে বেশ, লোকত ধর্ম্মত ভাল। আমরা ত উঁ থাকড়া।

দৈবজ্ঞের কথা। অভিষেক কথার সঙ্গে আর একটা ছোট কথা আছে সেটা দৈবজ্ঞের কথা। মান্দ্রাজ প্রদেশের ডিনডিগাল নামক স্থানে একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত আছেন। ফলিত জ্যোতিষে তাঁহার খুব অধিকার। এক বৎসর আগে জুন মাসের ২৮শে তারিখে তিনি গণনা করিয়া বলিয়া ছিলেন যে ১৯০২ সালের জুন মাসে ২১শে হইতে ২৮শের মধ্যে সম্রাটের কঠি পীড়া হইবে এবং তদুপলক্ষে অভিষেক কার্য্য বন্ধ হইবে। এই সংবা "মান্দ্রাজ মেল" নামক সংবাদ পত্রে প্রথমে প্রকাশিত হয় তারপর ষ্টেট্‌স্‌ম্যা পত্রে প্রকাশিত হয়। এক বৎসর পরে দৈবজ্ঞের গণনা ঠিক হওয়া দেখি সাহেবলোকে অবাক্ হইয়াছেন সুতরাং ইংরেজীনবিশ ও অহিন্দুগণও চম কিত হইয়াছেন। দৈবজ্ঞ কে? তিনি কোথা, একটা হুলস্থুল খোঁজ পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম কাণ্ডস্বামী পিলাই, তিনি থাকেন ডিনডিগাল সহরে। এই দৈবজ্ঞ আরও কতকগুলি গণনা করিয়াছেন। তাঁহার সব কথা এখন বলিয়া কাজ নাই। একটা এই যে আগামী ১৪।১৫ই ভাদ্র (২৯।৩০ আগষ্ট) ভারতে ভূমিকম্প হইবে। বাকি কথা এখন বলিলাম না, যদি ঠিক হয় ত বলিব। লোকে এখন বোধ হয় ভারতের ফলিত জ্যোতিষকে ঘৃণা করিবেন না। কাণ্ড স্বামীর মতে সম্রাট ১৫ বৎসর রাজত্ব করিবেন।

বিবেকানন্দের কথা। দৈবজ্ঞের কথা উঠায় আর একটা কথা মনে পড়িল। আমরা কোন সাধুর মুখে এক বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে বিবেকানন্দ স্বামীর দিন নিকট। তখন বুঝিতে পারি নাই যে এত শীঘ্র তিনি

লোকান্তর গমন করিবেন। ১৯শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার বেলুড়ের মঠে রাত্রি এগারটার সময় স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন, হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের নর্ত্তন বন্দ হইয়া যায়। শুনিলাম তিনি ব্রাইট্‌স্ ডিসীজ নামক ব্যাধিতে অনেকদিন ভুগিতেছিলেন। এই ব্যাধির লক্ষণ এই যে প্রস্রাবের দ্বার দিয়া শরীরের আলবুমেন পদার্থ বাহির হইয়া যায়। যাহাহৌক ভরষা করি তাঁহার গুরুদেবের ইচ্ছায়ই এই কার্য্য হইয়াছে।

সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসীর পূর্ব্বজীবনের কথা তুলিতে নাই—পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিতেন, "পেছনদিকে চাস্ না—পেছনে গু পড়ে"। বড় সত্য কথা। ভবিষ্যতের দিকেই দৃষ্টি করা উচিৎ। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি ছিলেন। বালক নরেন প্রথমে মেট্রোপলিটানে পাঠ করেন। পরে বি, এ, পর্য্যন্ত পাস করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন এবং ক্রমে সমাজের গীতগুলি তিনি গাহিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই পরমহংস তাঁহাকে কৃপা করেন। তিনি চিকাগো সহরে ধর্ম্মপার্লমেণ্টে হিন্দুর ধর্ম্ম কি জগতের লোককে বুঝাইয়া দেন। আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া তিনি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, শুনিলাম সে সমস্ত মঠে দান করিয়াছেন। আমেরিকায় অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন। দুই জন আমেরিকার বিদুষী কন্যা তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন, একজনের নাম স্বামী অভয়ানন্দ, অপরের নাম সিষ্টার নিবেদিতা। তাঁহারা এখন এদেশে। অভয়ানন্দ গৌরাঙ্গসমাজের হইয়াছেন, বিবেকানন্দ জনাথনকে বশ করিয়াছিলেন কিন্তু জন বুল্‌কে বশ করিতে পারেন নাই।

ভূতের কথা। আমাদের দেশে এখন অনেকে ভূত মানে না, দেবযোনী মানে না। কিন্তু বিলাতের বা য়ুরোপ আমেরিকার কথা হইলে তাঁহাদের বিশ্বাস করিতে আপত্তি হয় না। একটা গল্প শুনুন। ফরাশিদের রাজধানী পারি নগরের নিকট লেসাকে একটি অনাথ আশ্রম আছে, নাম অরফানেজ অব্ গ্রীজ। একটি নন্ নাম সিষ্টার সেণ্ট ফ্লুরে ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন। বার বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন ভগ্নী পড়িয়া যান ও হাত পা ছুড়িতে থাকেন,

ঠিক যেন হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। পরে ভগ্নী স্বয়ং বলেন যে আমার দেহে শয়তান প্রবেশ করিয়াছে। যখন দেহে শয়তানের আবেশ হয় তখন ভগ্নী বলেন যে সে আমাকে দংশন করিতেছে ও গাত্রদগ্ধ করিয়া দিতেছে। পরে দেহে সত্যসত্যই দংশনের ও দগ্ধের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যীশুর ছবি কি বাইবেল, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক তাহার নিকটে আনিবার যো নাই। লুকাইয়া আনিলেও ভগ্নী বুঝিতে পারে ও বলিয়া দেয় অমুকের কাপড়ে বাইবেল লুকান আছে, সে যেন কাছে আসে না। ভগ্নী আবেশের সময় লোকের মনের কথা বলিয়া দেয়। ভগ্নী নিরক্ষর এবং চলিত মাতৃভাষা ছাড়া কোন ভাষা জানেন না কিন্তু দেখা গিয়াছে ভগ্নী বিদেশীকে বিদেশীর ভাষায় জবাব দিতেছেন। ভগ্নী এইরূপে গ্রীক্, ইতালীয়, জার্ম্মাণ, ইংরেজী, রুষীয় ভাষায় অবলীলাক্রমে কথা কহিয়া থাকেন। বড় বড় ডাক্তার কত ঔষধ প্রক্ষেপ করিয়াছেন, কিছুতেই কিছু হয় নাই। এখন ভগ্নী সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে ভূতগ্রস্থা বলিয়াই পরিচিতা। নৈহাটীর গঙ্গা ময়রার ছেলেদের ডাকিলে এতদিন কোন্ কালে ভূত ছাড়াইয়া দিত।

কথার কথা। অনেক বাঙ্গালী জাপানে গিয়াছেন—কেহ বিদ্যা শিখিতে, কেহ ব্যবসা বাণিজ্য শিখিতে; কেহ চীনামাটী ও মীনার কাজ শিখিতে। জাপান এখন বাহুবলে প্রায় ইংলণ্ডের সমকক্ষ। জাপানে যুদ্ধ ও নৌযুদ্ধ শিখিবার জন্য কালেজ আছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি সাহস বীরত্ব ধৈর্য্য, ক্লেশ সহিষ্ণুতা সকল গুণই আছে। বাঙ্গালী জাপানে গিয়া কেন যুদ্ধ-বিদ্যা শিখেন না? জাপানে না হইলে ফরাশি দেশে গিয়াও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা হইতে পারে। ব্রেজিলে ত বাঙ্গালি সেনাপতি সুরেশ বিশ্বাস রহিয়াছেন।

বিলাতে ভারতসৈন্যের কথা। বঙ্গবাসীকে জাপানে গিয়া যুদ্ধ শিখিবার কথা বলার একটু তাৎপর্য্য আছে। ফরাশিশ চিরকাল ইংরেজের শত্রু। শত্রুর বাড়ীতে আমাদের বাড়ীর ছেলেটা যদি সর্ব্বদা যায় তবে মনটা কেমন কেমন করে—আবার সে যদি শত্রুর একটু ন্যাওটো হইয়া পড়ে তবে প্রাণ নিতান্তই খারাপ হয়। বন্ধুর বাড়ী আনাগোনা করিলে আবার সেই পরিমাণে প্রাণটা পুলকিত হয়। জাপান এখন ইংরেজের বন্ধু ইংলণ্ড বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন, জাপানীরা কি ধাতুর লোক। সমানে সমানে

দাঁড়াইয়াছে—আর অমনি রাজদ্বারে শ্মশানে উভয় উভয়কে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। য়ুরোপীয় যত সন্ধি আমাদের মনে হয়—ভানু হনুর মিলন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উভয়ের উভয়কে দরকার। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালী জাপানে গিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিলে, ইংরেজ রাগ করিবেন না—করিতে পারিবেন না। মনে হয়, মনে কিছু হইলেও মুখে ফুটিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী যদি জাপানে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া কৃতীত্ব দেখাইতে পারে—তবে ইংরেজ যদি তাঁহার সমাদর না করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে জাপান-রাজ-সরকারে চাকরী কিম্বা অপরাপর দেশের রাজার অধীনে চাকরী করিতে পারেন। আমাদের মনে হয়, অন্যায় করিয়া একটা কলঙ্ক বাঙ্গালীর শিরে চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। বাঙ্গালী স্বভাবত বীর। বাঙ্গালীর বাগ্‌দী কি দুর্ব্বল? সম্মুখযুদ্ধে লাঠিখেলায় মাথা ফাটাইয়া আসে না? উগ্রক্ষেত্রী, গোট গোয়ালা, ডোম, হাড়ী, চণ্ডাল, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, ছত্রি ইহারা সকলেই যুদ্ধপটু। বিষ্ণুপুরের রাজার ঢালী সৈন্যেরা যাহারা ক্লাইবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, শুনিয়াছি অধিকাংশ বাগ্‌দী ও গোট গোয়ালা। ভারতচন্দ্র, যশোর নগর ধাম—প্রতাপ আদিত্য নাম—মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থের—বায়ান্ন হাজার ঢালীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা ত সব বাঙ্গালী। প্রতাপ আদিত্যের সেনাপতিরাও ত বাঙ্গালী ছিলেন। এখনও অনেক বাঙ্গালীর সামরিক উপাধি আছে, বারুদকর, তোপদার, লস্কর, বাঘ, রায় এ সব সামরিক উপাধি নয় ত কি? আর বাঙ্গালী যুদ্ধ শিখিলে ইংরেজই বা আদর করিবেন না কেন? ইংরেজ কি শিখ, গুর্খা, পুরুবিয়া সিপাহীর, রাজপুতের সমাদর করেন না। অভিষেক উপলক্ষে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বিলাত গিয়াছে, তাহারা হাম্পটন কোর্টে রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য দলে দলে ইংলণ্ডের নরনারী ছুটিতেছে। দেখিয়া তাহাদের যুথেষ্ট ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ইংরেজ কি ইঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন না? যেদিকে ব্রাহ্মণ সিপাহীর খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেদিকে ম্লেচ্ছের ছায়াটি পর্য্যন্ত না পড়ে তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু একটা বড় বিপদ হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যগণের ও ভারতবর্ষীয় নিমন্ত্রিতগণের গম্ভীর মুখ ও সরু পা দেখিয়া বিলাতের লোক বড় আশ্চর্য্য হইয়াছে। ভাবিতেছেন—সকলে, বিশেষত সম্পাদকেরা—কেন এমন হয়, এত বড় দেহটা এমন

সরু দু-টা পায়ের উপর কি করিয়া থাকে। সে যাহাহৌক সৈন্যগণের আকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া কোন কোন সংবাদ পত্র সম্পাদক বলিতেছেন যে এ সকল সৈন্যকে বিলাতে আনিয়া ভাল কাজ হয় নাই। ইহাদের যখন এত বড় বড় দেহ, তখন লণ্ডনের লোকের ক্ষুদ্র কায়া দেখিয়া ইহারা ঘৃণা করিবে, হয় ত মনে করিবে "এ্যাঁ এখনই প্রহারেণ ধনঞ্জয় করিতে পারি, ইহারা আমাদিগকে অধীনে রাখিয়াছে!" "হস্পিটাল" নামক কাগজ বলিতেছেন—

Few things are more calculated than stature and bearing to inspire the imagination with a sense of superiority and of power to reconcile the many nationalities under our Government to the Sway which our people have come to exercise over them. Few things are more calculated to render that sway irksome and even humiliating than the presence in our streets of crowds of people, any one of whom the average Indian or Colonial soldier could break across his knee or with whom, in the graphic language of the Western America, it would be easy for him to wipe up the floor."

পীরিতির কথা। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, পীরিতি আঁখর তিন। লোকে বুঝিতে পারে না, পীরিতি কি করিয়া আঁখর তিন? এতদিনে কিন্তু বুঝা গেল যে সত্যসত্যই পীরিতি আঁখর তিন ব্যা-সি-লি। দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফরাশিশ ডাক্তার স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া বহু বর্ষের পর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পীরিতি love— আর কিছুই নহে, পোকা-ব্যাসিলি। দেহে এই ব্যাসিলি জন্মাইলে লোকে প্রণয়ে পড়ে, আত্মহারা হয়, খুনখারাপী করে। তাই দেখিয়া লেখকেরা উপন্যাস বা নবন্যাস লেখেন আর কবিরা প্রণয়-গীতা রচনা করেন। কেহ বা নিজের কথা নিজে বলেন—

হেন স্নিগ্ধ তপোবন ভিতরে আমার,
ঘুচিল না এ জনমে ইন্দ্রিয় বিকার।

শকুন্তলা নাই নতুবা পোষ্ট মর্টেম করিয়া দেখিলে হইত। এখন হইতে

৪৯৭।৪৯৮ ধারা (পীঃ কোড) অপরাধীগণের পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না? এখন হয় ত উক্ত ধারার আসামীরা জবাবে বলিবেন আমি নির্দ্দোষা প্রণয় ব্যাসিলি উৎপাতে কি করিয়াছি জানি না। বিংশ শতাব্দীর জয়দেব গাহিবেন প্রণয় ব্যাসিলি জ্বরে ধৃতবানসি শিরং জয় জগদীশ হরে।

প্রবলা অবলার কথা। প্রণয় ব্যাসিলি শুনিয়াছি রমণীদেহ অধিক মাত্রায় আক্রান্ত করে। সুশিক্ষিতা রমণীরা গোঁয়ার গোবিন্দের প্রেমেই বেশী পড়িয়া থাকেন। বৃন্দাবনেও গোবিন্দ অঘাসুর বকাসুর তৃণাবর্ত্ত, পুতনা প্রভৃতি মারিয়াছিলেন, হাতে গিরি ধরিয়াছিলেন—এত বড় গোঁয়ার। তাই শ্রীমতী রাধারাণী উক্ত গোঁয়ার গোবিন্দের হাতে আপনার কোমল প্রাণটুকু অর্পণ করিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। সে যাহাহৌক ইহাদের গতি কিরূপ হইবে বা হইয়াছে, পাঠিকা বলিতে পারেন। ৯ই জুন আজব সহর লণ্ডনে ক্রাইটিরিয়ণ হোটেলে বিদুষীদের একটি ভোজ হইয়াছিল। বছর বছর একদিন এইরূপই ভোজ হয় ও পরেও হইবে। বীবী ক্লিফোর্ড সভা পত্নীর(?) আসন গ্রহণ করেন। বীবী স্মিথ, টুইডী, উইণ্টার, হে, ল্যাং, লিউইস, ক্লারেণ্ডন, আণ্ডার্সন, ইত্যাদি ইত্যাদি ত ছিলেনই আরও ছিলেন, একজন চীন রমণী ও একজন পার্শী রমণী। পুরুষদিগের প্রবেশ নিষেধ। একেবারে (কেবল বাবুর্চ্চি ও চাকর ছাড়া)। বক্তৃতা হইয়াছিল, টোষ্ট পান ত হইয়াছিল। ছিপি খোলার শব্দে নাকি ঘর দম দম করিয়াছিল। সিগারেটধূমে ঘর নাকি অন্ধকার হইয়াছিল। উপরে যাহাদের নাম হইল তাহারা বড় বড় লেখিকা। আমাদের দেশে যখন ঐরূপ সখী-সমিতি হইবে তখন ভরসা করি হিন্দুরঞ্জিকার জন্য গঞ্জিকার সুবন্দোবস্ত হইবে। তাহাতে মহাদেব সন্তুষ্ট থাকিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই সকল স্নায়ু চলিতভাষায় বলিতে গেলে যেন যুগ বাঁধিয়াছে, তাই যুগ্ম যুগ্ম বা জোড়া জোড়া বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এক্ষণে মস্তিষ্কের স্নায়ু যুগ্মের হিসাব লউন—

১ম যুগ্ম স্নায়ু		ঘ্রাণ স্নায়ু (অলফ্যাক্টরী)।
২য় যুগ্ম		নয়ন স্নায়ু (অপটিক)।
৩য় যুগ্ম		নয়ন স্পন্দক (মোটর অকিউলি)।
৪র্থ যুগ্ম		নেত্র সঞ্চালক (প্যাথেটিকস্)।
৫ম ক যুগ্মাংশ		বদন ও রাসন (ট্রাজেমিনস ট্রাইফেসিয়াল)।
৫ম খ যুগ্মাংশ		নয়ন পেশীযুক্ত (এবডুসিডিস)।
৬ষ্ঠ	”	স্নায়ু।
৭ম	”	বদন সম্বন্ধীয় (ফেসিয়াল)।
৮ম	”	শ্রবণ স্নায়ু (অডিটারী)।
৯ম	”	জিহ্বামূল (গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল)।
১০ম	”	ভ্রমণশীল (নিউমোগাস্ট্রিক)।
১১শ	”	পৃষ্ঠবংশীয় (স্পাইনাল একসিসারি)।
১২শ	”	রসনাসঞ্চালক (হাইপোগ্লসাল)।

মস্তক গহ্বরে স্নায়ুসংস্থান বুঝিতে পারিলেন কিন্তু এই সকল যুগ্ম স্নায়ু আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে (ক) বিশেষ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় সংজ্ঞাবাহী অর্থাৎ ঘ্রাণ, নয়ন, শ্রবণ ইত্যাদি; অর্থাৎ উপরের তালিকার ১ম, ২য়, ৫ম ক, ৮ম, ৯ম, ইহারা। ইং নার্ভ অব্ স্পেশিয়ালসেন্স। (খ) সঞ্চালক বা গতিদায়ক (ইং মোটর ক্রেনিয়াল নার্ভ); ইহার মধ্যে পড়িবে, উপরের তালিকার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১২শ। (গ) মিশ্র (ইং মিক্‌ডনার্ভ) অর্থাৎ প্রথম দুই বিভাগের ক ও খ'র মিশ্রণে উৎপন্ন অর্থাৎ সংজ্ঞাবাহীও বটে, গতিদায়কও বটে। ইহার মধ্যে পড়িবে অবশিষ্টগুলি অর্থাৎ ১০ম, ১১শ। কাহারও কাহারও মতে ৯মটি মিশ্র স্নায়ু।

এই গেল মাস্তিষ্ক স্নায়ুর বিবরণ। এইবার পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু যুগ্মের বিবরণ। ইহার সংখ্যা ৩১ যুগ্ম।

৮টি	গলদেশীয় যুগ্ম (সার্ভিকেল)।
১২টি	পৃষ্ঠ দেশীয় (ডর্সাল)।
৫টি	কটিদেশীয় (লম্বার)।
৫টি	বস্তিদেশীয় (শেক্রোল)।
১টি	ত্রিকাস্থি দেশীয় (ককসিজিয়াল)।

এই সকল স্নায়ুযুগ্মের প্রত্যেকের উৎপত্তি স্থান দুইটি করিয়া। ইহাকে মূল (root) কহে, একটি সম্মুখে, অপরটি পশ্চাৎ হইতে প্রথমটি গতিদায়ক, দ্বিতীয়টি সমবেদক।

উৎপত্তি স্থান অনুসারে স্নায়ুর যে দুই বিভাগ তাহার একটির নাম সমবেদক, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মস্তকের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ককসিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৃষ্ঠবংশের দুই পার্শ্বে অবস্থিত শিকলের ন্যায় গ্রন্থিময় দুইটি স্নায়ুরজ্জু আছে, ইহারাই সমবেদক স্নায়ু সংস্থান। গলদেশে প্রত্যেক রজ্জুর তিনটি করিয়া গ্রন্থি আছে, আর এই দুইটি নিম্নদিকে গিয়া ত্রিকাস্থির সম্মুখে দুইটিতে মিলিত হইয়া একটি গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে। (ইং গ্যাংলিয়ন ইস্পার বা ককসিজিয়াল)। সমবেদক স্নায়ুরজ্জুর প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে অনেকগুলি করিয়া শাখা বাহির হইয়াছে। ইহাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুইটি নাম, বাহ্যিক শাখা কশেরুকা মজ্জার স্নায়ুতে মিলিত হয়। বাহ্যিক আবার দুই প্রকারের। কতক স্নায়ু কশেরুকা-মজ্জা হইতে সমবেদকে মিলিত হইয়াছে আর কতক সমবেদক স্নায়ুর গ্রন্থি হইতে কশেরুকা মজ্জায় গিয়া মিলিত হইয়াছে। আভ্যন্তরিক শাখাগুলি সমস্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি ও রক্তবাহিনী নাড়ীগুলি ব্যাপিয়া আছে। স্নায়ুর কথা এত করিয়া খুলিয়া বলিবার কারণ পাঠক মহাশয় এইবার বুঝিতে পারিবেন। আমরা বর্ত্তমান বিজ্ঞান মতে ষট্ চক্রের প্রতি চক্রের সংস্থান নির্ণয় করিতে যাইতেছি। আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি ব্যাপিয়া যে সকল শাখা আছে তাহারা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা স্নায়ুবিধানের শাখা সকলে মিলিত হইয়া শরীরের স্থানে স্থানে স্নায়ুজাল সৃষ্টি করে। এই স্নায়ুজালের ইং নাম প্লেক্সস্ (Plexus)। হৃদয়ে হৃৎপিণ্ডের নিকটে একটি উদরে নাভিমূলে একটি এবং কটিদেশে বস্তি বা পেলভিস গহ্বরে একটি ঐরূপ চক্রাকার জাল আছে। এই যে চক্রাকার জাল, ইহাই ষট্ চক্রের এক একটি চক্র। আমরা জানি একবার একজন ধার্ম্মিক

মুসলমান ডাক্তার ক্যাম্বেল মেডিকুল স্কুলে একজন যোগীর সাহায্যে মনুষ্য দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া অনুবীক্ষণ সাহায্যে এই জাল দেখিয়াছিলেন। ষট্ চক্রের নাম হইতেছে মূলাধার, স্বাধিষ্টান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার। মূলাধার পূর্ব্বকথিত গেংলিয়ন ইম্পার; ত্রিকাস্থির সম্মুখে পৃষ্ঠবংশের দুই পাশের দুইটি গ্রন্থিবিশিষ্ট স্নায়ুরজ্জুর একত্রে মিলনে যে গ্রন্থি বা জাল হইয়াছে তাহাই; ইহার ঠিক স্থান গুহ্যদেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যে আর মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তের নিম্নদেশে। ইহা কি ইড়া পিঙ্গলার মিলন নহে? কেহ কেহ মূলাধারকেই পেলভিক প্লেক্সস বলিয়াছেন। স্বাধিষ্ঠানের নাম হাইপোগ্যাষ্টিক প্লেক্সস। যাঁহারা মূলাধারকে গ্যাংলিয়ন ইম্পার বলেন, তাঁহারা স্বাধিষ্ঠানকেই হাইপোগ্যাষ্ট্রীক বা পেলভিক চক্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে মণিপূরক ইং নাম সোলার বা এপিগ্যাসট্রিক প্লেকসস, অনাহত হইতেছে, কার্ডিয়াক প্লেকসস্। এই কয়টিরই সংস্থান স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, বাকিগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।* বিশুদ্ধাখ্য চক্র কোনটী কাহারও মতে স্ফিনোপেলেটাইন বা গ্যাসেরিয়াণ বা অটিক গ্রন্থি। কাহারও মতে আজ্ঞাচক্র অলফ্যাক্‌টরি বল্‌ব।† সহস্রার পদ্ম চেনা যায় নাই।

স্নায়ুতে যে ধূসর বর্ণ পদার্থ আছে তাহারই বলে স্নায়ু সংবাদ বহ

*This time their anatomy is at fault. There are various plexuses and ganglia that are situated at the base of the brain, and in the region of the neck. Did they mean the Speno-palatine, or Gosserian or the Otic ganglia?

†আজ্ঞাচক্র is a lotus with two petals. This has been said to occupy a position between the eye-brows. It is difficult to find one occupying the exact anatomical position and resembling it in appearance. We have the olfactory bulbs, exactly resembling a flower with two petals. Its position at the base of the brain is not exactly the same, as that indicated by the books on Yoga. It would appear, that there is an important plexus, on the hollow of the frontal bone, the frontal Sinus, but nothing of the sort has been found here.

—Aryan Trails

করিতে সমর্থ হয়। ঠিক যেন ব্যাটারির তাড়িত শক্তি বলে তার সংবাদ বহন করিতেছে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রত্যেক গ্রন্থি এক একটি শক্তি স্থান। ত্বক্ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংবাদ বহন করিয়া কোন স্নায়ুগ্রন্থি বা মস্তিষ্কে লইয়া যাওয়া এবং মস্তিষ্ক বা ঐরূপ গ্রন্থি হইতে আজ্ঞা লইয়া শরীরের নানা স্থানের পেশীতে লইয়া যাওয়া, এই উভয় প্রকার কার্য্যই স্নায়ুর কার্য্য। আমরা কতকগুলি কার্য্য ইচ্ছাপূর্ব্বক করি। শরীরের স্নান বিশেষ কণ্ডুয়ন আমাদের ইচ্ছায় হয়। আর কতকগুলি কার্য্য আমাদের অনিচ্ছায় হইয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস বা হৃদ্‌পিণ্ডের গতি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। ইচ্ছা-পূর্ব্বক করা কার্য্যের নাম ইং ভলণ্টারি, আর অনিচ্ছাপূর্ব্বক কৃতকার্য্যের নাম ইং ইনভলণ্টারী। শেষোক্ত প্রকার কার্য্য স্নায়ুর প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া দ্বারা (Reflex action) দ্বারা হইয়া থাকে। যিনি যোগী তিনি এই দুইয়েরই অতীত হইতে পারেন। তিনি স্বাধীন হইবেন আর সকলই তাঁহার বশীভূত হইবে; চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা তিনি সকল কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন। যে নিশ্বাস জোর করিয়া বন্দ করিয়া দিলে মানুষের মৃত্যু হয়, যোগী সংকল্প বলে সেই নিশ্বাস এক দিন, এক মাস, এক বৎসর অন্তর পরিত্যাগ করিতে পারেন বা আদৌ ত্যাগ না করিয়া চিরকাল সমাধিমগ্ন থাকিতে পারেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিয়াছেন, তুমি সংকল্পের উপাসনা কর, ব্রহ্মরূপে সংকল্পের উপাসনা করিলে তুমি সত্যসংকল্প হইবে, কামচার হইবে, কোন কামনা অপূর্ণ থাকিবে না, কোন কর্ম্মই অসাধ্য থাকিবে না। তৈত্তিরীয় আরণ্যক এই কথাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন—সত্যসংকল্প যোগী সকলই করিতে পারেন, বিশ্বামিত্রাদি ঋষি সংকল্প মাত্রেই প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যোগীরা একাগ্রচিত্তের বলে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সকলই সম্যক প্রকারে দর্শন করেন। বেদব্যাস বলিয়াছেন যে সকল পদার্থই সর্ব্বাত্মক সর্ব্ববিকার-জনক ও সর্ব্বপরিণামক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সকল দ্রব্যেরই সকল প্রকার বিকার ও পরিণাম হইতে পারে, কেবল যে বীজ হইতেই বৃক্ষ হইবে এমন নহে; স্থাবর জঙ্গম হইতে পারে, জঙ্গম স্থাবর হইতে পারে; অণু বৃহৎ হইতে পারে, বৃহৎ অণু হইতে পারে। তবে যে আমরা দেখিতে পাই না, অভিব্যক্তি হয় না তাহার কারণ প্রতিবন্ধকতা—দেশ, কাল, অধর্ম্ম ইত্যাদি প্রতিবন্ধক। যেখানে এই প্রতিবন্ধকতা নাই সেখানে যেরূপ বর্ণিয়াছি,

ঐরূপই অভিব্যক্তি হইবে, সকল বস্তু হইতে সকল প্রকার কার্য্য হইতে পারিবে। দেশ কাল অধর্ম্ম যোগীদের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না, কেন না তাঁহাদের সংকল্প স্থির, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। যোগসূত্রভাষ্যের কথাটা একবার শুনিলে ভাল হয়—

জলভূম্যোঃ পরিণামিকং রসাদিবৈস্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষ্বিত্যেবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্ব্বে সর্ব্বাত্মকমিতি। * * দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধান্ন খলু সমানকালমাত্মনামভিব্যক্তিরিতি।

ভগবান পতঞ্জলিও ঐ কথা বলিয়াছেন যে সকল বস্তুই যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিবিশিষ্ট। পাঠক মহাশয় যদি কথাটা বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিয়াছেন যে যোগীদের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে এবং কেন অসম্ভব নহে তাহাও বুঝিয়াছেন। এখন বুঝিতে পারিবেন যে পেশী ও স্নায়ু মূলত একই জিনিষ হইলেও পেশীর কার্য্য ও স্নায়ুর কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কেন? এক কোষ বা সেল হইতে মানব ও উদ্ভিদ দুই-ই হইতেছে কিন্তু একেতে কেন ব্লাসটোডাম আর উদ্ভিদে কেন পেরেনকাইমা? এখন এই কথাগুলি বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্ব প্রথমে কোষ মিলন হইলে তাহার উপর একটি স্তর পড়ে, তাহা ব্লাসটোডাম (বীজত্বক্)। এই বীজত্বক আবার বাহ্য মধ্য ও অন্ত্য এই তিন ভাগে বিভক্ত। অন্ত্য বা সর্ব্বনিম্ন ত্বক্ হইতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (যেমন খাদ্যনালীর ঝিল্লী) প্রভৃতির উৎপত্তি। মধ্য ত্বক্ হইতে অস্থি ও পেশীর উৎপত্তি। আর বাহ্যত্বক্ হইতে চর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার স্নায়ু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। সেই একই সেল, সেই এক-ই কোষ কিন্তু কি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের কার্য্য হইতেছে? ইহার একমাত্র কারণ পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মের উপযোগিতা, যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু সুবুদ্ধি পাঠক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ঐ উপযোগিতা ধর্ম্মটি কোথা হইতে আসিল? কে গোপনে স্নায়ুর ভিতর ঐ ধর্ম্মটুকু রাখিয়া দিল? তাহার উত্তর, আমার মা—জগদম্বা। ভগবানকে দাদা খুড়া ভাই যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পার কিন্তু মা বলিয়া ডাকিলে একটু বিশেষ প্রকারের সুখ হয় না? আর শক্তিকে যখন ডাকিতেছি, তখন মা বলাই কি উচিৎ নয়? সে যাহাহৌক আর একটি কথা বলিব। যুগ যুগান্তরের অন্ধকার ভেদ করিয়া ঋষিবাক্য চলিয়া আসিতেছে। তথাপি আমরা তাহাদের মূল্য কিছুই জানি না। যখন দেখি য়ুরোপীয়

সুধীগণের একটা কথা ঋষিবাক্যের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, তখনই আমাদের চমক ভাঙ্গে মনে হয় তবে ত ঋষির মাথায় পদার্থ ছিল। হা দুর্দ্দশা! মাগো আর কতকাল এ পাপদেশকে বিড়ম্বনা-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবি? বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহাকে সংকল্প বলিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সভ্যসমাজের will force (ইচ্ছাশক্তি) বই আর কিছুই নয়। যত প্রকার শক্তি ভূমণ্ডলে আছে সকলই ইচ্ছাশক্তির বিকার একথা হিন্দুর কাছে নূতন নহে, শাস্ত্রে একথা অনেক স্থলে আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখই আছে। অধুনা একজন য়ুরোপীয় গ্রীণ সাহেব কি বলিতেছেন শুনিবেন?

Will then is equally and indistinguishably desire and thought—not however mere desire or mere thought, if by that is meant desire or thought as they might exist in a being that was not self-distinguishing and self-seeking, or as they may occur to a man independently of any action of himself, but desire and thought as they are involved in the direction of a self-distinguishing and self-seeking subject to the realisation of an idea. ... The will is simply the man. Any act of will is the expression of the man as he at the time is. The motive issuing in his act, the object of his will the idea which for the time he sets himself to realise, are but the same thing in different words. Each is the reflex of what for the time, as at once feeling, desiring, and thinking, the man is.

—*Prolegomena to Ethics.*

আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়ালেস কি বলিয়াছেন শুনিবেন?

If, therefore, we have traced one force, however minute, to an origin in our own Will, while we have no knowledge of any other primary cause of force, it does not seem an improbable conclusion that all force may be will-force; and thus that the whole universe is not

merely dependent on, but actually *is* the *will* of higher intelligences or of one Supreme Intelligence.

Natural Selection.

বাইবেলেও এই কথা। ভগবান বলিলেন আলো হৌক আর অমনি আলো হইল। হিন্দুরও সেই কথা। ভগবান বলিলেন "আমি বহু হইব।"

শ্বাসযন্ত্র বা নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

যোগের কথায় প্রাণায়াম আসিবে, প্রাণায়ামের কথায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস আসিবে বা অজপা জপের কথা আসিবে সুতরাং মনুষ্যদেহে নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের কার্য্যটা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। ফুসফুসের অবস্থান ট্রেকিয়া ব্রঙ্কি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আর একবার স্মরণ করাইয়া দি হৃৎপিণ্ডের দুই পার্শ্বে ফুসফুস। ইহা বায়ু ভরা থলী আর ছোট বড় হয় ইহার কার্য্য রক্ত পরিষ্কার করা। ইহা যে ত্বক দ্বারা আবৃত তাহার নাম প্লুরা। বায়ু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া প্রথমত কণ্ঠনালিতে যায় (কণ্ঠনালী =ফেরিংস), তাহার পর লেরিংস হইয়া ট্রেকিয়াও পরে ফুসফুসে প্রবেশ করে। লেরিংস হইতে বায়ুনালীর (ট্রেকিয়া) আরম্ভ আর ফুসফুসে শেষ। বক্ষগহ্বরে গিয়া নালী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক ভাগ বাম ফুসফুসে অপর ভাগ দক্ষিণ ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। ফুসফুসে দুদিকে যে দুই শাখা গিয়াছে তাহাদের নাম ব্রঙ্কি, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বক্ষগহ্বরে ফুসফুস অবস্থিত। বক্ষঃগহ্বরের প্রসারকালে বাহিরের বায়ু ফুসফুস ভিতরে প্রবেশ করে (অন্তশ্বাস বা ইং ইনস্‌পিরেশন) আবার বক্ষগহ্বর সঙ্কোচকালে ফুসফুসের ভিতরের বায়ু বাহিরে আসিয়া পড়ে, তাহাই বহিঃশ্বাস (ইং একস্‌পিরেশন)। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির এইরূপ প্রতি মিনিটে এইরূপ ২৪ বার প্রসার-সঙ্কোচ হইতে পারে। বক্ষঃগহ্বর প্রসারিত হয়, পেশীর সাহায্যে। এই প্রসার কার্য্যে সাহায্য করে, ডায়াফ্রাম স্তরের পেশী, পাঁজরের পেশী ও বক্ষঃগহ্বরের পাশের পেশী, বক্ষঃগহ্বরের বিস্তৃতি বশত ফুসফুস বিস্তার লাভ করে। তখন তন্মধ্যস্থিত বায়ুর চাপ কমিয়া যাওয়ায়, কতকটা বায়ু বাহির হইতে ট্রেকিয়া পথে আসিয়া উপস্থিত হয় ও ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই বায়ু প্রবেশ করিতে না করিতে ফুসফুসের আকার আবার ছোট হইয়া থাকে, তখন বায়ু থাকিতে না পাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। শেষোক্ত কার্য্যে

পেশীর সাহায্য অতি অল্পই আবশ্যক, এইরূপে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে। ইহাই সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস। ইহাই বাহিরের বায়ু। প্রায় ৩৫ ঘন ইঞ্চি বায়ু প্রত্যেক বারে প্রবেশ করে ও তাহাই বাহিরে আসে। যেটা ফুসফুসে প্রবেশ করে ও বাহির হইয়া যায় তাহার নাম টাইডেল এয়ার (স্রোত-বায়ু)। বায়ুর প্রায় ২৯ ঘন ইঞ্চি ফুসফুসে থাকিয়া যায় এবং সেই স্থানীয় দূষিত বায়ুর সহিত মিলিত হয়। যে বায়ু থাকিয়া যায় তাহার নাম স্থিতিশীল (ইং রেসিডুয়াল বা ষ্টেসনরী) বায়ু। এই বায়ুর সাহায্যে বায়ুর অম্লজান শোণিতে মিশে ও শোণিতের কার্ব্বণিক এসিড বায়ুতে আসিয়া মিশে, এই মেশা-মিশিটা ফুসফুসের এলভিওলিতে হয়। যে নিশ্বাস আমরা টানি তাহার অম্লজানের সহিত যদি যে প্রশ্বাস আমরা ফেলি তাহার অম্লজানের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে প্রায় শত করা সাড়ে চার অংশ অম্লজান প্রশ্বাসে কমিয়া গিয়াছে, আর প্রায় চার একের পাঁচ অংশ কার্ব্বনিক এসিড প্রশ্বাসে বাড়িয়াছে। যে নিশ্বাস গ্রহণ করি তাহাতে কি থাকে?—প্রশ্বাসেই বা কি থাকে?

নিশ্বাস (১০০)	প্রশ্বাস (১০০)
অক্সিজেন ২১	অক্সিজেন ১৬
নাইট্রোজন ৭৮·৯৬	নাইট্রোজন ৭৯·৭
কার্ব্বনিক এসিড ০·০৪	কার্ব্বনিক এসিড ৪·৩
জল (সামান্য)	জলীয় বাষ্প
আমোনিয়া (সামান্য)	আমোনিয়া
	উদজান, অপর গ্যাস, অপর শারীরিক দ্রব্য।

প্রশ্বাস দ্বারা অকসিজেন শরীরে নীত হয়। স্থূল শিরায় (ভেন) দূষিত রক্ত থাকে আর সূক্ষ্মশিরায় (আর্টরী) বিশুদ্ধ রক্ত থাকে আর অতি সূক্ষ্মশিরা (ক্যাপিলারী) ভেন ও আর্টরীকে পরস্পর যোগ করে। রক্ত বহা নাড়ীর এই তিনটি বিভাগ, ভেন, আর্টরী ও ক্যাপিলারী। আর্টরী দ্বারা হৃদয়ের শোণিত সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হয়। ভেন পুনর্ব্বার ঐ শোণিতকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য হৃদয়ে আনিয়া দেয়। নিশ্বাস দ্বারা ভেনের রক্ত আর্টরীর রক্তে অর্থাৎ দোষিত রক্ত বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়। হৃদয় হইতেছে দেহের রক্ত ভাণ্ডার, রক্তে এক প্রকার লোহিত কণিকা থাকে, তাহাকে হিমোগ্লোবিন

বলে। নিশ্বাসের অক্সিজেন দ্বারা এই হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ফুসফুসের কার্য্য হইল রক্ত পরিষ্কার করা বা নিশ্বাসের অকসিজেন দ্বারা রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিনের সংখ্যার বৃদ্ধি করা ও সর্ব্বশরীরে তাহা সঞ্চালন করা।

সহজ নিশ্বাসের কথাই এতক্ষণ বলা হইল। যখন হাঁপানী কাশী প্রভৃতি নিশ্বাসের রোগ হয় তখন বলাই বাহুল্য সহজ নিশ্বাসের অবস্থা থাকে না। তখন যে অধিক বায়ু ফুসফুসে নীত হয় তাহার নাম কমপ্লিমেনট্যাল বায়ু আর যে অধিক বায়ু ফুসফুস হইতে বাহির হইয়া যায় তাহার নাম সপ্লিমেণ্টেল বায়ু। শরীরে যে অকসিজেন অভাব হয় তাহা আমরা বায়ু হইতে সংগ্রহ করি আর কার্ব্বণের যেটুকু দরকার হয় তাহা আমরা শরীরের পেশী টিসু হইতেই প্রাপ্ত হই। পেশী ও টীসু দিবা রাত্রিতে কত কার্ব্বণ সরবরাহ করে তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ঐ সময়ের মধ্যে দেহের প্রায় ৩৫০০ গ্রেণ বা আট আউন্স কার্ব্বণ নষ্ট হয়। একখানি দর্পণে বা মাজা গ্লাসে যদি নিশ্বাস ত্যাগ করা যায় তাহা হইলে মসৃণ আর থাকে না, একটা সাদা মোটা দাগ পড়ে। সেটা জলীয় বাষ্পের কার্য্য। শরীরের অভ্যন্তর হইতে হাইড্রোজন গ্যাস অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বাষ্প সৃষ্টি করে। অহোরাত্রে মানবদেহ হইতে যে উদজান গ্যাস বাহির হয়, তাহার পরিমাণ প্রায় আধ পাঁইট। আমরা যে নিশ্বাস গ্রহণ করি তাহা ফুসফুসে গিয়া উষ্ণ হয়। মলভাণ্ডের মলত্যাগ সুচারুরূপে না হইলে শোষক্রিয়ায় নিশ্বাস গ্রহণ সহজসাধ্য হয় না। একজন সাধু বলিয়াছেন কলিতে জীবের মুক্তি মল ত্যাগের উপর নির্ভর করে।

মানবদেহে শোণিত সঞ্চালন।

মানবদেহে শোণিত সঞ্চালন সম্বন্ধে কিছু বলিবার অগ্রে শোণিত কি একটু বুঝা উচিৎ। এই রক্ত হইতে মানবদেহ নির্ম্মিত হয়, শোণিত টীসু প্রস্তুত করে। এই টীসু হইতে হাড়, মাস, স্নায়ু, ত্বক সকলই হয়। ইহা ছাড়া শোণিত শরীরের তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করে, পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার জন্য যকৃতের পিত্তরস, গ্যাষ্ট্রীক রস, মুখের লালা, ক্লোমরস প্রভৃতি যে সকল রসের দরকার শোণিত সেই সকল সৃষ্ট

করে। ঘর্ম্ম, প্রস্রাব, শ্লেষ্মা প্রভৃতি শরীর হইতে নিষ্কাষিত করা রক্তেরই কার্য্য। আর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রক্ত ফুসফুস হইতে নিশ্বাসের অকসিজেন চুষিয়া লয় ও মানবশরীরের সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত করে। শোণিতে প্রধানত দুই প্রকার পদার্থ থাকে—

১। নানা প্রকার ক্ষার পদার্থ রসায়ন সাহায্যে জানিতে হয়; যথা—ম্যাগনিসিয়স, সোডিয়ম, ক্যালসিয়ম, পটাস ক্লোরাইড, পটাস ফসফেট, পটাস কার্ব্বনেট।

২। সিরম, ফাইব্রিণ, এবং রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকা সকল। মাটীতে রক্ত পড়িলে বোধ হয় দেখিয়াছেন, খানিকটা সুতার মত লাগিয়া থাকে ও খানিকটা ফ্যাকাসে লাল তরল পদার্থ গড়াইয়া যায়। সুতার মত দ্রব্যটার নাম ফাইব্রিণ আর ফ্যাকাসে লাল তরল পদার্থের নাম সিরম। রক্তে প্লাজমা নামে আটার মত যে তরল পদার্থ থাকে তাহাই মাটিতে পড়িয়া ঐ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্লাজমার উপর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা ভাসিতে থাকে তাহার কতক লাল কতক সাদা [ইং করপস্‌লস্‌] প্লাজমা ও কণিকা লইয়াই রক্ত। অর্দ্ধেক স্বচ্ছ তরল প্লাজমা, অর্দ্ধেক কণিকা—ভাসিতে থাকে। রক্তে লাল কণিকার সংখ্যা প্রায় সাদার ৫০০ গুণ অধিক। লাল কণিকার আকার, গোল চ্যাপ্টা ও একটু ফাঁপা। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির ৩২০০ ভাগের এক ভাগ, আর ঐ ব্যাসের চারি ভাগের এক ভাগ স্থূলতা। ইহারা একক থাকে না। লালের আভাযুক্ত পীত বা পীতের আভাযুক্ত সবুজ ইহার প্রকৃত বর্ণ যাহা অনুবীক্ষণে দৃষ্ট হয় কিন্তু অনেকগুলি একত্রে থাকিলে বর্ণ লাল দেখায়। চাপ পাইলে আবার ছোট হয়। লোহিত কণিকা দুইটি দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত একটি হিমোগ্লোবিন অপরটি ষ্ট্রোমা। ষ্ট্রোমা বর্ণ হীন স্পঞ্জের ন্যায় স্থিতিস্থাপক। হিমোগ্লোবিন যখন নষ্ট হয় তখন হিমাটিন ও গ্লোবিলিউন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ইহা শীঘ্রই নষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিমোগ্লোবিন ফুসফুসের বায়ুর অকসিজন লইয়া দেহে সঞ্চালন করে। সাদা কণিকার নাম লিউকোসাইটিস, লাল অপেক্ষা ইহারা আকারে বৃহৎ অর্থাৎ ব্যাস একের ২৫০০ অংশ কিন্তু কোন বিশেষ আকার নাই কারণ অতি মুহূর্ত্তেই ইহারা আকার পরিবর্ত্তন করে। এই দেখিলেন ত্রিকোণ, তখনি দেখুন চতুষ্কোণ বা পঞ্চকোণী। লাল কণিকা দেহে অম্লজান

সঞ্চালিত করে কিন্তু শ্বেত কণিকার কার্য্য ডাক্তাররা এখনও প্লীহার ন্যায় ঠিক করিতে পারেন নাই। রক্ত যখন দেহে থাকে তখন তরল। বাহিরে আসিলে জমাট বাঁধে। রক্তের জমাট বাঁধার শক্তি না থাকিলে অনেক মানুষ রক্তস্রাবে মরিয়া যাইত। জমাট বাঁধার নাম-ই ক্লটিং বা কোএগুলেশন। মানবদেহের যত ভার তাহার তের ভাগের এক ভাগ শরীরের রক্ত। আমার দেহের ওজন যদি দুই মন এগার সের হয় তাহা হইলে আমার দেহে সাত সের রক্ত আছে জানিবেন।

পাঠক মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে রক্ত সঞ্চালনে হৃদ্, আর্টারী, ক্যাপিলারী ও হৃদ্‌পিণ্ড এই চারিটি যন্ত্রের আবশ্যকতা। হৃদ্‌পিণ্ডের আকার হরথনের টেক্কার মত, বক্ষগহ্বরের মধ্যস্থলে অবস্থিত, উপরে ষ্টার্ণাম বা বুকের হাড় আর দুই পার্শ্বে ফুসফুস কিন্তু একটু বামে হেলা। সাক্ষাৎ প্রাণ অর্থাৎ ভগবান কি না? কতকগুলি স্বাধীন পেশীনির্ম্মিত একটি ব্যাগ বুঝিলেই হৃদয় বুঝা যাইবে। ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, একটি জালবৎ ত্বক্ পদার্থ [পেরিকারডিয়াম]। ইহার উপরে আর একটি স্তর আছে তাহা কেবল সঙ্কোচনশীল সূত্রনির্ম্মিত, ইহার নিম্নে যে স্তর আছে তাহা সর্ব্বদা আর্দ্র। যে রসে সর্ব্বদা হৃদয় ভিজা থাকে তাহাকে সিরম রস বা কুই বলে। ঠিক যেন সর্ব্বদা হৃদ্‌পিণ্ড কল চলিবে বলিয়া ভগবান তেলের মত রস মাখাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয় স্বীয় হস্তমুষ্টির মত এবং কতকটা শুণ্ডের মত। রক্তবহা নাড়ীতে রক্ত প্রবেশ করানই হৃদয়ের প্রধান কার্য্য। একটি স্থূল পেশীস্তর হৃদয়কে উর্দ্ধ অধ ভাগে অবস্থিত হইয়া ডান বাম দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে আর সমান্তরালভাবে আর একটি পেশীস্তর হৃদয়কে নিম্ন ও উর্দ্ধ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে, তবেই এই দুইটি পেশীস্তর হৃদয়কে সর্ব্বশুদ্ধ চারি ভাগে বিভক্ত করি-

দ-অ	বাম-অ
দ-ভ	বা-ভ

দঅ = দক্ষিণ অরিকেল
বাম-অ = বাম অরিকেল
দভ = দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেল
বা-ভ = বাম ভেণ্ট্রিকেল

ভেন দ্বারা হৃদয়ের দূষিত রক্ত দক্ষিণ ভাগে আনিত হয় এবং রক্ত দিয়া

হইয়া পুনর্ব্বার বাম ভাগের আর্টরী দিয়া সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হয়। দক্ষিণ অরিকল হইতে রক্ত নীচু দিকে দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেলে যাইতে পারে কিন্তু বাম অরিকেলে যাইতে পারে না। ঐরূপ বাম অরিকেলের রক্ত নীচে বাম ভেণ্ট্রিকেলে যাইতে পারে। অরিকেল হইতে ভেণ্ট্রিকেলে যাইবার ঝিলী-ময় পর্দ্দা; পর্দ্দায় কপাট আছে। প্রয়োজন হইলে এই দ্বার খুলিয়া রক্ত যায়। দক্ষিণ দিকে তিনটি ও বাম দিকে ঐরূপ দুইটি কপাট [যথাক্রমে ইং ট্রাই ও বাই-কসপিড ভাল্‌ভ] পেরিকাডিয়ামের উপরের সূত্রময় স্তর যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন কার্য্যত হৃদয়ের গহ্বর সঙ্কুচিত হয়, তখনই রক্ত হৃদয় হইতে আপনি বাহিরে যায়। প্রথমে অরিকেল সঙ্কুচিত পরে তখনই ভেণ্ট্রিকেল সঙ্কুচিত হয়, রক্ত বাহিরে যায়, পরে একটু বিরামকাল, আবার হৃদয় পূর্ব্বাকারে প্রসারিত হয়। এই যে সঙ্কোচ-প্রসার ইহাই হৃদ্‌পিণ্ডের নর্ত্তন বা গতি। ইহাতে টিক্-টি এইরূপ শব্দ হয়। প্রথমটি দীর্ঘ ভেণ্ট্রিকেল সঙ্কোচ আরম্ভে শ্রুত হওয়া যায়, দ্বিতীয়টি হ্রস্ব ভেণ্ট্রিকেল সঙ্কোচের সর্ব্বশেষ সময়ে শোনা যায়। হৃদয়ের এই গতি হইতেই মানুষের নাড়ী ঠিক হয়, হাত দেখিয়া লোক নাড়ীর গতি তথা হৃদয়ের গতি অনুভব করে। হৃদ্‌পিণ্ডের এই নর্ত্তন চিরজীবন হয়। বন্ধ হইলে মানুষ তখনি মরিয়া যায়। প্রতি মিনিটে ভূমিষ্ঠ শিশুর হৃদ্‌পিণ্ডের গতি ১৫০ বার হইতে পারে, প্রৌঢ়ের গতি ৭০।৭৫ মধ্যে, আর বৃদ্ধের গতি ৫০ বার অপেক্ষাও ন্যূন হইতে দেখা গিয়াছে ইং নাম পলসেশন। জীবন কত শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে এটা মনে পড়াইতে হইলে হৃদ্‌পিণ্ডের নর্ত্তন শব্দ শুনিতে হয় বা মধ্যে মধ্যে নাড়ী টিপিয়া দেখিতে হয়।

ভেন। ভেনে দূষিত রক্ত থাকে। দেহের যাবতীয় দূষিত রক্ত আনিয়া দক্ষিণ অরিকেলে ঢালা হয় দুইটি ভেন দ্বারা, একটি উপরে একটি তাহার নিম্নে অবস্থিত, [যথাক্রমে ইং নাম সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাকেভা]। উচ্চ অঙ্গের মস্তক গ্রীবা হস্ত প্রভৃতির দূষিত রক্ত যে আনে সে সুপিরিয়র ভেনাকেভা। আর পদ হইতে ও উদর হইতে, মূত্রাশয় হইতে প্লীহা যকৃত হইতে যে রক্ত আনে সে ইনফিরিয়র ভেনাকেভা। মূত্রাশয় হইতে শিরা আসিয়া ইনফিরিয়রে মিলিয়াছে। উদরের পাকস্থলী অন্ত্র প্লীহা প্রভৃতি হইতে শিরা বাহির হইয়া [পোর্টাল ভেন] যকৃতের কেশবৎ সূক্ষ্ম শিরার

সহিত মিশিয়াছে, পরে যকৃৎ হইতে হোপাটিক ভেন ইনফিরিয়র ভেনা কেভার সহিত মিশিয়াছে। বাম অরিকেলে আরও চারিটি ভেন আসিয়া পড়িয়াছে, বামদিকের দুইটির নাম বাম পুলমনোরি, দক্ষিণের দুইটির নাম দক্ষিণ পুলমনোরি ভেন। ভেনে দূষিত রক্ত থাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি কিন্তু এগুলির নাম ভেন হইলেও ইহাতে দুষ্ট রক্ত থাকে না। ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত আনিয়া হৃদয়ে ঢালে এইজন্য ইহাদের নাম পুলমনোরি। ভেন কাটিলে বা ছিন্ন হইলে রক্তশূন্য হওয়ায় উভয় প্রান্ত একত্র করিলে জুড়িয়া যায়। শরীরের ভেনের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দুশাস্ত্র বলেন শরীরে ৭২০০০ নাড়ী আছে তাহা কি নাড়ী বলা যায় না। শাস্ত্র আবার বলিয়াছেন, নাড়ী অসংখ্য। যাহাহৌক সর্ব্বশরীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ভেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। ভেন ও আর্টারিতে প্রভেদ এই যে—

আর্টারি।—ছিঁড়িয়া গেলে রক্তহীন হয় না, একটি ছিদ্র স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল শেষের সেই দিনে আর্টারী রক্তশূন্য হয়। আর প্রভেদ এই যে আর্টারিতে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে ও তাহা গুদাম-হৃদয় হইতে লইয়া তাবৎ শরীরে বিলান হয়। মৃত্যুকালে, বলিয়া রাখি, কিন্তু ক্যাপিলারী ও ভেন উভয়েই রক্ত থাকে। বাম ভেণ্ট্রিকেল একটি কপাট দ্বার দিয়া রক্ত যে বুড় আঙ্গুলের মত মোটা আর সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ আর্টারীর মধ্যে লইয়া যায় তাহারই নাম এওর্টা। এওর্টা একটু অগ্রসর হইয়া কতকগুলি শাখা ও তাহাদের প্রশাখা হৃদয়ে লইয়া গিয়াছে। আর একটু নামিয়া এওর্টা একটি অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণে এক শাখা গিয়াছে—দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি দক্ষিণ বাহুতে, অপরটি দক্ষিণ গ্রীবা হইয়া মস্তকে। অপর একটি শাখা গিয়াছে, বাম গ্রীবায় ও তৃতীয়টী গিয়াছে বাম বাহুতে। আর একটু নামিয়া এওর্টা ফুসফুসে ও তস্য প্রাচীরে ও ব্রঙ্কিতে কতকগুলি শাখা পাঠাইয়াছে। ডায়াফ্রাম ভেদ করিয়া এওর্টা উদরে আসিয়া নাড়ী সংস্থানে মিলিত হইয়াছে। পরে দুই শাখায় দুই পদে গিয়াছে এইরূপে এওর্টা মানবশরীর ব্যপিয়া কার্য্য করিতেছে বা রক্ত বিলাইতেছে। এওর্টা উঠিয়াছে বলিয়াছি, বাম ভেণ্ট্রিকেল হইতে। দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেল হইতে যেটী বাহির হইয়াছে, তাহার নাম পুলমনোরি আর্টারি ইহা দুই শাখায় বাম ও দক্ষিণ দুই ফুসফুসে গিয়াছে। [যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ পুল-

মনোরি আর্টারি] ভেনের দ্বারা দূষিত রক্ত এখানে আসিলে এই আর্টারি অম্লজান সাহায্যে শুদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুসে লইয়া যায়।

ক্যাপিলারী অর্থে কৈশিক—কেশের মত সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম যে ইহার ২৫০০ এবং ৩০০০ গাছি পাশাপাশি রাখিলে এক ইঞ্চির সমান হয়। এই সকল সূক্ষ্ম শিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেন এবং আর্টারির সহিত যুক্ত হইয়া আছে। ইহাদের কার্য্য যেন ঘটকালী করা, রক্তের অম্লজান টীসুকে দেয় আর টীসুর কার্ব্বণ রক্তে লইয়া যায়।

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া।

এওর্টা ও তাহার শাখা প্রশাখা দ্বারা শরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে যে রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে তাহা ভেন দ্বারা ও ভেনাকেভা দ্বয় দ্বারা দক্ষিণ অরিকেলে নীত হয়। রক্ত সঞ্চালনের এই ক্রিয়াটী বৃহৎ বা শারীরিক সঞ্চালন [ইং গ্রেটার বা সিষ্টেমিক সারকুলেশন] বলিয়া উক্ত। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সচরাচর চারি অংশে বিভক্ত এইটীই প্রথম বিভাগ। দ্বিতীয়ত, রক্ত, দক্ষিণ অরিকেল কুঞ্চিত হইলে ট্রাইকসপিড ভালভ নামক চামড়ার পর্দ্দার দরজা দিয়া দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেলে যায় এবং দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেল আবার রক্তপূর্ণ হইয়া সঙ্কুচিত হইলে পুলমনোরি আর্টারি দ্বারা ফুসফুসে নীত হয়। ফুসফুসে অম্লজান সহযোগে রক্তপরিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলে ফুসফুস হইতে পুলমনোরি আর্টারি দিয়া বাম অরিকেলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাম অরিকেল হইতে বাইকসপিড পর্দ্দার-দ্বার সাহায্যে বাম ভেণ্ট্রিকেলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত দ্বার বন্দ হইয়া যাওয়ায় রক্ত এওর্টায় প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে ঘুরিতে শুদ্ধ রক্ত আবশ্যকীয় স্থানে দিয়া তাহাদের দূষিত অংশ গুলি নিজে লইয়া ক্রমশ নিজে দূষিত হইয়া পড়ে তখন ভেন সাহায্যে আবার দক্ষিণ অরিকেলে শুদ্ধ হইতে যায়। ফুসফুস হইতে রক্ত বাম ভেণ্ট্রিকেলে গমন পর্য্যন্ত আর একটী বিভাগ কল্পিত হয়। হৃদয়ের মধ্যেই রক্তের যে সঞ্চালন তাহার একটী স্বতন্ত্রবিভাগ [করোনারি সঞ্চালন]। আর উদরের যন্ত্রাদিতে অর্থাৎ পাকস্থলী যকৃত প্লীহা পানক্রিয়াস আন্ত্রতিতে রক্তের যে গমনাদি তাহা আর একটী স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্গত। রক্ত সঞ্চালনের এই চারিটী বিভাগ বৈজ্ঞানিক উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধ

অধভাগে দণ্ডায়মান হইয়া একটী পেশীস্তর হৃদয়কে বাম ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দক্ষিণ ভাগের নাম ভেনস্ বা পুল্ মনোরি বিভাগ—ইহার কার্য্য দেখিয়াছেন, দূষিত রক্তকে ফুসফুসে প্রেরণ করা। আর বামভাগের কার্য্য দেখিয়াছেন, ফুসফুস হইতে শুদ্ধ শোণিত আনিয়া দেহমধ্যে বিচরণ করান। ইহার নাম আর্টিরিয়ান বা সিষ্টেমিক বিভাগ। একথা বলাই বাহুল্য যে বাম ভাগের রক্ত দক্ষিণে বা দক্ষিণ ভাগের রক্ত বাম ভাগে হৃদয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাইতে পারে না—ঘুরিয়া যাইতে হয়।

বাতায়নে।

চাহেনি আমার পানে, কেন পড়ে মনে
জগত প্রফুল্ল কর
হাসি মাখা বিম্বাধর,
অতি স্নিগ্ধ ইন্দুকর বঙ্কিম নয়নে ?
কেন মনে পড়ে নিত্য
কপোল চন্দ্রিকা ধৌত
করপদ্মে পদ্মানন মুক্ত বাতায়নে ?
দেখি নাই কাছে কাছে
দেখিনি আলোক মাঝে
গোধুলি চিত্রিত সাঁঝে লাবণ্য কিরণে
দেখেছিনু একবার
দীপ্তিময়ী প্রতিমার
উজল মধুরছবি ; তাই পড়ে মনে।
উষায় অরুণ বুকে,
চন্দ্রবিম্বে, পুষ্পমুখে,
কোথা সে ত্রিদিব দীপ্তি ? মানস নয়নে

মানস রঞ্জিনী তব
চারুপ্রভা অভিনব
খেলা করে কল্পনায়, ঝলকে স্বপনে।
চাহেনি আমার পানে ;
একাকিনী বাতায়নে
ছিল বালা, কেন জ্বালা আমার পরাণে ?
দেখি নাই কুসুমিতা
প্রেম ভরা দেহ লতা ;
বিম্বিত ছিল কি দেহ, মুখদরপণে ?
প্রেমের শরীর নাই
বুঝি দেখেছিনু তাই
অনঙ্গ প্রেমের অঙ্গ সে চারু নয়নে।
কহেনি, শুনিনি কথা—;
তবু কি প্রেমের গাথা—
স্মরিলে তরল দিঠি— বাজে আশি কানে।
বাতায়ন পথ চাহি
একাকী সে গান গাহি ;
সে যদি না শোনে গীতি কি হবে সে গানে ?
প্রেমের প্রতিমা গড়ি
প্রীতির আরতি করি,
গোপনে বিজনে বসি ; সে ত নাহি জানে।
নিশি যায়, নিশি আসে,
স্বর্গ পটে দীপ্তি ভাসে ;
নিরুদ্ধ আমার স্বর্গ রুদ্ধ বাতায়নে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাচীন সাধন-সঙ্গীত।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

গত সালের চৈত্র মাসের "পূর্ণিমায়" ৯টী প্রাচীন সাধন-সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য আরো কয়েকটি প্রকাশ করা যাইতেছে। সঙ্গীত গুলি [কয়েকটা অতি পরিচিত বোধ হইলেও] পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে কি না, জানি না। নিম্নোদ্ধৃত ২৯ সংখ্যক গীতটির প্রথম চারি চরণ মাত্র "সঙ্গীতকোষে" স্থানলাভ করিয়াছে। দ্বিজ রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ [সেন কবিরঞ্জন] এক ব্যক্তি না হইলেও প্রথমোক্ত কবির গীত গুলি ও শেষোক্ত কবির গীত সংগ্রহ পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট দেখা যায়। "কাব্য বিশারদের সংগ্রহে ও "বিজয়া বটিকা-সঙ্গীতে" তাঁহাদের এই গীত গুলি পাওয়া যায় নাই। এই সকল গীতের শুদ্ধি অশুদ্ধি সম্বন্ধে পূর্ব্ব সংখ্যায় বলা গিয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

পূর্ব্ব সংখ্যার গীত গুলির কবির নাম ও গীত সংখ্যা এই ঃ— ১। রামজীবন ১, ২। রাম প্রসাদ ২, ৩। কৃষ্ণরাম দাস ১, ৪। দ্বিজ রঘুনাথ ১, ৫। নসিরাম ১, ৬। গোবিন্দ রাম ১, ৭। রামলোচন ১, ৮। জয়দেব দাস এবং অদ্যকার প্রবন্ধে এই গুলি ঃ— ১। তারিণী ব্রাহ্মণী ১, ২। রাম কিশোর ১, ৩। দ্বিজ হরি ১, ৪। ঈশ্বর ১, ৫। ভবানন্দ ১, ৬। দ্বিজ দুঃখীরাম ১, ৭। স্বরূপ দাস ১, ৮। রামমোহন ২, ৯। দ্বিজ শ্রীরাম ১, ১০। রামপ্রসাদ ৬, ১১। রামদুলাল ২, ১২। গোবিন্দ দাস ২, ১৩। রাম শরণ সেন ১, ১৪। লক্ষ্মীকান্ত ১। আর ৫টি গীত ভণিতা সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ।

এখানে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। রামজীবন [ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ] কৃত "মনসা মঙ্গল" ও "শ্রীশ্রীষষ্ঠীব্রত পাঞ্চালী", রামজীবন [রুদ্র] কৃত "দৌলার-চৌতিশা", দ্বিজ রঘুনাথ কৃত "মঙ্গল চণ্ডীর" ও "সত্যনারায়ণ-পাঞ্চালী" এবং বৈষ্ণব পদাবলী, রামলোচন [দাস] কৃত "ত্রিপদী" ও "আত্ম নিবেদন চৌতিশা, জয়দেব দাস কৃত বৈষ্ণবপদ, দ্বিজ হরি কৃত "শ্রীকৃষ্ণের শত নাম ভবানন্দ কৃত "হরি বংশ" ও কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা", দ্বিজ দুঃখী [রাম] কৃত "সুবচনীর পাঞ্চালী" এবং লক্ষ্মীকান্ত কৃত "গুরুভক্তি শ্লোক" এই গ্রন্থ

গুলা গিয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে এই গীত গুলির তত্তন্নামধেয় কবিগণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, কে বলিবে? "হরিবংশে" ভবানন্দের পিতার নাম "সদানন্দ" বলিয়া উল্লেখিত আছে। আর কাহারো কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

এখানে আর একটি নূতন সত্য—অর্থাৎ বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে আর একজন মহিলা কবি আবিষ্কৃত হইল। নীলাচল বাসী শিখী মাহিতীর ভগ্নী [সিদ্ধ সাড়ে তিন জন রসিক ভক্তের আধ খানা] মাধবীর পদ "পদকল্পতরু" রহে আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর বাসী জয় নারায়ণ সেন ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী আনন্দ ময়ী গুপ্তা উভয়ে মিলিয়া "হরিলীলা" রচনা করিয়া গিয়াছেন। আর অদ্য চট্টগ্রাম—সুচক্রদণ্ডী গ্রামে তারিণী দেবীর একটি গীত পাওয়া গেল। ইহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন সাহিত্যে এই তিন মহিলা কবি। মুসলমানের মধ্যে ত্রিপুরা লাকসামের [?] জমিদার নবাব কয়েজনেছা চৌধুরাণী একজন মহিলা কবি। তিনি "রূপ জালাল" নামে এক বৃহৎ কাব্য লিখিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যের দপ্তরে তাঁহার নাম ও থাকা উচিত।

সঙ্গীত গুলি যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা গেল ঃ—

শিব দুর্গা নাম লওনা কেন মন রে আমার! ধু।
অন্তিম কালে তরাইবে ভব নদী পার।
দুর্গা নামটী মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ,
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার॥
দুর্গা নামটি মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
কালো ভয় কালো চিন্তে নাইক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমন ভুবনে গেলে দোহাই দিবে কার॥ ১। ১০।

নাইচাছে রণে, পীযুষ পানে, নিলজ বরণী। ধু।
আউলাএ কুন্তল, নাইচাছে চঞ্চল, করে ঝলমল, জিনিএ সুদামিনী॥
হেইলে ঢুলে পড়ে, ঘনরব করে, করে ভইরে সুধা দিছে যোগীনী॥
হাইএ হইএ মেগ, সমরে উনমত্ত, রাজকিশোর ভাবে চরণ দুখানি॥ ১। ১১।

কালী বৈলে প্রাণ থাইকে থাইকে যাএ। ধুঁ।
ভজ সার সার, মন মধুকর, অনিত্য সংসার, জল বিম্ব প্রায়॥
যে শ্যামা চরণে, দিএ বিল্বদল, কিঞ্চিৎ দিলে হএ, বারাণশী ফল।
মুক্তিপদ ধাম, জপ তারা নাম, পরিত্রাণ হবে, রবিসুত দায়॥

অতুল্য প্রভাব, অনন্ত লীলে, গোপী সঙ্গে কেলি, করে গোকুলে।
ঐ রূপ তুলনা, কি দিব বোল না, অসংখ্য ব্রাহ্মাণ্ডে, সংখ্যা নহি পাই।
শয়নে স্বপনে, জপি তারা নাম, সঙ্কটে শঙ্করী, করে পরিত্রাণ।
বোলে দ্বিজ হরি, মম জীর্ণ তরী, অলঙ্ঘ্য সাগরে, ভাসিয়া বেড়াএ॥ ১১৩

ঝননা ঝননা ঝন্ বাজেরে।
চরণ কমলে ঘুঙ্ঘুরু বাইজাছে, কালিকে কিবা নাইচাছে রে॥
কালীকে নহুবত মধুর বাইজাছে,
ক্ব ক্ব ধুঁ ধুঁ ধিঁ ধিঁ কিটি ধাঁ ধাঁ ধাঁ বাজে রে॥
জগত ঈশ্বরী তুমি, জগতের মাঝে আমি,
তব ঈশ্বর কেনো ভবে মনদুঃখ পাইয়াছে রে॥ ১।১৩

মোরে ত্রাণ কর জননী!
তোমার পদ বিনে আর কিছু না জানি॥
ভবের যন্ত্রণা পাইয়া, তব চরণ শরণ লইলাম ধাইয়া,
বিষম বিপাকে পড়ি ডাকি ভবানী॥
ভবেতে জন্মাইয়া মোরে, ভাসাইলা ভব সায়রে,
তুমি না তরাইলে মোরে কে তরাবে অধনি॥
রামচন্দ্র রাজা ছিল, রাবণে সীতা হরি নিল,
রাবণেরে বাম তারা হইলা আপনি॥
সময় কালে বন্ধু হও, অসম কালে কোথা রহ,
মোরে রক্ষা কর জননী॥ ১।১৪।

প্রভাত।

মা ও তুমি জগত জননী।
হিম ঘরে জনমিলা, জগত মন মোহিলা,
দুর্গা নাম দুর্গতি নাশিনী॥
জন্মিয়া জনক ঘরে, মিথিলা নগরে,
হরের ধনু ভাঙ্গ পতিব্রতা।
ধরিয়া অশেষ লীলা হরের মন মোহিলা,
তে কারণে নাম ধর সীতা॥
গোকুলে ত জনমিলা, কানুর মন মোহিলা,
শাশুড়ীর বর ভাল পাইলা।
ষোল শ গোপিনী সঙ্গে, আছিলা বহুল রঙ্গে,
তে কারণে নাম ধর রাধা॥
ভকত যে মতিহীন, কহে ভবানন্দ দীন,
শুন মাতা ত্রিপথ গামিনী।
অরুণ উদয় কালে, যে তোমা স্মরণ করে,
তাহারে উদ্ধার * * ॥ ১।১৫।

কাশীনাথ এইবার ভবে তরাও মোরে।
মহিমা রবে তোমার এই সংসারে॥ ধু।
দুই আখি উদয় করি, বাম করে শিঙ্গা ধরি,
মাইখাছে শ্মশানের ধূলা কাশীনাথের অঙ্গেতে
শিরে যার গৌরী গঙ্গা বিরাজ করে।
মণিকর্ণিকা মাথে, তরঙ্গ লেখাএ তাতে অবিরতে,
ভগীরথে আনিছে গঙ্গা অনেক যন্ত্রণা পাইএ।
যোগী তরিবে কত যোগ যাগ সাধিএ॥
দ্বিজ দুঃখীরামে ভণে, কাশীনাথের চরণে,
দিন থেণে যেই নরে স্নান করে গঙ্গার জলে।
যমের কি সাধ্য আছে ছুইতে তাহারে॥ ১।১৬।

বামা কার কামিণী,
কি রূপ দেখাইলে, শতদল কমলে,
কালি দহের জলেতে ॥ ধু।
শ্রীঅনন্ত সদাগরে হস্তী দেখে কমলেতে।
বসি আছেন নারায়ণী গণেশ লৈয়া কোলেতে ॥
লক্ষই* সরস্বতী আর বসিছে কমল পাতে।
বসিয়াছেন নারায়ণী মহাদেব তান স্তবেতে ॥
বাম হাতে ধরাছ গদা দেখ্যা আইলাম গিরিতে।
তেমনি মতে স্বরূপ দাসকে রাখ চরণ তলেতে ॥ ১। ১৭।

বিষম সমরে সাজে আউলা কেশী দিগাম্বরী। ধু।
নয়ান উলট করি, পদতলে ত্রিপুরারি ॥
রাণী বল্যাছে গিরি, যাও ওমা কৈলাশপুরী।
দারুণ দশমী তিথি হইল আমার বৈরী ॥
ডাকিনী যোগিণী সঙ্গে নাচে গৌরী।
নিতান্ত না রবে ওমা যাবে হরের পুরী ॥
শ্রীরামমোহনের বাণী, শুন মাগো রাজরাণী,
শমন কালে পদছায়া দিবেন নারায়ণী ॥ ১। ১৮।

বিষম সমরে কিরে আউলা কেশী দিগাম্বরী।
নয়ান উলট করি পদতলে ত্রিপুরারি ॥ ধু।
মধুপানে মত্ত হৈয়া ভ্রমে একাকিনী।
নাশএ প্রলয় সেনা যেন মেঘ সুদামিনী ॥
নিশুম্ভে ভুলাছ তুমি কাহার কুমারী।
আস্যাছি সমরে আমি নগেন্দ্র নন্দিনী গৌরী ॥
শ্রীরাম মোহনের বানী, শুন অগো রাজরাণী।
শমন কালে কর পার তব দাস সুত জানি ॥ ২। ১৯।

* লক্ষই—লক্ষ্মী। সম্প্রসারণার্থে ঐরূপ করা হইয়াছে। আরো অনেক পুথিতে ঐরূপ প্রয়োগ দেখিয়াছি। অদ্ভুত বটে!

জয় তারিণী জয় তারা, তারারং ভুবন্‌মে জপিএ। *
মস্তক উপরে মোহন বেণী জবা ফুল মে ভেগ্ দিএ।
পতাকা উড়াছে ওই শম্ভু গগন পথ্‌মে ঠেক দিএ ॥
যথেক গন্ধর্ব্ব সবে তারা অগর চন্দন পল্‌সিএ।
জয়া বিজয়া তারা জয় জয় জয় কিএ ॥
শিবাগণ আদি করি তারা রণ ভুবনমে গিলিএ।
ডাকিনী যোগিণী তারা তাগ্‌ধিনা ধিন্ তা কিএ ॥
শিরে শোভে সোনার মুকুট মুণ্ডমালা কণীএ।
পদতলে শম্ভুনাথে মুং মুং কিএ ॥
শ্রীরাম দ্বিজের বাণী ওমা এজনমটি মর্‌গিএ।
ধরম করম যুগ জপিএ তুয়া পথ্‌মে সব দিএ ॥ ১। ২০।

প্রভাত—মালসী।

দুর্গা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী।
যুধিষ্টির ধর্ম্মপুত্র বড় পুণ্যবান
সশরীরে স্বর্গে গেল তোমার লইয়া নিজ নাম ॥
কৌশল্যা দ্রৌপদী সীতা রাণী মন্দোদরী।
নল রাজ যুধিষ্টির ভীমার্জ্জুন মহাবলী ॥
দশরথ সুত রাম পবন নন্দন।
চারি যুগে অমর রাজা বিভীষণ ॥
তোমার যে নাম লৈয়া যথা তথা যাই।
তোমার নাম জীয়নে মরণে * * ॥
ভক্তের যে নিবেদন শুন মা শঙ্করী।
স্রোত জল হৈয়া তোমার চরণেতে লাগি ॥ ২। ২১।

সে ত তুমি মা কত রঙ্গ জান কালী।
কখনে পুরুষ, কখনে প্রকৃতি, কখন হও বনমালী ॥ ধু।

* যে গীত একদিন ইংলণ্ড মাতাইয়া ছিল, সভ্য জগৎকে পাগল করিয়া ছিল সেই গান—"তারারা বম্ দিও"—মনে পড়ে না কি?

ব্রহ্মকুলে গিএ, ব্রহ্মময়ী হইএ, ব্রহ্ম কমণ্ডলু ছিলি।
বৃন্দাবনে আসি, বাজাইলে বাঁশী, গোপীর মন ভুলালি॥
রাম অবতারে, জনকেরি ঘরে, সীতা নাম প্রকাশিলি।
জনকেরি বংশ, ব্রহ্মশাপে ধ্বংশ, গঙ্গারূপে উদ্ধারিলি॥ ৩। ২২।

তারিণী মা তারিতে হবে।
নতুবা তারিণী নামে কলঙ্ক রহিবে শিবে॥ ধু।
যে জনে ভজন জানে, সে তরে আপনা গুণে,
ভজন বিহীন জনে উপায় কি হবে?
যদি দুরাচার হই, জানি না মা তোমা বই,
মা হইএ সন্তানের দুঃখ কেমনে হেরিবে শিবে॥ ৪। ২৩।

হইল কালাঙ্গী উলঙ্গী বামা রণ রঙ্গিণী। ধু।
অতি ঘোরতর, রূপে ভয়ঙ্কর, ক্রোধে ওষ্ঠাধর, কাঁপে থরে থর,
নাশিবারে নিশুম্ভ শুম্ভ শম্ভুসঙ্গিনী।
মায়ের চরণ অম্বুজ, দীর্ঘ চারি ভুজ, নাশিতে দনুজ,
অসি শোভে তাএ।
অট্ট অট্ট হাসি, লট্ট বট্ট কেশী, ললাটেতে শশী,
আছে দেখা যাএ॥
রুধির আননা, লোল লোল রসনা, বামা বিবসনা, বিকট দর্শনা,
নরশির মালে, শিশু বৃদ্ধ (?) গলে, শিব মাতঙ্গিনী॥ ৫। ২৪।

অনন্তরূপিনী কত লীলাতে বিহার করে।
শ্বেত রক্ত নীল অতি, পদ্ম কুটি কত জাতি,
মহারাজ হংসবর পরমানন্দে তথা চরে॥
নাগিনী ধামিনী (?) জিনি, সিরিজিলে মহামুনি,
অধঃ ঊর্দ্ধে বসে নর কোটী (রবি?) তেজ ধরে॥
গগণে কমল যথ, তাতে মধু জন্মে তথ,
খাইলে অমর হএ, কহি আছে দিগাম্বরে।

নদী তটে (?) সরোবর, তাতে পূর্ণ শশধর,
দিবানিশি ভেদ নাই, শত সূর্য্য প্রভা করে।
শ্রীরাম প্রসাদে বোলে, নাগিনীর সঙ্গে গেলে,
করে বামা করে উমা নাচ্যা ফিরে হরপুরে॥ ৩। ২৫।

অজরা অমরা মরা চরণ তলে কারণ কিরে। ধু।
সবে বলে মরা মরা, মরার হাড় কটিতে বেড়া, আর এক মরার চরণ ধরা,
মরা নিয়ে কেলি করে॥
দেখেআছি অনেক মরা দেখিনি আর এমন মরা, ও সে অনেক দিনের বাসি মরা,
স্মরণে (?) কেন পড়ে না রে॥
দ্বিজ রাম প্রসাদ কহে, এ মরা সামান্য নহে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ দিতে পারে॥ ৪। ২৬।

যাই আগে শ্যামা মায়ের কাছে রে। ধু।
হাট বাজার কৈর্ত্তে পাঠাইয়াছে, তোর সনে কি বিষয় আছে রে॥
জমিদারীর ভার রে শমন, কালী মায় আমায় দিয়াছে।
আপন দেহের জমিন জমা বাকী, তোর কাছে সার নিকাশ আছে রে॥
শুন ওহে যমদূত, যদি কিছু দোষ তোরে, তবে কর্ম্মফল পাবি জানিস্ অরে,
তোর সনে কি বিষয় আছে রে।
প্রসাদ বোলে, যমদূত কিরে কিছু বোল মোরে, তবে যাব তবে পাবি দিব তোরে,
কালী মায় হুকুম দিয়াছে রে॥ ৫। ২৭।

তোরে [illegible] কি দোষিব।
বলিতে যে ভয় বাসি, কাচা শব দেয়া ভেরে, মক্ষিকা উড়ে বসি॥
নাহি জানে ইষ্টা সাধ সদা এ মন খুসী। (?)
নিতান্ত করেছি আমি পাপ রাশীরাশি॥
তরাবে কি না তরাবে তারা তগো দীর্ঘকেশী॥
প্রসাদ বোলে মায়ের কোলে পাড়ে হাসি (?)।
বলিতে কি লজ্জা শিবে যাও ক্ষরে মহিষী॥ ৬। ২৮।

তারিতে হবে মা তারা হৈয়াছি শরণাগত।
অনায়াসে তৈরে গেছে মা পাপী কত আমার মত।
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞান শূন্য মিছে ভ্রমি,
মায়া জালে বদ্ধ হৈয়াছি মা, পিঁজরারি পাখীর মত॥
মাগো বাল্যকাল করেছি গত, হয়ে মাএর অনুগত,
যুবা সময় জায়ার মায়ায়, এরূপে কাল হলো হত॥
তৈরে মা চরণ ভেলা, পার কর এই বেলা,
সন্ধ্যা হৈলে বিষম জ্বালা, দুর্গতি মা পাব কত।
করিএ মিনতি নতি, শ্রীপদেতে যাচি তথি,
ভবের জ্বালা বিষম খেলা, সহিলেম মা দিল যত।
কালীর দাস প্রসাদ বলে, ভাবরে মন কালী বলে,
কালী বলে, শ্যামা বলে, জপ সদা অবিরত॥ ৭। ২৯।

মাএ চরণ বিনে আর লক্ষ নাই গো তারা। ধু।
মা কালী ঘাটে কালী গো তুমি কৈলাশে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা তুমি গোকুলে গোপিনী॥ *
মা ঘাটে ঘাটে কৈলাম গো পূজা পুষ্প উজান যাএ।
না জানি শঙ্করী মাএ কোন্ ঘাটে ডুবাএ॥
মা ছোট কালে মৈল গো পিতা রাজ্য নিল পরে।
আহ্মা হেন দুটা শিশু ভাসাইলে সাগরে॥
মা আপনে পাগল, পতি গো পাগল, আর নি পাগল আছে।
শ্রীরাম প্রসাদ পাগল চরণ পাবার আশে॥ ৮। ৩০।

কার কি মন ইজারাদারী।
ছেড়ে তৈক নিস্করো বাড়ী॥ ধু।
তহসীলদার কৈরেছ ভাল; তহসীলে নাই রমনা (?) জারি।
তাতে মোহরী কৈরেছ ভালো, আদায় নাই তার কড়াকড়ি॥

* এই দুইটি চরণ দ্বিজ রাম প্রসাদের আর একটি গীতেও দেখা যায়। সেই গীতের আরম্ভ—"মা বসন পর, মা বসন পর তুমি"। ভণিতাও একই।

মেয়াদ গতে হিসাব হৈলে, ছাড়্‌বে না তাএ মালগুজারি।
সেয়েখানে (?) বাড়ী না যাইবে, রাখরে তাএ নিশান গাড়ি॥
দুলাল বোলে, খাজনা দিএ, থাক রে আপনা সারি।
শেষে মেয়াদ গতে, হিসাব হৈলে, পায়েতে চড়াবে বেড়ি॥ ১। ৩১।

ত্বং নমামি মাগো তারা। ধু।
ত্বং নমামি অপদ গামিনী অপানি সর্ব্বদায়িনী।
অচক্ষে হেরনী অকর্ণে শ্রবণী সর্ব্ব আত্মারূপিনী॥
স্থূল সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানে ধ্যানে না পাএ নির্ণয়,
কথ যোগেন্দ্র মনীন্দ্র ফনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু হুতাশন;
সত্ব রজ তম তুমি রাম রামা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বেদে নাই সীমা,
শ্রীরাম দুলালে মাগো মন কুতূহলে, নিবেদন তব চরণ কমলে;
যে রূপেতে তুমি, সেরূপেতে প্রণামি, রূপ সীমা না জানি॥ ২।৩২।

দুর্গে দুর্গতি হারিণী তব নাম।
শুনেছি যে দুর্গা বলে, দুর্গতি না পায়গো,
লভে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
তাইত ডাকি দুর্গা বলে, দুর্গা মা কোথায় রৈলে,
দেখা দিয়ে পূরাও মনস্কাম।
নইলে দুঃখহরা নামে কলঙ্ক রটয়ে গো,
তাই বলি হইও না দীনে বাম॥
প্রকৃত যে স্তুতি নতি, জানি না মা ভগবতী,
ভকতিতে স্মরি কেবল নাম।
অন্তরযামিনী তুমি, অন্তরে বিহর গো,
চেয়ে দেখ নাহিক বিশ্রাম॥
ব্রহ্মা হরি হরার্চ্চিত, অমর সিদ্ধ রাঞ্ছিত,
ও শ্রীপদে সহস্র প্রণাম।
গোবিন্দ দাসে কয়, দুর্গা না হইও কৃপণা গো,
দেখাও পাদপদ্ম মোক্ষধাম॥ ১। ৩৩।

তারিতে হবে মা তারা হৈয়াছি শরণাগত।
অনায়াসে তৈরে গেছে মা পাপী কত আমার মত।
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞান শূন্য মিছে ভ্রমি,
মায়া জালে বদ্ধ হৈয়াছি মা, পিঁজরারি পাখীর মত॥
মাগো বাল্যকাল করেছি গত, হয়ে মা এর অনুগত,
যুবা সময় জায়ার মায়ায়, এরূপে কাল হলো হত॥
কৈরে মা চরণ ভেলা, পার কর এই বেলা,
সন্ধ্যা হৈলে বিষম জ্বালা, দুর্গতি মা পাব কত।
করিএ মিনতি নতি, শ্রীপদেতে যাচি তথি,
ভবের জ্বালা বিষম খেলা, সহিলেম মা দিল যত।
কালীর দাস প্রসাদ বলে, ভাবরে মন কালী বলে,
কালী বলে, শ্যামা বলে, জপ সদা অবিরত॥ ৭। ২৯।

মাএ চরণ বিনে আর লক্ষ নাই গো তারা। ধু।
মা কালী ঘাটে কালী গো তুমি কৈলাশে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা তুমি গোকুলে গোপিনী॥ *
মা ঘাটে ঘাটে কৈলাম গো পূজা পুষ্প উজান যাএ।
না জানি শঙ্করী মাএ কোন্ ঘাটে ডুবাএ॥
মা ছোট কালে মৈল গো পিতা রাজ্য নিল পরে।
আহ্মা হেন দুটা শিশু ভাসাইলে সাগরে॥
মা আপনে পাগল, পতি গো পাগল, আর নি পাগল আছে।
শ্রীরাম প্রসাদ পাগল চরণ পাবার আশে॥ ৮। ৩০।

কার কি মন ইজারাদারী।
ছেড়ে তৈক নিস্করো বাড়ী॥ ধু।
তহসীলদার কৈরেছ ভাল; তহসীলে নাই রমনা (?) জারি।
তাতে মোহরী কৈরেছ ভালো, আদায় নাই তার কড়াকড়ি॥

* এই দুইটি চরণ দ্বিজ রাম প্রসাদের আর একটি গীতেও দেখা যায়। সেই গীতের আরম্ভ—"মা বসন পর, মা বসন পর তুমি"। ভণিতাও একই।

মেয়াদ গতে হিসাব হৈলে, ছাড়্‌বে না তাএ মালগুজারি।
সেযেখানে (?) বাড়ী না যাইবে, রাখরে তাএ নিশান গাড়ি॥
দুলাল বোলে, খাজনা দিএ, থাক রে আপনা সারি।
শেষে মেয়াদ গতে, হিসাব হৈলে, পায়েতে চড়াবে বেড়ি॥ ১। ৩১।

ত্বং নমামি মাগো তারা। ধু।
ত্বং নমামি অপদ গামিনী অপানি সর্ব্বদায়িনী।
অচক্ষে হেরনী অকর্ণে শ্রবণী সর্ব্ব আত্মারূপিনী॥
স্থূল সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানে ধ্যানে না পাএ নির্ণয়,
কথ যোগেন্দ্র মনীন্দ্র ফনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু হুতাশন;
সত্ব রজ তম তুমি রাম রামা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বেদে নাই সীমা,
শ্রীরাম দুলালে মাগো মন কুতুহলে, নিবেদন তব চরণ কমলে;
যে রূপেতে তুমি, সেরূপেতে প্রণামি, রূপ সীমা না জানি॥ ২।৩২।

দুর্গে দুর্গতি হারিণী তব নাম।
শুনেছি যে দুর্গা বলে, দুর্গতি না পায়গো,
লভে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
ভাইত ডাকি দুর্গা বলে, দুর্গা মা কোথায় রৈলে,
দেখা দিয়ে পূরাও মনস্কাম।
লইলে দুঃখহরা নামে কলঙ্ক রটয়ে গো,
তাই বলি হইও না দীনে বাম॥
প্রকৃত যে স্তুতি নতি, জানি না মা ভগবতী,
ভকতিতে স্মরি কেবল নাম।
অন্তরযামিনী তুমি, অন্তরে বিদর গো,
চেয়ে দেখ নাহিক বিশ্রাম॥
ব্রহ্মা হরি হরার্চ্চিত, অমর সিদ্ধ রাঞ্ছিত,
ও শ্রীপদে সহস্র প্রণাম।
গোবিন্দ দাসে কয়, দুর্গা না হইও কৃপণ গো,
দেখাও পাদপদ্ম মোক্ষধাম॥ ১। ৩৩।

স্থাপন করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমার মনে বড় আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, এবার আমার অদৃষ্টে বিধাতা আবার বা কি দুর্ঘটনা লিখিয়াছেন। তুমি পত্র পাঠ বাড়ী আসিতে যত্ন করিও—তোমার জন্যই আমার অধিক চিন্তার কারণ। সরসীলালের অভাবে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু আমি পাষাণ—সে বজ্রাঘাতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই। যে দিন মাকে গৃহে আনিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার নিদ্রা গিয়াছে, যদিও বা শত চেষ্টা করিয়া একটু তন্দ্রা বোধ হয়, অমনি ভীষণ দুঃস্বপ্নে আমার সে তন্দ্রা টুকুও ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর শুনিলাম, আমার স্নেহময়ী বউ মা, কি জানি কেন রাগ করিয়াছেন! তুমি অবশ্যই জান, সংসার মধ্যে—এমন কি তোমা অপেক্ষাও আমি বউ মাকে অধিক ভালবাসী—কেন ভাল বাসী তাহা জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে পরমারাধ্য পিতৃদেবের সেই অন্তিম উপদেশ। সুতরাং আমার অনুরোধ বউ মা যাহাতে সন্তুষ্ট হন, প্রাণপণ করিয়া তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিও, এবং শ্রীমতী মহামায়ার পত্রানুসারে কার্য্য করিতে অন্যমত করিও না। অধিক আর কি লিখিব—যে পর্য্যন্ত বাড়ী না আইস, সে পর্য্যন্ত দৈনিক এক খানি করিয়া পত্র লিখিও ইতি।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীদেবেন্দ্রলাল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অগ্রজের পত্র পাঠ করিয়া, রাজেন্দ্রলাল কিছু মাত্র হেলিলেন না কেবল একবার মাত্র ভাবিলেন—"দুর্ব্বল শরীরে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম—অতিরিক্ত অধ্যয়ন—কঠোর দুশ্চিন্তা—এই জন্যই নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে; আর নিদ্রার ব্যাঘাতেই স্বপ্ন দর্শন অনিবার্য্য।" এই সব ভাবিয়া দাদাকে লিখিলেন:—

দাদা! আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যে ভয় করিতেছেন, তাহা অলীক। মঙ্গলময়ী মা হইতে সন্তানের কখন কি কোন অমঙ্গল হইয়া

থাকে? আপনি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, সবই জানিয়া শুনিয়া এরূপ বৃথা আশঙ্কাকে কেন হৃদয়ে স্থান দিতেছেন। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিবা রাত্রি অধ্যয়ন করেন; সুতরাং নিদ্রার ব্যাঘাত না হইবে কেন? যাহা হউক, নিজের শারীরিক অবস্থানুসারে সতত চলা আপনার কর্ত্তব্য। মানসিক পরিশ্রম এককালীন রহিত করিয়া, মন যাহাতে সতত প্রফুল্ল থাকে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি চতুর্দ্দশীর প্রভাতে শ্রীচরণ দর্শন করিব। শ্রীচরণে নিবেদন মিতি।

প্রণত সেবক
শ্রীরাজেন্দ্রলাল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শক্তিপুরের দেবেন্দ্রলালের গৃহে দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ পরে, আবার মহামায়ার আবির্ভাব হইয়াছে—সুতরাং দেবেন্দ্রলালের গৃহে বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চণ্ডিমণ্ডপে মালাকার মহামায়া দশ ভুজার মূর্ত্তিকে সাজাইতেছে, আর গ্রামস্থ বালকগণ, তাহার সাহায্য করিতেছে। অন্যদিকে চণ্ডিমণ্ডপের বারান্দার এক দিকে নূতন মাদুর বিছাইয়া নূতন হুকা কলিকা অজস্র তাম্রকূটের বংশ বিনাশ করিতে করিতে গ্রামের বর্ষীয়ান প্রতিবেশীরা সরস রসিকতার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হাসাইতেছিলেন। অন্যদিকে ভূমিতে পৃথগাসনে দেবেন্দ্রলাল বসিয়া প্রতিবেশীদের খোস্ গল্প শুনিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দু একটা সরস কথায় হাস্যস্রোত বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এমন সময় দীর্ঘ এক বৎসরের পর, হাসিতে হাসিতে রাজেন্দ্রলাল গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্রজের চরণ বন্দনা করিলেন। তারপর মহাদেবীর উদ্দেশে চণ্ডিমণ্ডপে প্রণাম করিয়া, প্রতিবেশী মণ্ডলীর মধ্যে প্রণম্যদিগকে যথারীতি প্রণাম ও স্বাগত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বয়ঃ কনিষ্ঠদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় হাসি মুখে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মহামায়ার দুই বৎসর বয়সের শিশুপুত্র নরেন্দ্রলালকে ক্রোড়ে করিয়া বরাবর মুখ চুম্বন করিতে করিতে, পাক-

আমাকে গ্রহণ করিতেন না। এই রূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে স্মৃতি পটে গুরুদেবের এমন দুই একটি কথা ভাসিয়া উঠিল তাহার স্পষ্ট অর্থ এই যে তিনি আপনা হইতে জানিতে পারিয়াছেন আমার কে আছে না আছে। মন অপ্রিয় সত্য সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না। মন কথাটা চাপা দিল কিছুতেই বিশ্বাস করিতে দিল না যে ঠাকুর কথাটা টের পাইয়াছেন অথচ মনে মনে জানি যে তিনি পরের মনের কথা বলিয়া দেন। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে মন একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। করি কি, যাই কোথা, শুধাই কাকে? ক্রমে গাত্র দাহ উপস্থি হওয়ায় মৃত্তিকায় শয়ন করিলাম। মৃত্তিকায় পড়িয়া ছট ফট করিতে থাকিলাম। পিপাসায় তালু শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তৃষ্ণা ও গাত্র দাহ নিবারণের জন্য পুনঃ পুনঃ জলপান করিলাম। ফল এই হইল যে কিছু ক্ষণ পরে ভেদ বমি উপস্থিত হইল। ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। আশ্রমে দ্বিতীয় লোকটি নাই যে সাহায্য করে। তাই দেখিয়া বুঝি নিদ্রা দেবীর দয়া হইল। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা কিছুই জানি না। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম যেন আমার মৃতদেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে আমি যেন শূন্যে দাড়াইয়া সেই দেহ দেখিতেছি। ভাবিতেছি আমি তবে কি মরিয়াছি? এমন সময় দুই জন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আসিয়া রজ্জু দ্বারা দৃঢ় রূপে হস্ত বন্ধন করিল এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিল—কোন কথা কহিল না। আমি মুগ্ধ হইয়া সেই প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ বন জঙ্গল দিয়া চলিলাম ক্রমে একটা প্রান্তরে অসিয়া পড়িলাম,সেই প্রান্তরে পা বাড়াইবার যো নাই। ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও গুল্ম কে যেন কাটিয়া লইয়া গিয়াছে—খোঁচা খোঁচা ঘন সন্নিবিষ্ট ৩।৪ আঙ্গুল লম্বা গোড়াগুলি সৈন্যের ন্যায় সজ্জিত অথচ চিহ্নিত পথ নাই আর আমার পায়ে জুতা বা খড়ম কিছুই নাই; এদিকে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দুইজন সবেগে রজ্জু টানিয়া—নৌকার গুণ টানার ন্যায়—চলিয়াছে। আমার পা দুটি ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছে কিন্তু বিরাম নাই বিশ্রাম নাই দয়া মায়া নাই রজ্জু টানিয়া যাইতেছে আর আমিও অনিচ্ছায় যেখানে সেখানে পা দিয়া দৌড়িতেছি। কিছু কাল পরে খোঁচা ফুরাইল। আঃ বাঁচিলাম বলিয়া নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে দ্বিতীয় প্রান্তর আরম্ভ হইল। এবার প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক—নানাবিধ আকার প্রকারের ও

বিভিন্ন বর্ণের—এক একটার এমন বীভৎস বর্ণ ও আকৃতি যে দর্শন মাত্রেই অন্তরাত্মা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। পা দিয়া চলিব কি সড়্ সড়্ করিয়া দুদশটা পায়ে উঠিল—দেখিতে দেখিতে পৃষ্ঠে বুকে মাথায়—ত্রাহি মধুসূদন যাই আর কি। কোন্‌টা অধিক যন্ত্রণা দায়ক, দংশন কি কেবল দেহ মধ্যে দ্রুত সঞ্চরণ, তাহা এখন আমি আর মনে করিতে পারি না। কতক্ষণ যে বৃশ্চিক প্রান্তরে নির্ম্মম কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষদ্বয় রাখিয়া ছিল তাহা বলিতে পারি না বোধ হয় যেন অনন্তকালই ছিলাম। তৎপরে অপর একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম—এটা সর্প ও নাগ প্রান্তর। জীবিত কালে বা পূর্ব্বে কয়টা সর্পই বা দেখিয়াছিলাম? এ কি এ? এ যে সর্প-সমুদ্র। না না সর্প-মহা-মহা-সমুদ্র। এত ক্ষুদ্র সর্প ত কখন দেখি নাই। ওঃ ওটা কি সর্প, না ক্রোশ ব্যাপী কর্ত্তিত বৃক্ষ? হস্তীর আকারের কি সর্প আছে পক্ষীর আকারের কি সর্প আছে? এবার যে একেবারে গেলাম! প্রাণ থাকিতে ত আর সর্পের গাত্রে, ফণা উচ্চু করিয়া রহিয়াছে যে, পা দেওয়া যায় না। ওহে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষগণ তোমরা কে বলিতে পার? তোমাদের কি দয়া মায়া মনুষ্যত্ব চক্ষুলজ্জা কিছুই নাই? কি করিয়া সাপের ফণায় পা দিব। আরে দাঁড়াও টেণো না! উঃ কি টান্! আচ্ছা বেশ একেবারে শেষ হইয়া যাউক। কই তা ত হয় না—এত গুলো সাপে কামড়াইল কই মৃত্যু ত হয় না কেবল যন্ত্রণাই সার। যা হোক্ এই বার—ঐ আকাশ পাতাল হাঁ করিয়া যেটা আসিতেছে ঐ টা আমায় গিলিয়া ফেলিবে তাহা হইলেই পাপ চুকিয়া যাইবে। না না বোধ হয় গিলিবে না পাশ দিয়া চলিয়া যাইবে। না গো ঐ যে সত্যই হু হু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। যাই—গেলাম—গিলিবে যে—। আর গিলিবে। এই গিলিল! কত দিন সর্পের উদরে ছিলাম জানি না, কি করিয়া বাহির হইলাম জানি না, কে দয়া করিয়া আমার সংজ্ঞা লোপ করিয়া দিয়াছিল। এখন মনে হইতেছে, যা বাঁচিয়া গিয়াছি।

মনে সুখের সঞ্চার হইতে না হইতেই আশার সঞ্চার না হইতেই হইতেই আবার বিপদ উপস্থিত। এবার প্রান্তরে কতকগুলি মানুষের আকার জীব দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা কি দুর্ভিক্ষ পীড়িত কোন দেশ হইতে আসিয়াছে? ইহাদের এত বিভৎস আকৃতি কেন, দেখিলে ভয়কেও ভয়

পাইতে হয়। ইহারা আমাকে দেখিয়া অমন মুখভঙ্গী করিতেছে কেন। বাপরে এমন রুক্ষ কেশ ত কখন দেখি নাই। ইহারা দল বাঁধিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন? মনের অভিলাষ কি? ওঃ সর্ব্বনাশ আমাকে খাইবে না কি? ইহারা কি রাক্ষস আমার দক্ষিণ হস্তটা যে একটা জীব চর্ব্বণ করিতেছে। হাঁ গা বলিতে পার কে আমাকে রক্ষা করিল কে আমাকে বাঁচাইল? আমি ত এত ছুটিলাম কিন্তু এক পদও ত অগ্রসর হইতে পারিলাম না? যেন যেখান কার সেই খানেই রহিলাম আর ঐ জীবটা হস্ত চর্ব্বণ করিতে লাগিল। কে ঠিক সময়ে ধাক্কা মারিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল—হাত বাঁচিয়া গিয়াছে কেবল খানিকটা মাংস লইয়া চলিয়াছে—উঃ রক্ত যে ফিন্‌কী দিয়া বাহির হইতেছে।

এ আবার কি? পিতা মাতা তোমরা কোথা কেন এ অভাগা সন্তানকে মানব দেহ ধারণ করাইয়াছিলে? উঃ যন্ত্রণা তোমার কি দয়া নাই। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষদ্বয়! রক্ষা কর আর পারি না—নয়ন যে আর দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে না। এ কি এ? এমন কদর্য্য ক্ষত ও কি মানব দেহে কখন হয়? কি বীভৎস দৃশ্য গড় গড় করিয়া মাথা হইতে পূঁজ পড়িতেছে আর হাতে পূঁজ মুছিতেছে কিন্তু তবুও কি নিস্তার আছে ক্রমে মুখে পূঁজে বুঁজিয়া যাইতেছে। মুখের ভিতর যে পূঁজ আসিয়া পড়িতেছে। ওঃ ও লোকটার যে পায়ের সাদা হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রাম রাম এ কি! কি সর্ব্বনাশ এই নিদারুণ পূতিগন্ধটা কি ইহার উরুদেশ হইতে নির্গত হইতেছে। উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য এ লোকটার নাকটা কি হইল কেবল দুইটি ছিদ্র দিয়া অনর্গল পূঁজ পড়িতেছে! এ আবার কি প্রায় একশত লোক এ দিকে কেন আসিতেছে? ইহাদের অর্দ্ধেকের সর্ব্ব গাত্রে পারার ঘা ও নালী। আর অর্দ্ধেকের সর্ব্বগাত্রে বিস্ফোটক। মানুষের গাত্রে একেবারে এত ফোড়া হইতে পারে তাহা আমি কখনও কল্পনায় ও মনে করি নাই। বিশেষ এই যে সকল গুলি হইতে পূঁজ পড়িতেছে আর কতকগুলির একেবারে দগ দগ করিতেছে। তাহারা সকলে আসিল আসিয়া প্রত্যেকে আমায় আলিঙ্গন দিতে লাগিল আমি রজ্জু বদ্ধ হইয়া ছুটিতেছি আর এক এক জন ছুটিয়া আসিয়া আমায় কোল দিতেছে। গায়ে পূঁজ চুইয়ে করিতেছে—গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবার উপক্রম। প্রাণ

কঠিন যায় না যে। কতক্ষণ যে এই নিদারুণ যম যন্ত্রণা ভোগ করিলাম তাহাও এখন মনে হয় না।

তার পর যাইতে যাইতে আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত। আকাশ হইতে গায়ে ছোট ছোট বিড়াল বাচ্ছা পড়িতে লাগিল। বিড়াল গুলো গাত্রে বসিয়া রহিল—কিছুতেই পড়ে না। ছাড়াইতে গেলে জোর করিয়া মাংস ধরে—মাংস ছিঁড়িয়া যায় তবুও যাইবে না। ক্রমাগত বিড়াল বৃষ্টি হইতে লাগিল। এতক্ষণে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু উপায় কি যাই কোথা? কৃষ্ণবর্ণ পুরুষদ্বয় অসঙ্কোচে নিদারুণ টান টানিতেছে। আরও চলিলাম। কখনও ধূ ধূ করিতেছে মরুক্ষেত্র। তপ্ত বালুকা রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়—বন্দুক নিঃসৃত ছিট্টা গুলির ন্যায় গাত্রে লাগিতেছে—গাত্র দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। চোখ মুখ নাক কাণ তপ্ত বালুকায় পূর্ণ। কণ্ঠ রোধ, শ্বাস রোধ, দৃষ্টি রোধ, ঘ্রাণ রোধ, শ্রবণ রোধ—সর্ব্ব ইন্দ্রিয় রোধ কেবল যন্ত্রণা রোধ হয় না। যখন এইরূপ বালুকা সমাধিগ্রস্ত করিয়া যখন পর্ব্বত প্রমাণ বালুকা তরঙ্গ আসিয়া একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মনে করিলাম আপদ গেল কিন্তু কই? পরক্ষণেই আবার দারুণ দুঃসহ শীতে গ্রস্ত হইলাম। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে মরু ভূমির পর বোধ করি সুখ দিবার জন্যই এই হিমানীমণ্ডিত প্রদেশে নীত হইতেছি। কোথা হা আশা তোমার সকলই কি চাতুরী। এ যে অস্থির মজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে, মনে হইতেছে মরুভূমি ছিল ভাল। এ দুঃসহ শীত কে সহ্য করিবে। হস্ত পদ—সর্ব্বাঙ্গ অবশ চলিবার সামর্থ নাই, দন্তে দন্তে লাগিয়া গিয়াছে। বরফের উপর বসিয়া পড়িলাম। তখন যেন একটু নিদ্রার মত আসিল। দেখিলাম আমার মত শত শত জীবের এই রূপ নানা প্রকার দণ্ডভোগ হইতেছে। বাল্যে ও যৌবনে রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে রাবণের যম জিনিতে যমলোকে গমন উপলক্ষে নরক বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম। দেখিলাম এখানে তাহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। সেই—

"যমদূত হানে দণ্ড মস্তক প্রদেশে
কাটে কৃমি, বক্র নখা মাংসাহারী পাখী,
উড়ি উড়ি ছায়া দেহে ছিঁড়ে নাড়ী ভুঁড়ী
হুহুঙ্কারে। আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী।

সেই—

রৌরব এ হ্রদ নাম * * *
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি
তার চিরবাস সেথা, বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে
আর আর পাপী যত মহা পাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে।
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে
চিরকাল অগ্নিরূপে বিধি রোধ হেথা
জ্বলে নিত্য!

আবার সেই—

শূন্যদেশভরা বাণী ভৈরব নিনাদে—
"বৃথা কেন মূঢ়মতি, নিন্দিস বিধিরে
তোরা, স্বকরম ফল ভুঞ্জিস এ দেশে,
পাপের ছলনে ধর্ম্ম ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে।

দেখিতে দেখিতে হুহু করিয়া চলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে ভয়ানক সূচিভেদ্য অন্ধকারে প্রবেশ করিলাম। মস্তিষ্ক আর সহ্য করিতে পারিল না—ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড তোরণের সম্মুখে সিঁড়িতে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি। কতক্ষণ পরে সেই প্রকাণ্ড কপাট অল্পে অল্পে খুলিয়া গেল অমনি কে আমকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিল অমনি দ্বার হইয়া গেল! আমি দেখিলাম সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে—সিঁড়ি। দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম সিঁড়িটি রাস্তার মত, স্থানে স্থানে পথি পা নানাবিধ বৃক্ষ, কিন্তু তাহার অধিকাংশই তুলসী বৃক্ষ, অনেক দূর গমন ক দেখিলাম পথি পার্শ্বে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই বৃক্ষমূলে একটি বেদী। সেই বেদীতে নূতন রকম আকৃতি একজন মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন—ম দুই পার্শ্বে দুইজন বসিয়া আছেন—মধ্যস্থলের জনের দেহ হইতে উ

জ্যোতি নির্গত হইতেছে। দুই পার্শ্বের ব্যক্তির মধ্যে একজনকে চিনিলাম ইনি আমার স্বগ্রামবাসী জ্ঞাতি খুড়া। অপর ব্যক্তিকে চিনিলাম না। জ্ঞাতি খুড়ার নাম রামচরণ—তাঁহার সহিত আমাদের কখন বা ভাব কখন বা ঝগড়া হইত। মধ্যস্থলের যিনি তিনি বুঝিলাম সর্ব্বপ্রধান। আমি যখন গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন এক ব্যক্তি উচ্চ বেদীর সম্মুখে নিম্নদেশে জোড় হাত করিয়া দণ্ডায়মান—তাহারও দুই পার্শ্বে দুইজন কৃষ্ণ-বর্ণ পুরুষ দণ্ডায়মান। দেখিয়াই বুঝিলাম আর একজন আমার দশাপ্রাপ্ত আমার একটু পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছেন। একটু দূরে একটা বৃক্ষমূলে দেখিলাম যথা একটা প্রকাণ্ড মহিষ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল আরও দুইজন চারীজন প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক অপরটি পুরুষ। বুঝিলাম ইহারাও আমার অগ্রগামী। যদিও নিতান্ত যন্ত্রণায় আমি ম্রিয়মাণ হইয়াছিলাম তথাপি আরও কয়েকজনকে আমার অগ্রগামী দেখিয়া বলিতে কি, আমার যেন একটু সুখ হইল। এমন সময়ে মধ্যদেশ হইতে একজন বৃদ্ধ লোক আসিয়া একটা বড় পুঁথী খুলিয়া বলিল তুমি প্রস্তুত, মধ্য ব্যক্তি বলিলেন 'বল'। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—নাম হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলি ইনি অসৎ উপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, অনেক বারবার গচ্ছিত টাকা হিসাব গোলমাল করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, কখনও কোন সৎকার্য্য করেন নাই অপিচ সেই অসদুপায়ে উপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়া সাহেব ভোজন করাইয়া অনারারি মাজিষ্ট্রেট এবং লোকাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোর্ডের মেম্বর হইয়া কেবল আপনার সুবিধা করিয়াছেন। যে গ্রামে উঁহার পুত্র বিবাহ করিয়াছে সেই গ্রামের রাস্তা করিবার জন্য বৎসর বৎসর টাকা দিতেন—আর যেখানে একান্ত আবশ্যক সেখানে টাকা দেন নাই। আপনার মনোমত ব্যক্তিকে ঘাটের ইজারদারী দিতেন—সে কখনও ধৃত পশুদিগকে এক আটি বিচালী দেয় নাই বা তৃষ্ণায় জল দেয় নাই। পাউণ্ডের একহাঁটু কাদায় পশুদিগকে আহারে দিন দিন টাঙ্গাইয়া রাখিত। ইনি জানিয়াও তাহার প্রতিবিধান করিতেন না। ইজারদার মুরগী হাঁস ও উভয় জাতীয় পক্ষীর ডিম দিত ও তাহার ছেলে দিগকে সময় মত জুতা কিনিয়া দিত। মিথ্যা বিল করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে পাথেয় লইতেন। অনারারি মাজিষ্ট্রেট রূপেও ঘুষ

লইতেন এমন কি লাউ কুমড়া বেগুণ ইলিস মাছ কাপড় জামা কিছুই ব
দিতেন না। তবে গুণের মধ্যে এই ছিল যে পক্ষের ঘুষ লইতেন
পক্ষের হইয়া রায় দিতেন—উভয় পক্ষ লইতেন না। (বেদীর উপর হো
করিয়া একটা উচ্চ হাস্য রোল উঠিল) বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—যত্ন বা
আত্মীয় স্বজনের অনুরোধেও কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। উকী
উপর রাগিয়া মক্কেলের মোকদ্দমা নষ্ট করিতেন। আর একজন
উকীল ছিল, সে যে পক্ষের মোকদ্দামায় থাকিত সেই পক্ষেরই জয়
হইত। বেদীর অজ্ঞাত ব্যক্তি বলিলেন আর কেন? তখন মধ্যস্থিত
যাঁহাকে কর্ত্তা মনে করিতেছি—বলিলেন। ইহার তিন কল্প রৌরব
চারি কল্প কুম্ভিপাক—লইয়া যাও। যেমন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দ্বয় লইয়া যাই
এমন সময় বৃদ্ধ বলিল, সব বলা হয় নাই, মিউনিসিপাল কমিসনার ছি
কর্ত্তা বলিলেন—সেখানেই নরক যথেষ্ট হইয়াছে—আচ্ছা কৃমীশুদ্ধ মল উ
মস্তকে ও মুখে ঢালিয়া দেও। কর্ত্তা এই কথা বলিয়া দক্ষিণ পার্শ্বচর
বলিলেন—কেমন এই ব্যবস্থা মিউনিসিপাল কমিশনর মাত্রেরই উপর হ
পারে না। পার্শ্বচর বলিলেন—হাঁ।

এখন আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে মধ্যস্থলের ব্যক্তি
আর বৃদ্ধটি চিত্রগুপ্ত। অপরিচিতটিকে ত চিনি না কিন্তু জ্ঞাতি
রামচরণ কোথা হইতে আসিলেন ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলাম, কে
হিসাবই পাইলাম না। আরও একটি কথা দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময় যম
একটি দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন—দেখিলাম যে দণ্ড হইতে উজ্জ্বল কি
মালা বাহির হইতেছে—এত উগ্র যে চাহিবার উপায় নাই।

এইবার অপর পুরুষটি আসিলেন, নাম কি শুনিয়াছিলাম এখন ম
মনে নাই। যাহাহৌক, বৃদ্ধটি—আসামী যথাস্থানে নীত হইলে—বলি
লাগিলেন—ইনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। প্রথমে সামান্য কার্য্য করি
পরে একজন সাহেবের তুষ্টিজন্য একটা কদর্য্য কার্য্য করিয়া ডেপুটি
ইহার অসাধারণ গুণ ছিল। ইনি আসামী আসিলে ফিরাইতেন না—জনি
দণ্ড দিলেই পদোন্নতি হইবে। ইনি অধিকাংশ সময়েই শতকরা ১০০ জ
দণ্ড দেয়াইতেন। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিলেন—কেন না তাঁহারা
বলিয়া দিতেন ইনি ঠিক সেই রূপই বিচার করিতেন। সকাইরের

না শুনিয়া বাটী হইতে রায় লিখিয়া আনিতেন। কখনও বা অর্ডারসীটে হুকুম লিখিয়া দণ্ড দিতেন, লোককে পীড়া দিবার জন্য তারপর ৪।৫ দিন পরে রায় লিখিতেন। অতিরিক্ত ফী দিয়া রায়ের নকলের দরখাস্ত করিলেও লোকে পাইত না। মাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল হইত না। আর ইনি নিজে স্বধর্ম্মত্যাগী ও পাষণ্ড মতাবলম্বী ছিলেন। বৃদ্ধের বাক্য শেষ হইলে যমরাজ দণ্ড হস্তে হইয়া বলিলেন। উঃ কি ভয়ঙ্কর জ্যোতিই সেই দণ্ড হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই ব্যক্তিকে মহা-রৌরব, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, বৈতরণী এবং দন্দশূক নরকে যথাক্রমে নিক্ষেপ কর। কোটী কল্প ইহার নরক বাস। পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্প সকল ইহাকে মূষিকের ন্যায় গ্রাস করিবে।

তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটি আনিত হইল। ইনি স্বামীর মৃত্যুর পর—ইহার স্বামী একজন বড় ডাক্তার ছিলেন ও অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন—এক পয়সা ব্যয় করেন নাই। ভিক্ষা দেন নাই। অতিথি অভ্যাগত আসিলে বক্র দৃষ্টিতে দেখিতেন ও তাড়াইয়া দিতেন। ইনি অগণ্য পুরুষ গমন করিয়াছেন ও প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া সুখনিদ্রার জন্য শয্যার ছারপোকা গুলি মারিতেম, যমরাজ দণ্ডহস্তে বলিলেন—তুই পাপীয়সী জগদম্বার স্বরূপিনী হইয়া এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছিস। স্বামী থাকিতে গোপনে ব্যভিচারিনী হওয়ায় সেই পাপে তোর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তোর গুরুতর সাজা হইবে। ভগবানের নিয়মে ছারপোকা মনুষ্য রক্ত খায় তুই তাহাদিগকে পীড়া দিয়াছিস তজ্জন্য তুই অন্ধকূপ নরকে দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর থাকিবি, ভক্ষ্যদ্রব্য অপরকে না দিয়া খাইয়াছিস—সেই জন্য কৃমি ভোজন নরকে লক্ষ বৎসর কৃমি ভোজন করিবে। সর্ব্বদেহে নারায়ণ বাস করিতেছেন তিনিই আত্মারূপী তাহাতে অতিথি ভাবে যাইয়া বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়াছ এই জন্য পর্য্যাবর্ত্তন নরকে বজ্রতুল্য তুণ্ডধারী পক্ষীগণ তোমার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিবে। যক্ষের ন্যায়ধন রক্ষা করিয়াছ কোন সদ্ব্যয় কর নাই সেই জন্য সূচীমুখ নরকে অযুত বৎসর থাকিবে। যমদূতগণ তন্তুবায়দিগের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তোর সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিয়া সূত্র প্রস্তুত করিবে, আর ব্যভিচারের জন্য সংদংশ নরকে যমদূতগণ উত্তপ্ত সাঁড়াশী দিয়া তোর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিবে ও কোটী কল্প তোকে তপ্ত শূর্ম্মি নরকে

অগ্নিময় লৌহ পুরুষকে কশাঘাত দ্বারা আলিঙ্গন করাইবে। পাপীয়সীকে পীঘ্র লইয়া যাও।

এইবার আমার পালা।

নগেন্দ্রবালা।

"The very birds sang in his rhyme;
The sunshine, the delicious air.
The fragrance of the flowers are there;"

Longfellow.

বিমল সলিলা অই মৃদুতরঙ্গিনী
শ্যাম উপবন মাঝে ধীরে ধীরে যায়,
বিশদ কৌমুদী বামা বাসন্তী যামিনী
সাথে লয়ে অনুচর মৃদু মলয়ায়,
উপনীত, কুসুমের মধুর শোভায়
সুমধুর পরিমলে প্লাবিত মেদিনী;
প্রকৃতির এ সুচারু বেশের ছটায়
শোভিত বসুধা যেন মোহিনী কামিনী।
তোমার কবিতা ধারা তেমনি সুন্দর,—
তটিনীর কলধ্বনি কৌমুদির হাসি,
মলয় বায়ুর মন্দ স্পর্শ মনোহর,
অনুপম পরিমল সুষমার রাশি
কুসুম, সকলি লভি কবিতা ভিতর
তেঁই তব গাথা, বালা, এত ভালবাসি।

অ।

গিরীন্দ্র মোহিনী
ও
মানকুমারী।

"It was woman at first,
In knowledge that tasted delight,
And sages agree
The laws should degree
To the first possessor the right."

Pope.

কবিতা কানন মাঝে দুইটি বল্লরী,
পল্লবিনী তেজস্বিনী উভয়ে সুন্দর;
সমান সুরভি শোভা উভয়ে বিতরি
শোভিছে এ বঙ্গভূমে; মুগ্ধ নারীনর।
দীপ্ত দুটি তারা কাব্য গগন উপরি
স্নিগ্ধ কিরণের ধারা ঢালে তরতর;
ফুল্ল যুগ্ম তামরস কাব্যসরে, মরি!
বিতরে অপূর্ব্ব শোভা! মুগ্ধ চরাচর!
ধন্য বঙ্গভাষা, ধন্য কবিতা বঙ্গের,
অনন্ত বসন্ত জাগে তব উপবনে,
হেন পিককুলেশ্বরী মধুর স্বননে
তোষে যারে অনুক্ষণ, অভাব কিসের
আছে তার? হেমচন্দ্র, দেখ দেখ চেয়ে,
চেন কি? ওই যে যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

অ।

অরুণোদয়ে ধবলাশৃঙ্গ।

প্রভাতে—অরুণোদয়ে
কিসুন্দর চারু বেশ ধর গিরিবর !
কুবের ভাণ্ডার খুলি
মণি কাঞ্চনের ডালি
যেন ধরি তোলে তব অনন্ত শেখর !
স্বপনের সর্গ আঁকা
বিচিত্র কল্পনা মাখা
গগন করিয়া কোলে শীরষের শেষে ;
যেন কত স্তরে স্তরে
বিকশিত পদ্ম থরে
ফুটায় বিবিধ কান্তি—নানা বর্ণ বেশে !
চূর্ণ কত জল ধনু
চূর্ণ কত চন্দ্র তনু
চূর্ণ কত ক্ষুদ্র তারা—চিকণ ঝালর,
ধবল শিলার রাশি
তুষার বিন্দুতে হাসি
কাঁপিছে অরুণ করে কিবা থর থর !
স্বপ্ন যথা নিদ্রা ঢাকা
শিলীন্ধ্রে নিহার মাখা
স্ফটিকে স্ফটিকে যোগ কি মধুর বেশ !
কিরণ ঝলসে তায়
পুষ্প ধনু দগ্ধ প্রায় !
শোভা ! আহা ! শিবপুরে যেন ব্যোমকেশ।

ঈশান।

কথা।

(২)

আবার দৈবজ্ঞের গণনা।

দৈবজ্ঞের কথা মত ভূমিকম্প হয় নাই বলিয়া ও পীলে নিজে মরিয়াছে—নি নিজের মৃত্যুর দিন গণনা করিতে পারেন নাই, ভূমিকম্প কি প্রকারে ণনা করিবেন, সকলই বুজরুকি বলিয়া—একদল লোক খুব হৈ চৈ রিতেছেন। পীলের মৃত্যু সংবাদ রটিয়াছে বটে কিন্তু কথা সত্য নয়। হাহোক ভূমিকম্প কলিকাতায় হয় নাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে থাও হয় নাই ? তাহা নহে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের কিছু দিন মাত্র পূর্ব্বে গলি, কলিকাতা অঞ্চলে জলকম্প হইয়াছিল তাহা আমরা চক্ষে দখিয়াছি। ইহাতেই গণনা ঠিক সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। পরে সংবাদ াওয়া গিয়াছে ৩১শে আগষ্ট শনিবার মালদহ শিবগঞ্জে ও শ্রীহট্টে ান কোন স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছিল। ঐ তারিখেই বন্দর আব্বাসে ূমিকম্প হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। উহার দুই এক দিন পূর্ব্বে ঐ দিনে মণ্টপিলি ও পরে সেণ্ট ভিনসেণ্টে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইয়াছে এখনও হইতেছে। পরে সংবাদ পত্রে প্রকাশ আসিয়ার স্থানে স্থানে কালিফর্নিয়ায় ভূ-কম্প হইযাছে। ভারতেও হিমালয়ের পাদদেশ নিহিত দেশে—কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত—অনেক স্থানে ভূ-কম্প ইয়াছে। না হয় দুই এক দিন পূর্ব্বে বা পরে। গণনা মিথ্যা একথা কখনই লা যায় না। এমন কি নোয়াখালি চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছে। যাঁহারা লেন ভূ-কম্প গণনা করা যায় না তাঁহারা ভ্রান্ত। আমাদের শাস্ত্রে ভূ-কম্প' ণনার বিধি আছে ও তদনুসারে গণনা করা যায়। সে সকল গ্রন্থের নাম র্য্যন্ত অনেকে জানেন না। অনর্থক লোকটিকে গালি দেওয়া ভাল হয় াই। হিন্দুর সকলই বিষ নয়নে যাঁহারা দেখেন তাঁহাদের—সেই সকল লাঙ্গারের পক্ষে আমোদ হইতে পারে—কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা ঝিবেন যে ভারতের শাস্ত্র ধ্রুব সত্য আর পীলের মত লোক মাথারমণি।

৪ঠা সেপ্টেম্বরের ইংলিসম্যান পত্রে একজন পত্রপ্রেরক ভূমিকম্প সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, পাঠকের উচিৎ তাহা পাঠ করা। মণ্টপিলির

অবস্থান হইতেছে আমাদের পাতালে অর্থাৎ বঙ্গদেশ হইতে মাটী খুঁড়িয়া ক্রমাগত নামিয়া গেলে পৃথিবীর অপরপ্রান্তে মণ্টপিলির দেশে পঁহুছা যায়। মণ্টপিলির অবস্থান ঠিক বিপরীত দিকে হওয়ায় ও সেখা অগ্ন্যুৎপাত হওয়ায় পৃথিবীর এ প্রান্ত অর্থাৎ আমাদের দেশ রক্ষা হইয়াছে সমস্ত তেজ পাতাল প্রান্তেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এমন ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে যাহাতে গণনার সত্যতার বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না।

যাহাহৌক এই গণনার ব্যাপারে অনেক রহস্যই দেখা গেল। গেল য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক দলের বড়ই গাত্রদাহ। হবে না ব্লাকি গণনায় বলিয়াছিল অভিষেক বন্ধ হইবে আর তাহাই হইল। ঝাড়িতেছেন বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা পীলের উপর। ভূকম্প লইয়া একজন বৈজ্ঞানিক কলম ধরিয়াছেন আর ধরিয়াছেন ফাদার লাফো ইনি হিন্দুশাস্ত্রকে হিন্দু জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষকে পর্য্যন্ত কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক টানিয়াছেন। এত রাগ কেন হে বাপু? গণনা মিথ্যা হইয়াছে বলিয়া ত? তোমাকে লোকে ফাদার বলে, পদ আছে মর্য্যাদা আছে অভিমান আছে এত রাগ কি ভাল দেখায়? পীলে ত কখন তোমার যশের ভাগ লইতে যায় নাই—সেণ্ট জেভিয়ারের ত্রিসীমানায়ও ত যায় নাই। বলি প্রভু মুণিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। ইংরেজিতে বলে না to err is human to forgive divine? গণনায় কি ভুল হয় না। যখন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্পেন্সর কলিকাতার গড়ের মাঠ হইতে ফোঁ করিয়া আকাশে উঠিয়া যান তখন না প্রভু স্বয়ং অনেক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বলিয়াছিলেন যে স্পেন্সর মরিয়া গিয়াছে বা যাইবে। কোন ক্রমে বাঁচিবে না। কিন্তু গণনা কি মিথ্যা হয় নাই। তখন ত কোন হিন্দু বৈজ্ঞানিক তোমাকে গালি দেয় নাই? যীশু না এ গণ্ডে চপেটাঘাত হইলে গণ্ডান্তর ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছেন।

আরও রহস্য আছে; সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে কাণ্ডস্বামী পীলের ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। বহুকাল অনাদর অবজ্ঞা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এ পীলে আমাদের বিশ্বাস বড় শক্ত হইয়াছে। এ পীলে মনে হয়, সহজে ফাটিবে না। তবে এই সঙ্গে অনেকের পীলে চমকাইবে।

আবার খরচার কথা।

সংবাদ পত্রে প্রকাশ ইংলণ্ড ভারতীয় অভিষেক-নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের খরচার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভালই হইয়াছে। প্রসাদ বলে কম পড়িল বটে, সুবুদ্ধি ঘটেছে ঘটে।

দিল্লীর দরবার।

শুনিলাম রাজভ্রাতা ডিউক অব কনট সস্ত্রীক আসিয়া আগামী শীতকালে অভিষেক কার্য্যে দিল্লীর দরবারে যোগ দিবেন। লর্ড কর্জ্জন পদত্যাগ করিবেন না। এ সম্বন্ধে যে গুজব উঠিয়াছে তাহা মিথ্যা। আর দিল্লীর দরবারে—ঠিক দরবার খরচার জন্য—মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। নিমন্ত্রিত সম্পাদকগণের অধ্যক্ষতা করিবেন সিবিলিয়ান শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইনি মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা। স্বধর্ম্মনিরত হিন্দু সম্পাদকগণের নিত্যপূজার জন্য ফুল বিল্বপত্রের নিত্য অয়োজন হইবে ত? আমাদের ছুটিই লাভ। কিন্তু সদাগর আফিষ খোলা থাকিবে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। দরবারের ডাইরেক্টরি শীঘ্র বাহির হইবে।

ভ্রান্তি-বিলাস।

বিলাতে অভিষেক উপলক্ষে অনেক রহস্য অভিনয় হইয়া গিয়াছে। একটি শুনুন। অধ্যাপক ডিওয়ার স্কচ বড় বৈজ্ঞানিক, অম্লজান উদজান বায়ু প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ ও গ্যাস তরল করিয়াছেন। ইঁহার কৃপায় যো করিলে আপনি এক চুমুক তরল বায়ু পান করিতে পারেন। আর একজন ডিওয়ার আছেন তিনিও স্কচ তিনি ডিওয়ার হুইস্কী মদের সত্ত্বাধিকারী। অভিষেকে অধ্যাপক ডিওয়ারের নিমন্ত্রণ হইবার কথা। কিন্তু কোনক্রমে হৌক আর রহস্যের খাতিরে হৌক নিমন্ত্রণ পাইলেন হুইস্কী মদের ডিওয়ার। বেশ নয়?

ঠাকুরের কথা।

একজন ভদ্রলোক গল্প করিয়াছিলেন যে তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে ঝুলান দেখিয়া আসিয়াছেন। নারায়ণ শিলা ক্রমাগত বাম দক্ষিনে তরঙ্গে তরঙ্গে দুলিতেছেন—বিরাম নাই বিশ্রাম নাই। দুলিলেন কোনরূপ যন্ত্র সাহায্যে—সম্ভবতঃ ঘড়ির কলের মত কোন কল—এই রূপ দোলন ক্রিয়া হইতেছে। গল্প শুনিয়া একজন শ্রোতা—"এ ঠাকুর কি অভিষেক দেখিতে বিলাতে গিয়াছিল?"

বক্তা—"না, যিনি গিয়াছিলেন তিনি জয়পুর ওয়ালার ঠাকুর। ইহাদের ঠাকুরের যাইবার আবশ্যকতা নাই।

শ্রোতা—কেন?

বক্তা—ইহাঁরা যে নিজেই ঠাকুর প্রদ্যোৎকুমার যিনি গিয়াছিলেন তিনি নিজেই ত ঠাকুর।

ফুলের কথা।

বাল্যকালে পিতামহীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে মনুষ্য জন্মলাভ করিবার অগ্রে আত্মাকে গো-জন্ম ও পুষ্প-জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। একজন মার্কিন ডাক্তার উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন গাছেরা গান শুনে, গান শুনিতে ভালবাসে, তিনি যখন বৈঠকখানায় সুরলয়ে গান গাহেন তখন আগ্রহ সহকারে ফুল প্রস্ফুটিত হয়, নাচিতে থাকে, তাহাদের শরীরে রস ছুটাছুটি করে। উত্তেজনায় মানুষের স্নায়ুতে যেমন রক্ত ছুটে সেই রূপ। আবার বিকট চীৎকার ও কর্কশ শব্দ করিয়া দেখিয়াছেন লজ্জাবতীর ন্যায় গাছগুলি মুড়িয়া যায়। অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত ফুল বুজিয়া যায়। শরীরে রস সঞ্চালন বন্ধ হইয়া থাকে। গাছেরা যে কিরণ সেবনে এইরূপ ব্যবহার করে তাহাও দেখিয়াছেন। এইরূপ স্নায়ুর জটিল ক্রিয়া মানুষে কেবল সম্ভব। ইতরেতর জন্তুর স্নায়ুর ক্রিয়া নাই। ডাক্তার বলেন পুষ্প জন্মের পর মনুষ্য জন্ম বিজ্ঞান সম্মত। স্নায়ুর জটিল ক্রিয়ায় তাহা প্রমাণিত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বান্ধব।—২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা। চৈত্র হইতে ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ। কিশোর গৌরাঙ্গ, স্বামী না ত কি? ছায়া দর্শন—তথা, ডবলিউ ব্রেণাণ্ড কৃত হিন্দু জ্যোতিষ, আর্য্য হিন্দু সমাজের সূচনা, আরাধনাতত্ত্ব, এই গুলি হইতেছে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বা ক্রমশঃ প্রবন্ধ, আরও অনেক বার বাহির হইবে। সুতরাং এগুলির প্রকৃত পক্ষে সমালোচন হইতে পারে না। এখন এ সকল প্রবন্ধের সমালোচনা প্রত্যাশা করা আর অধৈর্য্য উদর-পরায়ণের উত্তপ্ত-কটাহ-স্থিত অর্দ্ধপক্ক মাংস-ঝোল হইতে মাংস খণ্ড বা দুইটা আলু চাকা একই কথা। তাহাতে রান্নাঘরের পাচক ঠাকুরের যেমন বিরক্তি

সমালোচকেরও তেমনি বিরক্তি। কিন্তু আমরা জানি পাচকের তিরস্কার মাথায় করিয়া তবু মাংসখণ্ড বা আলুটা খাইতে হইবে—এমন রসনা-রসজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন। বঙ্গবাসীর "স্বামী না ত কি?" সমালোচনা আমরা এই মর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছি। এখন আলুটা দিব কি না পাঠক ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। অপর প্রবন্ধগুলি হইতেছে শিক্ষা ও বংশানুক্রমিকতা, কেন দেখিলাম, কবি শ্রীহর্ষ; নির্ম্মল উৎকর্ষ ও নেড়া হরিদাস। সলিল শয্যায় (কবিতা), নন্দন কুসুম (কবিতা), পূর্ব্বস্মৃতি (কবিতা), তারপর—তারপর এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রথমেই প্রবন্ধ পরিচয় দেওয়া উচিত। কিশোর-গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের বাল্যকালের বিবরণ বৈষ্ণবকবিগণের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের মন্তব্য সহ লেখক প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্থ সংখ্যায় শিরোবচন

ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর,
দেখি জগন্নাথ অতি আনন্দ অন্তর।

দেখিলে মনে হয় গৌরাঙ্গ ও তস্য ভ্রাতা বিশ্বরূপের বিবরণ। কিন্তু ঠিক তাহা নয়। সে যাহাহৌক এই প্রবন্ধ কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা এখন কেবল কল্পনার কথা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় অমিয় নিমাই চরিত আর কিশোর গৌরাঙ্গ—ডাউডেন (Dowden) আর গ্রিবিনস (Gervinus) না কি?

"স্বামী না ত কি?" মনে হয় লেখক "কথা" ("তার পর—তার পর" দেখ) লিখিতেছেন। "ছায়া দর্শন"—প্রেতের কথা। মনে হয় পরলোক আছে—এইটিই প্রমাণ করা লেখকের উদ্দেশ্য। বুঝা যায় গ্রন্থ হইবে—উদ্দেশ্য ভাল। ব্রেণাণ্ড কৃত হিন্দু জ্যোতিষ আর্য্য হিন্দু সমাজের সূচনা—নামেই সপ্রকাশ। "আরাধনাতত্ত্ব" গীতার কৃষ্ণোক্ত কর্ম্মযোগ। "শিক্ষাও বংশানুক্রমিকতায়" বলা হইতেছে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহার কারণ শিক্ষা পুরাতন দার্শনিকেরা বলিতেন। এখনকার মত বংশানুক্রমিকতা (heredity) এবং আধ্যাত্মিক প্রণোদনা (psychological suggestion) "কেন দেখিলাম"—সলিল সিক্ত সূক্ষ্মাম্বরে সোণার অঙ্গ আবরিয়া ও আর্দ্র কেশরাশি পৃষ্ঠে দোলাইয়া, তটিনীর তটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এক সুন্দরী—তাহার অদূরে অধিকতর সুন্দর সোণার পুতুলের মত মনোহর একটি সুকুমার শিশু। এই রূপ লহরী আঘাত করিয়াছে

লেখকের হৃদয়ের নিভৃত কন্দর – প্রতিঘাত স্বরূপ পাইয়াছি ভাবোন্মাদ ও ভাবোচ্ছ্বাস। লেখক ডুবিয়াছেন, ইন্দ্রিয় পথে পান করিতেছেন, সমাধিতে অনুভব করিতেছেন, বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে একই বস্তু পাইতেছেন – সত্যং শিবং সুন্দরং। তখন কে যেন কানে কানে কহিল "রূপ দেখিয়া নয়ন জুড়াও, রূপ দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর – এবং রূপনিধানকে প্রাণের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া চির জীবনের জন্য কৃতার্থ হও।" যে হৃদয় এ রূপ দেখিবে, এ রূপের উপাসনা করিবে তাহাকে লালসা পিপাসা ও পরিতাপের আগুণে পুড়িয়া পবিত্র হইতে হইবে – নতুবা নহে।

শ্রীহর্ষ – লেখক বলিতেছেন আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত শ্রীহর্ষ বা হর্ষ বর্দ্ধনই যে নিষধের কবি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। "নির্ম্মল উৎকর্ষ ও নেড়া হরিদাস" – বান্ধবের "নেড়া হরিদাসের" সুদীর্ঘ সমালোচনা। "এসকল ক্ষুদ্র দোষ সত্ত্বেও মোটের উপর গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়।"

বান্ধবের তিনটি কবিতার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। "তারপর – তারপর" প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের শত্রু ছিল – কবিতা, এমন কি আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত কবিতায় লেখা। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের শত্রু হইতেছে "কথা"। এখন কথা অর্থে কি বুঝিবেন? নবেল না কাব্য না দুই-ই?

ভরসা করি প্রবন্ধ পরিচয় একরূপ দিতে সক্ষম হইয়াছি। যা একটু বাকি আছে – "ছায়াদর্শন" অর্থাৎ প্রেতের কথা পাঠক কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বান্ধবের একটি গল্পের মর্ম্ম দিলেই বুঝিতে পারিবেন। একজন মধ্যবিত্ত ইংরেজ ভদ্রলোক নাম ওয়াকার ডারহাম শায়রে চেষ্টার-লী ষ্ট্রীট নামক স্থানে বাস করিতেন। গৃহিণী মরিয়া গেলে সংসার অন্ধকার দেখিলেন – সবই আছে অথচ গৃহিণী না থাকায় কিছুই নাই। দূর-সম্পর্কীয়া যুবতী কুটুম্বিনী কিছু দিন পরে আসিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইলেন, আবার সবই হইল। যুবতী বোধ হয় বিবাহের আশ্বাস পাইয়া থাকিবেন সেই কারণে বা যে কারণেই হৌক তাঁহার অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হইল। পাড়ায় কানাকানি হইল। তারপর একদিন যুবতী সন্ধ্যাকালে সার্প নামক ওয়াকারের একজন অনুগত লোক সঙ্গে কোথায় চলিয়া গেল। সার্প খনিতে কয়লা খুঁড়িত। অনেক দিন গেল ওকথা চাপা পড়িয়া গেল।

গ্রেহাম নামে একজন কামার ওয়াকারের প্রতিবেশী ছিল। শীতকালের গভীর রজনীতে গ্রেহাম দোকান বন্ধ করিয়া আলো হাতে বাড়ী যাইতেছে এমন সময় দেখিল – রমণী মূর্ত্তি – কেশপাশ উন্মুক্ত – মস্তকে কয়েকটা অস্ত্রাঘাত চিহ্ন। ঐ সকল ক্ষত স্থান হইতে অনবরত রুধির নির্গত হইতেছে গ্রেহাম চক্ষু মুদিল, ভগবানের নাম করিল, পুনরায় চাহিয়া আবার সেই মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিল। মূর্ত্তি বলিল যে সে ওয়াকারের বাটীতে ছিল গর্ভ হইয়াছিল। ওয়াকারের পরামর্শ মতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত কোন নির্জ্জন স্থানে থাকিবার জন্য সার্পের সঙ্গে যাইতেছিল, কথা ছিল প্রসবের পর সুস্থ হইলে আবার ওয়াকারের বাটীতে ফিরিয়া আসিবে। পরে বলিতে লাগিল, "আমি বিশ্বাস করিয়া যাইতে যাইতে যেমন একটা জনশূন্য বিলের নিকট পঁহুছিলাম অমনি সার্প কয়লা খননের কুঠার লইয়া আমার মস্তকে বারম্বার আঘাত করিল। দুঃসহ যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া অচেতন হইলাম চেঁচাই-বারও সময় পাই নাই। চৈতন্য হইলে দেখিলাম আমার ক্ষতবিক্ষত দেহ মাটিতে পড়িয়া, আমি দেহ হইতে বাহির হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। সার্প দেহটাকে দ্রুতপদে একটা কয়লার গর্ত্তে ফেলিয়া দিল, কুঠারটাও রাখিল জুতা ও মোজায় রক্ত লাগিয়াছিল বিস্তর ধুইল কিছুতেই রক্তের দাগ উঠিল না তাই জুতা ও মোজা তথায় পুঁতিয়া রাখিল। গ্রেহাম, প্রতিহিংসায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছি মাজিষ্ট্রেটকে খবর দাও। তাহা হইলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। গ্রেহাম কিছু করিল না – হাকিমকে জানাইল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী আসিতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার সেই মূর্ত্তি দেখা দিল। বলিল, "এখনও খবর দাও নহিলে তোমার ভারি অকল্যাণ। মূর্ত্তি আকাশে মিশিয়া গেল। গ্রেহাম তবু কিছু করিল না। কিছু দিন পরে খৃষ্টম্যাস সময়ে গ্রেহাম বাগানে বেড়াইতেছেন এমন সময় সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার সেই মূর্ত্তি দেখা দিল। বলিল "এখন পালাবি কোথা" মূর্ত্তির রাগ দেখিয়া গ্রেহাম বলিল, "আমি কালই মাজিষ্ট্রেটকে বলিব, আমাকে ভয় দেখাইও না।"

গ্রেহাম বলিল মাজিষ্ট্রেট বিশ্বাস করিল না। কিন্তু গ্রেহামের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শেষে তদন্ত আরম্ভ করিল। গর্ত্তে মৃতদেহ পাওয়া গেল, বরফে শরীর ঠিক ছিল, মস্তকে আঘাতের ৫টা বড় বড় চিহ্ন। কুঠার, জুতা,

মোজা সবই মিলিল। সনাক্ত হইল। বিচার হইল। ওয়াঁকার ও সার্পের ফাঁসি হইল। ছায়ামূর্ত্তি জজ ও জুরিপতিকেও দেখা দিয়াছিল। জজ এই ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের বিষয় স্বয়ং সার্জেণ্ট হটনকে পত্র লিখেন। সেই পত্র হইতে এই কাহিনী সংগৃহীত।

লেখক এই কথা বলিয়া, বলিতেছেন—পরলোক সত্য, এবং পরলোকের বিচার ও দণ্ড পুরস্কারও পরম সত্য।

এখন আমাদের দুই চারিটা কথা, বান্ধব, এখন কথা হইতেছে যে, প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন না দশটার একটা? আমরা দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে পারিলাম না বাধ্য হইয়া বলিতেছি দশটার একটা। মৌলিক ভাব, মৌলিক গবেষণা, কই? অনেক স্থলে ভাষার দোষ দেখিলাম। আরও দেখিলাম পূর্ব্ব-বঙ্গের চলিত ভাষাকে জোর করিয়া সাহিত্যের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা। অনেক স্থলে এই ব্যাপার দেখিয়া মনে হইল এটা একটা মৎলবের উপর হইতেছে। আমরা সৌখীন কবিতার সৌখীন "কথার" চিরকাল বিরোধী, দেখিলাম বান্ধবেরও সেই মত, বান্ধবের দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যায় একটিও কবিতা বা পদ্য নাই কিন্তু চতুর্থ সংখ্যায় একেবারে তিনটি পদ্য বা কবিতা। মাসিক সাহিত্যে একেবারে কবিতা থাকিবে না তাহা বলি না—তাহা কেহই বলিবেন না, কেবল "পূর্ব্ব স্মৃতি" থাকিলে কিছুই বলিতাম না। কিন্তু "সলিল শয্যার" ও "নন্দন কুসুমের" প্রকাশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আরও বিস্মিত হইলাম 'নন্দন কুসুমে' বান্ধব সম্পাদকের টীকা দেখিয়া। মিছরীর সরবৎ, বান্ধবই বলিয়াছেন, সকল সময়ে ভাল লাগে না, আর দেওয়ারও বিধি নহে। এখন গুরুপাক হবিষ্যান্নের বিশেষ আবশ্যকতা, তাহার পর সরবতের প্রয়োজন হইতে পারে। আর ভরষা করি mutual adulation society র পাপ বঙ্গ সাহিত্যে প্রশ্রয় পাইবে না, এবিষয় ইঙ্গিতই যথেষ্ট মনে করি। বান্ধবকে বড় ভাল-বাসি তাই এত কথা বলিলাম। কতদিনে আমরা বান্ধবকে মাসিক সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে পারিব?

সুলভ সংস্করণ।

২০শ বর্ষ—৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক—১৩০৯।



মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ; শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ; শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ; শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়; শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। আলোচনা	১৭৫
২। শাক্যসিংহ	১৭৯
৩। উড়িষ্যা পাকনী	১৮৫
৪। মহাযাত্রা	১৯৩
৫। নীলাম্বরে কাকমেঘ	১৯৪
৬। গণাই পুরুত	১৯৫
৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	২০১

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ বেদান্তবাগীশ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী,

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—১০ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় সমূহ—

(১) শোভাবাজার শাখা, ৩৯ নং অপার চিৎপুর রোড;

(২) বড়বাজার শাখা, ২৮৬ নং হারিসন রোড;

(৩) ঢাকাপুর শাখা;

(৪) পাটনা শাখা;

(৫) ডালহাউসি স্কোয়ার শাখা, ১নং গুড় কোর্ট হাউস

কর্ণওয়ালিস (৬) মথুরা শাখা।

সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাক্স, ঔষধের শিশি, ছুরী কাঁচী, ডাক্তারের ইত্যাদি অর্থাৎ ডাক্তারদিগের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য যথা মূল্যে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

আমাদিগের নিকট সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রয়ার্থে মজুত আছে।

মূল্য ৷৷০ গিনি। ক্ষুদ্র প্রকাশ। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা

ডাক্তার সত্যচরণ লাহিড়ী কৃত। মহামতি ডাক্তার এলেন সাহেবের পুস্তক হইতে সঙ্কলন করা হইয়াছে। ইহা অতি চিকিৎসার পক্ষে অতি উপযোগী পুস্তক।

সাবধান।

কাপনী সাহেবের ডাক্তারি প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত হইলে যে ওষধি সম্বন্ধে মহোপকার হইয়া থাকে তাহা বোধ করি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এক্ষণে শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই সাবধানে করিতে পারেন এবং ইহাতে অসাধুলোকগণ যেরূপে সকলকে মুগ্ধ করিবেন সে বিষয়ে সাবধান নাই।

মূল্য ছোট শিশি ৪ ড্রাম ৷৷০ আনা।

,, বড় শিশি ১ আউন্স ৷৷০ আনা

আত্মোৎসর্গ।

কি দিব চরণে মাতঃ কি আছে আমার।
এহেন শারদ মাসে চরাচর মহোল্লাসে
পূজিছে অভয়পদ, জননি, তোমার।

ঢালে সুধা শশধর নীল নভস্তলে
সেফালিকা সারারাতি ঢালে পদে ফুল পাতি
সরোবর করে পূজা শ্বেত শতদলে

গায় পাখী স্তুতিগান পুরিয়া কানন।
স্রোতস্বতী পূতনীর ঢালে পদে জননীর
মলয় সমীর করে মৃদুল ব্যজন।

আপনি প্রকৃতি ঢালে প্রীতি উপহার।
বিশ্বব্যাপি আয়োজন নিরখি মোহিত মন
কি দিব চরণে মাতঃ কি আছে আমার।

তব যোগ্য উপচার পাইব কোথায়।
অকাজে যাপিয়া দিন আমি মা সম্বল হীন
কি দিয়া পূজিব মাতঃ না দেখি উপায়।

শুনি নাকি ভালবাস পবিত্র হৃদয়।
ভক্তিপূত আত্মাপ্রতি সতত তোমার প্রীতি
তাই মা কল্পনা এই মানসে উদয়।

মলা মাটী ভক্তি নীরে ধুইয়া যতনে,
ভুলিয়া অনিত্য খেলা জুড়াতে ভবের জ্বালা
করিব মা আত্মদান তোমার চরণে।

সসীম এজীব টুকু অসীমে মিশা'য়ে
নাশিব কৃতান্ত ভয়, গাইব তোমার জয়
অনুভবি অমরত্ব আত্মহারা হ'য়ে।

লও, মা, এ আত্মা খানি পদতলে লও।
আপনার বস্তুজ্ঞানে রে'খো এরে সযতনে
সুপথে ইহারে মাগো সতত চালাও।

তোমার এ স্থাপ্যধন তোমারে অর্পিয়া,
স্বর্গীয় আনন্দে এবে ফাঁকি দিয়া রিপুসবে
বিচরিব রাজ্যে তব উন্মুক্ত হইয়া।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদীয়া।

এক্ষণে আর বর্ষার বৃষ্টি অনবরত বর্ষণ করে না, বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে শরৎকাল আসিয়াছে। বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারময় গগণমণ্ডল বিনির্মুক্ত হইয়া সুদূর অনন্তব্যাপী সুনীলাম্বর সুপবিত্রভাবে দিঙ্মণ্ডলোদ্ভাসি হইয়াছে। তাণ্ডবতরঙ্গ সংক্ষুব্ধ প্রচণ্ডাবর্ত্তময়ী কল্লোলিনী স্রোতস্বতী আর এখন সে বেগবতী উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্র তটিনী বীচিমালা আর খরস্রোতে দুকুল ভাঙ্গিয়া কাহারও ক্ষতি করি প্রবাহিত হইতেছে না। শরৎ সমাগমে সবই যেন গুরু গাম্ভীর্য্যভা মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে, হাস্যময়ী প্রকৃতি দেবী জীবনীশ সঞ্চারিত করিয়া মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া সমুজ্জ্বলভাবে বিরা করিতেছেন। নবদুর্ব্বাদলশ্যাম শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, শ্বেতমেঘ সমন্বিত নভোমণ্ড সদ্য সুধা পরিস্নাত সুনির্ম্মল শরচ্চন্দ্র, উপবন প্রস্ফুটিত কহ্লার, মানব

রণ মুগ্ধ করিয়া পবিত্র আনন্দ, প্রাণমন আন্দোলিত করিতেছে। যদি তরঙ্গ কুল কলনাদিনীর শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিতে চাও, যদি হরিদ্বর্ণ শস্য শোভা খিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে এই শরৎকালের দিকে দৃষ্টিপাত কর। দি সুবিমল সুধাংশুদেবের বর্ষিত সুধা আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে চাও, হা হইলে সুধাকরের স্নিগ্ধ রশ্মিতলে উপবেশন কর, প্রাণমনে বিমল সুধা শি বর্ষিত হইবে। শারদীয় প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য সাদৃশ তুলনা বিরল। গো মরি! এখন সকলেই কমনীয় সুস্থির, প্রশান্ত সৌন্দর্য্যশালী। বর্ষা-লের সেই দুঃখিনী মলিনা প্রকৃতি দেবী আজ লক্ষ্মী স্বরূপিনী, রাজরাজে-রী হইয়াছেন, সেই সন্তাপিনী অশ্রুমুখী দেবী আজ স্নেহময়ী হাস্যে সহাস্য মুখময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সুনির্ম্মল রূপ সাগরে অঙ্গ ঢলঢল করিতেছে, র সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিলে কাহার হৃদয় ও মনে না প্রেমভক্তি লীপিত হইবে? কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি না শারদীয় সৌন্দর্য্যের প্রভূত খ্যান গাহিবে?

আজ ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গবাসী সম্বৎসরের বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়াছে, শোকতাপ র গিয়াছে, চির দুঃখাভিভূত বঙ্গবাসীর মুখে আনন্দের জ্যোতি প্রতিভাত। বিত মৃগ যেন মরুদ্যান পাইয়াছে, মুক যেন বাকশক্তি লাভ করিয়াছে। ভক্ত সন্তানগণ মনঃসংযোগে পুলকিত অন্তরে মাতৃ চরণে প্রণাম রিয়া, আদ্যাশক্তি দেবীর অধিষ্ঠানে অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে মাতৃ ভূমিকে সুচারু কার্য্য দ্বারা সুন্দর রূপে সুসজ্জীভূত করিতেছে। সে সাজ ঠাক ঠমক দৃশ্য। বহুদিনের পর দশভুজা প্রতিমার ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি পূজামণ্ডপ বিস্তৃত চন্দ্রাতপ দেবীর আভায় আলোকিত করিতেছে। যে কোন মর্ম্ম-ড়িত আজ দুর্গা প্রতিমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছে, আর মনে মনে কে ডাকিতেছে, মাতৃচরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া অনশনে কঙ্কালাবশিষ্ট দেহের ৎসভাব ধারণ করিতেছে। দারিদ্র্যতার আধি ব্যাধি শোকতাপ পীড়িত ব্যক্তিগণ কত মনের দুঃখ জানাইতেছে, কত দয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা হিতেছে। সকলেই মার স্নেহময়ী মূর্ত্তি দর্শন পাইয়াছে, বঙ্গবাসী আজ চরণে প্রাণোৎসর্গ এই অনিত্য জীবন সার্থক করিতেছে। তাই তিন নের জন্য সকলে একত্রিত হইয়া আনন্দময়ী বিশ্বজননীর অভয় চরণ হৃদয়ে ণ করিয়া মা চৈতন্যময়ী, চৈতন্য দিন বলিয়া ভক্তিভরে মাকে প্রাণ

খুলিয়া ডাকিবে, আর তাঁহার শ্রীচরণে গললগ্ন কৃতবাসে জন্ম নি
পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

শাস্ত্রে কথিত আছে, বিষ্ণুকর্ণমূলোদ্ভূত মধুকৈটভ দৈত্য ভয়ে দেবগ
দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, পরে দুর্দ্দমনীয় মহিষাসুর সংহারের জ
তৎপরে রক্তবীজ চণ্ড মুণ্ড ও দুর্দ্দান্ত প্রচণ্ড শম্ভু নিশম্ভু বধের জন্য দেবী
আরাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। এক দিন রামচন্দ্র লঙ্কাপু
রাবণ বধের জন্য অকালে ব্রহ্মার আজ্ঞায় অসুর দলন করিবার জন্য অসু
দলনী মায়ের অকালে উদ্বোধন করিয়াছিলেন। হনুমান আনীত অষ্টোত্ত
নীলপদ্ম অপহৃত হইলে সেই নবদুর্ব্বাদলশ্যাম স্বীয় নীলপদ্ম নয়ন উন্মী
করিয়া প্রসন্নময়ী মাকে প্রসন্ন করিয়া পূজা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন
আদ্যাশক্তির অপার মহিমা প্রভাবে প্রভাবান্বিত রঘুবীর স্বীয় ভুজব
বিপুল রক্ষকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রবণ বাঙ্গালী সেই অতীত
স্মৃতি লইয়া মাতৃরূপ কল্পনা করিয়া প্রগাঢ় প্রেমভক্তি সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মময়
ত্রিগুণ মূর্ত্তিরূপা মূর্ত্তি সংগঠিত করিয়া মাতৃ পূজা করে।

আয়োজন।

দুর্গোৎসব আয়োজনে সকলেই শশব্যস্ত। মা দুর্গা পূজায় হিন্দুর এ
প্রগাঢ় প্রেমভক্তি সংযতচিত্তে দুর্গানাম জপ ও এই মাতৃ ক্রোড়ই হিন্দু
শান্তিনিকেতন তাই দুর্গোৎসবামদে দুর্গতিনাশিনীর দুর্গানামই মা মা ধ্বনি
সকলের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত
দুর্গানাম শরণ করিয়া হিন্দুরা মার অভয়পদে বিলুণ্ঠিত হইবে, তাই মা তোমা
আগমনে তোমার এই নিঃস্ব সন্তান মা কুলদায়িনী কুল দিবেন বলি
মুখ তুলিয়া চাহিতেছে। বিশ্বব্যাপী মা আনন্দময়ী নামের গুণ কীর্ত্তন দা
নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত ছাইয়াছে। এখন যে দিকে যাও যে দিকে চাও সর্ব্বত্র
মা নামের আনন্দোৎসবে মাতিতেছে, সুখের প্রস্রবণ ছুটিতেছে, কোটী কো
কণ্ঠের আনন্দের ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইতেছে, মা জগজ্জননীকে প্রাণ
এক করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ডাকিতেছে। এই বিজন শ্মশানে কেন আ
এ মঙ্গল বাজনা বাজিতেছে? শিবা ও শকুনি পূর্ণ কঙ্কাল বিস্তৃত ও মনু
দেহ দগ্ধীভূত ভস্মাবশিষ্ট স্থানে কেন আজ এ অভাবনীয় সমাবেশ? কে
আজ দ্বারে দ্বারে সারি সারি পূর্ণ কুম্ভ শোভা পাইতেছে; কেন আজ দে

সিংহাসনে আলপনা, কেন আজ বিল্বমূলে ও বোধন ঘরে অম্বুগর্ভ নারিকেল
ফল ও শাখা শাখাপল্লবাদি যুক্ত শুভ ঘট স্থাপিত ও আনন্দ প্রদীপ জ্বালিত
কেন? সর্ব্বত্রই মা মা উত্তরোল কেন? ঘরে ঘরে আনন্দের হাট কেন?
কাহার শুভাগমে আজ এ পবিত্র আনন্দ প্রস্রবণ? জ্যোৎস্না বিধৌত
নিহার সিক্ত শারদীয় কুসুম নিচয়ের সৌগন্ধ প্রাতঃসমীরণে মৃদুমন্দ বাহিত
হইয়া কাহার আগমন বার্ত্তা তড়িদ্বেগে প্রচার করিয়া দিতেছে।

মা আনন্দময়ী জগজ্জননী তুমি কি আসিতেছ, তাই কি জগৎ এত
আনন্দময়। মা জগদম্বা তুমি কি তোমার চির বিজিত দুর্ব্বল বঙ্গবাসীকে
অভয় দিতে আসিতেছ। সেই জন্যই কি বঙ্গবামা সালঙ্কৃতা হইয়া পূর্ণ
কুম্ভ কক্ষে লইয়া তোমার সম্ভাষণের জন্য হুলুধ্বনি দিতেছে, সেই জন্যই কি
ঘরে ঘরে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর নিনাদিত হইতেছে, সেই জন্যই কি হিন্দু যুবক
আনন্দপ্রদ আগমনী সংগীত গাহিতেছে।

প্রতিমা রচনা।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাধিকরণে, দেশ কাল পাত্র ভেদে দেবী প্রতিমা সংগঠিত
হইয়া থাকে। বঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণনগরে দেবী প্রতিমা নির্ম্মান প্রণালীর
উৎকর্ষ হয়। এক্ষণে কুলপ্রথা অনুসারে কোথাও দেবী মূর্ত্তি দশভূজা,
কোথাও দেবী অষ্টভূজা, কোথাও বা দেবীর চতুর্ভূজা মূর্ত্তি সংগঠিত হয়,
কখন নীল, কখন কাল, কখন রক্ত বর্ণ ইত্যাদি, বিভিন্ন আকারে রচিত
হইয়া পূজা হইয়া থাকে। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহোপরি স্থাপিত।
সিংহ অর্থে চিন্ময়ীর চৈতন্যযুক্ত শক্তি। বাম পদ ঊর্দ্ধ করিয়া তদঙ্গুষ্ঠ
মহিষাসুরোপরি রাখিয়াছেন, নিম্নে রত্নাসনে ছিন্ন মস্তক মহিষ পতিত, মহিষ
বলিতে ক্রোধ আর মহিষ হইতে প্রকাশিত অসুর মূর্ত্তি শত্রু অর্থাৎ
তমোরূপাশক্ত পাশবিক শক্তি। চম্পক বরণি হেমাঙ্গিনী নবযৌবন সম্পন্না
ঘন লাবণ্যময়ী বিহিত অলঙ্কার বিভূসিতা মনোহর স্নিগ্ধ নয়ন সম্পন্না
পীনোন্নতপয়োধরা বঙ্কিম সুঠাম সমন্বিতা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশহস্ত সমবেষ্টিতা
হইয়া কল্যাণীরূপে বিরাজমানা। নবযৌবন সম্পন্না বাঞ্ছাকল্পতরু অনন্ত
সৌদামিনী প্রভাসম বদনমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাশন স্বরূপ ত্রিনয়ন-
বিস্ফারিতা দক্ষিণভাগে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও বামভাগে দেব সেনাপতি
কার্ত্তিকেয়। বামভাগে বাগবাদিনী সরস্বতী ও দক্ষিণে সম্পদ্দাত্রী কমলা

অবস্থিতা। গণপতির দক্ষিণভাগে নব পত্রিকা দুর্গাদেবী অর্থাৎ কলাবৌ। ইহা নব বৃক্ষশাখা সংগঠিত হইয়া অপরাজিতা সূত্রে বেষ্টিত ও বস্ত্রাবৃত হয় বলিয়া নব পত্রিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূজা বিধি।

শরৎকালে শারদীয় দুর্গা পূজা, তাই নিদ্রিত দেবীকে বোধন (জাগ্রত) আরাধনা করিবার শাস্ত্রাজ্ঞা আছে। রঘুবীর রামচন্দ্র সত্বরে দেবীকে পূজা করিতে মনস্থ করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। কুলপ্রথা অনুসারে বিল্ববৃক্ষ মূলে দেবীর আমন্ত্রণাদি অধিবাস হইয়া থাকে। আর্য্য শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ পূজাবিধি নিরূপিত হইয়াছে। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্বিক পূজায় গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট সাধক ভক্ত, যতিস্বরূপ পবিত্র মনে স্বয়ং পূজা করিয়া কৃতার্থ জ্ঞান করেন। বলিদান সামিষ, নৈবেদ্য, জপ ষোড়শোপচার, বিরহিত অন্ন ব্যঞ্জন (রন্ধন উপচার) দ্বারা পূজা রাজসিক পূজা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মন্ত্রহীন দেবীর অর্চ্চনা তামসিক পূজা নামে কথিত হয়। কুল প্রথা অনুসারে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ঘট, পট, পূজা পদ্ধতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এরূপ পূজাতে যুগপৎ একই ফললাভ হয়, তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত। সুরথ রাজা রাজসিক পূজায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পুনঃরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অষ্টমী ও নবমী পূজা, বিশেষতঃ অষ্টমীর শেষভাগে ও নবমীর প্রারম্ভে অর্থাৎ (সন্ধিক্ষণে) সন্ধিপূজা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়।

প্রার্থনা।

মা চৈতন্য স্বরূপিনী! হৃত সর্ব্বস্ব সন্তানের বল, বুদ্ধি, সাধনা, সিদ্ধি, মঙ্গল সম্পদ, শিব, অশিব কেহই তোমার ভিন্ন নয়, সর্ব্বত্রই সকল বস্তুই তোমার করতলস্থ। এই যে মহাপ্রলয়, বিপদ সঙ্কুল দুঃখ তরঙ্গ শোক তাপের ঝঞ্ঝাবাত, দারিদ্রতার আবর্ত্ত, রোগের যন্ত্রণা প্রপীড়িত তোমার সন্তানগণ মৃতবৎ হইয়াছে, তাঁহা কি তোমার কিছু অজ্ঞাত আছে? তাই বুঝি সেই মঙ্গল নিধান শিব মূর্ত্তি তোমার ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া নিজমায়া শক্তি দেখাইতে নিম্নে স্থান লইয়াছ। শিব যেখানেই থাকুন না কেন সর্ব্বদা তোমার ভুবনমোহিনী রূপেই শিবের একমাত্র লক্ষ্য। তখন শিবের বাহ্য জ্ঞান ছিল, এখন শিব পাগলা ভোলা, তাই এই রূপে মর্ত্তে

পূজাগ্রহণ করিতে আসায় আকাশ পাতাল প্রভেদ, এখন শিব সেই পূজার দিন ভুলে গিয়ে কেবল স্থির দৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া আছেন, জীবের প্রতি শিবের কৃপা দৃষ্টি লোপ হইয়াছে, তাই সন্তানের এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মা আর তোমার এ অবস্থায় থাকা ভাল দেখায় না। একবার তোমার সন্তানের দিকে করুণা দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ দেখি? সে দিনে আর এদিনে কত প্রভেদ। তাই শিব আর নীচের দিকে তাকান না। আর ভুমিত মায়া দৃষ্টি ছাড় না। তাই বুঝি মা তোমার সেই প্রলয়রূপিনী মূর্ত্তির বিকাশ মহাপ্রলয়! ওমা তোমার দয়াত সকলেরই উপর সমান, তবে এ বাছাবাছি কেন মা, কুসন্তান বটে কুমাতা ত নয়? তুমি মা সকলকে সমান চক্ষে না দেখিলে জীবকে আর কে সমান চক্ষে দেখবে? তোমার সন্তানগণকে আজ তোমার পূজার দিনে তোমার মূলাধার স্থানেই হউক, আর শিব স্থানেই হউক, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে লইয়া যাও, তোমার সন্তানগণ আজ সেই তোমার মূলাধার শক্তি উপলব্ধি করে পরম তৃপ্তিলাভ করুক, কৃতকৃতার্থ হউক।

মা কুলদায়িনী দেখ তোমার কৃপা দৃষ্টি অভাবে, সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারতে থাকিয়া কত কষ্ট সহ্য করিতেছি, তবুও তৃষিতের জল, ক্ষুধার অন্ন পইতেছি না, অনশনে অর্দ্ধাসনে দৃষ্টিশক্তি হীন হইয়াছি। তথাপি না আজ তোমার আগমনে সকলি ভুলিয়াছি তোমার সেই যুগ্ম শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পাইয়া সকল শোক তাপ ভুলিয়া আবার তোমার পূজা করিব, অশ্রুনীরে আবার তোমার অভিষেক করাইব, ভক্তিবিমল পুষ্পে আবার পূজা করিব। এস ভাই শোকার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত বঙ্গবাসী আমরা ভক্তি গদগদ চিত্তে আজ মায়ের চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিব, আমরা সেই শিব বাঞ্ছিত পরম রত্ন লাভ করিয়াছি। এমন সুবর্ণ সুযোগ আর হইবে না, মায়ের জন-মনমোহিনী-প্রতিমা পূজা করি, আর সবান্ধবে ডাকি, মা দয়াময়ী আমাদের সকল যন্ত্রণা দূর কর।

এস শাক্ত, এস শৈব, এস গাণপত্য প্রভৃতি ভক্তগণ! আজ আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়া মায়ের মোক্ষমূলাধার পদে অর্পণ করিয়া নর নশ্বরতা অপনোদিত করি, মুক্তি জন্য ভিক্ষা করিয়া বলি—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যাতি হরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীরজনীকান্ত ভক্তিবিনোদ।

উড়িয়া কাহিনী।

"অম্বুজ মণি" বা "চারি সঙ্গাত"।

এক দেশে এক মহাজন ছিল। তার দুটি ছেলে। মহাজন একদিন ওদের ডেকে বল্লে "বসে খেলে নদীর বালিও ফুরোয়, তোমরা কিছু কিছু উপায় কর। আমি তোমাদের এক একশ টাকা দিচ্ছি, তোমরা গিয়ে ব্যবসা-বানিজ্য কর। বিদেশে যাও, কে কি রোজগার করে আন্‌বে দেখ্‌বো"। এই বলে তাদের একশ করে টাকা দিলে। বড় ছেলে যেতে যেতে রাস্তায় এক জায়গায় দেখ্‌লে, একটি "কেলা" একটি শুক্‌পাখি নিয়ে যাচ্ছে। কেলা বল্লে, কুড়ী টাকা হলে এই শুকপাখিটি বিক্রি কর্ব্বে। মহাজনের ছেলে কুড়ী টাকা দিয়ে পাখিটি রাখলে, তারপর আর কিছু দূর গিয়ে একটি লোক একটা লেউল নিয়ে যাচ্ছে। কুড়ী টাকা দিয়ে সেইটি কিন্‌লে। তারপর দেখ্‌লে একটি লোক একটি ওধ নিয়ে যাচ্ছে। কুড়ী টাকা দিয়ে সেটিকেও কিন্‌লে। আবার খানিক গিয়ে দেখলে, একটা লোক একটা সাপ্ ঝুড়িতে পুরে নিয়ে যাচ্ছে। কুড়ী টাকা দিয়ে সাপটিকেও কিন্‌লে। এই রূপে চার কুড়ী টাকা ফুরুল আর কুড়ী টাকায় নিজে খেয়ে ও তাদের খাইয়ে খরচ করে তাদের নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

ছোটটিও একশ টাকা নিয়ে বিদেশে গেছল। ফিরে আসিবার সময় চারশ টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরলে, মহাজন ছোট ছেলের বিষয় বুদ্ধি দেখে তাকে ঘর দোর সব সঁপে দিলে। বড় ছেলেকে ঘা কতক দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিলে। বড় ছেলেটি সেই চারটি জন্তু নিয়ে গাছের তলায় গিয়ে

বোস্‌ল। তাদের বল্লে, যার দেশে যে চলে যাও, আমি তোমাদের আর খেতে দোব কোথেকে? ওরা বল্লে, "আজ থেকে তুমি আমাদের সেঙ্গাত হলে। যখন তোমার কোন বিপদ ঘট্‌বে, আমাদের স্মরণ কল্লেই আমরা এসে হাজির হব। এই বলে শুক, ওধ এবং লেউল বনে গেল। সাপ বল্লে, "সেঙ্গাত, চল আমাদের দেশে যাবে। আমার বাপ মা আছে, ওদের যা চাইবে, তারা তা দেবে"। মাহাজনের ছেলে ওই সাপের সঙ্গে গেল। গিয়ে নাগরাজার দেশে পৌছুল। সাপের মা বাপ সাপকে দেখে বড় খুসী হল। সাপ বল্লে, "তোমরা আমাকে পেতে কোথেকে? সেঙ্গাত কুড়ী টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে। ওর কথা আগে বোঝ, তার পর আমার খবর বুঝবে"। তাতে তার বাপ মা মহাজনের ছেলেকে খুব আদর কল্লে, ভাল ভাল জিনিস এনে খেতে দিলে, শুতে ভাল খাট বিছানা দিলে। বিদায় হবার সময় ওকে একটি মণি দিলে ও বল্লে "এ মণি যার হাতে থাক্‌বে তার। ওকে যা বল্‌বে, ও তাই করবে। এর নাম অম্বুজ মণি"। মহাজনের ছেলে মনিটি নিয়ে ফিরল। আসতে আসতে রাস্তায় এক রাজার দেশ পড়ল। মহাজনের ছেলে মণিকে জিজ্ঞাসা কল্লে "হাঁরে মণি, তুই কার" মণি বল্লে, "যার হাতে আছি, তার" ও মণিকে বল্লে, "রাত্রের মধ্যে এই রাজবাড়ীর সাম্‌নে হীরে, জহরৎ, মতি, মাণিক প্রভৃতিতে একটা রাজবাড়ী হবে পুকুরের সাম্‌নে "শঙ্খ মরমর" পাথরের এক পুকুর হবে। বাগানের সাম্‌নে রূপোর গাছ, সোনার ফুলের এক বাগান হবে।"

সত্যি সত্যি সকাল সকলে উঠে দেখে যে এই ব্যাপার। দেশ শুদ্ধ লোক দেখে অবাক। মহাজনের ছেলে নতুন রাজবাড়ীর ভেতর থাকে। রাজা যখন বাইরে বেরোন, সেও তখন বাইরে বেরোয়। রাজা পুকুরে গেলে সেও যায়, রাজা বাগানে গেলে, সেও নিজের বাগানে যায়। এই রকম দিন কতক গেল। তারপর এক দিন রাজা মাহাজনের ছেলের বাড়ীতে গেলেন ওর সঙ্গে অনেক সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা হল। বল্লেন, "আমার ছেলে নাই। একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দোব। রাজ্যও তোমাকে দোব। কিন্তু তুমি এ সব পেলে কোথা বল্‌তে হবে।" মহাজনের ছেলের মনে খল কপট নাই। সে রাজাকে সব কথা বলে ফেল্লে। কি রকমে রাজা ওই মণিটিকে হাত কর্ব্বেন, দিন রাত ওই কথা ভাব্‌তে

লাগ্‌লেন। বাড়ী এসে মেয়েকে বল্লেন, তুমি ওর কাছে যাও, ও তোমাকে বে কর্‌তে বল্‌বে, তুমি বল্‌বে, আমার বার মাস ব্রত পূর্ণ না হলে আমি বিয়ে করবো না। এই বলে ওর কাছে যে কোন রকমে হোক মণিটি হাত করে আমাকে এনে দেবে। না আন্‌তে পাল্লে তোমাকে বাড়ী থেকে দূর করে দেব।"

রাজকন্যে সেই রকম কল্লে, সে মহাজনের ছেলেকে বল্লে "তোমার যদি আমার উপর ভালবাসা থাকে, তাহলে ওই মণিটি কোথায় রাখ বল।" মহাজনের ছেলে বল্লে "আমি ওকে বালিসের নীচে রেখে ঘুমুই।"

রাজা ধুৎরো বিচি দিয়ে কতকগুলি পিঠে তৈরি করে মেয়েকে দিলেন বল্লেন "যে এবারেও যদি না আন্‌তে পারিস্‌, তাহলে তোর মাথা কাটা যাবে।" রাজকন্যে সেইগুলি মহাজনের ছেলেকে খাওয়ালে। তাই খেয়ে মহাজনের ছেলে অচৈতন্য হয়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল। সেই সময় বালিসের নীচে থেকে মণিটি বার করে নিয়ে মেয়ে বাপের কাছে এনে দিলে। রাজা জিজ্ঞাসা কল্লে, "তুই কার।" মণি বল্লে, "আমি যার হাতে আছি তার, যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।" রাজা বল্লেন "কাল সকাল ওঠবার সময় মহাজনের ছেলে একটা নেকড়া পরে সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপে একটা চার্‌দিক বন্ধ মন্দিরে যেন শুয়ে থাকে।" সত্যি সত্যি মহাজনের ছেলে সকাল উঠে দেখে যে সব দিকেই আঁধার। মণিটি খুঁজলে পেলে না। কোথায় কি রকমে এসে পড়েছে কিছুই ঠিক কর্‌তে পাল্লে না। কত কাঁদ্‌লে, তখন আর কেঁদে কি হবে। এই সময় তার চার সেঙ্গাতের কথা মনে পড়ে গেল। ও তারপর সেই চার সেঙ্গাতকে স্মরণ কল্লে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওরা সব এসে সেখানে হাজির। নেউলটা মন্দিরের নীচে দিয়ে এক গর্ত্ত খুঁড়লে। তাই দিয়ে সে বেরিয়ে এল। তাদের সব কথা বল্লে। শুকপাখি ভাল ভাল বনের ফল এনে খেতে দিলে। তারপর তারা তার কাছে আট দিনের মত খাবার রেখে দিয়ে বল্লে "তুমি এই খানে থাক আমরা গিয়ে মণি নিয়ে আস্‌ছি।" এই বলে তারা চার সেঙ্গাত গিয়ে রাজার বাড়ী পৌছুল। রাজা দোতলার উপর হাওয়া খেতে এসেছেন, শুকপাখিটি গিয়ে পাশে বসে রাম নাম কল্লে। "গীতগোবিন্দ" আওড়াতে লাগল। রাজা দেখে বড় খুসী হলেন। একটি "বিল্ব" ফল ধরে পাখিটিকে ডাক্‌লে। শুক বল্লে,

তুমি সত্যি কর, আমাকে খাঁচায় রাখবে না। তাহলে আমি তোমার কাছে দিন রাত থাক্‌ব।" রাজা সত্যি করায়, সে এসে রাজার হাতে বস্‌ল। রাজা যা পড়তে বলেন সে তাই পড়ে। এদিকে মণিটির উপর নজর রাখে। রাজা ঘুমোবার সময় মণিকে জিবের নীচে রেখে ঘুমান, শুক দেখে এসে বাকী তিন সেঙ্গাতকে বল্লে। রাজা ঘুমিয়েছেন, নাক্‌ ডাকচে, এই সময়, তারা তাঁর খাটের কাছে উপস্থিত হল। সাপটি তাঁর নাকে লেজ ঢুকিয়ে দিলে। রাজা হেঁচে ফেল্লেন। যাই হেঁচেছেন মণিটি বাহিরে এসে পড়লো, নেউলটি তখুনি তাকে মুখে করে ফেল্লে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে তারা সেঙ্গাতের কাছে যাবে বলে বেরুল। ওধ উপর সাপ তার ফণার উপর নেউল বসে, সমুদ্র পার হল। শুকটি উড়ে উড়ে এল। নেউলের মুখে মণিটি থাকে। সমুদ্র পার হবার সময় নেউলের হাই উঠ্‌ল। সে সময় মণিটি জলে পড়ে গেল। এত দুঃখে পাওয়া, হারিয়ে গেল, কি করা যায়। ওধ এই কথা শুন্‌লে। ওধ হচ্ছে মাছেদের রাজা। সে গিয়ে সমুদ্র তমাম ঘেটে দেখ্‌লে। "রাঘব" মাছকে ধরে এনে বল্লে "মণিটি শিগ্‌গির হাজির কর, না হলে তোমাদের সবংশে খেয়ে ফেল্‌ব।" একটি মাছ মণিটিকে গিলে ফেলেছিল। এই শুনেই মণিটি বমি করে ফেল্লে। তারপর মণি নিয়ে তারা মহাজনের ছেলের কাছে হাজির হল।

মণিটি পেতে মহাজনের ছেলে আহ্লাদে দশখান হল। মণিকে হুকুম দিলে, একটা "মনপবণ" নৌকা এল, চার সেঙ্গাতকে নিয়ে সাত সমুদ্র "চিল্কা" পার হল। রাজার দেশে এসে পৌছুল। মণিকে হুকুম দিলে, আমি যেখানে ছিলাম রাজাকে সেই রকম অবস্থায় সেই জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এস। তারপর রাজকন্যেকে ডেকে সব কথা জিজ্ঞেস কল্লে। সে সব কথা স্বীকার কল্লে। বল্লে, আমাকে কেটে ফেল্‌ব বলায় আমি করেছি। তুমি যাবার পর আমার বে দেবার জন্যে বাবা অনেক জেদ্‌ করেছিলেন, কিন্তু আমি বে করি নাই। আমি তোমাকে খুঁজতে থাকি। আমাকে বলেছিলেন যে যদি এক মাসের মধ্যে বিয়ে না কর তাহলে তোমাকে কেটে ফেল্‌ব। দৈবযোগে এক মাস যেতে না যেতেই তুমি এসেছ। মহাজনের ছেলে সেই সব কথার প্রমাণ নিলে। নিয়ে দেখ্‌লে সত্যি। ভাব্‌লে "যা হবার হয়ে গেছে, রাজাকে এখানে না আনলেই সব গোলমাল চোকে, এই ভেবে মণিকে হুকুম দিলে

সাত সমুদ্রের মধ্যে রাজবাড়ী তৈরি করে দিতে। সেই খানে রাজা থাক্‌বে।" তারপর, মহাজনের ছেলে রাজকন্যেকে বে করলে। বাপ ভাইকে এনে পাত্র মন্ত্রী করে রাখ্‌লে। রাজকন্যে ও মহাজনের ছেলে আনন্দে ঘর দোর কল্লে, আমি যেতে কথা কইলে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

মহাযাত্রা।

চতুর্থ সর্গ।

সহ্যাদ্রি শিখরে বসি দিব্যালোক যোগে
দেখিলা পাণ্ডব রাজ অনল প্রসাদে
বিস্ময়ে অদ্ভুত দৃশ্য ভাসিল আকাশে
তারকা খচিত চারু চন্দ্রাতপ তলে
স্বর্ণমেঘে রাজসভা, রাজিছেন তথা
দেবগণ, চিন্তামগ্ন সবে একমনে
চক্রাকারে বেড়িয়াছে সর্ব্ব দেবদেহে
সুন্দর প্রভামণ্ডল, শশাঙ্কে যেমতি
বেড়য়ে বিবিধ বর্ণে উজ্জ্বল পরিধি
নিশাকালে, বরষার আগম সূচক; (১)
এক এক করি দেব সুবর্ণ দিধিতি (২)
পৌরবে চিনায়ে দিয়া কহিলা এমতি
"তুমার ধবল কান্তি, দেখ, সিংহাসনে
করে জ্যোস্না শুভ্রদণ্ড, বদন মণ্ডলে
প্রশান্ত পাবনজ্যোতি সুন্দর বিরাজে;
স্ফীতবক্ষ অনুচর ধর্ম্মের সম্মুখে

(১) চন্দ্রমণ্ডলকে লোকে বরষার সূচক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।
(২) সুবর্ণ দিধিতি—অগ্নি।

দাঁড়ায়ে যে, দেবে তাঁর "সাহস" আখ্যাতি;
ধর্ম্মপাশে "সত্য" মহা তেজস্বী নির্ভীক,
স্বচ্ছবৎ শোভে যাঁর সমগ্র বিগ্রহ,
হলেও ভূষণ হীন নৈসর্গিকরূপে
দেখায় সুন্দর অতি সে দিব্য মুরতি;
সত্যের অদূরে দেখ তুলাদণ্ডধারী
নিস্তরঙ্গ হ্রদ সম গম্ভীর মুরতি
"ন্যায়" দেব নেত্রবদ্ধ ঘন কৃষ্ণবাসে
ছোটবড় আত্ম পর জ্ঞানের রোধক;(৩)
তাঁর পাশে "তপ" ক্ষীণ বপু জটাধারী
মুক্তা মেখলায় বদ্ধ শোভে কটিদেশে (৪)
বল্কল, লম্বিত লম্ব শ্মশ্রু বক্ষস্থলে;
"তপ" পাশে "ক্ষমা" হস্তে আবরণ পট
ব্যস্ত সদা পরদোষ সংগোপন তরে;
তাঁর পার্শ্বে "দয়াদেবী" স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী
মুক্তাফল গঞ্জি অশ্রু ঝরে নেত্রযুগে
পরদুঃখে, বাহু তুলি ডাকিছেন কিবা
দুঃখীজনে স্থান দিতে আপানার ক্রোড়ে;
কুম্ভ হ'তে জল ঢালি প্রক্ষালেন দেহ
"শৌচদেব" শঙ্কুচিত সদা অনাচারে;
খুলিছেন দেহ হ'তে বাস ভূষা যিনি
নিয়োজিত দেহ মন পরসেবা লাগি
"তিতিক্ষা" তাঁহার নাম ত্যাগব্রতে রতা; (৫)
সাধু জন সেব্য এই পরিত্র "আর্জ্জব" (৬)
শালসম ঋজু দেহ ঋজু দৃষ্টিরেখা;
বিশ্বশোভা রাণী দেবী "পদ্মালয়া"

(৩) আত্মপর এই জ্ঞানের রোধক, ঘনকৃষ্ণবাসে ন্যায়দেবের নেত্রবদ্ধ।
(৪) মুক্তা—তৃণ বিশেষ। (৫) ত্যাগ-ব্রতে-রতা—আত্মোৎসর্গে রত।
(৬) আর্জ্জব—সরলতা।

আভরণ প্রভাজালে নশো উদ্ভাসিনী,
ফুল্লরক্ত শতদল শোভে দক্ষকরে
দক্ষেতরে ধান্যতোড়া, দেবীর প্রসাদে (৭)
মেঘে রাজে ইন্দ্রধনু, পুষ্পরাজি বনে,
জগত জীবন যষ্টি, শস্য শস্যক্ষেত্রে
সতত অস্থিরা দেবী সদা ভিন্না মনে
অস্থিরে করেন স্থিতি স্বভাবে চপলা;(৮)
শ্বেত পদ্মাসীনা ওই দেবী সরস্বতী,
কুন্দেন্দু তুষার প্রভা, শুভ্র বস্ত্রাবৃতা,
এক হস্তে গ্রন্থ, আনে বীণা সপ্তস্বরা,
হইয়া বারেক তুষ্ট অসাধ্য সাধনে
দিয়াছিলা এই মৃত সঞ্জীবনী বীণা
নবতানে গাহিবারে বাল্মিক প্রতিভা
মুনিবরে, পুনর্ব্বার কৃষ্ণদ্বৈপায়ণে,
সে হেন সেবক আর না দেখি ভারতে
ভারতী সে বীণা এবে ধরেন শ্রীকরে;
এই মতে ভারতের যত দেব দেবী
কলি আগমন ভয়ে করেন মন্ত্রণা
লুকাবেন কোথা কোন্ বিজন প্রদেশে।
বিলম্বত নাহি আর "ভারত" বদনে
বিরাজিছে যেই শোভা যাইবে মিশিয়া
অল্পক্ষণে, গল্পমাত্র রবে তার স্মৃতি!
ধর্ম্মের এ উপবন হবে পরিণত
পাপ মরুভূমে, এবে লক্ষ্মী লীলাসরঃ
শুকাইবে, আহা, এই ক্রূর অবগ্রহে! (৯)
বলিতে বলিতে নভঃ ভীষণ তমসে

(৭) লক্ষ্মী শোভা এবং সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী, শতদল শোভাব্যঞ্জক ধান্যতোড়া সম্পদ ব্যঞ্জক। (৮) লক্ষ্মীর চঞ্চলা নাম পুরাণ প্রসিদ্ধ, তাঁহা চঞ্চলতা অনুভব সিদ্ধও বটে। (৯) অবগ্রহ – অনাবৃষ্টি।

গেল পুরি, কৃষ্ণকায় করাল আকৃতি—
ঊর্দ্ধ হ'তে নামিলেন কলি দলবলে,
লোহিত মঙ্গলগ্রহ সম ভয়াবহ,
অমঙ্গল দুই চক্ষু, নিসঃরয়ে যাহে
ভীম ধুমকেতুপুঞ্জ সম জ্যোতিঃরেখা,
কৃতান্ত করাত সম অতিত্রাসপ্রদ
আবর্ত্তসন্নিভ তুণ্ডে তীক্ষ্ণ দণ্ডাবলী
আসিতেছে নিজবেশে কলি পাছে পাছে
কলি অনুচর বৃন্দ, সদা ধর্ম্মদ্রোহী,
ললিত ললনা ভুরু চারু চাপধারী
অগ্রে বিশ্বজয়ী "কাম" পুষ্পের মুকুট
শোভে শিরে, পুষ্পমালা লম্বিত উরসে,
আসিতেছে চারি পাশে বেড়ি নরাপ্সরা
কুরঙ্গনয়নী চারু চম্পক-বরণী,
বিম্বাধরী, ঘনলম্ব কেশী, স্মেরাননা
বারাঙ্গনা দল, রতি জিনি রূপবতী;
চারুবক্ষ কোরকিত উরজ কোরকে
লালসার স্বর্ণনীড় যেন সেই দুটী,
সুবলিত রম্ভা উরু আবৃত দুকূলে
যেই আবরণ ভেদি নিভৃত প্রদেশে
বিচরণ আসি সদা কামুক-কল্পনা!
বীণাধ্বনি সঙ্গে উঠে সঙ্গীতের ধ্বনি
সে দলে. হে যুবাবৃন্দ ক্ষণমাত্র স্থায়ী
যুবাকাল, মধুকাল এই সে জীবনে!
ইহা বুঝি, সব ত্যজি, মজি প্রেমরসে
পুরাও ভোগের স্পৃহা, পুরুষ জীবনে
পুরুষার্থ এক মাত্র রামা উপাসনা!
কামাতুরা নবীনার কামনা পুরায়ে
সার্থক পুরুষ জন্ম কর এ বয়সে;

প্রভাত শিশিরে স্নানি সদ্য পুষ্প যবে
বৃন্তাসনে হাসি ঢালে অলিরে চাহিয়া
প্রেমোৎসুকে, দেয় কিহে কখন সে অলি
আতপে ঝলসি পুষ্প বাসি হ'য়ে যেতে!
মদালসী রম্যস্তন স্বর্ণমেরুরূপী
এ প্রত্যক্ষ স্বর্গ ছাড়ি, কোন্ ভ্রমে পড়ি
হে যতি, নিয়ত তুমি রত যোগ তপে,
অপ্রত্যক্ষ অনিশ্চিত স্বর্গভোগ আশে?
কি ভোগ সে স্বর্গে আছে এভোগ হইতে?
হে পণ্ডিতকুল, আত্ম বঞ্চনায় পড়ি
গ্রন্থকীট হয়ে কেন কাটাইছ বৃথা
যুবাকাল, কবিতার সঙ্কল্প আমোদে!
সুন্দরী-অধরমধু-সমান কি কভু
কাব্যরস? আন কাব্য ছুড়ে ফেলে দূরে
যুবতী যৌবন কাব্য পড়হে সতত।
হে বীর, বিফলে কেন মর অনুসরি
রণভূমি মরুভূমে যশমরীচিকা,
সম্মুখে সুলভ দলি সুধা তরঙ্গিনী!
মহা বিভীষিকাময়ী রণস্থলী ত্যজি,
কেশরী বিক্রমে পশি সে সংগ্রামে, যথা—
রসিকার সঙ্গে যুঝি প্রেম কুতুহলে,
জয় হ'তে পরাজয়ে কৃতি বলি মানে
"আপনারে প্রেমোল্লাসে প্রেমোন্মত্ত যুবা";
ঢালয়ে শ্রবণে সুধা কণ্ঠ যন্ত্রধ্বনি
এমতি, সুতানে মিশি ভূষণ সিঞ্জিতে,
কজ্জল কেশীর রূপে উজ্জ্বলিত সদা
সে দেশ, বসন্তে কুঞ্জে পুষ্প পুঞ্জে যথা,
পুষ্পাবৃত খাত প্রায় বাহ্যেরম্যারামা!
হস্তে শোভে পুষ্প কিন্তু বস্ত্র তলেতলে

গলিগলি চলিয়াছে অলক্ষিতরূপে
পরিচারদল নানা ভয়াবহ ব্যাধি।
তাম্বুল করঙ্কধারী চলেছে পশ্চাতে
ধনীর তনয়বৃন্দ শন্তলী শোষিত (১১)
সর্ব্বস্ব পাণ্ডুর রিক্ত শরদভ্র যথা; (১২)
কামপ্রতি বৈশ্বানর অঙ্গুলি নির্দ্দেশী
কহিলা পৌরবে "মহাদুষ্ট মতি এই।
চন্দ্রচূড় আঁখি হ'তে বারেক বাহিরি
দহেছিনু এ দুরন্তে, তাঁরে সেই হেতু
ডরে দুষ্ট, তাঁর ভক্ত হ'তে র'হে দূরে"
আক্রোশে গরজি "ক্রোধ" আসে কাম পাছে
রক্তচক্ষু সত্য কি সে জগত দহিবে!
বজ্রের ঔরসে ব্যাত্যাগর্ভজাত হ'য়ে
বাড়বার স্তন্যে বেড়েছিল যে সাগরে, (১৩)
ভূকম্প দোলায় সুখে দুলিয়া শৈশবে,
মহাভয়ঙ্কর রিপু! রক্তিমা সঞ্চারি
বিরক্তি জন্মায় যেই বহ্নি শিখা জ্বালি
উপজায়ে তমঃ, জ্ঞান বিবেক বিলোপী (১৪)
অনুচর রূপে তার আসে পাছেপাছে
"হত্যা" করবাল হাতে, রক্ত লিপ্ত বাসে;
বিষধর সম ত্যজি নিশ্বাস সঘনে
আসিতেছে পরিজন, বহ্নয়ে অধরে
লহুধারা নিজদণ্ডে নিজেরে কামড়ি,
কালভুজঙ্গিনী প্রায় ভ্রুকুটি ললাটে

(১১) গণিকা সংগ্রহকারিণী। (১২) ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে হীনবীর্য্য রক্ত শূন্য হইয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে। (১৩) বড়বা—সমুদ্র গর্ভস্থিত বড়বানলের প্রসূতীরূপী ঘোটকী। সম্ভবতঃ জলমগ্ন আগ্নেয় গিরিমালা। (১৪) ক্রোধ—রক্তিমা জন্মায় অথচ সেই সঙ্গে বিরক্তিজাত করে, অগ্নি জ্বালিয়া দেয় অথচ সেই অগ্নি দ্বারা আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকার সৃষ্টি করে।

শৃঙ্গহীন হ'য়ে তবু উদ্যত বিদ্ধিতে
রোষে পরস্পরে যেন সবৎসা ধেনুকা
কথায় কথায় সবে যাইতেছে রুষি
বারুদে অনল যথা, কথায় কথায়
লাঠালাঠি করি তাহে মরয়ে পামরে।
ক্রোধ পাছে লোভ সদা প্রসারিত পাণি
ভিক্ষা লাগি, কাকুবাণী নিয়ত বদনে,
সকল ইন্দ্রিয়ে তার হলেও বসতি
শ্রদ্ধা সমধিক পুনঃ রসনা নিবাসে;
ধাবিত সঙ্গেতে ভিক্ষাপটু বটুদল
অত্যাহারে রোগী পুনঃ রোগে অত্যাহারী!
রসনায় অবিরত স্রবিতেছে লালা,
ধাবিত এ দল সনে ধন লোভী মূঢ়ে,
ধন যার পিতামাতা অভিষ্ট দেবতা,
অকাতর, কন্যা কিবা বনিতা ভগিনী
দিবারে ধনীকে, তুচ্ছ ধন বিনিময়ে!
এদল করয়ে বৃদ্ধি বৃদ্ধ বার্দ্ধুষিকে
অধমর্ণ মক্ষিকার ঊর্ণনাভরূপী,
কুবেরের বরপুত্র, বাড়ায় সতত
(মদ্যপের তৃষা যথা মুহুর্মুহু পানে)
ধনবৃদ্ধি সঙ্গে যার ধনের লালসা,
মহান্ কৃপণ, দাতা মিষ্ট বাক্য দানে।
ভবদুঃখ হর, মোক্ষ পথের বিরোধী,
শূন্যে জড়াইয়া ধরি নিবীড় আশ্লেষে
আসে "মোহ," শিষ্যবৃন্দ আসে পাছেপাছে,
কুটুম্ব জম্বালে মগ্ন কুণ্ঠিত যাহারা (১৬)
কণ্ঠাগত প্রাণেতেও স্মরিতে ঈশ্বরে!
শাস্ত্র জ্ঞান সত্ত্বে জড় অন্ধচক্ষু থাকি!

(১৬) জম্বাল—পঙ্ক।

হ'লেও জাগ্রত গাঢ় নিদ্রা অভিভূত!
দীপ সত্ত্বে মরে যারা সদাই ঘুরিয়া
ঘোর তমে, চিরবদ্ধ মমতা শৃঙ্খলে;
আসে "মদ" তুঙ্গশির লেগেছে আকাশে
মহা অহমিকামত্ত, হস্ত বক্ষস্থলে (১৭)
সঙ্গে উপাসকদল গম্ভীর মুরতি
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, পদভরে টলে বসুন্ধরা,
আপনারে বড় মানি অন্যেরে কুণ্ঠিত
মহার্ঘ বচন ব্যয়ে মান হানি ভয়ে
অহমিকা কূপে কূপ মণ্ডুক সবাই
ধনমদে মত্ত কেহ, কেহ জন মদে
ভজনের মদে কেহ, কেহ পদ মদে
কেহ রূপ মদে, কেহ আভিজাত্য মদে
বিদ্যামদে, বুদ্ধিমদে স্ফীত হ'য়ে কেহ
নিজেরে অতুল মানি ধরা মানে সরা।
অন্য ঠাঁই অতিমাত্র অবনত হ'য়ে
অতি বিনয়ের ভান কেহ করে পুনঃ
অহঙ্কার শূন্য বলি মনে অহঙ্কারী।
মদ পাছে আসে "ঈর্ষা" কৃষ কলেবরা
করাল কুটিল দৃষ্টি, পাণ্ডুর বদনা,
ক্রূর চাহনিতে যার যায় ঝলসিয়া
চৌদিকের তরুলতা, যথা তপ্তবাতে,
রোগক্লিষ্টা প্রায় তুষ্টা অপ্রসন্ন সদা,
শুষ্কাস্যে উপজে হাস্য কদাচিত যদি
সে কেবল পরদুঃখে, কারেও দুঃখেতে
কাঁদিবারে না দেখিলে মরে সে কাঁদিয়া।
রসনায় বিষ তার অনর্গল স্রবে,
এ বড় বিষম বিষ যার তীব্র তেজে

(১৭) আত্মদম্ভ।

অপরে দহিয়া দুষ্ট নিজে মরে জ্বলি,
পরনিন্দা বাবদুক মূক পর যশে
পরহানি প্রিয় খল, কর্ণে জপে যারা (১৮)
যেতেছে তাদের মুখ শুকাইয়া দুঃখে
পরস্পর মুখকান্তি দেখি পরস্পরে ;
ব্যথায় অধীর কেহ, শুনি লোক মুখে
পরযশ কথা, যথা বৃশ্চিক দংশনে,
পরের সৌভাগ্য শুনি মহাখিন্ন মনা
লঘু করে হৃদিভার কেহ দীর্ঘশ্বাসে,
মহাঘোর ঈর্ষানলে নিরন্তর জ্বলি
জীবন্তে নরকভোগ করয়ে হিংসুকে।
খনাসম থাকি থাকি কহি নানা কথা
আসিতেছে "মিথ্যা" যার বস্ত্রময় তালি
তালির উপর তালি, তালি তারোপরে,
এত তালি সত্ত্বে ফুটি দেখা যায় দেহ
পুনঃপুন, মহাব্যস্তে লাগায় সে তাই
আবার নূতন তালি সে জীর্ণ বসনে ;
আসিছে পূজক দল জল্পি নানা মতে,
পারিষদ বৃত্তিধারী স্বার্থ সিদ্ধি লাগি,
প্রভুর অলীক যশগানে কেহ রত
চাটু পটু, প্রভু মন তোষণ কৌশলী,
কেহ বা করিছে নিজ বংশের গরিমা,
কেহ বিদ্যা সম্পত্তির, প্রেতাদির কথা
কহে কেহ দূরদেশ ভ্রমণ কাহিনী
কহে কেহ, গেছিল সে মানসরোবরে,
দেখিল সে তথাগণ্ড ভৈরণ্ড বিহঙ্গ

(১৮) কর্ণেজপ—যাহারা অন্যের নামে লাগাইয়া কথা কয়। এক মিথ্যা কহিয়া তাহার সত্যতা স্থাপনের জন্য আরও মিথ্যা বলিতে হয় তথাচ মিথ্যা ঢাকা থাকে না।

তিনটি প্রকাণ্ড করি করিদল হ'তে
ছিনিয়া লইয়া গেল নখে চঞ্চুপুটে ;
কেহ কহে কিস্কিন্ধ্যার মর্কট নগরে
শুনেছে সে নিজ কর্ণে কর্ণ রসায়ন
মর্কট সুন্দরী মুখে সঙ্গীত মাধুরী ;
কেহ কহে বিভীষণ পালিত সিংহলে
দেখিয়া এসেছে রক্ষ সুন্দর মুরতি
চতুর্ম্মুখ, অষ্টপাদ আদি,
কেহ কহে কাশ্মীরেতে দেখিনু মানব
দীর্ঘকর্ণ, এক কর্ণ শেষ রূপে পাতি
আনকর্ণে দেহ ঢাকি শুয়েছে সে শেষে,
অবিশ্বাস ব্যক্তি স্মিত স্রোতামুখে দেখি
সদর্পে শপথ করি কহিছে সে পুনঃ
"জন্মে আমি মিথ্যা নাহি কহি কোন কালে,
মিথ্যা হ'তে পাপ আর নাহি ত্রিজগতে"।
সুবস্ত্রে কুৎসিত দেহ আবরি যতনে
হাস্যে মিষ্ট মুখ "শাঠ্য" আসিছে তাপাছে,
সুতীক্ষ্ণ গুপতি ল'য়ে গুপ্ত কক্ষতলে
বিষ দিগ্ধ, বাহ্যে অতি নিরীহ মুরতি,
কিন্তু বড় আততায়ী দুর্ম্মতি অন্তরে,
আসিতেছে শিষ্যবৃন্দ, দুরন্ত সবাই,
কেহ চৌর্য্যে রত, কেহ কৃত্রিম মুদ্রনে,
কৃত্রিম লেখ্য লিখনে, কেহ রত সিঁধে,
কেহ বিষ দানে, কেহ গুপ্ত প্রাণ নাশে।
ধর্ম্মভেকধারী কেহ, গৈরিক বসনে
দীর্ঘশ্মশ্রু, দীর্ঘনখ, দীর্ঘজটাজুটে
মণ্ডিত কাহারো পুনঃ ভস্মমাখা তনু,
কেহ বা জপের মালা জপে অবিরত,
নানা গূঢ় আবরণে আবৃত সবাই

সারস্বত চক্ষু যাহা না পারে ভেদিতে (১৯)
কৃষ্ণ শুক্ল দুই বর্ণ ছিন্ন বস্ত্রধারী
দুই করে দুই কাঠি বাজায়ে কৌতুকে
আসিছে "কলহ" যার শিরোরুহ শিরে
পরস্পর অসংলগ্ন, কণ্টক যেমতি,
লেখ্য, নিদর্শন, সাক্ষ্য, ব্যবস্থা প্রমাণ,
মীমাংসা, বর্ণনাপত্র, আদিলিপি যত
তাড়া তাড়া করি দুষ্ট রেখেছে কটিতে
অমোঘ শোষণ অস্ত্র! যে অস্ত্র প্রয়োগে
শোষয়ে ধনীর ধন, অন্ন দরিদ্রের
অলক্ষিতে, নানামতে অনর্থ সঞ্চারি,
সমদশা ভাগী করি অর্থী প্রত্যর্থীরে; [২০]
সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে ব্যবহারজীব [২১]
লিপিকারদল, সাক্ষী, পদাতিক আদি
শিবাগৃধ্ররূপী অধিকরণ মশানে [২২]
মুহুর্মুহু হাইতুলি, ঘন তুড়ি দিয়া
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে আসিছে পশ্চাতে
"আলস্য", মন্থরগতি কুৎসিত মুরতি,
শিষ্যেরা মলিন বেশ ধূলিতে ধূসর;
কেহ বা অগ্রণী পরছিদ্র অন্বেষনে,
পরনিন্দা পরকুৎসা কথনে সজ্জনে,
রত কেহ, মত্ত হয়ে কেহ গল্পামোদে
ফুৎকারে উড়ায়ে কত রাজা মহারাজা,
সর্ব্বজ্ঞের মত কেহ না দেখি না শুনি
গল্পের তরঙ্গে ভাসি কহে নানা কথা,
কেহ বা আলস্য বশে ধর্ম্ম ধ্বজী হ'য়ে

(১৯) সারস্বত চক্ষু—সরস্বতীর চক্ষু। (২০) মোকর্দ্দমায় প্রায় বাদী ও প্রতিবাদীর সর্ব্বনাশ হয়। (২১) ব্যবহারজীব—উকীল।
(২২) অধিকরণ—বিচারালয়—এই উপমায় অর্থী প্রত্যর্থী শবস্থানীয়।

পরপাশে সদা অর্থ শোষণ প্রয়াসী
ধর্ম্মনামে, আত্মোদর পোষণের লাগি;
যেতে যেতে কেহ পথে পড়িছে বসিয়া
দন্তে কেহ কাটে তৃণ, কেহ মাটি পরে
নখে লেখে, মগ্ন হ'য়ে মনে যাহা আসে,
এলাইয়া দীর্ঘকেশ বসিয়াছে কেহ,
পশ্চাতে বসিয়া কেহ মারিছে উকুনী।
এইরূপে আছে যত মহা সেনাপতি,
কলির পার্শ্বদ দলে সকলেরে ল'য়ে
প্রচণ্ড বিক্রমে কলি আক্রমিল আসি
ভারতের ধর্ম্মপুঞ্জে, দুর্জ্জয় প্রতাপী,
চিলিকার নীলবক্ষে শ্বেত হংস মালা,
শরতে যে কালে রয় রত সন্তরণে
কুঞ্চিত চিলিকা বীচি প্রহারে অটল
জটিয়ার জটা হ'তে সয়তান সহসা (২৩)
মহাতীব্র বেগে যবে আসে অধোমুখে
বজ্রনখ, অস্তে ব্যস্তে পক্ষীকুল যথা
পলায় চৌদিকে উড়ি জীবন বিকলে,
কিম্বা যথা কোনার্কের অনন্ত সৈকতে (২৪)
কেতকী কুণ্ডল স্তূপ হইতে আসিলে
শার্দ্দূল তলেতে, খসি পলায় তরাসে
দ্রুতপদে কৃষ্ণসার সঙ্গে মৃগবধূ,
সদলে কলিরে দেখি বিকলে তেমনি
আস্তে ব্যস্তে ভারতের পূণ্য পুঞ্জ যত
পলাইয়া সভা ছাড়ি লুকাল কে কোথা।
পৃষ্ঠরক্ষী এক মাত্র ধর্ম্ম সহচর

(২৩) জটিয়া—চিলিকা তীরস্থ পর্ব্বত বিশেষ। [২৪] কোনার্ক—কৃষ্ণক্ষেত্র—পুরী হইতে ১১ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এ অঞ্চলে সমুদ্র কূলে সহস্র সহস্র হরিণ দেখা যায়। এ অঞ্চলের কেতকীবন ব্যাঘ্রসঙ্কুল।

"সাহস" পশ্চাতে রহি, কলি সৈন্য করে
হ'ল বন্দী তবে কাম, কলি আজ্ঞামতে
কিঙ্কর স্বরূপে তারে নিল নিজ বলে।
বিস্মিত পৌরবে চাহি অনল বিষাদে
কহিলা "হে বীর, এবে দেখ কি দুর্গতি
হৈল সাহসের, কলি শাসন ভারতে।
ভারত রক্ষণ তরে ক্ষত্রিয়ের নেতা
ছিল চির দিন যেই, আজি সেই জন
হবে লম্পটের সখা, অগম্য গমনে,
প্রাচীর, পরিখা, পুরী, লঙ্ঘিবার কালে।"
পলাবার কালে, ধর্ম্ম গিয়াছিলা ফেলি
দিব্য পরিচ্ছদ, "মৌন" নামে অভিহিত
কুড়ায়ে সে পরিচ্ছদ "শাঠ্য" মহোল্লাসে
অগ্নিদ, গরদ, কুটলেখ্যের লেখক (২৫)
সিঁধেল, ঘাতক, চৌর আদিরে ডাকিয়া
শিরোপা স্বরূপে বাঁধি দিল শিরোদেশে
শান্তি রক্ষকেরে মারি, তার পরিচ্ছদে
করয়ে যেমন নিজদলে সজ্জীভূত
লোক প্রবঞ্চনা পটু দুষ্ট দস্যুপতি।
সুমতি কৌন্তেয় তবে বিষণ্ণ অন্তরে
কহিলা হে দেব, বড় বিষম এ কথা!
অসহ্য এ দৃশ্য মোর পবিত্র ভারতে,
ব্রাহ্মণের মন্ত্র বলে, ক্ষত্র বীর্য্যবলে
সুরক্ষিত আর্য্যদেশে ঘটিবে অনীতি
এতদূর? অসম্ভব লাগে বড় মোরে!"
শুনি হব্যবাহদেব দিব্য তেজ নিজ
সম্বরি, ঈষদ্ হাস্যে কহিলা পৌরবে
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গৃহে সর্ব্ব অগ্রে গিয়া

[২৫] গরদ – বিষ প্রয়োগকারী – কুটলেখ্য জালদস্তাবেজ।

পশিবে কৌশলী কলি বল্মীক স্বরূপে,
নিভৃতে পশিয়া সে ধর্ম্ম তরু মূলে,
অলক্ষিতে কুরিমূল, অন্তঃসার হরি
কল্পজীবি সে দ্রুমের, দূর হ'তে ডাকি
যবনেরে, তার হস্তে লুটাইবে ভূমে,
অসাধ্য সে ব্যাধি, যাহা ভারতের দেহে
ঘটিবে, হবেন ধ্বস্ত নিজে ধ্বন্বন্তরী [২৬]
শুশ্রুতের শল্য তন্ত্র হারিবে সে ব্রণে [২৭]
না হয় উচিত আর রহিবারে এবে
বহু দিন এ ভারতে, তীর্থাটন ব্রত
সারি, হে ভারত, দ্রুত যাহ হিমাচলে
ধর্ম্মে একতানমতি, ধর্ম্ম পক্ষপাতি
তুমি বীর, অনাচার দমনে অক্ষম
হ'য়ে দহ্যমান হবে নিজে অনুতাপে,
বন্দী পতি যথা পত্নী লাঞ্ছনা দর্শনে;
আসিছে পাপের বন্যা, ভারত ভরসা
পাপজলে দ্বীপরূপী মহৎ যে জন
যাইবে ডুবিয়া, আহা, এ ঘোর প্লাবনে;
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ব্রতে সহায় বিহনে
সাধুর জীবন হবে মহা বিড়ম্বনা,
মহা অনর্থের হেতু হবে কালবশে
ধৈর্য্য, বীর্য্য, প্রতিভাদি মহত্ত্ব যা কিছু
পুরুষের, কাপুরুষ প্লাবিত ভারতে;
কলি শিষ্য কুক্ষিম্ভরী দ্বিজাতির পাপে
ছারখার হবে হায় অচিরে এ ধরা
সেই দেশে, সেই গিরি, সেই মদ নদী,
নগর, নগরী, তীর্থ, আশ্রমাদি করি,

[২৬] ধন্বন্তরী – আর্য্য বৈদ্যে শাস্ত্রের আদি প্রণেতা। [২৭] সুশ্রুত চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি। শল্যতন্ত্র [সার্জ্জারীর] আদি প্রণেতা।

সবি রবে পূর্ব্বসম, মানব কেবল
নামেতে মানব রহি পশু হ'তে হীন
হ'য়ে যাবে যুগধর্ম্মে, ভারত মণ্ডলে।

ইতি চতুর্থ সর্গ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

নীলাম্বরে কালমেঘ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র রাজেন্দ্রলাল কালেজ হইতে বাসায় আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন, এখনও কালেজের পোষাক পরিত্যাগ করেন নাই, এমন সময় ডাক ঘরের পিয়ন আসিয়া কয়েক খানি ডাকের চিঠি হাতে দিয়া চলিয়া গেল। পত্র হাতে করিয়া আপনার শয়ন প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া দেখিলেন যে, পত্র গুলির মধ্যে একখানি তাঁহার অগ্রজ দেবেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনখানির একখানি, তাঁহার এক মাত্র কনিষ্ঠা ভগ্নী মহামায়া, আর একখানি আপনার ভ্রাতৃজায়া দেবেন্দ্রলালের পত্নী বাসন্তী লিখিয়াছেন। শেষ পত্র খানি একটু বেশি রকমের জাঁকালো—রাজেন্দ্রলাল বুঝিলেন যে এখানি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লিখিয়াছেন। পত্র কয়েক খানি দেখিয়া রাজেন্দ্রলাল প্রথমে অগ্রজের পত্রখানি খুলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অগ্রজের পত্র খুলিয়া রাজেন্দ্রলাল পড়িলেন। অগ্রজ দেবেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন :—

স্নেহের রাজেন্দ্র!

ক্রমাগত তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। তবে শারীরিক দুর্ব্বলতা অত্যন্ত। যাহা হউক, এখন আশা

দাঁড়াইয়াছে যে, এ জীবনে আরও কিছু দিন বাঁচিব। বাঁচিব সত্য, কিন্তু যে রকম দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে হয়ত আমার অদৃষ্টে আরও দুঃখ যন্ত্রণা পাওয়া বিধাতার অভিপ্রেত; নতুবা এত দিনের এত বড় পীড়া হইতে এ যাত্রা আরোগ্য লাভ করিব কেন? ভাবিয়া কি করিব—আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, সবই ঘটিবে এবং পাষাণের মত সবই আমাকে সহ্য করিতে হইবে, নহিলে প্রিয়তম সরসীলালের অভাবে এ হৃদয় বিদীর্ণ হইল না কেন? যাহা হউক পূজার দিন আসিতেছে। যে দিন আমরা পরমারাধ্য পিতৃদেবকে হারাইয়াছি, সেই দিন হইতে, আজি এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষকাল, পিতৃদেবের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়াকেও হারাইয়াছি। আজ মনের প্রবল বাসনা পুনরায় এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ পরে, আবার দুই ভাই একত্রে মিলিয়া মহামায়ার চরণে একটি বিল্বপত্র ও একটু গঙ্গাজল দিই। কিন্তু ভাই আমি অধম, আমার এই ক্ষুদ্র আশা এ জীবনে পূর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং মনের অভিলাষ মনেই বিলীন হইবে। আবার, তুমিও যে দিন হইতে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়াছ, সেই দিন হইতে অনবরত বিপদ আসিয়া জলের মত বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে তোমাকেও আর পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না। যাহা হউক, কালেজ বন্ধ হইলে, বাড়ী আসিবে—তোমাকে দেখিলেও আমার সকল কষ্ট দূর হইবে। বাড়ী আসিলে, সাক্ষাৎকার সব বলিব। সতত তোমার কুশল সংবাদে সুখী করিবে ইতি।

নিত্য আশীর্ব্বাদক
তোমার শ্রীদেবেন্দ্রলাল—

রাজেন্দ্রলাল অগ্রজের পত্র পাঠ সমাপন করিয়া, মহামায়ার পত্র পাঠ করিলেন। মহামায়া পত্রে লিখিয়াছেন :—

দাদা! বড় দাদার পূজা করিবার অভিলাষ, কিন্তু সম্যক অর্থাভাব। তোমাকেও এ বিষয় পত্রে লিখিতে পারেন না; কেন না তুমি চাকুরী আরম্ভ করা অবধি অনবরত বিপদের পর বিপদ আসিয়া জলের ন্যায় অজস্র অর্থ-রাশি ব্যয় হইয়া যাইতেছে। আমি নিজে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে বাসনা করি। বাবার মৃত্যুর পর, আর আমরা মহাদেবীর চরণ দর্শন করিতে পারি নাই; তবে আমাদের আশা আছে, মহাদেবীর কৃপায় দু দিন

অগ্র পশ্চাৎ তোমার দ্বারাই আমরা আবার মহাদেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিব। আর কি লিখিব—পত্র পাঠ তোমার শারীরিক মঙ্গল সম্বাদ দিও। শ্রীমান শ্রীমতীদের সহ আমরা সকলেই ভাল আছি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

তোমার স্নেহের
মহামায়া।

মহামায়ার পত্র পাঠ করিয়া, রাজেন্দ্রলাল চির প্রেমময়ী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ভ্রাতৃজায়া বাসন্তির পত্র পাঠ করিলেন। বাসন্তী লিখিয়াছেন :—

স্নেহের ঠাকুর পো! দীর্ঘকাল আপনার পত্র পাই নাই। বাড়ী আসা এক কালে ছাড়িয়া দিয়াছেন—পত্র লিখিতেন বোধ হয় এবার তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ণ এক বৎসর পর, আজ আপনাকে একটি আবশ্যকীয় কথা মনে করিয়া দিতেছি। গত বৎসর এই পূজার সময় হাসিতে হাসিতে আপনি বলিয়াছিলেন, বৌ আগামী বৎসর, নিশ্চয় পূজা করিব। এ কথা এখন আপনার মনে আছে কি? আপনার মনে থাকুক আর না থাকুক—আমার মনে আছে, তাই আজ আপনাকে মনে করিয়া দিলাম। আমার বিবেচনায় এবার অপনার পূজা করা কর্ত্তব্য। বৎসরে যে টাকাটা, আপনি খুঁটিনাটি কার্য্যে অপব্যয় করেন, সেই অর্থ রাশির দ্বারা সুন্দর রূপে পূজার ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে। তারপর, বৎসর বৎসর এই পূজা উপলক্ষে, যে টাকার পোশাকি কাপড় আমাদিগকে দেন—এবার আমরা পূজোপলক্ষে সে কাপড় চাহিনা—কাপড়ের সে টাকাটাও পূজার ব্যয় মধ্যে করিতে পারেন। আপনার ইহাতে মত কি? এখন আমাদের যে অবস্থা তাহাতে পূজা না করা ভাল দেখায় না। আপনার যাহা মত হয়, পত্র পাঠ লিখিবেন। আপনার সম্মতি সূচক পত্র পাইলেই, আমরা পূজার আয়োজনে নিযুক্ত হইব। দীর্ঘ কাল দাদার সংবাদ পাই নাই—আপনি তাঁহার সম্বাদ জানিতেছেন, তাঁহার মঙ্গল সম্বাদ সহ আপনার কুশল সম্বাদে সুখী করিবেন। আর পূজা না হইলেও বাড়ী আসিতে অন্যমত করিবেন না ইতি।

আপনার বউঠাকুরাণী
শ্রীমতী বাসন্তী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম তিন খানি পত্র পাঠ সমাপনান্তে রাজেন্দ্রলাল আপনার প্রণাধিকা পত্নী সুভাষিণীর পত্র পাঠ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুভাষিণীর পত্র খানি একটু অধিক মাত্রায় জাকাঁলো গোছের; পত্র পাঠ করিয়া রাজেন্দ্রলাল দেখিলেন যে, পত্রের বাহিরে যেমন জাঁকালো রকমের ভিতরে তেম্নি জাঁকালো—কথার পারিপাট্যে পরিপুর্ণ। পাঠক পাঠিকার পরিতৃপ্তির জন্য সুভাষিণীর পত্র খানির অবিকল নকল দিলাম। সুভাষিণী স্বামীকে লিখিয়াছেন :—

প্রাণেশ্বর! দীর্ঘকাল তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাই নাই। শ্রীচরণ দর্শন দূরের কথা—তিন মাস হইল অনবরত পত্রের উপর পত্র লিখিয়াও পরাজয় মানিলাম—একখানি পত্রেরও উত্তর পাইলাম না। কলিকাতা সহরে বাস কর; সুতরাং নিত্য নূতন দেখ—বোধ হয় তাহাতেই পুরাতনে আর মন টানে না; নহিলে এত দীর্ঘকালেও একবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইলাম না কেন? রাশি রাশি পত্র লিখিয়াও উত্তর পাইলাম না কেন? কি করিব—এখন সে রূপ নাই—যৌবন নাই, সুতরাং কি সে তোমার মন মজাইব, তাহাই এ জনমের মনের দুঃখ মনেই রহিল। এখন বাজে কথা ছাড়িয়া দুই একটা কাজের কথা লিখি। পূজো আসিল—পূজোপলক্ষে আমি শ্রীমান্ শ্রীমতী সহ ৩রা আশ্বিন শ্যামপুর যাইব। তোমায় সকল কথা লিখিতে ভয় হয়, আবার পত্র না লিখিলেও চলে না। যদি তুমি অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইতে, তবে কখন এত কথা লিখিতাম না। কিন্তু তাহা নহে; তুমি মাস মাস বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতেছ—বড় চাকুরী করিতেছ—বাড়ীতে ও কলিকাতায় অনেক কুপোষ্য প্রতিপালন করিতেছ; কর—আমি তাহাতে নিষেধ করি না; তবে বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, তোমার নিজের স্ত্রী পুত্রের অভাবই কেবল পরিপূর্ণ করিতে পার না। দেখ, লোকে গোলামী করে কেবল স্ত্রী পুত্রের অভাব মোচন করিবার জন্য—আর তুমি যে কি উদ্দেশ্যে গোলামী করিতেছ তাহা এক মাত্র ভগবানই বলিতে পারেন। এ দিকে তোমার এই ব্যবহার অন্য দিকে পত্র লিখিলেও রাগ কর। যাহা হউক, নিজের এবং পুত্র কন্যার ভবিষ্যত

ভাবিয়া—নির্লজ্জার মত মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া—এবারও প
লিখিলাম। এবার আশা পূর্ণ না হইলে, এ জীবনে তোমার নিকট আ
কখন কিছুরই প্রার্থনা করিব না। জানি না মনে আছে কি না—ত
কর্ত্তব্য বোধে মনে করিয়া দিতেছি, এবার পূজোপলক্ষে কলিকাতা হইতে
আইসাকালে, ন বাড়ীর মেজ গিন্নীর মত একছড়া সোনার চন্দ্রহার আনিও
আর এবার ছোট বাড়ীর মেজ ঠাকুর ঝির স্বামী কুমুদ বাবু কলিকাতায়
এস্ কে দাস—কি জানি কার দোকান হইতে একটী সুন্দর ক্লিওপেট্রা
হার আনিয়াছেন, ঠাকুর ঝির স্বামী কুমুদ বাবু অপেক্ষা তুমি কৃতি পুরু
এবং বড় চাকুরী করিতেছ; সুতরাং ক্লিওপেট্রা হারও আমার পাওয়া
কর্ত্তব্য। এই সব বিবেচনা করিয়া—বিশেষতঃ বিনা অলঙ্কারে লোক সমাজে
আমার মুখ দেখাইতে লজ্জা ও ঘৃণা হয়, এই সব বিবেচনা করিয়া একছড়া
সোণার চন্দ্রহার আর একছড়া ক্লিওপেট্রা হার আনিতে অন্যমত করিও না।
ক্লিওপেট্রা হারের দাম শুনি নাই—তবে মনে হয় চারি পাঁচ শত টাকা
হইলেই হইবে। তার শ্রীমান্ ভূপেনের জন্য জরির শোষাক এক সুট ও
শ্রীমতী সুলোচনার জন্য ভাল রেশমী সাড়ী একখান ও সোনার ডাইমন
কাটা মিছরিদানা চুড়ি এক প্রস্ত, আর গলার জন্য সোনার দড়া হার একটা
আনিও। দিব দিব বলিয়া, আজ দুই বৎসর চলিতে বসিল—এ পর্য্যন্ত
কোনটাই পাইলাম না। এখন, পূজার সময় পিত্রালয়ে যাইতেছি—এ সময়
এ গুলিন না পাইলে কোন মতেই চলে না। জামাই বাবু ও বড় দিদি
এবার পূজাতে আসিবেন; সুতরাং বিনা অলঙ্কারে তাঁহাদিগকে আমার
মুখ দেখান কঠিন হইবে। লোকের পুত্র কন্যা ও স্ত্রীরা এই পূজোপলক্ষে
কত গহনা পত্র—কত ভাল কাপড় পাইতেছে; আর তুমি—তুমি বড় চাকুরী
করিতেছ, সত্য অথচ তোমার নিজেরই স্ত্রী পুত্র কন্যা একটু সুতার কাপড়ের
কাঙ্গাল—ইহা কত দূর পরিতাপের বিষয়, তুমি নিজেই বিবেচনা করিও।
এ বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব—যাহা ভাল বোধ হয় করিও। শ্রীচরণে
নিবেদন ইতি।

তোমার স্নেহের দাসী
শ্রীমতী সুভাষিণী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুভাষিণীর পত্র পাঠ করিয়া, রাজেন্দ্রলাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। র পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মনে মনে ভ্রাতৃজায়া বাসন্তী ও পনার প্রাণাধিকা পত্নী সুভাষিণীর পত্রের বিষয় ভাবিলেন, তারপর এক- র পত্র দুই খানির তুলনা করিলেন—উভয়ে কত প্রভেদ। স্বর্গ আর রক—সুখে আর দুঃখে—আলোকে আর আঁধারে—বসন্তে আর গ্রীষ্মে— লনে আর বিচ্ছেদে যত প্রভেদ, বাসন্তী আর সুভাষিণীর পত্রে তত ভেদ। একের পত্র—বাসন্তীর পত্রে স্বর্গের সুধা বরিষণ হইতেছে, অপরের ত্র—পত্নী সুভাষিণীর পত্র কালকুটে পরিপূর্ণ। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতায় াসিক দুই শত টাকা বেতনে একটা মিস্‌নারী কালেজে অধ্যাপকের কাজ রিতেন। দুই বৎসর হইতে চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দুই ৎসর মধ্যে অগ্রজ দেবেন্দ্রলালের কঠিন ব্যারামে জলের ন্যায় অর্থরাশি ব্যয় টিয়া গিয়াছে। তারপর পৈতৃক ঋণও অনেক ছিল, সে দেনাটাও চাকু- তে নিযুক্ত হইয়া পরিশোধ করেন। অন্যদিকে কলিকাতায় চাকুরী রিতেন, সুতরাং কলিকাতার বাসাতে নিজের দরিদ্র আত্মীয় স্বজনও ৭।৮টি কি ও—ইহাতেও মাস মাস সত্তর আশী টাকা ব্যয় হইত। তারপর ড়ীতে দাদা, তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা, বিধবা কনিষ্ঠা ভগ্নী মহামায়া তাহার টি আশ্রয় হীন অপগণ্ড শিশু, বিধবা পিসী ও বিধবা খুড়ী—তাঁহাদের স্থান আছে, তারপর ঠাকুর সেবা—অতিথি অভ্যাগত আছে—লোক লৌকিকতা আছে। সর্ব্বশেষ, পল্লীগ্রামে বাড়ী—ম্যালেরিয়ার আধিক্যতা তু ডাক্তার কবিরাজের ব্যয় গৃহাদি নির্ম্মাণ মেরামত—এই সব কারণে ৎসর বৎসর বহুতর অর্থ ব্যয় হইত। সামান্য মাসিক দুই শত টাকা আর দারীর সামান্য আয়ে কত কুলাইবে? এই সব কারণে সুভাষিণীর ক্রান্ধ আনা পত্র পড়িয়া রাজেন্দ্রলাল হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিলেন—উপার্জ্জন করিব আমি—আমার ইচ্ছা মত ব্যয় করিব, অন্যের হাতে কথা বলিবার অধিকার কি? আর অপব্যয়ই বা কি করিতেছি— ত্মীয় স্বজন সবই আমার আমি তাহাদিগকে প্রতিপালন না করিলে— ক করিবে? আর যদি দাসত্ব করিয়া দীন দরিদ্র আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন

না করিলাম—তবে এক মাত্র স্ত্রী পুত্রের বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য এ
দাসত্ব করা কেন? "শেষ ঠিক করিলেন—" এবার একটু কঠোর ভা
সুভাষিণীর পত্রের উত্তর দিবেন।

সুভাষিণীর পত্রোত্তরের ব্যবস্থা করিয়া, রাজেন্দ্রলাল অগ্রজের পত্রের বি
উত্তর দিবেন, ক্ষণকাল মাত্র তাহা ভাবিলেন। শেষ পূজা করাই স্থি
করিলেন। পূজা করিতে রাজেন্দ্রলালের কোন দিনই অমত নাই, তবে
অনাটনের সংসার—উপার্জ্জন করিবার লোক সবে এক জন, ব্যয় যথেষ্ট
সংসারের সকল দিক রক্ষা করা কঠিন, তাই সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও এতদিন
মনের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এবার অগ্রজ দেবেন্দ্রলালের
আগ্রহাতিশয্য, সঙ্গে সঙ্গে চির হতভাগিনী সংসার সুখ বঞ্চিতা বালবৈধব
প্রপীড়িতা ভগ্নী মহামায়ার বলবতী স্পৃহা আর চির প্রেমময়ী ভ্রাতৃজায়া
বাসন্তী দেবীর অভিলাষ; সুতরাং এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে রাজেন্দ্রলাল পূজা
করাই স্থির করিলেন। পূজা করা স্থির করিয়া, রাজেন্দ্রলাল হাত মুখ ধুইয়া
পত্র লিখিতে বসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজেন্দ্রলাল পত্র লিখিতে বসিয়া প্রথমে অগ্রজ দেবেন্দ্রলালকে নিয়োজ
মত পত্র লিখিলেন:—

দাদা! আমার শত শত প্রণাম জানিবেন:—

এই মাত্র শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ পত্র পাইলাম। পূজা করিতে
আপনার অভিলাষ—আমারও তাহাতে সম্পূর্ণ মত আছে; তবে দুর্ভাগ্য
ক্রমে এত দিন সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি নাই। এখন দীর্ঘকাল পর
আজ্ আপনার আশীর্ব্বাদে দীর্ঘকালের সেই অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করিতে
পারিব বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আপনি পূজার আয়োজন করিতে
প্রবৃত্ত হইবেন। কলিকাতা হইতে যে সব জিনিস পত্র খরিদ করিতে হইবে
তাহার তালিকা পাঠাইবেন। এবং সত্বর কালিকাপুর হইতে প্রতিমা
আনাইবেন। পূজা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহাই করিবেন। এই শুভ
সম্বাদ আমার শত আদরের আদরিণী বউঠাকুরাণী ও প্রাণাধিকা ভগ্নী

শ্রীমতী মহামায়াকে দিবেন। কালেজ বন্ধ হইলেই শ্রীচরণ দর্শন করিবার
জন্য গৃহে যাত্রা করিব। শ্রীচরণে নিবেদন মিতি।

প্রণত সেবক আপনার স্নেহের
শ্রীরাজেন্দ্র লাল।

অগ্রজকে পত্র লিখিয়া, পরে ভ্রাতৃজায়া বাসন্তী ও ভগ্নী মহামায়াকে
সংক্ষেপে দুই খানি পত্র লিখিলেন। সর্ব্বশেষ পত্র লিখিলেন আপনার পত্নী
সুভাষিণীকে। সুভাষিণীর পত্র একটু তিরস্কার সূচক। শিক্ষাভিমানিন্
বা পাঠকের আর বঙ্গ-গৃহ-বিচ্ছেদ কারিণী সুন্দরী পাঠিকার জন্য পত্র
খানির অনুলিপি নিম্নে দিলাম। রাজেন্দ্রলাল পত্নীকে লিখিলেন:—

স্নেহের সুভাষ!

তোমার পত্র পাইলাম, আর সেই সঙ্গে আর এক খানি পত্র
পাইলাম, সে খানি আমার শত আদরের আদরিণী চির স্নেহময়ী বউ-
ঠাকুরাণীর। পত্র দুই খানি পড়িলাম; পড়িয়া দুই খানিতে বিস্তর প্রভেদ
দেখিলাম। এক খানিতে—বউঠাকুরাণীর পত্র খানিতে অনবরত স্বর্গের
সুধা বরিষণ করিতেছে, আর অপর খানি—তোমার খানিতে কেবল হিংসা
দ্বেষ ও নরকের বিষ বরিষণ করিতেছে। এক খানি পাঠ করিলে, শত
যাতনার মধ্যেও হৃদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত হয়, অন্য খানি পাঠ করিলে শত
শান্তির মধ্যেও ঘোর অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। এখন দিন দিন তোমার
বয়ঃবৃদ্ধি হইতেছে—পুত্র কন্যার এখন তুমি মা; কিন্তু এখনও তোমার
হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ হৃদয়ের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। তোমার কার্য্যে
আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই, কেবল মাত্র আমার দুরদৃষ্ট ভাবিয়া দুঃখিত
হইয়াছি। তুমি আমার স্ত্রী—আমার সুখ দুঃখের তুল্যাংশ ভাগিনী—ধর্ম্মের
সহায়, কোথায় তুমি আমার ধর্ম্মের সহায়তা করিবে—বুদ্ধি দোষে আমি
পথ ভ্রষ্ট হইলে, তুমি উপদেশ দিয়া আমাকে আবার সৎপথে আনিবে, না,
বলিতে দুঃখ হয়, তুমি আমার সহধর্ম্মিনী হইয়া কোথায় ধর্ম্মের সহায় হইবে,
না বরং যাহাতে আমি ধর্ম্ম পথ ভ্রষ্ট হই—ইহাই তোমার আন্তরিক
অভিলাষ। আমি কুপোষ্য প্রতিপালন করিতেছি—আমার দাদার পুত্র
কন্যা অথবা অভাগিনী কনিষ্ঠা ভগ্নী মহামায়ার পুত্র কন্যা—ইহারাই কি
আমার কুপোষ্য? ভাবিয়াছিলাম তোমাকে বৃথা আর কোন কথা বলিব

না—বলিব না বলিয়াই এতদিন তোমার পত্রের কোন উত্তর দিই নাই কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার নিজের মঙ্গলের জন্য—পুত্র কন্যার মঙ্গলের জন্য আবার তোমাকে লিখিতে হইতেছে। তুমি তোমার স্ত্রীবুদ্ধি বশতঃ বুঝিতেছ না—অন্যে বুঝাইলেও তুমি বুঝিবে না, কিন্তু এক দিন বুঝিবে যে তোমার এই পাপ হিংসা বৃত্তি কি কুফল প্রসব করিবে? তাহাই এখন আমার ও তোমার আর তোমার গর্ভজাত ভূপেন ও সুলোচনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তোমায় লিখিতেছি যে, সময় থাকিতে এখনও সতর্ক হও; নহিলে অপরের সন্তানের উপর হিংসা প্রকাশ করিয়া আপনার হৃদয় চের অমূল্যধন ভূপেন ও সুলোচনাকে হারাইও না। তোমার ব্যবহারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দাদা ও মহামায়ার ছেলে মেয়েদের প্রতি তোমার হিংসার ফলেই, আমি ভূপেন ও সুলোচনাকে হারাইব। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত তোমার চরিত্র সংশোধন না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি আর আমাকে পত্র লিখিও না। আমি নিজে অর্থ উপার্জ্জন করি; সুতরাং আমার ইচ্ছানুসারে ব্যয় করিব, তাহাতে তুমি বা অন্যের কথা বলিবার আবশ্যকতা কি বুঝিতে পারি না? লোকে প্রবাসে বসিয়া প্রাণাধিকা পত্নীর প্রেম পরিপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া সুখ সাগরে ভাসিতে থাকে; আর আমি এমনই হতভাগ্য যে, প্রবাসে বসিয়া স্ত্রীর পত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ে কেবল বৃশ্চিক দংশনাধিক যাতনা ভোগ করি—সবই আমার কর্ম্মফল। এ সম্বন্ধে তোমাকে আর কি লিখিব। বাড়ীতে এবার পূজা, সুতরাং পূজোপলক্ষে এবার তোমার পিত্রালয়ে যাওয়া হইবে না। তোমরা তিন জনে মিলিয়া মিশিয়া পূজার কার্য্যে নিযুক্ত হইবে ইতি।

তোমার হতভাগ্য
রাজেন্দ্রলাল।

রাজেন্দ্রলাল পত্র লেখা সমাধান করিয়া, পত্র কয়েক খানি ও বাড়ীর জন্য কিছু অর্থ মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে টাকা ও পত্র আসিয়া দেবেন্দ্রলালের হাতে পড়িল। দেবেন্দ্র লে তাড়াতাড়ি আপনার পত্র পড়িয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে দুর্গা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহামায়াকে ডাকিলেন। অগ্রজের স্নেহ পরিপূর্ণ আহ্বানে মহামায়া আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহামায়ার হাতে তাহাদের — পত্র কয় খানি দিয়া কহিলেন—"রাজেন্দ্রলাল এবার পূজা করিবে—তোমরা তিন জনে পূজার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হও। আমি আজ গঙ্গারামপুরের হাট করিয়া রজনী প্রভাতে প্রতিমা আনিবার জন্য কালিকাপুর যাইব।" এই বলিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়া নৌকার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে মহামায়া আর বাসন্তী নিজ নিজ পত্র পাঠ করিয়া আনন্দ সলিলে ভাসিলেন। কেবল রাজেন্দ্রলালের স্ত্রী সুভাষিণী স্বামীর পত্র পড়িয়া একেবারে তপ্ততৈলে জ্বলিয়া উঠিলেন। নানা কারণে সুভাষিণী আজ রাজেন্দ্রলালের উপর বিষম চটিয়াছেন। প্রথমতঃ পত্রের উত্তর খুব কড়া মেজাজে দিয়াছেন। তারপর, বাসন্তীতে আর তাহাকে তুলনা করিয়া এক জনকে—বাসন্তীকে স্বর্গেরদেবী আর অন্যজনকে—সুভাষিণীকে নরকের কীট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সব চাহিতে যে সব জিনিসের তিনি ফরমাইস করিয়াছিলেন, তাহাও আনিবেন না—নিশ্চয়। যদি আনিতেন তবে পত্রের উত্তর এমন ভাবে কখনই দিতেন না। সুতরাং রাগে আর অভিমানে সুভাষিণীর সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। যখন ক্রোধে ও অভিমানে সুভাষিণী বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলেন, ঠিক সেই সময়ে সেই খানে সুভাষিণীর তিন বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র ভূপেন বসিয়া, মার বাক্স হইতে এটা সেটা বাহির করিতে-ছিল, কাগজ দুই খানি ছিঁড়িয়া দোয়াতের কালী ফেলিয়া একটা কলম ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং রাজেন্দ্রলালের উপর ক্রোধ ঝাড়িবার অন্য সুযোগ না পাইয়া, তিন বৎসরের শিশু পুত্রের উপর সেই ক্রোধ

ঝাড়িলেন—বিষম প্রহারে শিশুর সেই নবনীত কোমল দেহ স্থানে স্থা
রক্তজবার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। সহসা শিশুর বিকট চীৎকারে বাস
আসিয়া রক্ষা না করিলে, হয়ত আজ বালকের জীবন রক্ষা কঠিন হই
ভূপেনের প্রহারে বাসন্তীর আগমন দেখিয়া, সুভাষিণী কাল সাপিনীর ন্য
গ্রীবা উত্তোলন করিয়া তীব্র তিরস্কার স্বরে কহিলেন—"থাক আর আদ
ক'র্ত্তে হবে না—যা ক'র্ল্লে ঢের হয়েছে; আগে তোমার দেওর বা
আসুক—তখন আদর দেখিয়ে পূজার বাজারে বক্‌সিস্ নিও"—এই বলি
বাসন্তীর ক্রোড় হইতে ভূপেনকে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন।

এবার বাসন্তী দৃঢ় ক'রে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"আ
আবার কোন ভূতে তোকে পেলে?"

রাগে ফুলিতে ফুলিতে সুভাষিণী কহিল—"আমার সাথে লাগলে ভা
হ'বে না। যত ছোট লোকের মেয়ে জুটে দিবা রাত্রি আমার হাড় জ্বালা
বসেছে—পোড়ার মুখিদের আর কাজ নেই?"

এবার বাসন্তী হাসিলেন—হাসিয়া কহিলেন—"আমরা সবাইতো ছে
লোকের মেয়েই বটে, তুমি বড় লোকের মেয়ে হ'য়ে ছোট লোকের ঘ
এসেছিলে কেন?

রাগে ফুলিতে ফুলিতে সুভাষিণী দুই চারিটা কড়া কড়া কথা বাসন্তী
শুনাইয়া দিলেন, বাসন্তীও ধীরে ধীরে দুই চারিটা কথার উত্তর দিলেন।

বাসন্তী ও মহামায়া সুভাষিণীর প্রকৃতি বেশ জানিতেন, তার
রাজেন্দ্রলালের বউ বলিয়া দেবেন্দ্রলাল ভাতৃ বধূকে একটু ভাল বাসিতেন
একটু অধিক স্নেহ করিতেন; সুতরাং সুভাষিণীর কল্যাণে বাসন্তী মা
কর্ত্তৃক মাঝে মাঝে তিরস্কৃত হইতেন এবং এই জন্য বড় করিয়া কিছু বলি
সাহস করিতেন না। তাই সুভাষিণীর কণ্ঠ স্বর যখন পঞ্চম ছাড়াই
সপ্তমে চড়িল, তখন বাসন্তী ভূপেনকে ক্রোড়ে করিয়া যাইতে উদ্যত হই
হাসিয়া কহিলেন—"আজ তোর কি হ'য়েছে—পাগল হবি না কি?"

এবার সুভাষিণী রাগে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া কহিলেন—"হবে আ
কি, তোমার দেওর মরেছে—আমার শাঁখা পরা জন্মের মত ঘুচে গিয়েছে।

সুভাষিণীর কথায় বাসন্তী হাসিয়া কহিলেন—"ঠাকুর পো কেন মর
লা—পোড়ারমুখি। তুই পোড়ারমুখি মর্—ঠাকুর পোকে আবার বি

দিয়ে একটা সোণার চাঁদ বউ ঘরে নিয়ে এসে আঁধার ঘর আলো করি;"—
এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ভয়ে ভয়ে ভূপেনকে ক্রোড়ে করিয়া
চলিয়া গেলেন। বাসন্তী চলিয়া গেলে পর—শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী—
যে সুভাষিণী কিঞ্চিৎ অলঙ্কার লাভের প্রত্যাশায় কত প্রাণেশ্বর—কত প্রা
বল্লভ, কত প্রিয়তম সম্বোধন করিয়া স্বামীকে পত্রের পর পত্র লিখিতেছিলেন,
আজ সেই সুভাষিণী প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের পত্র পাঠ করিয়া, মেজেতে মাথা
কুটিতে কুটিতে সেই হৃদয়েশ্বরকে জীয়ন্তে যমালয়ে প্রেরণের সুব্যবস্থা করিতে
লাগিলেন। আর চির প্রেমময়ী রসবতী বঙ্গের পাঠিকারা, যদি রাগ
না করেন তবে বলি যে সংসারে ইহাই "স্ত্রী চরিত্র—অপূর্ব্ব স্ত্রী চরিত্র।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অগ্রজকে পত্র লেখার পর হইতে, নিজের মনে যাহা যাহা উদয় হইল,
রাজেন্দ্রলাল ক'দিন ধরিয়া তাহাই ক্রয় করিলেন। তারপর যথাসময়ে
অগ্রজের পত্র পাইলেন। অগ্রজ দেবেন্দ্রলাল পত্রে লিখিয়াছেন:—

প্রণাধিক রাজেন্দ্র!

তোমার পত্র পাইয়াছি—মহামায়ার পূজার উদ্যোগ চলিতেছে।
গত পরশ্ব প্রভাতে পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষকাল পরে, আমার এই ব্যাধের মন্দিরে
আবার মহামায়ার আবির্ভাব হইয়াছে। এ ব্যাধের গৃহে মা'র শুভাগমন
হইয়াছে সত্য; কিন্তু কি জানি কেন মার বদন কমলে, যেন এবার বাৎসল্য
ভাবের বড়ই অভাব—সত্য কথা বলিতে কি যেন অকালে মার বদনশশী
দুষ্ট রাহুগ্রস্থ চন্দ্রমার ন্যায় হরিতবর্ণ হইয়া যেন দিবা যামিনী শুধু 'সংহার
সংহার রব করিতেছেন। মার এবারকার মূর্ত্তিতে, আর পিতৃদেব ঠাকুরের
আনিত মূর্ত্তিতে কত যে প্রভেদ তাহা পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। মার
এই বিষাদ মলিন অশিব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যেন মাকে এবার আনিয়া
নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছি। কি করিব—উপায় নাই, যখন
আনিয়াছি, তখন আমার পোড়া অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে—
পূজা না করিয়া তো উপায় নাই। যে দিন শত আদরে মাকে চণ্ডীমণ্ডপে

স্থাপন করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমার মনে বড় আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, এবার আমার অদৃষ্টে বিধাতা আবার বা কি দুর্ঘটনা লিখিয়াছেন! তুমি পত্র পাঠ বাড়ী আসিতে যত্ন করিও—তোমার জন্যই আমার অধিক চিন্তার কারণ। সরসীলালের অভাবে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু আমি পাষাণ—সে বজ্রাঘাতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই। যে দিন মাকে গৃহে আনিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার নিদ্রা গিয়াছে, যদিও বা শত চেষ্টা করিয়া একটু তন্দ্রা বোধ হয়, অমনি ভীষণ দুঃস্বপ্নে আমার সে তন্দ্রা টুকুও ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর শুনিলাম, আমার স্নেহময়ী বউ মা, কি জানি কেন রাগ করিয়াছেন! তুমি অবশ্যই জান, সংসার মধ্যে—এমন কি তোমা অপেক্ষাও আমি বউ মাকে অধিক ভালবাসী—কেন ভাল বাসী তাহা জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে পরমারাধ্য পিতৃদেবের সেই অন্তিম উপদেশ। সুতরাং আমার অনুরোধ বউ মা যাহাতে সন্তুষ্ট হন, প্রাণপণ করিয়া তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিও, এবং শ্রীমতী মহামায়ার পত্রানুসারে কার্য্য করিতে অন্যমত করিও না। অধিক আর কি লিখিব—যে পর্য্যন্ত বাড়ী না আইস, সে পর্য্যন্ত দৈনিক এক খানি করিয়া পত্র লিখিও ইতি।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীদেবেন্দ্রলাল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অগ্রজের পত্র পাঠ করিয়া, রাজেন্দ্রলাল কিছু মাত্র হেলিলেন না কেবল একবার মাত্র ভাবিলেন—"দুর্ব্বল শরীরে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম—অতিরিক্ত অধ্যয়ন—কঠোর দুশ্চিন্তা—এই জন্যই নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে; আর নিদ্রার ব্যাঘাতেই স্বপ্ন দর্শন অনিবার্য্য।" এই সব ভাবিয়া দাদাকে লিখিলেন:—

দাদা! আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যে ভয় করিতেছেন, তাহা অলীক। মঙ্গলময়ী মা হইতে সন্তানের কখন কি কোন অমঙ্গল হইয়া

থাকে? আপনি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, সবই জানিয়া শুনিয়া এরূপ বৃথা আশঙ্কাকে কেন হৃদয়ে স্থান দিতেছেন। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিবা রাত্রি অধ্যয়ন করেন; সুতরাং নিদ্রার ব্যাঘাত না হইবে কেন? যাহা হউক, নিজের শারীরিক অবস্থানুসারে সতত চলা আপনার কর্ত্তব্য। মানসিক পরিশ্রম এককালীন রহিত করিয়া, মন যাহাতে সতত প্রফুল্ল থাকে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি চতুর্দ্দশীর প্রভাতে শ্রীচরণ দর্শন করিব। শ্রীচরণে নিবেদন মিতি।

প্রণত সেবক
শ্রীরাজেন্দ্রলাল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শক্তিপুরের দেবেন্দ্রলালের গৃহে দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ পরে, আবার মহামায়ার আবির্ভাব হইয়াছে—সুতরাং দেবেন্দ্রলালের গৃহে বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চণ্ডিমণ্ডপে মালাকার মহামায়া দশ ভুজার মূর্ত্তিকে সাজাইতেছে, আর গ্রামস্থ বালকগণ, তাহার সাহায্য করিতেছে। অন্যদিকে চণ্ডিমণ্ডপের বারান্দার এক দিকে নূতন মাদুর বিছাইয়া নূতন হুকা কলিকা অজস্র তাম্রকূটের বংশ বিনাশ করিতে করিতে গ্রামের বর্ষীয়ান প্রতিবেশীরা সরস রসিকতায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হাসাইতেছিলেন। অন্যদিকে ভূমিতে পৃথগাসনে দেবেন্দ্রলাল বসিয়া প্রতিবেশীদের খোস্ গল্প শুনিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দু একটা সরস কথায় হাস্যস্রোত বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এমন সময় দীর্ঘ এক বৎসরের পর, হাসিতে হাসিতে রাজেন্দ্রলাল গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্রজের চরণ বন্দনা করিলেন। তারপর মহাদেবীর উদ্দেশে চণ্ডিমণ্ডপে প্রণাম করিয়া, প্রতিবেশী মণ্ডলীর মধ্যে প্রণম্যদিগকে যথারীতি প্রণাম ও স্বাগত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বয়ঃ কনিষ্ঠদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় হাসি মুখে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মহামায়ার দুই বৎসর বয়সের শিশুপুত্র দেবেন্দ্রলালকে ক্রোড়ে করিয়া বারবার মুখ চুম্বন করিতে করিতে, পাক-

শালার দিকে গমন করিয়া শত আদরের আদরিণী ভ্রাতৃজায়া বাসন্তীকে প্রণাম করিলেন এবং অনুজা মহামায়ার প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে সপ্তমী পূজা শেষ হইয়া, মহা ধূমধামে মহাষ্টমী পূজা শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর মহামায়া জগদম্বার আরতি আরম্ভ হইল। বিশাল ও উন্নত ললাটে সুবিস্তৃত ত্রিপুণ্ড্রক শোভিত—একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির আধার—শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে বিশারদ, ধর্ম্মাত্মা কুলপুরোহিত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ অতি যত্নের সহিত, অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া, পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ পরে, দেবেন্দ্রলালের এই দেবালয়ে—মহাষ্টমীর মহানিশায় সর্ব্বসন্তাপ হারিণী—সর্ব্বশোক-তাপ-নাশিনী সর্ব্ব মঙ্গলময়ী মাতা শরৎসুন্দরী শারদার আরতি করিতেছিলেন। চণ্ডিমণ্ডপের মধ্যস্থলে দেবী প্রতিমা, সম্মুখে দীপাধারে উজ্জ্বল ও পরিস্কার মোমের বাতী জ্বলিতেছিল, আর সেই দীপাবলীর উজ্জ্বল আলোক প্রতিমার বদনে আর প্রতিমার সেই সাজের উপর পড়িয়া, দরিদ্র দেবেন্দ্রলালের চণ্ডিমণ্ডপ খানি সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সেই "উজ্জ্বলে আর মধুরে" মিশিয়াছিল। সম্মুখে ধুনচী—ধুনচীতে ধুপ গুগ্‌গুল ও অগুরুর ধুমে দশদিক আমোদিত করিয়া বৎসরান্তরে—বৎসরান্তরই বা কেন—সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ পরে, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির প্রেম মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিতেছিল। অন্যদিকে প্রাঙ্গন মধ্যে ঢাক ঢোল সানাইয়ের মধুর রবে আর শরতের সেই চাঁদনী রজনীতে আজ দীর্ঘকালের দাসত্ব পীড়িত বঙ্গ সন্তান, মায়ের অপার করুণায় সামান্য দিবসত্রয়ের জন্য আপনার দাসত্ব জীবন ভুলিয়াছেন—পর পদ সেবার যন্ত্রণা ভুলিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল, অন্ততঃ ক্ষণ পর্য্যন্ত মার আরতি দেখিয়া দেখিয়া একবার—শুধু একবার মাত্র ভাবিলেন—"পবিত্র হিন্দুকুলে—ততোধিক পবিত্র ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়া দেব দুর্ল্লভ মানব জনম সার্থক করিয়াছি।" * * * *

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে মহানবমী পূজা শেষ হইল। মহানবমীর পূজা শেষ করিয়া কুলাচার অনুসারে অগ্রজের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজেন্দ্রলাল বেলা স্বার্দ্ধ দ্বিতীয় প্রহরের সময়, অন্তঃপুর মধ্যে পূজোপলক্ষে আত্মীয় স্বজন আশ্রিত প্রতিপালিত, দাস দাসী দিগকে নববস্ত্র বিতরণ করিতে বসিলেন। প্রথম বালক বালিকাদিগকে নব বস্ত্রে সুশোভিত করিয়া, শেষে আর আর সকলকে বস্ত্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হৃষ্ট মনে, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিয়া, কেহ বা প্রণাম করিয়া, রাজেন্দ্রলালের হস্ত হইতে নব বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, আবার নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সকলকে বস্ত্র দান কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, এবার মহামায়া, বাসন্তী এবং পত্নী সুভাষিণীর পালা উপস্থিত হইল। রাজেন্দ্রলাল তখন স্নেহ পরিপূর্ণ মধুর স্বরে মহামায়াকে ডাকিলেন। মহামায়া, দাদার আদরের ডাকে, মূহুর্ত্ত জন্য আপনার হৃদয়ের শত যন্ত্রণা ভুলিয়া, মলিন হাসি মুখে দাদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আজ এই পূজোপলক্ষে—এই নব বস্ত্র বিতরণ সময়ে নিজের স্নেহময়ী বাল বৈধব্য পীড়িতা কনিষ্ঠার মুখ প্রতি চাহিয়া, কনিষ্ঠার বিষাদ মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া, ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রলালের দুই নয়নে অশ্রুধারা ধারার পর ধারায় প্রবাহিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য হৃদয় যাতনা উপস্থিত হইল। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কনিষ্ঠার মুখ প্রতি চাহিয়া, রাজেন্দ্রলাল অশ্রু মোচন করিলেন, কেন না আজিকার এই শুভ দিনে যে বেশে কনিষ্ঠা ভগ্নীকে সাজাইলে, দেবেন্দ্রলাল অথবা রাজেন্দ্রলাল দেখিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেন, বিধাতা তাঁহাদের সে সাধে জন্মশোধ বাদ সাধিয়াছেন। ভাগ্যনেমীর কঠোর শাসনে মহামায়া আজ বিধবা—প্রথম ও পূর্ণ যৌবনে রমণীর একমাত্র সুখ প্রদীপ, মহামায়ার স্বামী সরসীলাল—অকালে সবে মাত্র পঞ্চ বিংশ বর্ষ বয়সে পদার্পন করিতে না করিতে—ভবিষ্যতে, সুখপূর্ণ মনে করিয়া, সংসারে প্রেমের যে পর্ণ কুটির কল্পনা বলে বাঁধিতেছিলেন, সেই কুটির নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতে, বিধাতার অপূর্ব্ব বিচারে অকালে তিন দিনের জ্বরে—আর বৎসর এমনই দিনে সংসার সুখানভিজ্ঞা মহামায়া আর সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রলাল ও রাজেন্দ্রলালের হৃদয়ে হঠাৎ, বিনা মেঘে অশনি-

পাত করিয়া জন্মের মত ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অনে
ক্ষণ পর, রাজেন্দ্রলাল আবার মধুর স্বরে ডাকিলেন—"মহামায়া!"

এবার অগ্রজের স্নেহপূর্ণ মধুর সম্বোধনে ধীরে ধীরে সরলতা পরিপূ
মধুর হাসি হাসিয়া মহামায়া রাজেন্দ্রলালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া মধু
স্বরে যন্ত্রণা বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন—"দাদা আমার আবার পূজার কাপ
কেন?"

আবার রাজেন্দ্রলালের নয়নে জল আসিল। রাজেন্দ্রলাল নয়নের জ
মুছিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ পরিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"মহামায়া, ভগ্নি, যতদি
আমি আর দাদা জীবিত আছি, ততদিন আমার আর দাদার সন্তোষ সাধ
তোমাকে করিতেই হইবে। তারপর, আমাদের অভাবে যাহা তোমা
কপালে আছে—তাই ঘটিবে।" এই বলিয়া এক খানি গরদের সাটী
বাহির করিয়া, মহামায়ার হাতে দিয়া কহিলেন—আজ সন্ধ্যার পর এইখানি
পরিয়া, মায়ের আরতি দেখিতে যাইও—ইহার অন্যথা যেন না হয়।"

গরদের সাটী খানি হাতে করিয়া মহামায়া হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা
দাদা এখানার দাম কত?"

রাজেন্দ্রলাল—"কেন? ইহার দাম পনের টাকা।"

মহামায়া—"আমি এখন পরিব না। আগামী কার্ত্তিকের পূর্ণিমায় গুরু
দেব আসিয়া আমায় দীক্ষা দিবেন—স্বীকার করিয়াছেন। সেই সময়ে এ
গরদ দিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিব।"

রাজেন্দ্রলাল মহামায়ার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—"না, মহামায়া
তাহা হবে না। এখানি তোমাকে পরিতেই হইবে। যখন তুমি দীক্ষ
গ্রহণ করিবে, তাহার পূর্ব্বে আমায় বলিও, আমি ঠিক এমনই দামে এমন
এক খানি কিনিয়া পাঠাইব।" অগ্রজের কথায় মহামায়া আর দ্বিরুক্তি ন
করিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তারপর সুশীলা বাসন্তী ধীরে ধীরে অধরে সরলতার মোহিনী হা
হাসিতে হাসিতে আসিয়া দেবরের হাত হইতে, তাঁহার প্রাপ্য পূজার কাপ
আর সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রণাম লইয়া চলিয়া গেলেন।

এবার সুভাষিণীর—রাজেন্দ্রলালের পত্নী সুভাষিণীর পালা। রাজেন্দ্র
লাল সুভাষিণীকে না ডাকিয়া, পুনরায় ভ্রাতৃজায়া বাসন্তীকে ডাকিলেন

বাসন্তী আসিলে, যাই তাঁহার হস্তে পত্নীর প্রাপ্য বস্ত্রখানি দিলেন, অমনি
রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার শয়ন গৃহের দ্বারের নিকট হইতে
যে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সুভাষিণী এতক্ষণ নব বস্ত্র বিতরণ দেখিতে-
ছিলেন) ত্বরিত পদে আসিয়া, ক্ষিপ্র হস্তে বাসন্তীর হাত হইতে আপনার
বস্ত্র খানি কাড়িয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে কাপড় খানি খণ্ড খণ্ড
করিয়া জলসিক্ত প্রাঙ্গনের মধ্যে ফেলিয়া আপনার পদতলে মর্দ্দিত
করিলেন।

এবার রাজেন্দ্রলাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পত্নীর এবম্বিধ
কার্য্য দেখিয়া ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন—তারপর ক্রোধে পায়ের খড়ম
তুলিয়া সুভাষিণীকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। বাসন্তী সুভাষিণীকে
সরাইতে না সরাইতে রাজেন্দ্রলাল নিক্ষিপ্ত সেই কাষ্ঠ পাদুকা যাইয়া
সুভাষিণীর গায়ে না লাগিয়া, দক্ষিণ হস্তের শাঁখায় লাগিয়া শাঁখা ভাঙ্গিয়া
গেল। সুভাষিণী পূর্ব্বের ন্যায় ক্রোধে কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিতে
গর্জ্জিতে দক্ষিণ হস্তের দ্বারায় বাম হস্তের শাঁখা গাছিও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া
কহিলেন—"এই দেখ, আজি হইতে আমি বিধবা হইলাম—এজন্মে আমার
শাখা পরা ঘুচিয়া গেল।"

পত্নীর কথা শুনিয়া রাজেন্দ্রলালও মর্ম্মভেদী হাসি হাসিয়া কহিলেন—
"আমিও কায়মনবাক্যে তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি শীঘ্রই বিধবা
হও—বিধবা না হইলে তোমার হিংসা দ্বেষ যাইতেছে না; আজিকার
অস্তমিত সূর্য্য যেন আগামী কল্য প্রাতে তোমায় আর সধবা না
দেখেন"—আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা মহামায়া আসিয়া
আপনার করে রাজেন্দ্রলালের মুখ চাপিয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে
কহিলেন—"দাদা, আমার পত্রানুসারে তুমি কাজ করিলে, আর কোন
গোলযোগ হইত না। বাড়ীর মধ্যে একজন যদি অবুঝ হয়—তবে সকল-
কেই কি অবুঝ হইতে হইবে?"

রাজেন্দ্রলাল উত্তর করিলেন—"শক্তিপুরের রায়দের গৃহে এমন কুলাঙ্গার
এপর্য্যন্ত কেহ জন্মে নাই যে, চির দিন স্ত্রীর গোলাম হইয়া থাকিবে? আর
এপর্য্যন্ত এগৃহে এক মাত্র সুভাষিণী ভিন্ন এমন রাক্ষসী আইসে নাই যে,
চির জীবন বাড়ীর সকলকেই জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারিবে। ওর যেমন

অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমি বিধবা না হইলে অহঙ্কার চূর্ণ হইবে না এই বলিয়া, বিষণ্ণ মনে ধীর পদে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে মহা নবমীর দিবাও শেষ হইল। সন্ধ্যার পর যথা সময়ে, পূর্ব্ব দিনের ন্যায় দেবীর আরতি কার্য্য শেষ হইল। অদ্য শেষ পূজা অপরাহ্ন হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আগন্তুকদিগের ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারপর রাজেন্দ্রলাল ও বাসন্তীর ভ্রাতা হেমচন্দ্র উভয়ে স্নান করিয়া আসিলেন। পরে, পূর্ব্বরীতি অনুসারে দেবেন্দ্রলাল ও রাজেন্দ্রলাল দুই ভ্রাতা হেমচন্দ্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব পরিবৃত হইয়া একত্রে বসিয়া আজিকার এই মহা নবমীর গভীর নিশায় দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আহারাদি কার্য্য শেষ করিয়া, গালগল্পাদি ও তাম্বুল চর্ব্বণে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত করিয়া রাজেন্দ্রলাল সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রলাল আপনার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে শয্যোপরি আসিয়া শয়ন করিলেন—অন্যের অলক্ষ্যে নিভৃতে বসিয়া একবার মনের সাধে কাঁদিলেন। এমন শুভ দিনে কাঁদিবেন কেন? বস্ত্র বিতরণের সময় পত্নী সুভাষিণী যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই জন্যই কি কাঁদিলেন? না, তাহা নহে? কাঁদিলেন, স্নেহের পুত্তলি—সরলতার আধার, আপনার প্রাণাধিকা অনুজা মহামায়ার জন্য। এই শোক পরিপূর্ণ সংসারে জন্মিয়া যিনি একবারও কাঁদেন নাই আমার বিবেচনায় তিনি অধম। নিজ দুঃখেই হউক, অথবা পরের দুঃখেই হউক, যিনি জীবনে একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য কাঁদেন নাই, তিনি ভালবাসার মর্ম্ম—প্রেমের

দুর্ব্বোধ্য রহস্য—জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তিনি বুঝিতে পারেন নাই—জীবনে কোন দিন পারিবেন কি না বিধাতাই বলিতে পারেন। মনের দারুণ জ্বালা এক মাত্র অশ্রুজলেই নির্ব্বাণ হয়। আজিকার এই সুখের শরৎকালে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে শরৎসুন্দরী শারদার আবির্ভাব, সুখের সত্য, কিন্তু ভাই আমি অধম—মায়ের কুসন্তান; তাই আমি এই সুখের শরৎকালে মাতা শরৎসুন্দরীর শুভাগমনেও হৃদয়ে এক বিন্দু—ক্ষুদ্র এক বিন্দু সুখের অংশ পাইলাম না। যেমন বার মাস ত্রিশ দিন, এই সংসার কাননে সুখ পাইতাম, আজিকার এই সুখের শরৎকালে শরৎসুন্দরী শারদার আগমনে সুখ ত দূরের কথা বরং দুঃখের বোঝা আরও ভারী হইতে চলিল। আমার কথায় তোমরা আমায় শত ধিক্কার দিবে—দাও, আমি কিছু মাত্র ক্ষতি বোধ করিব না। মনুষ্য—শুধু মনুষ্যই বা বলি কেন? মনুষ্য সমাজের এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের তীব্র তিরস্কার তীব্র ঘৃণা এবং কথায় কথায় লাঞ্ছনা, হৃদয়ের প্রত্যেক রক্ত কণিকায় শত বৃশ্চিক দংশনাধিক জ্বালার অধিক জ্বলিতেছে। আমার হৃদয়ের এ জ্বালা—অন্তরের এ তাপ এ জন্মে ঘুচিবে কি না জানি না। আমার কথায়, আমাকে মূর্খ বলিতে হয় বল—অধম বলিতে হয় বল, যাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় বল, একবার কেন—শতবার—শত প্রকারে বল, কোন আপত্তি করিব না। লোকের হাসি ঠাট্টা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, ঘৃণা ও তিরস্কার যখন আমার অঙ্গের আভরণ করিয়াছি, তখন আর ভয় কি? আজ মহা নবমীর মহা পূজা—বড় আমোদের, বড় সুখের দিন সত্য; কিন্তু ঐ দেখ পুত্র হীনা অনাথা বিধবা মাতা, আজ এক মাত্র হৃদয়ের শোনিত—স্বামীর এক মাত্র শেষ স্মৃতি চিহ্ন পুত্রকে অকালে যমের দ্বারে ডালি দিয়া—তোমরাই বল না, আহা অভাগিনী মাতা শরৎকালের এই শারদোৎসবে কি করিবে? তাই বলিতেছিলাম, আমার এই হৃদয়ের জ্বালা শত শরৎকাল আসিলে যাইবে না—যাইবার নহে—এ জ্বালার নির্ব্বাণ হইবে না। নিভিবে—হৃদয়ের এই তীব্র জ্বালা এক দিন নিভিবে, সেই দিন—সেই শুভ দিন, যে দিন শেষ শ্মশান সৈকতে শুইতে পাইব—হৃদয়ের এই যাতনা, আত্মীয় স্বজনের শত নির্য্যাতন, বন্ধু বান্ধবের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সেই দিন সেই শুভ মুহূর্ত্তে চির দিন তরে নিভিবে। রাজেন্দ্রলালের হৃদয়েরও সেই জ্বালা—

সেই প্রাণ প্রতিম, শত আদরের আদরিণী, স্নেহের পুত্তলী—মহামায়ার স্বামী সরসীলাল প্রথম বিকাশোন্মুখ নবযৌবনে গত বৎসর এই মহা নবমীর রাত্রিতেই পৃথিবীর সকল সাধে জলাঞ্জলী দিয়া চির দিন তরে চলিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রলালের হৃদয়ের প্রতি স্তরে এ জ্বালা রাবণের চিতার ন্যায় দিবা রাত্রি জ্বলিতেছে, তবে দেবেন্দ্রলাল সংসারে এক মাত্র অনুজ রাজেন্দ্রলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, হৃদয়ের সকল দুঃখ—সকল যন্ত্রণা ভুলিতে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, রাজেন্দ্রলাল কিসে এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভুলিবেন? রাজেন্দ্রলালের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই—সরসীলালের মৃত্যুতে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাই এই মহা নবমীর মহা নিশায় শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলেন—"হায়! আমার হৃদয়ের এ জ্বালা কি নিভিবে না?" আবার ভাবিলেন—"যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে তত দিন এই অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেই হইবে। হৃদয়ের এ অনল—এ অনল শত শরৎকালে শত শরৎসুন্দরী আসিলে নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না।" রাজেন্দ্রলাল শয়ন করিয়া, আপনার মনে একবার ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ভাবিলেন—এই উৎসবে বাহ্যিক আনন্দে ডুবিয়াছেন সত্য; কিন্তু হৃদয়ে অহরহ অগ্নেয় গিরির গর্ভস্থ অনলের ন্যায় দাবানল জ্বলিতেছে। রাজেন্দ্রলালের হৃদয়ের এ দাবানল কবে নিভিবে—কখন এ দাবানল নিভিবে কি? তারপর ভাবিলেন—"আহা, মহামায়া—যে মহামায়া সরলতা ও পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি—সেই মহামায়ার কার অভিসম্পাতে আজ এই নবীন বয়সে—এই দশা। কোন্ পাপে সংসার জ্ঞান শূন্যা বালিকার প্রতি বিধাতার এই স্নেহ শূন্য নীরস অপূর্ব্ব বিচার? ইহাই কি বিধাতার সর্ব্বজন প্রীতি—ইহারই নাম বিধাতার অনুগ্রহ? এমন সাক্ষাৎ নির্দ্দয়তার প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া কেন পূজা করিব?" ভাবিতে ভাবিতে বালকের ন্যায় রাজেন্দ্রলাল কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ অশ্রু মোচনের পর হৃদয় যাতনার কতকটা লাঘব হইলে, আবার আজিকার ঘটনা মনে পড়িল—বস্ত্র বিতরণ মনে পড়িল—পত্নী সুভাষিণীর ব্যবহার মনে পড়িল—প্রত্যেক কার্য্যেই সুভাষিণীর হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় মনে হইতে লাগিল। অমনি রাজেন্দ্রলালের হৃদয়ে আবার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, ভাবিলেন—"আমি এমনই হতভাগ্য যে, সংসারে একমাত্র শান্তিরূপিনী যে পত্নী, আমি সে পত্নী স্নেহেও

বঞ্চিত—বিধাতা সে সুখেও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।" এইরূপ ঘোর দুশ্চিন্তায় রাজেন্দ্রলালের রাত্রিতে নিদ্রা হইল না।

প্রভাতে পক্ষী কূজনের সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে গেলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আর উঠিয়া আসিতে পারিতেছিলেন না। বড় কষ্টে উঠিয়া আসিয়া প্রাঙ্গন মধ্যস্থ কামিনী বৃক্ষ মূলে বসিলেন। বসিতে না বসিতে আবার মল ত্যাগের ইচ্ছা হইল—অমনি ধীর পদে গৃহের পশ্চাতে গেলেন—অধিক দূর যাইতে সক্ষম হইলেন না। অনেকক্ষণ পরে বড় কষ্টে আবার সেই কামিনী বৃক্ষ মূলে আসিয়া বসিলেন। সর্ব্ব শরীরে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় স্বেদ ধারা বহিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে বমন উপস্থিত হইল। বমনে ও অজস্র স্বেদ ধারায় শরীর আরও দুর্ব্বল হইল—মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। প্রভাতে সকলেই উঠিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন—কেহই রাজেন্দ্রলালের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কয়েক দিনের কঠিন পরিশ্রমে আজ বাসন্তীর উঠিতে একটু বেলা হইয়াছিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া দ্বারের নিকট আসিতেই, বাসন্তী কামিনী বৃক্ষ মূলে রাজেন্দ্রলালকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং দ্রুত পদে দেবরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভ্রাতৃজায়া বাসন্তীকে দাঁড়াইতে দেখিয়া রাজেন্দ্রলালের নয়ন কোণে ক্ষুদ্র দুই বিন্দু অশ্রু আসিল। অশ্রু বিন্দু মুছিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—"মরিলাম, আমার কলেরা হইয়াছে।"

রাজেন্দ্রলালের বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে, বাসন্তী—মহামায়া বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এবং ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রলালকে ধরিয়া শয্যায় আনিলেন। শয্যায় আসিয়া রাজেন্দ্রলালের শ্রাবণের প্রবল ধারার ন্যায় স্বেদ ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এ দিকে বাসন্তীর বিকৃত কণ্ঠের বিকৃত চীৎকার শুনিবা মাত্র মহামায়া প্রভৃতি সকলেই দৌড়াইয়া আসিলেন। দৌড়াইয়া আসিয়া মহামায়া রাজেন্দ্রলালের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া—"দাদা শীঘ্র কবিরাজ ডাকিতে লোক পাঠাও—আর তুমি শীঘ্র এস—ছোট দাদার"—আর বলিতে পরিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দেবেন্দ্রলাল, মহামায়ার কথা শুনিয়া, ভৃত্য রঘুনাথকে বৈদ্য ডাকিতে

পাঠাইয়া, দ্রুত পদে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অনুজের অবস্থা দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন—সহসা বাক্য সরিল না। অনেকক্ষণ পরে, হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ ভরে কহিলেন—"রাজেন্দ্র—ভাই, এই জন্যই কি পূজা করিতে তোর এত উৎসাহ হইয়াছিল।" আর বলিতে পারিলেন না—বালকের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্রলাল অগ্রজের স্নেহ মাখা কথা শুনিলেন—অমনি কোটর গত নয়নে বিন্দুর পর বিন্দু—জল গড়াইতে লাগিল। চক্ষুর জল মুছিবার জন্য হাত উঠাইলেন, পারিলেন না, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হাত পড়িয়া গেল। কেবল বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন—"পদধূলি দিন—আমি চলিলাম।" মহামায়া আপনার দুই করে দেবেন্দ্রলালের পদধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজেন্দ্রলালের মস্তকে ও হৃদয়ে মাখাইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ পর, রাজেন্দ্রলাল ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—"দাদা, আমি চলিলাম—আমার দিন পূর্ণ হইয়াছে। আমার জন্য কাঁদিও না, পাষাণে বুক বাঁধিও। আর এ সংসারে কে কার—দু দিনের জন্য সংসার। দিন পূর্ণ হইলে সকলকেই চলিয়া যাইতে হইবে। আমার সুভাষিণী—হতভাগিনী অভিমানিনী সুভাষিণী আর সুলোচনা ও ভূপেন রহিল।" আবার ক্ষণকাল নীরব হইলেন, তার-পর ক্ষীণ কণ্ঠে একটু জল চাহিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে মহামায়া রাজেন্দ্রলালের মুখে একটু জল দিলেন। জল পান করিয়া, মহামায়াকে কাঁদিতে দেখিয়া মহামায়ার হাত দুই খানি আপনার বুকের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—স্নেহের মহামায়া—বোন কাঁদিও না; আজিকার দিন কাঁদিবার নহে, তুমিত চির দিনই কাঁদিবে—কাঁদিবার জন্যইত বিধাতা তোমাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। আজিকার দিন বরং সুখের দিন, সরসীলালের অভাবে হৃদয়ে যে দাবানল জ্বলিতেছিল, আজ এক বৎসরের পর, সেই দাবানল নির্ব্বাণ হইবে।" এই বলিয়া আবার একটু জল পান করিলেন। জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইলেন, এমন সময় গ্রামের বৃদ্ধ চিকিৎসক রাজকুমার সেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কবিরাজ মহাশয় রাজেন্দ্রলালের পার্শ্বে বসিয়া একবার রোগীকে দেখিলেন—সেই আনন্দ জ্যোতিঃ তুল্য মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে—কোটর গত চক্ষু যুগলে কৃষ্ণ কালিমা পড়িয়াছে। রাজেন্দ্রলালের অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকের মুখ শুখাইয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া একবার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তারপর আর একবার—আর একবার—এইরূপ তিন চারিবার নাড়ী পরীক্ষার পর মুখ বিকৃত করিলেন—অন্যের অশ্রুত স্বরে কহিলেন—"সবই অদৃষ্ট—এখন দুর্গা ভরসা।" তারপর আনুপূর্ব্বিক সব শুনিলেন, আবার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তারপর একটি ক্ষুদ্র বটিকা বাক্স হইতে বাহির করিয়া চিনির সরবতের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে উঠিয়া গেলেন।

রাজেন্দ্রলাল কবিরাজ প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিলেন, তারপর পুনরায় আর একটু জল চাহিলেন। মহামায়া আবার একটু জল দিল। এবার মহা-মায়াকে বলিলেন—"আমার সময় হইয়াছে—এখন আর এ সব জল না দিয়া পবিত্র গঙ্গা জল দাও—জ্ঞান থাকিতে মনের সাধে একবার পবিত্র গঙ্গা জল পান করি।" আবার মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে গঙ্গা জল আনিয়া রাজেন্দ্র-লালের মুখে দিলেন। রাজেন্দ্রলাল ধীরে ধীরে আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়া গঙ্গা জল পান করিলেন। পবিত্র গঙ্গা জল পানে, রাজেন্দ্রলাল দেহে যেন একটু বল পাইলেন—স্বর্গের নির্ম্মল ও পবিত্র জ্যোতিতে মুখমণ্ডল প্রভান্বিত হইল, মহামায়াকে কাঁদিতে দেখিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে কহিলেন—"ছি, মহামায়া কান্না কেন? এখনও তুমি সৌভাগ্যবতী—যত দিন নৃপেন্দ্র ও মনোরমা জীবিত আছে, তত দিন তুমি সৌভাগ্যবতী—প্রার্থনা করি উভয়ে জীবিত থাকিয়া সরসীলালের নাম উজ্জ্বল করিবে। উভয়কে যত্ন করিও—সুপাত্র দেখিয়া মনোরমার বিবাহ দিও, নৃপেন্দ্রের যাহাতে লেখা পড়া হয়, তদ্বিষয় তাহার চেষ্টা করিও।" তারপর ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রলালকে কহিলেন, "মধুপুরের জমিদারী টুকু মহামায়াকে দিবেন।" তারপর আবার মহা-মায়াকে কহিলেন—"ভূপেন ও সুলোচনা রহিল—দেখিও।" আবার ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া কহিলেন—"বড় বউ—আমার বড় বউ কৈ?"

বাসন্তী প্রথম হইতেই স্নেহাস্পদ দেবরের নিকট বসিয়াছিলেন আর নয়ন জলে আপনার বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছিলেন। এখন দেবরের স্নেহপূর্ণ—

ভক্তিপূর্ণ আহ্বানে কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বসিলেন। বাস
সম্মুখে আসিয়া বসিলে পর, রাজেন্দ্রলাল বাসন্তীর পদধূলি লইয়া আপন
মস্তকে দিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মধুর স্বরে কহিলেন—"আমি চলিলাম
আমার মহামায়া ও সুভাষিণী থাকিল। সুভাষিণী বড়ই অভিমানিনী
কনিষ্ঠা বলিয়া তাহার শত অত্যাচার সহ্য করিবেন—ইহাই আমার
অনুরোধ। আর আমার অনুরোধ আপনার হেমেন্দ্রের ন্যায় ভূপেন্দ্র
নৃপেন্দ্র এবং কমলার ন্যায় মনোরমা ও সুলোচনাকে দেখিবেন।" অ
কথা সরিল না—বাক্ রোধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় কাঁদি
কাঁদিতে উন্মাদিনী বেশে সুভাষিণী আসিয়া স্বামীর চরণ প্রান্তে আছড়াই
পড়িলেন। আজ, এতক্ষণে পাষাণ গলিয়াছে—সুভাষিণীর হৃদয়ে অনুতাপে
তীব্র অনল জলিয়া উঠিয়াছে—হায় অভাগিনী যে উচ্চ রবে কাঁদিবে
বিধাতা সে পথও রোধ করিয়াছেন। প্রাণাধিকা পত্নীর মুখ প্রতি দৃষ্টি করি
রাজেন্দ্রলাল কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন ন
এবার আবার রাজেন্দ্রলালের নয়নে জল আসিল—বাসন্তী কাঁদিতে কাঁদি
ধীরে ধীরে দেবরের চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরে সুভাষিণী
প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার কপালে হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন
তারপর হঠাৎ বিকৃত কণ্ঠে একবার দুর্গা নাম করিয়া চক্ষু স্থির করিলেন
অমনি সকলে ধরাধরি করিয়া বিল্ব বৃক্ষ মূলে নামাইয়া, অন্তিম কার্য
আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ক্রন্দনের গভীররোল পড়িয়া গেল
আর সেই সঙ্গে অমনি মহামায়ার বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের বাজনা বাজি
উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় বিজয়া দশমীর প্রতিমা বিসর্জ্জন হইতে চলি
—আর সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রলালের হৃদয়ের শোনিত, বাহুর বল, আত্মার সুখ
যৌবনের সহায়, বার্দ্ধক্যের একমাত্র আশ্রয় স্থল—যাহার মুখ পানে চাহি
সরসীলালের অভাবেও আবার সংসারে হৃদয় বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন
সেই স্নেহ প্রতিম অনুজ রাজেন্দ্রলালের শব ও ঠিক বিজয়া দশমীর প্রতিমা
ন্যায় জন্মের মত বিসর্জ্জিত হইতে চলিল।

শক্তিপুরের পাদদেশে মহানন্দা প্রবাহিত। মহানন্দার তীরে যেখানে
সর বৎসর প্রতিমাদি বিসর্জ্জন হয়, তাহারই কিছু দূরে পূর্ব্ব দিকে শক্তি-
বর শ্মশান ভূমি। বর্ষা শেষ হইলেও, এখন এ সব দেশে বিনা নৌকায়
যায়াত করা অসম্ভব; তাই নৌকাযোগে রাজেন্দ্রলালের শব শ্মশান
কতে আনিত হইয়াছে। প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে শব আসিয়াছিল, যেমন
ার সময় দেবী প্রতিমা বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল, অমনি সঙ্গে
গগন ভেদী গম্ভীর 'হরিবোল'—শব্দে গগন মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া সজ্জিত
রার উপর পাপশূন্য সংসারকাননের এক মাত্র প্রস্ফুটিত পবিত্র কুসুম
জেন্দ্রলালের শব স্থাপিত করিয়া—লিখিতে বুক ফাটিয়া যায়—স্বয়ং অগ্রজ
দেবেন্দ্রলাল পাষাণে বুক বাঁধিয়া স্নেহ প্রতিম অনুজের মুখাগ্নি ক্রিয়া করি-
ন; আবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় হরিধ্বনি দিয়া প্রতিবেশী মণ্ডলী চিতার
দিকে অগ্নি প্রদান করিলেন। ক্রমে ক্রমে, আস্তে আস্তে অগ্নি
দিকে ধরিয়া উঠিল। এদিকে সর্ব্বশুচি অগ্নিদেবের লেলিহান্ জিহ্বার
হরিধ্বনি শব্দ—দেবেন্দ্রলালের আর্ত্তনাদ, অন্য দিকে প্রতিমা বিসর্জ্জনকারীদের
ষ্ট মনে মনের উল্লাসে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন শব্দ—দুয়ে মিশিয়া—শোকে
ার দুখে, হর্ষে আর বিষাদে সেই নিস্তব্ধ রজনীর নৈশ নীরবতাকে পরাভব
রিয়াছে। অতি অল্পক্ষণ পরে, সর্ব্বভুক অগ্নিদেব রাজেন্দ্রলালের কলঙ্কশূন্য
দেহ শরীর গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রলাল ভ্রাতার মুখাগ্নি কার্য্য
ষ করিয়া এতক্ষণ চিতার সম্মুখে নীরবে বসিয়া অনুজের শবদেহ নির্নিমেষ
চক্ষে দেখিতেছিলেন—মুখে শব্দ মাত্র নাই, কেবল প্রবল বর্ষার অশ্রান্ত
রিধারার ন্যায় অশ্রু জলে আপনার বুক ভাসাইতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে
ম্পিত ও কম্পিত কণ্ঠে সর্ব্বসন্তাপ হারিণী—সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী দুর্গা
নাম করিতেছিলেন। শেষ, যখন দেখিলেন, সর্ব্বভুক অগ্নিদেব অনুজের
সুন্দর সুকোমল দেব শরীর সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছেন, অমনি তখন দ্রুত পদে
উঠিলেন—একবার শূন্য হৃদয়ে চিতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তারপর
বিকৃত কণ্ঠে—"রাজেন্ ভাই, আমায় ছেড়ে কোথা যাস্"—বলিয়া সেই
মহানন্দার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রলালকে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া,
সঙ্গে সঙ্গে দুই জন শববাহী আত্মীয়ও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, অনেক যত্নের
পর দেবেন্দ্রলালকে উঠাইলেন—উঠাইয়া দেখিলেন দেবেন্দ্রলাল মূর্চ্ছিত

হইয়াছেন। অল্পক্ষণ পরে যথারীতি মহানন্দার জলে রাজেন্দ্রলালের নাভিপ্ বিসর্জ্জন করিয়া সকলে দেবেন্দ্রলালকে ধরাধরি করিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদ গৃহে ফিরিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে—বাহিরে বারান্দায় শয্যা উপরে মুর্চ্ছিত দেবেন্দ্রলাল। মহামায়া আর সুভাষিণী তাঁর শুশ্রূষায় নিযু আছেন। আর পৃথকাসনে বাসন্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমচন্দ্র বসিয়া বাষ্পাকু লোচনে এক এক বার রাজেন্দ্রলালের কথা ভাবিতেছিলেন—আর এক এ বার দেবেন্দ্রলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বাসন্তী স্বামীর পদ প্রান্তে বসিয়া ধীরে ধীরে চরণ সেবা করিতেছিলেন, আর দু নয় অশ্রু জলে প্লাবিত করিতেছিলেন। দূরে পৃথক শয্যার উপর বসিয়া প্রাচী কবিরাজ রাজকুমার সেন মহাশয় করতলে কপোলদেশ বিন্যস্ত করি দেবেন্দ্রলালের স্বর্গগত পিতা চণ্ডিদাসের কথা ভাবিতেছিলেন—রাজে লাল ও দেবেন্দ্রলাল—দুই ভ্রাতার পরস্পর ভক্তি ও স্নেহের কথা—গ্রামে উন্নতি অবনতির কথা ভাবিতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যা করিয়া আপনার মনঃকষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাত্রি নীরব—ততোধিক বিকট শ্মশান তুল্য দেবেন্দ্রলালের গৃহও নীরব। কেব কদাচিৎ গ্রাম্য কুক্কুরের চীৎকার ধ্বনি—দূরে নৈশ শিবাগণের কোলাহল আর গৃহ সংলগ্ন আম্রকানন স্থিত আম্র বৃক্ষের পাতার মর্ মর্ শব্দ নিশীথিনীর গভীরতা ভঙ্গ করিতেছিল। এই রূপে দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। পূর্ব্ব দিন যেমন রজনী প্রভাত হইয়াছিল আজিও তেমনি প্রভাত হইতে চলিল। পূর্ব্ব দিনের ন্যায় তেমনি পক্ষীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল। বাসন্তী উভয় প্রভাতের প্রতি লক্ষ্য করিলেন—দেখিলেন কালিকার প্রভাতে কত আশা ছিল, আর আজিকা প্রভাতে শুধু গভীর নিরাশা আসিয়া সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছে শুধু দেখিলেন, কল্য প্রভাতে রাজেন্দ্রলাল ছিলেন—আজিকার এই প্রভাতে রাজেন্দ্রলালের অস্তিত্ব মাত্র নাই।

প্রভাতে রাজকুমার একবার দেবেন্দ্রলালের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—একবার নিদ্রিত নয়ন পল্লব অঙ্গুলীর দ্বারায় উল্টাইয়া দেখিলেন, পুনরায় আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত আবার হাত দেখিলেন—আবার নয়ন পল্লব তুলিয়া দেখিলেন; অতিকষ্টে পুনরায় একবার সঞ্জীবনী সুধা সেবন করাইলেন; তারপর হেমচন্দ্রকে কহিলেন—"আর ভয় নাই—শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন। আপনি বসুন—আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসি।" এই বলিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। * * *

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়, একবার দেবেন্দ্রলালের জ্ঞান সঞ্চার হইল—অতিকষ্টে মহামায়ার যত্নে একবার পাশ ফিরিলেন—পাশ ফিরিতেই অমনি অভাগিনী সুভাষিণীর মলিন মুখ প্রতি নয়ন পতিত হইল, আবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব স্মৃতি আসিয়া হৃদয় মথিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিয়া, আবার মুর্চ্ছিত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় পাঁচ দিনের বহু যত্নে ও বহু চেষ্টায় এবং বৃদ্ধ চিকিৎসক রাজকুমারের চিকিৎসা প্রণালীর গুণে দেবেন্দ্রলাল আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। যথা সময়ে রাজেন্দ্রলালের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইল। সেই দিন হইতে দেবেন্দ্রলাল আর বাসন্তী—সুভাষিণী আর মহামায়ার প্রফুল্ল বদনে যে কালিমা রেখা পাত হইয়াছে—এই গভীর কালিমা রেখা চিরজীবনে মুছিবে কি না—জানি না। আবার সুখের শরৎকাল আসিতেছে—বঙ্গের গৃহে গৃহে শরতের শরৎসুন্দরীর আবির্ভাবে আনন্দের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইতেছে; কিন্তু চির হতভাগ্য দেবেন্দ্রলালের গৃহ, গত বৎসর এমনই দিনে যে নীরব হইয়াছে—ঠিক তেমনি নীরবেই আছে—চির দিন এমনই নীরবে থাকিবে—ইহাই বুঝি বিধাতার অভিপ্রেত। সুখের শরৎকাল আর শরৎকালের শরৎসুন্দরী বৎসরান্তরে বঙ্গের গৃহে গৃহে আসেন, কিন্তু কয় জন সংসারী প্রকৃত সুখী—তিনিই বলিতে পারেন।

গদাই পুরুত।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

বক্তা গদাই।

আমার রক্ষী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দুই জন যথাকালে আমাকে বেদী সম্মুখে লইয়া চলিল। আমি কম্পিত কলেবরে বেদীর পুরোভাগে দাঁড়াইলাম। আমার জ্ঞাতি খুড়া রামচরণ আমাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে ভাবিতেছি—"যমের বাড়ী আসিয়াও জ্ঞাতির হাতে নিস্তার নাই। যে দণ্ড হইবে এই জ্ঞাতি খুড়া টের পাইবেন, কি পরিতাপ!" আমি এই রূপ ভাবিতেছি এমন সময় যমরাজ রামচরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এ ব্যক্তি কি কি পাপ করিয়াছে তুমি বল। তখন রামচরণ রোষ কষায়িত লোচনে কহিতে লাগিল লোকটা জ্ঞাতিদ্রোহী সর্ব্বদা জ্ঞাতিগণের সহিত কলহ করে। ১ আঙ্গুল বেড়া চাপাইয়া লইয়াছে বলিয়া রামচরণ নামক একজন জ্ঞাতি খুড়ার সহিত অত্যন্ত কলহ করিয়াছিল—তাহাকে পিতৃ মাতৃ উৎসন্ন করিয়া অনেক অকথ্য অবাচ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল। এখনই দাঁড়াইয়া জ্ঞাতি হিংসার কথা ভাবিতেছিল। (আমি চমকাইয়া উঠিলাম—চিত্রগুপ্ত এমন সময় কি বলিতে যাইতেছিলেন যমরাজ হস্ত সঞ্চালনে তাহা নিবারণ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন—রামচরণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল) পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ কিছুই পরিশোধ করেন নাই। অনেক সময়ে পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন ভট্টাচার্য্য হইয়া লোনামাছ ও পলাণ্ডু ভোজন করিতেন আহারের পর দেব পূজা করিয়াছেন, উপবাসের দিন নিজে গোপনে আহার করিয়া যজমানকে জানাইয়াছেন যে নিজে উপবাসী আছেন। যজমানের বাড়ী কাম কটাক্ষে স্ত্রীলোকের প্রতি দর্শন করিয়াছেন। গুরুর নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এমন সময় চিত্রগুপ্ত মহাশয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া রামচরণের কর্ণে কর্ণে কি কথা বলিলেন। রামচরণ আবার যমরাজের কর্ণ

কুহরে কি বলিলেন। তখনই কড় কড় কড়াৎ করিয়া একটা বজ্রাঘাতের ন্যায় কি ভয়ানক শব্দ হইল। আমি শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি যে ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছি। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথা রহিয়াছি, এ সব আর কিছুই ধারণা হইতেছে না। স্মৃতি শক্তি যেন জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আলো হইল। দেখিলাম সেই রূপই একটি সিঁড়ির ধারে পড়িয়া রহিয়াছি কিন্তু একক—কেহই সঙ্গে নাই—যতদূর নজর চলিতেছে জন প্রাণী নাই—খানিকক্ষণ শুইয়া রহিলাম। কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ধীরে ধীরে উঠিয়া উপর দিকে চলিতে লাগিলাম, চলিলাম—অনেক দূর গিয়া দেখিলাম সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড তোরণ—দ্বার বদ্ধ। সেই খানে বসিয়া তোরণ পার হইয়া ভিতরে যাইবার বড় ইচ্ছা হইল। সেখানে বসিয়া মনে হইল হয় ত এই ভগবানের রাজ্য, এই দ্বার খুলিতে পারিলেই ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। এই মনে করিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। হে দেব তুমিই জ্যোতি স্বরূপ তুমি আমায় কৃপা কর তোমার জ্যোতি বিন্দু পাইয়াই সূর্য্য চন্দ্র জগতে আলোক বিতরণ করিতেছেন, নক্ষত্রগণ প্রতি রাত্রে মিটি মিটি করিয়া চক্ষুর ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে সেই কথা জানাইতেছেন। একটু মাত্র জ্যোতি দিয়াছ বলিয়া আমি চক্ষে আজ সব দেখিতে পাইতেছি নহিলে অন্ধ হইয়া থাকিতাম। দেব কৃপা কর, তোমার জ্যোতি সাগরে আমার এই খদ্যোতের জ্যোতি জন্মের মত মিশিয়া যাউক। বহু স্তুতি করিলাম, তোরণ খুলিল না। আবার বলিতে লাগিলাম তুমি শব্দ স্বরূপ, তুমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ তুমিই সব নিখিল ব্রাহ্মাণ্ডেশ্বর, তুমি আমাকে কৃপা কর। কত স্তব করিলাম কিছুতেই তোরণ খুলিল না।

তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম তোরণের পারে জলের শব্দ, যেন শত শত লোক জল ক্রীড়া করিতেছে। যেন তাহারা জল ক্রীড়া করিতে করিতে কথা কহিতেছে, যেন তাহাদের আহ্বানের স্বর আমার কর্ণে আসিতে লাগিল। যেন আমার পিতামহী কেহ বলিতেছে এস এস বংশধর এস বাপ এস ভয় কি? ভগবানের নাম কর। যেন বংশের আর একজন বংশ-পরিচয় দিয়া আমাকে ডাকিতেছেন। যেন একজন বলিতেছেন একটা

কথা বলিলেই তোরণ খুলে কিন্তু সে কথাটা কিছুতেই বলিতে পারিল না। আমি এই সব শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে সে কথাটা কি যাহা একবার বলিলে তোরণ খুলিয়া যাইবে। মনে মনে বলিলাম, ওগো তোমরা কে গা আমায় কথাটা বলিয়া দাও না।

এমন সময় সুগন্ধে মস্তক ভরিয়া গেল, নাসা পথে এমন স্নিগ্ধ সুকোমল অমিয় গন্ধ আরত কখন পান করি নাই। সুরমোহন সুমৃদু সুশ্রাব্য সুস্বর সঙ্গীতের মোহন মধুর মৃদুল ধ্বনিতে মর্ম্ম শিথিল হইয়া গেল। সে স্বর শুনিয়াই বুঝি চণ্ডীদাস একদিন গাহিয়াছিলেন।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?

শ্যাম নাম মনে হওয়াতে উদ্বিগ্ন হইয়া চাহিয়া দেখি তোরণ একটু খুলিয়া গিয়াছে। ফাঁকের ভিতর দিয়া দেখিলাম সত্য সত্যই কলবাহিনী তরঙ্গিণী। সুবর্ণময় তীরে বসিয়া কত অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বর্ণময় দেহ জপ করিতেছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ আহ্নিক করিতেছে, কেহ জলকেলী করিতেছে। বাঃ ছোট ছোট এ গুলি কি – নানা বর্ণের দেখিতেছি। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বটে কিন্তু ইহারই মধ্যে মুখ চোখ নাক কাণ সবই ত বিদ্যমান, ইহারা কি বালখিল্য মুনি! বিস্ময়ে ভাবিতেছি যে এ কি ব্যাপার, ইহারা কাহারা? এমন সময় নাম ধরিয়া স্পষ্ট আহ্বানের স্বর শুনিলাম। একবার দুইবার তিনবার, বুঝিলাম স্বর আসিতেছে তোরণের অপরপার হইতে। একজন বলিল 'আমি তোর পিতামহী আয় আয় বাবা' আর একজন বলিল 'আমি তোর বৃদ্ধ পিতামহ এস এস বাবা এস,' একজন বলিল "বাবা আমি তোমার মাতামহ," ইত্যাদি শুনিতেছি, এমন সময় একটি মূর্ত্তি আমার কাছে আসিয়া বলিল, গায়ত্রী কি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া ভুলিয়া গিয়াছ। মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, আমার মাতার মূর্ত্তির মত। চাহিতে না চাহিতে মূর্ত্তি সরিয়া গেল, আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছি যে কই গায়ত্রী ত মনে পড়ে না। একটু চেষ্টা করিয়া গায়ত্রীর প্রথম অক্ষর প্রণব যেমন উচ্চারণ করিয়াছি, আর অমনি আমার সম্মুখের সেই শত শত মণ ভার তোরণ কপাট যেন ফুৎকারে উড়িয়া গেল, তোরণ আপনা হইতে খুলিয়া গেল, যেমন খুলিয়া গেল, আর অমনি চকিতের ন্যায় একবার দৃশ্য

দেখিয়াছিলাম। সুবর্ণময় সুরতরঙ্গিণী তীরে, জানি না তাহা বৈতরণী কি লোকিনী, শত শত মন্দির দেখিলাম। সুবর্ণ প্রভৃতি নানা ধাতুময় মন্দির গুলি কিন্তু সকল গুলির মাথায় সুবর্ণ কলস ও ত্রিশূল বা চক্র এবং সকল গুলির মাথায় বা চূড়ায় চূড়ায় নানা বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। যেন কি একটা উৎসব, পরে মনে করিয়াছিলাম যে এ উৎসব এখানকার নিত্য ব্যাপার। যাহা হউক নৈবেদ্য ও ফল পুষ্প আদি লইয়া মন্দিরে মন্দিরে লোক পূজা করিবার জন্য ছুটিতেছে অবিরাম শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য রব হইতেছে। যেন কি একটা ভারি আমোদ।

চক্ষুর পলকে এ সব দেখিলাম। চক্ষুর পলক না পড়িতে পড়িতে একটা বজ্র গম্ভীর স্বর শুনিতে পাইলাম। "কাহার এমন দুর্ব্বুদ্ধি জীবন্ত মনুষ্যকে লইয়া এ কি খেলা – কর্ত্তা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন – অনেকের দণ্ড হইবে!"

কথা যেমন শেষ হইল, ভয়ানক শব্দ সহকারে আপনা হইতে সে তোরণ পড়িয়া গেল, আমি শব্দে আবার মূর্চ্ছিত হইলাম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বীরভূমি—১৩০৮ মাঘ ও ফাল্গুন। সকল প্রবন্ধ গুলিই সুপাঠ্য। জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে একটু সংবাদ আছে। পাঠকের স্মরণ আছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাল প্রতাপচাঁদ বলিয়া এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এখনও বোধ হয় অনেকে জানেন যে বঙ্গদর্শনে "জাল প্রাতাচাঁদ" প্রকাশিত হইলে সঞ্জীব বাবুর ভ্রাতা বঙ্কিম বাবুকে সরকারের নিকট একটু লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। অবিচারে রাজ্য পাইতেছেন না বলিয়াই যে লোকে তাঁহার উপর সহানুভূতি দেখাইত তাহা নহে, সত্যসত্যই অনেকে তাঁহাকে শ্রীহরির অবতার বা গৌরাঙ্গ অবতার বলিয়া মনে করিত ও বিশ্বাস করিত। লোকে বলিত তিনি ছিলেন গৌরাঙ্গ, আর মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন নিত্যানন্দ। এই সকল কথা আমরা টের পাইতেছি এক খানি পুস্তক হইতে। পুস্তক খানির নাম "প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত" বৈদ্যমান – কাটোয়া – শ্রীখণ্ড নিবাসী অনুপচন্দ্র দত্ত এই গ্রন্থ ১৭৬৫ শকে

(১২৫০ সাল) ১৩ই অগ্রহায়ণ সমাপ্ত করেন। জালরাজা ১৮৫২।৫৩ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন, এই গ্রন্থ ১৮৪৪ সালে তাঁহার জীবদ্দশায় রচিত। গ্রন্থ খানি পদ্যে রচিত। লোকে বিশ্বাস করিত ম্লেচ্ছদলন জন্য প্রতাপের জন্ম হইয়াছিল অথবা শ্রীহরি অবতার হইয়াছিলেন। "বীরভূমি" গ্রন্থ হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা একটু তুলিয়া দিলাম।

উগ্রাধিপতি শ্রীমান রণজিত রাজন।
বহু সৈন্য বেষ্টিত আছয়ে সেই জন॥
বর্দ্ধমান রাজধানীর প্রাপ্তির বিলম্বে।
আসিবে সিংহের সৈন্য সেই অবলম্বে॥
ম্লেচ্ছদলন হেতু সেই মহাজন।
সখা প্রিয়তম সঙ্গে হইবে মিলন॥

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। "কলিকাল" লেখক প্রসন্নকুমার চট্টোর প্রবন্ধ শেষে আত্ম পরিচয় কেন? আত্ম পরিচয় ছাড়িয়া দিলেও প্রবন্ধের অন্যায় রূপে কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আবার বলি বীরভূমি বেশ চলিতেছে।

উদ্বোধন—ফাল্গুন, চৈত্র ৪ খানি ১৩০৮। পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে তবে ভাব একটু গাঢ়, বেদান্তের একটা কথা মনে পড়ে গেল। হাঁড়িতে ভাত হচ্চে ভাতে আলু পটল সব দিয়েছে সে গুলা লাফাচ্চে। কাটি খানা টানিয়া লইলেই আর লাফায় নাই—নিস্তব্ধ। রামকৃষ্ণ কথামৃত আগে অনেক কাগজেই—হিন্দুপত্রিকা, সাহিত্য, আলোচনা, পূর্ণিমা, নব্য ভারত—ইহা বাহির হইত। অনেক আলু পটল লাফাইত। বলি এখন কাটখানা টানিয়া লইল কে? মাষ্টার মহাশয় নিজে না সম্প্রদায়ের কাহারও পরামর্শে? এখন কেবল মাত্র উদ্বোধনে "রামকৃষ্ণ কথা" বাহির হইতেছে। আমাদের একটা গান মনে পড়িতেছে—

নগর ভ্রমণ করি গৌর এল ঘরে—গৌর এল ঘরে ঐ গৌর এল ঘরে।
ব্যস্ত হয়ে শচীমাতা পুত্রে ক্রোড়ে করে॥

একি সাম্প্রদায়িক প্রেম না সার্ব্বজনিক উদারতা?

"গুরু কে?" এরূপ আংশিক ভাবে লিখিতে নাই। বৈজ্ঞানিক কথা আবার উদ্বোধনে কেন?

পূর্ণিমা; ১০ম বর্ষ; ৮ম ও ৯ম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০৯।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরিপাক ক্রিয়া।

পরিপাক ক্রিয়া কাহাকে কহে? যে ক্রিয়া দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ শোণিত হয় বা শোণিতের সহিত মিশিবার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পরিপাক ক্রিয়া একেবারে এক স্থানে হঠাৎ হয় না। একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে যাইতে ভুক্ত দ্রব্যের নানা রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, শেষে পরিণতি—শোণিতে। হাতে তুলিয়াই হৌক আর কাঁটা চামচ সাহায্যেই হৌক মুখে খাদ্য দিলেই দন্তেরা চর্ব্বণ আরম্ভ করিল। নারিকেল কোরা হইল, লালা মিশ্রিত হইল, তারপর তুমি গিলিলে। গিলিলেই গলনালীতে চলিতে লাগিল; গল নালীর প্রথম ভাগের ইং নাম ফেরিংশ আর শেষ ভাগের ইং নাম গলেট বা ইসোফেগস। এই শেষ ভাগ পাকস্থলীতে গিয়াছে, ইসোফেগসের নিম্ন দেশীয় পেশী সঙ্কোচক নয়। পাকস্থলীতে ৪টি স্তর আছে। ইহার বাম ভাগ প্রসারিত হয় কিন্তু পাকস্থলীর দক্ষিণ ভাগ একেবারে নিশ্চল। ৪টি স্তরের মধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্তরে পাকের ক্রিয়ার সময় রক্ত জমে অপর সময় রক্ত থাকে না। এই রক্ত জমিলেই পরিপাকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে গাষ্ট্রিক রস তাহা পাকস্থলী হইতে নির্গত হইতে থাকে। পাকস্থলীর কার্য্য শেষে একটি ছিদ্র (পিলোরস) দিয়া ভুক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পাকস্থলীর ন্যায় ক্ষুদ্রান্ত্রেও চারিটি স্তর আছে। শেষ স্তরে কতকগুলি আঙ্গুলের মত বা গরুর বাঁটের ন্যায় রসবহা টিসু আছে ইং নাম ভিলি। ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে পিত্তরসে মিশ্রিত হইয়া খাদ্য বৃহদন্ত্রে যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্ন ভাগ (ইলিয়ম) আর বৃহৎ অন্ত্রের ঊর্দ্ধেভাগের (সিকম) মধ্যে একটি পর্দ্দা আছে তাহার গুণে খাদ্য উপর হইতে বৃহদ অন্ত্রে আসিতে পারে বটে কিন্তু আর ফিরিয়া যাইতে পারে না। ইলিয়মের দিকে কতকগুলি "ভিলি" আছে তাহারাও পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। বৃহদ অন্ত্রে পরিপাকের কতটা কার্য্য হয় তাহা ঠিক জানা নাই। খাদ্যের যে অংশ হজম হয় না তাহা মলরূপে মলনালী দ্বারা বাহির হইয়া যায়।

রাস্তার কথা বলা হইল এইবার পরিবর্ত্তন ও পরিণামের কথা। মু
চর্ব্বণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে খাদ্য মুখের লালার (ইং সেলাই
মিলিত হইয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। চর্ব্বণের জন্য দাঁতে
প্রয়োজন। এ কথা বড় ঠিক যে মানুষ দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না
দন্ত সাধুরা বলেন ভোজনের অহঙ্কার; দাঁত গেলেই মানুষের আহার গে
তখন মরিয়া বাঁচা বা বাঁচিয়া মরা, বিশেষত মাংস ভোজীদিগের বড় বিপদ
সে যাহা হৌক দাঁতের কথা একটু বলা আবশ্যক কেন না দাঁত দেখি
মানুষ নিরামিষ কি আমিষ ভোজী তাহা স্থির হইয়াছে। মানুষের ৮টী দ
ছেদক (ইং ইন্‌সিসার) ৪টি কুকুর-দন্ত (ইং কেনাইন) এবং ২০টি পেষণ দ
(ইং মোলার) এই ৩২টি স্থায়ী দন্ত। এই ৩২টি দন্তের মধ্যে ১৬টি নীচে
মাড়ীতে আর ১৬টি উপরের মাড়ীতে। ১৬টি নীচের মাড়ীর এই রূপ
ছেদক ২টি কুকুরীয় বা বিদারণ ক্ষম ৪টি বাইকসপিড বা পূর্ব্ব-মোলার আ
৬টি মোলার। উপরের মাড়ীতেও ঐরূপ সংস্থান। মানুষের দুধেদাঁত ২০
মাত্র, সপ্তম বৎসরে পড়িতে থাকে ও সেই সময়ে মোলার দন্ত উঠিতে আর
হয়। আক্কেল দাঁত ছাড়া সকলগুলিই ১৪ বৎসর মধ্যে উঠিয়া থাকে
শেষ মোলার দন্ত ১৮ : ২০ বৎসরে উঠিয়া থাকে। প্রত্যেক দন্ত দুই ভাগে
বিভক্ত মূল বা শিকড় (ইং ফ্যাংস) আর অগ্র ভাগ (ইং ক্রাউন) দাঁতে
শিকড় ফাঁপা এক প্রকার শাঁস থাকে। রক্ত বহা শিরা তথা মিশে
প্রত্যেক দন্তমূলে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে তাহাতে একটি করিয়া স্নায়ু
আছে। দন্তের মূল উপাদান অস্থিময় (ইং ডেনটাইন)। যাহাতে মাড়ীকে
দৃঢ় রাখে তাহা সিমেণ্ট আর অগ্রভাগে সাদা থাকে তাহা এনামেল।
মনুষের দন্তের সংস্থান দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মনুষ্য উভ
ভোজী জীব হইবেন এইটিই সৃষ্টি কর্ত্তার অভিপ্রেত। মনুষ্যের বয়স নিরূপণে
দাঁত একটি প্রধান সহায়। যাঁহারা মাংস ভক্ষণের পক্ষপাতী তাঁহারদের
যুক্তি চমৎকার। ওয়ালাস বলেন—

"A comparison of the skull and teeth of man with
those of a purely carnivorous animal, such as the tiger,
and with those of a purely graminivorous animal, such
as the ox, leads to the conclusion that a mixed diet

omprising flesh and vegetables is natural to man. A
omparison of the intestines leads to the same conclu-
ion; the intestine of a flesh feeder is short, that of a
egetable eater is long, that of a man is of moderate
ength."

"মানবতত্ত্ব" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখক বলিয়াছেন—"ওয়ালার যাহা
লিয়াছেন পাশ্চাত্য দেশে সকলেই তাহাকে যুক্তিযুক্ত বা তথ্যরূপে গ্রহণ
রিতে পারেন নাই। জার্ম্মান দেশীয় 'লুইস কুন্' (Louis Kuhne)
বিধ যুক্তি দ্বারা, এই রূপ অনুমান যে, অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ভূমিক নহে,
ং প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।"

"In a number of families children have been
eared from the beginning without meat, and I have
lways made a special point of watching the develop-
ent of such. I can confidently assent, that the
ults have resulted decidedly in favour of a vegetable
iet—the children's development is almosl without
xception admirable both physically and mentally in
ll three directions—that of understanding, the will,
nd the temper."

—The New Science of Healing by Louis Kuhne
p p. 127-8.

ত্তর খাদ্য অতি গুরুতর। খাদ্য চর্ব্বণের সময় খাদ্যের সহিত লালা
ত্ত হওয়ায় পরিপাকের কার্য্য মুখ হইতেই আরম্ভ হয়। আমাদের নীচের
চল। তাহাতেই ও জিহ্বার সাহায্যে যথেষ্ট চর্ব্বণ হয়। মুখে
প্রকার মাংস গ্রন্থি আছে (ইং নাম প্যারোটিড গ্লাণ্ড সব্ ম্যাক্সিলারি ও
লিঙ্গয়াল গ্লাণ্ড) প্রত্যেকটি হইতে লালা নির্গত হয়। লালা জলীয় ক্ষার
ণ বর্ণ ঈষৎ কাল। ইহার দ্বারা শ্বেতসার (ষ্টার্চ) চিনি হয় আর শর্করা
ও লবণ যুক্ত খাদ্য তরলাবস্থায় পরিণত হয়। যত চিবাইবে তত খাদ্য
লা মিশ্রিত হইবে ততই পরিপাকের সহায়তা হইবে। ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী
ষ্টোন সাহেবকে একদা এক ব্যক্তি তাঁহার দীর্ঘায়ু ও সবল সুস্থ শরীরের

কারণ জিজ্ঞসা করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রত্যেক মা
খণ্ড ৩৬ বার চর্ব্বণ করেন।

পাকস্থলীতে চর্ব্বিত খাদ্য আসিয়া পঁহুছিলে তাহা গ্যাষ্ট্রিক রসের সহি
মিলিত হয়। এই রস তরল গদার্থ ও একটু টকরস। পরীক্ষা দ্বারা দি
কৃত হইয়াছে যে গ্যাষ্ট্রিক রসে, সোডিয়ম, ক্যালসিয়ম, ক্লোরাইড অব পটা
এবং হাইড্রোক্লোরাইড এসিড আছে। এই শেষোক্ত রসের পরিমাণ স
রসের পাঁচভাগের এক ভাগ। এই রস কেবল নাইট্রোজনযুক্ত খাদ্য
এলবুমেনযুক্ত খাদ্য, যাহাদের সাধারণ নাম প্রোটিড, জীর্ণ করি
পারে। তৈলযুক্ত ও মেদযুক্ত খাদ্য গ্যাষ্ট্রিক রস জীর্ণ করিতে পারে ন
কিন্তু ইহা লালার ক্ষারগুণ নষ্ট করে। এই রস সাহায্যে প্রোটিড পেপটে
পরিণত হয়। গ্যাষ্ট্রিক রস সাহায্যে খাদ্য যে আকার ধারণ করে তাহা
নাম ইং কাইম। কাইম পিলরস ছিদ্র দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্র
ন্ত্রের প্রথমাংশের নাম ডিউডনম। এখানে খাদ্য আর কয়েকটি রসের সহি
মিলিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে পিত্তরস, ক্লোম বা পানক্রিয়া
রস ও আন্ত্রিক রস। খাদ্য পাকস্থলীতে আসিলেই পিত্তাধারে পিত্ত সঞ্চি
হয়। দুইটি পথে এই রস যকৃৎ হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পিত্ত
দ্বারা তৈলযুক্ত ও মেদযুক্ত খাদ্য আরও তরল হয়। খাদ্য উদরস্থ হইবা
প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ক্লোম বা পানক্রিয়াসংরস নির্গত হয়। ইহার পরিমা
অল্প এবং পিত্তরসের পথেই ইহা অন্ত্রে আসিয়া থাকে। এই রস সাহায্য
প্রোটীড পেপ্টনে এবং ষ্টার্চ বা শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয় এবং তৈলযু
ও মেদযুক্ত খাদ্য একেবারে তরল হইয়া যায়। লালা ও গ্যাষ্ট্রিক ও পিত্ত
যে কার্য্য করিতে পারে না ক্লোম রস তাহা করিয়া দেয়। ক্লোম এ
প্রকার ক্ষার। অন্ত্রের মাংশ গ্রন্থি হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাই আন্ত্রি
রস ইহা গাঢ় ক্ষার আর পিত্তের ন্যায় হরিদ্রাভ। ক্লোম রসের সকল গু
এই রসে বর্ত্তমান আছে। আরও কিছু আছে নহিলে এই স্বতন্ত্র র
সৃষ্ট হইল কেন? তবে বৈজ্ঞানিক এখনও তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই
সে যাহা হৌক কাইম পিত্তরসের সহিত মিলিত হইলে দানা দানা পনীরে
মত দেখায় তারপর ক্লোম ও আন্ত্রিক রসের সহিত মিলিত হইলে ডিউডন
থাকিতে থাকিতেই কাইম দ্রবীভূত মাখনের ন্যায় দেখায়। তখন ডি

ডনমের অপর অংশে কাইম যায় ও কাইল নামে পরিচিত হয়। এখন ইহার বর্ণ দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত। তখন রসবাহী শিরা ইহা শুষিয়া লয় ও ইহা শোণিতের সহিত মিলিত হয়। এখনও খাদ্যের যে অংশ পরিপাক হয় নাই তাহা বৃহৎ অন্ত্রে প্রবেশ করে। বৃহৎ অন্ত্রের কি কার্য্য তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তরল অংশ এখানে মল হয় ও যথা সময়ে মলনালী ইহাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পাঠক মহাশয় দেখিলেন মুখে দন্ত যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল বৃহৎ অন্ত্রে তাহা শেষ হইল। এই কার্য্যে প্রায় আ কি ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। যকৃৎ হজম কর্য্যে সাহায্য করে কিন্তু প্লীহা করে না, প্লীহার কি কার্য্য তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে প্লীহা স্পঞ্জের ন্যায় হওয়ায় ও সর্ব্বদা শোণিত পূর্ণ থাকায় কেহ কেহ বলেন শোণিত সম্প্রসারণই ইহার কার্য্য। কেহ কেহ বলেন রক্তের শ্বেত কণিকা এখানে উদ্ভূত হয়; লাল কণিকা নষ্ট হয়।

আহার।

আহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা এই খানেই বলা উচিত। দাঁতের সঙ্গে কথাটা একবার উঠিয়াছে। বলাই বাহুল্য আমরা নিরামিশ ভোজনের পক্ষপাতী। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই কথা বলিব যে, যে ধর্ম্মই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, যে ধর্ম্মই মনুষ্যকে দেবত্বে লইয়া যায়, সেই ধর্ম্ম আচরণ বা সঞ্চয় করিতে হইলে সাত্ত্বিকতার বিশেষ আবশ্যকতা। এই সাত্ত্বিকতা সঞ্চয় করিতে হইলে সাত্ত্বিক আহার করিতে হইবে। যাহাতে রজ বা তমোগুণ বৃদ্ধি হয় এমন আহার করিতে নাই। আমিষ ভোজনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক হ্রাস হয়। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপ তথা দানং তেষাং ভেদ মিমংশৃণু॥ ৭। ১৭ অ।
আয়ুঃসত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনা।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্ত্বিকা প্রিয়াঃ॥ ৮
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্ট মপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

ইহার ভাবার্থ এই—

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকার, তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর। ৭

আয়ুঃ সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচির বর্দ্ধক, রসযুক্ত এবং স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী এরূপ এবং চিত্ত পরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। ৮

অতি কটু অতি অম্ল অতি লবণ অত্যুষ্ণ অতি তীক্ষ্ণ অতি রুক্ষ অতি বিদাহী এই সকল দুঃখ মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় আহার। ৯

শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত, বিরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্ব দিন পক্ক অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য যে আহার তাহা তামস গণের প্রিয়। ১০

ভগবান শ্রীমুখে এই গুণভেদে আহার ভেদের কথা বলিলেন। গীতা যোগ শাস্ত্র এখানে যোগের উপর দৃষ্টি করিয়া কথা বলা হইতেছে। যখন যোগীর সুষুম্না পথ খুলে নাই তখন ঈড়া কিম্বা পিঙ্গলায় প্রণায়ামের বায়ুর চলাচল হয় তখন তিনি হয় রজ না হয় তমোগুণাবলম্বী হইবেন। তখন রজোগুণাবলম্বীর কি আহার ভাল লাগে এবং তমোগুণাবলম্বীর কি রূপ আহার প্রিয় ৯ ও ১০ সংখ্যক শ্লোকে তাহাই বলিলেন। যখন সুষুম্না পথ খুলিয়াছে তখন যোগী সত্ত্ব গুণাবলম্বী তখন তাঁহার প্রিয় আহার যাহা তাহা ৮ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যখন যোগী প্রণায়াম দ্বারা কণ্ঠের ঊর্দ্ধে প্রাণকে রাখিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার আহারের আবশ্যকতাই থাকে না। তখন বায়ু আহারই যথেষ্ট। শরীরের ক্ষয় নিবারণের জন্য আহারের প্রয়োজন। যে কোন কার্য্য দ্বারা অল্প বিস্তর শরীরের ক্ষয় সংসাধিত হয়। এখনকার বৈজ্ঞানিক বলেন যে কোন কার্য্য করিতে যাহার যত বেশী নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়িবে তাহার তত বেশী শরীরের ক্ষয় হইবে। এই ক্ষয় নিবারণের জন্য শরীরে অম্লজান প্রক্ষেপ করিতে হয়। অম্লজান প্রক্ষেপের আবশ্যকতা ক্ষুধা দ্বারা জানা যায়। যাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই, তাঁহার শরীরে ক্ষয় নাই—সুতরাং তাঁহার ক্ষুধাও নাই, আহারের আবশ্যকতাও নাই। তৃষ্ণাও নাই। শরীর ক্রিয়া পরিচালন জন্য অন্নের অভাব বোধের নামই ক্ষুধা। ক্ষুধা সর্ব্ব শরীরে অনুভূত হইলেও পাকাশয়েই ইহার বিশেষ অনুভূতি হয়। সেই রূপ তৃষ্ণা বা শরীরে জলাভাব অনুভূত হইবার

স্থান জিহ্বাতন্ত্ব (জিহ্বার অধোদেশ ইং প্যালেট) এবং কণ্ঠ। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয় কণ্ঠকূপে চিত্ত সংযম করিলে। বেদব্যাস বলিয়াছেন জিহ্বার অধোদেশ 'তন্ত', তন্তুর অধোদেশ 'কণ্ঠ' এবং কণ্ঠের অধোদেশ 'কূপ'। কণ্ঠ ইং ফ্যারিংশ এবং কূপ তথা হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যোগ বুঝেন না সুতরাং ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির এই গুহ্য সংবাদ জানেন না। আর বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণও চক্ষু থাকিতে অন্ধ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

সে যাহা হৌক যখন আহার চাই তখন আহার কি রূপ হওয়া উচিত? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন আমাদের আহারে থাকা উচিত প্রোটিডস্ (অম্লজান উদজান নাইট্রোজান, গন্ধক, কার্ব্বণও ইহাদের সংযোগযুক্ত যে সকল খাদ্য); বসা (মেদ বা তৈলযুক্ত খাদ্য সকল) লবন (লবণাত্মক খাদ্য সকল) কার্বোহাইড্রেটস্ (অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বণযুক্ত খাদ্য সকল) এবং জল। কোন কোন ডাক্তার আমাদের খাদ্যকে আবশ্যকীয়, সহকারী ও ভৈষজ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ব্ল্যাক সাহেব আবার আবশ্যকীয় খাদ্যকে আরও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (১) খনিজ (২) তাপোৎপাদক ও বলপ্রদ এবং (৩) মাংস বর্দ্ধক। "মানবতত্ত্ব" লেখক খাদ্যকে (৭৯পৃঃ) হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বৃহদ আরণ্যক উপনিষৎ, মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব, অগ্নিষোমময়ং তস্মাজ্জগৎ কৃৎস্নংচরাচরম্) যোগবাশিষ্ঠ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া এই কথা প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন। "এ কথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়াছেন।" গ্রোভ সাহেবের পুস্তক হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় বলিতেছেন "সূর্য্য স্বীয় একতেজঃ বা শক্তিকে বায়ু অগ্নি ও সোম এই ত্রিধা বিভক্ত পূর্ব্বক জগদ্দেহকে ধারণ করিয়াছেন, সূর্য্যই বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা লক্ষণ দোষ ত্রয়রূপে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, শরীরের সংরক্ষণ করিতেছে। অথর্ব্ব বেদের এই উপদেশ আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বলিতে পারি আমাদের দেহ বা প্রাণরক্ষার্থ সামান্যতঃ, বায়ু'অগ্নি ও সোমাত্মক অথবা বাতপিত্ত ও কফ স্বভাবক আহার

প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য নরশরীর বিজ্ঞান বলিয়াছেন আলবুমেন গ্লুটেন প্রভৃতি দ্রব্য শরীর পোষণ করে এবং শর্করা শ্বেতসার নানাবিধ তৈলাক্ত পদার্থ ইত্যাদি ইহারা তাপোৎপাদনে ব্যয়িত হয়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত সোমাত্মক ওজো নামক পদার্থকে আমরা আলবুমেনের কিয়দংশ সদৃশ মনে করি। সর্ব্ব শরীরস্থ শীত, স্নিগ্ধ, স্থির, সোমাত্মক, শরীরের বলপুষ্টিকর পদার্থ বিশেষকে আয়ুর্ব্বেদ "ওজঃ" বলিয়াছেন। চরক সংহিতা ওজো ধাতুকে গুরুত্ব, শৈত্য, মৃদুতা, শ্লক্ষ্ণতা, ঘনতা, মধুরতা, স্থিরতা, নির্ম্মলতা, পিচ্ছিলতা ও স্নিগ্ধতা এই দশবিধ গুণবিশিষ্ট বলিয়াছেন। * * পাশ্চাত্য শরীর বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ যে সোমাত্মক পদার্থকেই শরীর পোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল।

এখন পাঠক মহাশয় সেই একটা পুরাতন কথা বুঝিতে পারিবেন কেন অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য খাইতে নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের আশীর্ব্বাদে কোন জিনিষটির আলবুমেন আছে কোন্‌টায় গ্লুটেন আছে ইহা আর ভাবিয়া বেড়াইতে হইবে না। অনেক দেখিয়া শুনিয়াই তাঁহারা আমাদের খাদ্য দ্রব্য নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন আর হবিষ্যান্নকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন এবং ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইতে বলিয়াছেন। যাহাহৌক অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া আর দুই একটা কথা বলিয়াই খাদ্য প্রকরণ শেষ করিব। আহারের সহিত শরীর ও মনের বিশেষ সংযোগ থাকাকেই আর্য্য ঋষিগণ খদ্যাখাদ্য বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা কতকগুলি খাদ্য একেবারে অভক্ষ্য বলিয়াছেন, কতকগুলিকে ঋতু বিশেষে অভক্ষ্য ও কতক-গুলিকে তিথি বিশেষে অভক্ষ্য বলিয়াছেন। মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে আহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে কোন গুলি অভক্ষ্য দেখিতে পাইবেন। লশুন ও গাজোর একেবারে অভক্ষ্য, বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে। আমরা জানি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও গোল আলু এদেশে চলে নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ঠাজাত দ্রব্য বলিয়া চৌদ্দ আনা লোক কপি খাইত না। সেই রূপ বিলাতী কুমড়া অভক্ষ্য ছিল। মোটের উপর ভিন্ন দেশীয় সামগ্রী খাইতে নাই। ঋতু বিশেষে বর্জ্জন মধ্যে দেখিতে পাই—কার্ত্তিক মাসে মৎস্য মাংস ভোজন করিলে চণ্ডালত্ব হয়। মাঘ মাসে মূলা ভক্ষণ করিলে নরকস্থ হইতে হইবে

তুবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তি-কের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেত শিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমী শাক বার্ত্তাকু ও কৎবেল খাইতে নাই।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড খাইতে নাই। কেন? প্রতিপদে শ্লেষ্মা লবণ রসা-ক্রান্ত হয়। কুষ্মাণ্ডে লবণ ও ক্ষার বেশী সুতরাং ভক্ষণে ব্রণাদিরোগ হইতে পারে।

দ্বিতীয়ায় বৃহতী অখাদ্য। দ্বিতীয়ায় পিত্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু রুক্ষ হয়। বৃহতী পিত্ত উষ্ণ কারিণী ও ক্রূর বায়ু বর্দ্ধিনী। দ্বিতীয়ায় বৃহতী খাইলে অর্ব্বুদ রোগ বা ক্যান্সার হইতে পারে। এইরূপ কারণেই তৃতীয়ায় পটোল নিষেধ, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠীতে নিম্বক, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বী, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই এবং অমা-বস্যা ও পূর্ণিমায় মাংস ভক্ষণ নিষেধ। তিথি বিশেষে নিষিদ্ধ দ্রব্যের দোষ এই গুলি; পটোল রক্ত উষ্ণ করে, মূলক সাধারণত আম কারক, কাঁটাল বায়ু পিত্ত কফকে ক্রূর করে। নেহাসিদ্ধ—পৈত্তিক বিকার বৃদ্ধি কারিণী। বিল্ব—পিত্ত কারক; নিম্বুক শিরা নিহিত শৈত্য রস বর্দ্ধক; তাল রক্ত পিত্ত রোগ বর্দ্ধক, বহুমূত্র ও তন্দ্রা উৎপাদক; নারিকেল—গুরু দুষ্পাচ্য মল রোধক; অলাবু—বাতশ্লেষ্মারোগ কারিণী অতি কষ্টে জীর্ণ হয়; কলম্বী—ঘৃষ্টপিত্ত রোগ হয় শ্লেষ্মা ও মলবৃদ্ধি করে; শিম্বী—শৈত্যগুণ; পূতিকা—রক্তাকাশ বর্দ্ধিনী; বার্ত্তাকু—কণ্ডুরোগ বর্দ্ধিনী; মাসকলাই—অতিসার রোগ কারক।

শাস্ত্রানুসারে এই গুলি সাত্ত্বিক খাদ্য* রম্ভা, কেমুক ফল বা গাছ আলু, মানকচু, ওল, তিল, যব, কাউন, হেলেঞ্চা বা কালশাক, তুষী, বেথুয়া শাক, আতপ তণ্ডুল, মুগ, মটর, লোনা, কাঁটাল, আম্র, কমলা লেম্বু বা নারাঙ্গী।

এই গুলি নিতান্ত গুরুপাক—রাঙ্গা আলু, মসুর, খর্জ্জুর, পাণিফল।

শেষ কথা আপরুচি খানা কথাটা সত্য নহে। খাদ্য বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা নাই।

স্মৃতিতে হবিষ্যান্নের তালিকা আছে—

* হিন্দু পত্রিকা ৮ম বর্ষ ৩২৬ পৃঃ হইতে।

হৈমন্তিকং সিতাস্বিরং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
ফলায় কর্কুনীবারা বস্তুকং হিলমোচিকাঃ॥
যষ্টিকা কালী শাকঞ্চ মূলকং কেসুকেতরং।
লবণে সৈন্ধবে সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পিষী॥
পয়োহনুদ্ধৃত সারঞ্চ পনসাম্র হরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী॥
কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্য গুড়মৈক্ষরং।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

আজ বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশী, ২রা জুন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ী হইয়া অধরের বাড়ী আসিলেন। সেখানে কলহান্তরিতা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া রামের বাড়ী আসিলেন।

রামচন্দ্রের বাড়ী সিমুলিয়া মধুরায়ের গলি। রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী কেমিক্যাল একজামিনার হইয়াছিলেন ও Science Associationএ রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে এই বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এস্থান ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনেকবার শুভাগমন করিয়া পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন। তাই ভক্তদের কাছে এটী আজ মহাতীর্থস্থান হইয়াছে। রামচন্দ্র শ্রীগুরুর করুণা বলে বিদ্যার সংসার করিতেন। ঠাকুর দশমুখে রামচন্দ্রের সুখ্যাতি করিতেন, বলিতেন – রাম বাড়ীতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা করে, তার বাড়ী ভক্তদের একটী আড্ডা। নিত্যগোপাল, লাটু, তারক (স্বামী শিবানন্দ) রামচন্দ্রের এক রকম বাড়ীর লোক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেক দিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। আর বাড়ীতে ৺নারায়ণের নিত্য সেবা হইত।

রামচন্দ্র ঠাকুরকে বৈশাখ পূর্ণিমার দিন – ফুলদোলের দিন – এই ভদ্রাসন বাটীতে পূজার্থে প্রথম লইয়া যান। প্রায় প্রতিবর্ষে ঐ দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন। রামচন্দ্রের সন্তানপ্রতিম শিষ্যেরা এখনও অনেকে ঐ দিনে উৎসব করেন।

আজ রামের বাড়ী উৎসব। প্রভু আসিবেন! রাম শ্রীমৎভাগবত কথামৃত তাঁহাকে শুনাইবার আয়োজন করিয়াছেন! ছোট উঠান, কিন্তু তাহার ভিতরই কত পরিপাটী। বেদী রচনা হইয়াছে, তাহার উপর কথক ঠাকুর উপবিষ্ট। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা হইতেছে, এমন সময়ে বলরাম ও অধরের বাড়ী হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র আগুয়ান হইয়া ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তেরা। মাষ্টারও কাছে বসিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! তুমি আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর তোমার স্থান নাই। তবে ৺কাশীধামে তুমি থাকিতে পার। সে মহাদেবের স্থান। চল তোমাকে তোমার সহধর্ম্মিণী শৈব্যা ও তোমার পুত্র সহিত সেখানে পঁহুছিয়া দিই। সেইখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা যোগাড় করিয়া দিবে। এই বলিয়া রাজাকে লইয়া ভগবান বিশ্বামিত্র ৺কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পঁহুছিয়া সকলে ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলেন।

বিশ্বেশ্বর দর্শন কথা হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবস্থ; 'শিব' 'শিব' এই কথা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিতে পারিলেন না – কাজে কাজেই শৈব্যাকে বিক্রয় করিলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রহিলেন। কথক ঠাকুর শৈব্যার প্রভু ব্রাহ্মণের বাড়ী রোহিতাশ্বের পুষ্পচয়ন কথা ও সর্প দংশন কথা বলিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন কালরাত্রে সন্তানের মৃত্যু হইল, সৎকার করিবার কেহ নাই, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভু শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না – শৈব্যা একাকী পুত্রের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া শ্মশানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন ও অশনিপাত নিবিড় অন্ধকার যেন

বিদীর্ণ করিয়া এক একবার বিদ্যুৎ খেলিতেছিল—শৈব্যা ভয়াকুলা, শোকাকুলা—রোদন করিতে করিতে আসিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছেন। তিনি শ্মশানে চণ্ডাল হইয়া বসিয়া আছেন। কাষ্ঠ লইয়া সৎকার কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কত শবদেহ জ্বলিতেছিল কত ভস্মাবশেষ হইয়াছিল। সেই অন্ধকার রজনীতে শ্মশান কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে! শৈব্যা সেইস্থানে আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—সে ক্রন্দন বর্ণনা শুনিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্ দেহধারী জীবের হৃদয় বিচলিত না হয়? সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শুনিতেছেন—একেবারে স্থির—একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটী বারিবিন্দু উদ্গত হইয়াছিল, সেইটী মুছিয়া ফেলিলেন। তিনি অস্থির হইয়া হাহাকার করিয়া পড়িলেন না কেন?

শেষে বিশ্বামিত্রের আগমন, রোহিতাশ্বের জীবনদান, সকলের হরিশ্চন্দ্রের দর্শন ও হরিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, কথক ঠাকুর কথা সাঙ্গ করিলেন।

কথক ভাগবত কথা কহিতেছিলেন, ঠাকুর বেদীর সম্মুখে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হরিকথা শ্রবণ করিলেন। কথা সাঙ্গ হইলে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী, কথক ঠাকুরও কাছে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথককে বলিলেন, কিছু উদ্ধব সংবাদ বল।

কথক বলিলেন—যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, রাখালগণ ও ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন? তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন? এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন, ও বলিতে লাগিলেন, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ধেনুকাসুর বধ করিয়াছিলেন, এখানে শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন, এই মাঠে তিনি গরু চরাইতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন, এখানে রাখালদের লইয়া ক্রীড়া করিতেন। এই সকল

কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন। উদ্ধব বলিলেন, আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? তিনি সর্ব্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। গোপীরা বলিলেন, আমরা ও সব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখা পড়া কিছু জানি না। আমরা কেবল আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন। উদ্ধব বলিলেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হ'য়ে যায়। গোপীরা বলিলেন, আমরা মুক্তি—এ সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই সকল কথা একমনে শুনিতে লাগিলেন ও ভাবে বিভোর হইলেন। বলিলেন, গোপীরা ঠিক বলেছেন। এই বলিয়া তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন।

গান।

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই।
শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাতর হই॥
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে হয়রে ত্রৈলোক্যজয়ী॥
ভক্তির কথা শুন বলি চন্দ্রাবলী, ভক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই।
ভক্তির কারণে পাতাল ভুবনে বলির দ্বারে আমি দ্বারী হ'য়ে রই॥
শুদ্ধ ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কথকের প্রতি) গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জান? জ্ঞানমিশ্র ভক্তি। যেমন, সেই কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু প্রেমাভক্তির সঙ্গে ও জ্ঞানটুকু মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বলে সীতারাম দেখ্‌বো। ঠাকুর রুক্মিণীকে বল্লেন, তুমি সীতা হ'য়ে ব'স, তা না হ'লে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই। পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম কর্‌তে লাগ্‌লো। বিভীষণ বল্লেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম ক'র্ব্বো, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ক'র্ব্বো, আর কারুকে ক'র্ব্বো

না। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কর্‌তে লাগ্‌লেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটসুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে।

"কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ। দেওর, ভাসুর, শ্বশুর, স্বামী, সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্য রকম সম্বন্ধ।

"এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে। 'অহংতা' আর 'মমতা'। যশোদা ভাব্‌তেন, আমি না দেখ্‌লে গোপালকে কে দেখ্‌বে, তা হ'লে গোপালের অসুখ ক'র্ব্বে। যশোদার কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে বোধ ছিল না। আর 'মমতা' আমার জ্ঞান আমার গোপাল। উদ্ধব বল্লেন, মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎচিন্তামণি। তিনি সামান্য নন। যশোদা বল্লেন, ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—না, আমার গোপাল।

"গোপীদের কি নিষ্ঠা! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে সভায় ঢুক্‌লো। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাঁদের লয়ে গেল। কিন্তু পাকড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, তারা হেঁটমুখ হ'য়ে রইল। পরস্পর বল্‌তে লাগলো এ পাকড়ী বাঁধা আবার কে। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'ল্লে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হবো! আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়াপরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়! দেখেচ, এদের কি নিষ্ঠা!

"বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি দ্বারকার কাছে লোকেরা অজ্ঞানের কৃষ্ণ পূজা করেন। তারা রাধা চায়না।

একজন ভক্ত। কোনটী ভাল, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, না প্রেমাভক্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রেমাভক্তি কি জান? খুব ভালবাসা না হলে হয় না। আর আমার জ্ঞান। তিন বন্ধু একটা বন দিয়ে যাচ্চে। এমন সময় এক বাঘ এসে উপস্থিত। একজন ব'ল্লে, ভাই! আমরা সব মারা গেলুম! আর একজন ব'ল্লে কেন? মারা যাব কেন? এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। আর একজন ব'ল্লে, না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস এই গাছে আমরা উঠে পড়ি।

"যে লোকটী ব'ল্লে, আমরা মারা গেলুম, জানেনা যে ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা আছেন। যে ব'ল্লে এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। তার

বোধ আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব কর্‌ছেন। আর যে ব্যক্তি ব'ল্লে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস আমরা গাছে উঠি, তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের কর্ত্তাকে ছোট মনে করে। পাছে তাঁর কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাঁকে ভালবাসে, তাঁর পায়ে কাঁটাটী পর্য্যন্ত না ফোটে।

ঠাকুর গোপীদের প্রেমাভক্তি এইরূপে বুঝাইলেন।

রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভক্তদের আমন্ত্রণ করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। ঠাকুরকে নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীম——কথিত।

প্রকৃত বৈষ্ণব।

আজ কাল যে সময় পড়িয়াছে তাহাতে প্রকৃত অপ্রকৃত আসল নকল চিনিবার উপায় নাই। গুরু শিষ্য একাসনে বসিয়া মদ্য পান করিতেছেন অথচ উভয়েই "সাধক", গৈরিক বস্ত্রের পতাকা উভয় কলেবরই বিভূষিত করিয়া দোদুল্যমান রহিয়াছে, দীর্ঘ কেশ সিন্দুর উভয়েরই শিরোভূষণ। কমণ্ডলু হস্তে সন্ন্যাসী ঠাকুর বোম্ বোম্ শব্দে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, পর দিন পুলিসের লোকে গৃহ পরিপূর্ণ হইল—ঠাকুর ৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিবেশী বিধবা কন্যাকে হত্যা করিয়াছেন। ত্রিকণ্ঠ পীড়িত বৃষস্কন্ধ বাবাজি মহান্তের কুটীর অভ্যন্তরে ভ্রূণ হত্যা হইতেছে—কিন্তু স্বচ্ছন্দচিত্ত বাবাজি সেই বাবাজিই আছেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের ঘোর ব্যভিচার বৈষ্ণব সমাজের রক্ত মাংস চুষিয়া খাইতেছে। যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহার নাম করিতে কতকগুলি সেবাদাসীর বীভৎসাকৃতি মনে পড়ে। বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, গয়া, কাশী যে তীর্থে যাইবেন সেই খানেই দেখিবেন "সহজ সাধন" বিকৃত হইয়া অতি অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব অতি যত্নে যে

স্বর্ণহার বঙ্গভূমির কণ্ঠে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন "শিশ্নোদরের" জ্বালায় আমরা সেই অমূল্য নিধি বেচিয়া খাইয়াছি। হায়, আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, নতুবা আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন?

বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থানের কথা আজ কাল অনেক স্থলে শুনা যাইতেছে সত্য, কিন্তু বলিতে কষ্ট হয়, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, পুনর্জ্জীবিত ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ষোলকলায় ভিন্নাকারের প্রতীয়মান হইবে।

মৃদঙ্গ ধ্বনির মধুর নিনাদে যে মত্ততা ও ভাব উৎপন্ন করে তাহা যদি প্রকৃত মত্ততা ও ভাব হইত তাহা হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থানের আর আবশ্যকতা হইত না। "ফাঁকা ভাবাবেশ" চির দিনই আছে, "আহা" "উহু" "মরি মরি" লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে। যে অমৃতের আস্বাদন করিতে করিতে মহাপ্রভু সিন্ধুজলে নিমগ্ন হইয়া মকরন্দ পরিপূর্ণ সরসিজের ন্যায় ভক্ত ভৃঙ্গকে আকুলিত করিতেন, সেই অনাস্বাদিত পূর্ব্ব রস সেই হৃদয়োন্মাদকারী রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবাই, পুনরুত্থিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর হইতে অপসারিত হইয়াছে। যাহা প্রাণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া, শবদেহ লইয়া টানাটানি করিলে কি হইবে? ভাই, বাহ্যিকে দেশ ছারে খারে গিয়াছে ও যাইতেছে তবে আবার "মর্কট বৈরাগ্য" কেন? শ্রীচৈতন্যদেব যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই নিষেধ বাক্য না শুনিয়া সেই নির্ম্মল গুরুপদেশের অন্যথাচরণ করিয়া, রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক ধর্ম্মপ্রচার করা আমাদের মহাপরাধ।

যাহা প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ মিলিলে মানব নিত্য সঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত নিত্য লীলার সহায় হয়েন ও সেই চিহ্ন পরিস্ফুটাকারে প্রকাশিত হয়, তাহারই সাধনা আমাদিগের প্রয়োজন হইয়াছে। স্বকপোল কল্পিত "চিহ্নিত পুরুষ" সাজিয়া নিত্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করা কালহরণ মাত্র।

রাধাকৃষ্ণ সেবা যে বৈষ্ণবের আজিও চরম লক্ষ্য হয় নাই, যে বৈষ্ণব সখী ভাবকে আজিও সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, তিনি উচ্চ মহীরুহের মত আজিও দণ্ডায়মান, তিনি প্রেমিক হইলেও আববাহিত, অজগলস্তনবৎ; তিনি বৈষ্ণব সমাজে আছেন এই মাত্র। মাতৃ বক্ষে যে মধুরতা আছে মাতৃ স্তন্যের ভিতর যে পীযূষ নিহিত রহিয়াছে, তাহা যেমন

শুষ্ককণ্ঠ শিশুই বুঝিতে পারে, তেমনি এই রাধাকৃষ্ণ সেবা যে কি মধুর তাহা যিনি ক্রিয়াশীল (প্রাক্‌টিক্যাল) তিনিই অনুভব করিয়া থাকেন।

সাধনার ঘনীভূত অবস্থায় সাধক দেখিতেছেন, শ্যামসুন্দর রসময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রসময়ী রাসরসিকা শ্রীমতী রাধিকার সহিত অনুক্ষণ যুগলমিলনে মিলিত হইতেছেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যেমন ধরণীবক্ষের উপর তারকা খচিত সুনীল নভোমণ্ডল দিগন্ত প্রসারিত হইয়া আনন্দোদ্গার করিতে থাকে তেমনই সাধনার প্রশান্তক্ষেত্রে অবতীর্ণ সাধক প্রকৃতি পুরুষের মহা যোগ জনিত আনন্দসুধা নিশিদিন পান করিয়া আত্মাকে চির পরিতৃপ্ত মনে করেন। তাঁহার আমিত্বের মধ্যে রাধা পরিরম্ভিত শ্যাম সুন্দর হেম বিজড়িত মরকত মণির মত স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতিভাত হয়েন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনা যখন রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে অনুপ্রাণিত, তখন বৃন্দারণ্য সেই ধবলী শ্যামলী, সেই বংশীবট, তপন তনয়া তটস্থিত নবীন মদনকে পরিত্যাগ করিয়া স্মর গরল খণ্ডন করিতে কে সাহস করিতে পারে? শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আভ্যন্তরীণ মন্ত্র পাঠ করিলে এই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। যে ভাবাবেশে তিনি কমঠাকার শিথিলাঙ্গ হইতেন সেই ভাবাবেশেই তিনি রাধাকৃষ্ণ ধ্যান করিয়া কুঞ্জ সেবার অধিকার প্রাপ্তির আশায় মহা উন্নত চিত্ত। চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে যখন শুনি তিনি রঘুনাথ গোস্বামীকে উপদেশ দিতেছেন—

"ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে" তখন বুঝিতে পারি না ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা কি বস্তু। কিন্তু যখন দেখি মহাপ্রভু চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন গিরি ভ্রমে "হন্তার মদ্রিরবলা হরিদাস বর্য্যো" বলিতে বলিতে বায়ুবেগে ছুটিতেছেন গোবিন্দ, রামাই নন্দাই শঙ্কর গদাধর জগদানন্দ পণ্ডিত ভারতী গোসাই তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, আবার পরক্ষণে ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখি—

"স্তম্ভভাব পথে ইথে চলিতে নাহি শকতি।
"প্রতি রোম কূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ম্মর নাহি বর্ণের উদ্ধার॥

দুই নেত্রে বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্র মিলিল যেন গঙ্গা যমুনার ধার॥
বৈবর্ণ শঙ্খ প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িল।
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইল॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্বাস লইয়া করে অঙ্গ সংবীজন॥
স্বরূপাদিগণ তাহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কাঁদিতে লাগিলা॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে আট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হইল চমৎকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জল করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে॥
এইরূপ বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
হরি বল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি॥"
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অঙ্গ বাহ্য হইল।
স্বরূপ গোসাঞিয়ে কিছু কহিতে লাগিল॥
গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পাইল॥
ইহা হইতে আজি মুঞি গেনু বৃন্দাবনে।
দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে॥
হেন কালে তথা কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণু নাদ শুনি আইল রাধা ঠাকুরাণী।

তার রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥
রাধা নঞা কৃষ্ণ প্রবেশিল কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহা হইতে ধরি মোরে ইঞা আইলা॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাই দেখিতে॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তার দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥"

তখন রাধাকৃষ্ণের সেবা বুঝিতে আর বাকি থাকে না। আট সাত্ত্বিক বিকারে যখন কলেবর সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন গোবর্দ্ধনে বেণুবাদন শ্রবণ অবিশ্বাসীর পক্ষে যদিও (Hallucination), সাধকের নিকট তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরম রহস্য পূর্ণ সম্ভোগামৃত। এই বিলাস কলায় যাহার কৌতূহল জন্মে নাই তিনি অমিয় নিমাই চরিত আস্বাদন করিয়া গদগদ কণ্ঠ হইলেও প্রকৃত বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত নহেন।

কবি বৃন্দাবন সেন।

বৃন্দাবন সেন একজন প্রাচীন শাক্ত ও শৈব কবি। জড়ভরত চট্টগ্রামে তাঁহার নাম এই প্রথম প্রকাশিত হইল। হয়ত এক দিন তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে খুব প্রসিদ্ধই ছিলেন; যতক্ষণ নদীর জল সাগর বারিতে সম্মিলিত না হয়, ততক্ষণ তাহার খুবই কল্লোল শুনা যায়—মিশামিশি হইলে আর কিছু নাই; বৃন্দাবন সেনের আত্মাও আজ পরমাত্মায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে পার্থিব কল্লোল উঠিবে কেন? সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব, তিরোভাব, তাঁহার পিতা মাতার নাম প্রভৃতি বিষয় যে অনাবিষ্কৃত থাকিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তবে তিনি যে চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত। তাঁহার কোন কোন সঙ্গীত পাঠে প্রতীতি হয়,

যে, তিনি একজন ভাল সাধক ছিলেন। কবি তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রামকে একটি সঙ্গীতে কাশীধামের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতই জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

পাণ্ডুলিপি খানি আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু, ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি, এ, মহোদয়ের বাটীতে চট্টগ্রাম—পরৈকোড়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা তাঁহার পিতৃদেব ৺রসিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের হস্ত লিখিত। পুঁথিতে সন তারিখ নাই। কিন্তু উহার অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, পুঁথি খানির বয়স অন্ততঃ ৪০।৫০ বৎসরের কম নহে। গঙ্গাচরণ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত বলেন, "তাঁহাদের বংশে 'বৃন্দাবন' নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের বংশ বহু বিস্তৃত—অনেক গুলি গ্রামে অনেক শাখা প্রশাখা আছে। তাঁহাদের বংশীয়েরা রায়, দাস গুপ্ত, লালা, চৌধুরী, সেন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ধারণ করেন। স্বগ্রামেও একটি শাখায় 'সেন' উপাধির প্রচলন আছে। কবি বৃন্দাবন সেন তাঁহাদের বংশীয় হইতেও পারেন*।"

যে পাণ্ডুলেখ্যে বৃন্দাবনের গীতগুলি লিখিত আছে, তাহার ভিতর এক স্থানে জ্যোতিষ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পদ্যময় সন্দর্ভও আছে। পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়েই তাহা লিখিত হইয়াছে। এই পণ্ডিত বাহাদুর আবার কে? পরে সত্য নির্ণয়ের সুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় উক্ত 'জ্যোতিষ বচনটি' নিম্নে তুলিয়া দিলাম:—

জ্যোতিষ-বচন।

জ্যোতিষেতে নানা মত, গণনার সঙ্কেত,
জানে নানা জ্যোতির্ব্বেত্তাগণে।

* এই বংশ চট্টগ্রামে অতি প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত। আদি পুরুষ সদানন্দ পন্থদাস 'রাঢ় বঙ্গ' হইতে আসিয়া পরৈকোড়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন। নবাবী ও ইংরেজ আমলে এই বংশের অনেকে রাজ সংসারের উচ্চ উচ্চ পদে অধিরূঢ় ছিলেন। নবাবী আমলের চট্টগ্রামের দেওয়ান মণিরাম এই বংশোদ্ভূত। আদি পুরুষ হইতে এখন প্রায় ৩০ পুরুষ চলিতেছে। গঙ্গাচরণ বাবুর মুখে ইহার প্রকৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইব, আশা আছে। তখন বংশ পত্রিকা সাহায্যে কবির সময়াদি নির্দ্দেশ করা কঠিন হইবে না।

কিন্তু তাতে মনঃপূত, ভাব নহে উদ্ধৃত,
দেখিলাম ভূত বর্ত্তমানে॥
অতি সূক্ষ্ম সঙ্কেত, পাইয়া মনের মত,
ভাষায় তাহা করি সুরচনা।
শুন গুণী জ্ঞানীগণ, হইয়ে সাবধান মন,
যেমতে তা করিবে গণনা॥
জন্ম দণ্ড পল বিপল, অঙ্ক পাত এক স্থল,
তার নীচে দণ্ড পঞ্চ দশ।
একত্রিংশ পল ধরে, ত্রিংশত বিপল পরে,
পাতন করিয়া ঠিক কশ॥
লম্বিতেতে অবিকলে, যত অঙ্ক পাবে হেলে,
সে লগ্নেতে বর্ষের প্রবেশ।
লগ্ন হইতে এক ঘর, মুন্থা হবে অগ্রসর,
নিশানাথ নবাংশ ভুক্ত শেষ॥
পঞ্চ কিবা ষষ্ঠ রাশি, অগ্রসর হবেন আসি,
সপ্ত বর্গের স্থিত গ্রহগণ।
পূর্ব্ব স্থিত গৃহে গৃহে, থাকিবেন অবিরহে,
জাতকের যাবত জীবন॥
প্রতি বর্ষে একবার, হইবেক আগুসার,
ষষ্ঠী দণ্ডে দুবারের বৃদ্ধি।
প্রতি বর্ষে জন্ম মাসে, নূতন বর্ষ প্রবেশে,
হয় বার তিথির বিরুদ্ধি॥
লগ্ন মুন্থা চন্দ্র ধরি, সপ্ত বর্গের গ্রহ হেরি,
করিয়া ভাবের বিবেচনা।
ভাল মন্দ ফলাফল, জানা যাবে অনর্গল,
করিলে সুস্থিরেতে গণনা॥
লগ্ন মুন্থা চন্দ্রিমার, অষ্টমের অধিকার,
গ্রহগণ সে বর্ষে মৃত্যুপতি।
মৃত্যুস্বামী যে যে গ্রহ, সপ্তবর্গে শক্তি গৃহ,

অংশ ক্রমে যদি হয় স্থিতি ॥
সপ্তম গৃহ শক্ত্যালয়, প্রাপ্তে মৃত্যু সুনিশ্চয়,
প্রত্যক্ষ হইয়াছে বহু জনে।
কিন্তু প্রধান অংশ আদি, সপ্তমে না পড়ে যদি,
রক্ষা পায় শান্তি স্বস্ত্যয়নে ॥
বিশেষ অষ্টম গৃহে, উদাসীন গৃহ রহে,
করে সেই মৃত্যু নিবারণ।
পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়,
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন ॥

বৃন্দাবন রচিত ২৭টি সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৫, ৭, ২১, ২৫ ও ২৬ সংখ্যক গীত গুলি অসম্পূর্ণ। তাঁহার রচিত আরও অনেক গুলি গীত ছিল বলিয়া বোধ হয়। গীত গুলিতে ঝিঝিট, পূরবী, খাম্বাজ, বসন্ত, ইমন, ললিত প্রভৃতি রাগ রাগিণী এবং আড়া, কাওয়ালী, আড়া খেমটা, মধ্যমান প্রভৃতি তালের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এই রাগ তালের মধ্যে কোন কোনটি বোধ হয় আধুনিক উদ্ভাবিত। ঝিঝিট, খাম্বাজ, আড়া, খেমটা, প্রভৃতি রাগ তালের নাম আর কোন প্রাচীন পুঁথিতে দেখিয়াছি, মনে হয় না। এই সন্দেহের সমর্থনার্থে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সকল গীত গুলিতে রাগ তালের নির্দ্দেশ নাই ও রাগ তাল লেখার অক্ষর ও কালী মূল গীতের অক্ষর ও কালী হইতে একটু বিভিন্ন দেখায়। তাই আমরা অনুমান করি, কোন ব্যক্তি পরেই রাগ তাল গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই কাজ বৃন্দাবনের স্বকৃত হইলে, সকল সঙ্গীতে রাগ তাল নির্দ্দিষ্ট না থাকিবার কোন কারণ ছিল না।

গতাসু কবিগণের রচনার দোষগুণ সমালোচনা করা ন্যায় সঙ্গত নহে। এ মর জগতের স্তুতি বা নিন্দা কিছুই আর তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না। বিশেষতঃ সমালোচ্য সঙ্গীত গুলি প্রাচীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত; প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা 'সত্য' আবিষ্কার করাই এখন আমাদের বিশেষ আবশ্যক; পথে সৌন্দর্য্য কিছু পাই ত, তাহাকে 'ফাউ' স্বরূপ গণ্য করিয়াই উপভোগ করিব। তবে এক কথায় এই গীত গুলি সম্বন্ধে এই

বলা যাইতে পারে যে, কোন ধর্ম্ম পিপাসু পাঠকই গীত গুলির রসাস্বাদন করিয়া অসন্তুষ্ট হইবেন না।

পাঠকগণের রসাস্বাদন ও রক্ষণার্থে সঙ্গীত গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। গীত গুলির সাধারণ বর্ণ বিন্যাসাশুদ্ধি শোধন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করি নাই। গীত গুলির মধ্যে মধ্যে যে সংখ্যা গুলি দেওয়া গেল, তাহা মূলেই আছে।

১। ঝিঝটী—আড়া।

জগদ্‌গুরু কল্পতরু কৃপাঙ্কুর পঞ্চানন।
দেব দেব মহাদেব আদিদেব সনাতন ॥
স্বয়ম্ভুব কৃপাময়, ত্রিপুরারি মৃত্যুঞ্জয়,
দীনে দিএ পদাশ্রয়, পরংব্রহ্ম পরায়ণ। ১
দারুণ খলের দাএ, অনর্থক যন্ত্রণায়ে,
কোন পাপে সর্ব্বদাএ, দেও এত অপমান ॥ ২
ভৃকুটী (ভ্রূকুটি) ভঙ্গিমা হেরি, সুস্থির হইতে নারি,
কৃপা করে ত্রিপুরারি, দাসে কর পরিত্রাণ। ৩
এ বিভুতি নিবারণ, কর বিভুতি ভূষণ,
ভনে দীন বৃন্দাবন, রক্ষ আশুতোষ মান ॥ ৪

২। পূরবী—আড়া।

কর মনঃ অনুক্ষণ ভজন পূজন শিব।
অহিকে (ঐহিকে) আর পারত্রিকে যদি চাহ নিজ শিব ॥
ববম্ ববম্ বলে, নববিল্বদল জলে,
পূজ লিঙ্গ অবিকলে, পাষাণ ধাতু পার্থিব। ১
সত্ত দেবী দেবাগণ, আছেন এ ত্রিভুবন,
করিলে শিব অর্চ্চন, মহা তৃপ্ত হবে সব ॥ ২
ভজিলে শ্রীআশুতোষ, পূর্ণ হবে অভিলাষ,
ছেদ করে কাল পাশ, তরে যাবে ভবার্ণব। ৩
শিব শক্তি পদার্চ্চন, করে হবে পদে লীন,
ভনে বৃন্দাবন সেন, ত্রাহি মাং পামরে ভব ॥ ৪

৩। খাম্বাজ—কওয়ালী।

যদি বাঞ্ছা কর ভোলা মন,
ভোলানাথের শ্রীচরণ।
ত্যজি এ বিষয় রঙ্গ, বন্ধু পরিজন সঙ্গ,
শ্রীচন্দ্রশেখর শৃঙ্গ, কর আরোহণ। ১
বিরলেতে নিশাভাগে, আত্মমন সুসাঙ্গাগে,
দৃষ্টি স্থির করে নগে, থাক জাগরণ॥ ২
যথা জ্যোতি দীপ জ্বলে, তথা মন অনর্গলে,
হেরিবে হর অবহেলে, করিলে মনন। ৩
বিভূতি ভূষণ অঙ্গ, দেখিবে সগণ সঙ্গ,
শুনিবে নাদ তরঙ্গ, মন বৃন্দাবন॥ ৪

৪। পূরবী—আড়া।

চণ্ডেশ্বর গঙ্গাধর কত রঙ্গ লীলা জান।
জগবন্ধু কৃপা সিন্ধু গুণ-ইন্দু ভগবান॥
শ্রীচন্দ্রশেখর পরে, কত রঙ্গ ভঙ্গ করে,
অটবী গুহা গহ্বরে, কলিযুগে অধিষ্ঠান। ১
ক্ষণে হও জ্যোতির্ম্ময়, ক্ষণে হও ধূম্রাশয়,
ক্ষণেকে হও কতিপয়, ঋষিরূপে বিদ্যমান॥ ২
ক্ষণে স্থূল কলেবর, হয়ে দিব্য জটাধর,
দাবানলে নৃত্য কর, হেরে হএ হতজ্ঞান। ৩
ক্ষণেকেতে যন্ত্রাকৃতি, রূপ ধর পশুপতি,
বৃন্দাবন করে স্তুতি, ঐক্য করে মন প্রাণ॥ ৪

৫।

দয়া কর চণ্ডেশ্বর করুণা আধার।
জ্যোতির্ম্ময় পদাশ্রয় প্রদানে এবার॥
দেব দেব মহাদেব, বিতরে চরণতরি,
কর এই ভবার্ণব দুস্তার নিস্তার। ১

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
কি হবে আমার গতি, না জানি সাঁতার॥ ২
বিষয় কলুষ ভোগে, জরা হয়ে শোক রোগে,
সতত উৎকটোদ্বেগে, করি হাহাকার। ৩

সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ।

৬।

বিনা যত্নে ঘটে কিরে ওরে মন!
ভবৌষধ শিবপদ অমূল্য রতন॥
বিনা নিশি জাগরণ, বিনা ধ্যান সুমনন,
হয় কি শ্রীপঞ্চানন-পদ-দরশন। ১
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার, হেরিলে মন এইবার,
আছে কি সন্দেহ আর, বিনা বিড়ম্বন॥ ২
কেবল কিঞ্চিৎ ক্লেশে, দেখিবে মন অনায়াসে,
আদ্যিদেব আশুতোষে, বসে নিকেতন।
চট্টল পরম কাশীধামে, মন দিবানিশি,
শিব লীলা হের বসি, ভজ বৃন্দাবন॥ ৪

৭।

জয়তি জয় গঙ্গাধর চণ্ডেশ্বর করুণাময়।
জগৎ গুরু কল্পতরু করুণাঙ্কুর মৃত্যুঞ্জয়॥
ভক্তবৎসল আশুতোষ, ক্ষেম স্বাধীন দাস দোষ,
ছেদনং কুরু কালপাশ, বিশ্বেশ্বর জ্যোতির্ম্ময়। ১ অসম্পূর্ণ।

৮। পূরবী—আড়া।

ভাবনা কি ভবে মন থাকিতে ক্রমদীশ্বর।
কীর্ত্তিবাস আশুতোষ শ্রীচন্দ্রশেখরেশ্বর॥
ব্যক্তরূপা জ্বলাসহ (জলাশয়), ভজে যেই অহরহ,
চতুর্ব্বর্গে কি সন্দেহ, আছে হে তাহার। ১

সেব মন যুগ্ম পদ, দিব্য রসায়নৌষধ,
ঘুচিবে ভবের গদ (১), হইবে অজর ॥ ১
সাক্ষাতে ভঙ্গির লীলা, হেরিলে হে মন ভোলা,
কর কি আর মন উতলা, ভয় কৃতান্তের। ৩
কৃতান্তের অন্তকারী, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিপুরারি,
ভাবিলে চরণতরী, (হবে) নির্ভয় অন্তর ॥ ৪

৯। বসন্ত—আড়া।

চল যাই ভ্রান্ত মন শ্রীচন্দ্রশেখরে।
দিবা নিশি তথা বসি ভাবি স্বয়ম্ভূরে ॥
হর নেত্রানল জ্বালা, অপূর্ব্ব দীপের মালা,
তার মধ্যস্থলে ভোলা, আনন্দে বিহরে। ১
বিভূতি ভূষণ অঙ্গ, যোগী ঋষিগণ সঙ্গ,
লয়ে করে নানা রঙ্গ, নয়ন গোচরে ॥ ২
প্রত্যক্ষ হেরিলে মন, বহুজন বিদ্যমান,
জীবন সার্থক মান, ভ্রান্তি পরিহরে। ৩
দেব দেবী সিদ্ধাগণ, ধ্যানে না পায় যে চরণ,
ভাগ্যে বৃন্দাবন-মন, হেরিলে তাহারে ॥ ৪

১০। ইমন—খয়রা।

হেরে হর বিশ্বেশ্বর ভঙ্গিমা তোমার।
হঠাতে ভুলিল মন নয়ন আমার ॥
বিরুপাক্ষ গুহা পরে, উত্তরাচল শেখরে,
জ্যোতিরানল অন্তরে, কৌতুক বিহার। ১
প্রথমে দীপের শ্রেণী, দ্বিত (২) সন্ন্যাসী মুনি,
তৃতী (৩) প্রলয়াগুলি, জ্যোতি চমৎকার ॥ ২

(১) গদ—রোগ। (২) দ্বিতীয়। (৩) তৃতীয়। সম্ভবতঃ লেখকের দোষে শব্দ দুইটি এইরূপ হইয়াছে।

অনলের মধ্যস্থলে, আসনে দিব্য জটিল,
পঞ্চমে উত্থান স্থূল (স্থল), নৃত্য অনিবার। ৩
যেরূপে শ্রীচন্দ্রাচলে, দীনে দরশন দিলে,
বৃন্দাবনে অন্তকালে, ওরূপে নিস্তার ॥ ৪

১১। খাম্বাজ—আড়া খেমটা।

দীননাথ কবে কর্‌বে দয়া দীন পামরে।
দিন গেলে করুণায় তোমার কি লাভ আমার হবে পরে।
মনে অতি সাধ করি, ভবের বাণিজ্যে হরি,
আলেম (৪) সাজে কায়তরি, মহাজনের ধন ভরে।
না বুঝে ছয় জনা বৈরী, করিলাম কাণ্ডারী ডাড়ী (৫),
জুয়াতে সর্ব্বস্ব হারি, গেল তারা অভ্যন্তরে ॥ ২
হইয়ে হীন কাণ্ডারী, বিষম তরঙ্গে ঘুরি,
নিতান্ত মিনতি করি, ডাকি তোমায় দীন কাতরে। ৩
দয়াময় নিজ গুণে, ত্রাণ কর দীন হীনে,
ভীত হয়ে বৃন্দাবনে, শ্রীপদে কাকুতি করে ॥ ৪

১২।

আগত সমরে কার রমণী।
লম্পে দম্ফে সদায় কম্পে ধরণী ॥
করে অসি দিগ্‌বাস, মুখে অট্ট অট্ট হাস,
করেছে দনুজ গ্রাস ঘনি। ১
লোল জিহ্বা চারি কর, পদতলে দিগম্বর,
কাদম্বিনী ঘোরতর বরণী ॥ ২
চরণে নপূর বাজে, কটিতে কিঙ্কিনী রাজে,
গলে মুণ্ডমালা সাজে কৃপানী। ৩
ভণে দীন বৃন্দাবন, ঐক্য করে কায়মন,
পাবার আশে শ্রীচরণ-তরণী ॥ ৪

(৪) আলেম—আইলাম। (৫) দাঁড়ী।

১৩।

দীন-দয়াময় মৃত্যুঞ্জয় শ্রীনকূল।
কৃপা করে কর দীনের মানস প্রতুল॥
ভবে এসে বিষয় মজে, মত্ত হয়ে অপকাজে,
ডুবে পাপার্ণব মাঝে, হারালেম দুকূল। ১
মরি এ বিষম লাজে, চরমে শ্রীধর্ম্মরাজে,
ধার্ম্মিকগণ সমাজে, বলিব কি বোল॥ ২
আশুতোষ দীনবন্ধু, অগাধ করুণাসিন্ধু,
অধমে বিতর বিন্দু, হয়ে অনুকূল। ৩
দেব দেব আদি দেব, বৃন্দাবনে বাঞ্ছে তব—
আশ্রয় পদ পল্লব সর্ব্ব সিদ্ধিমূল॥ ৪

১৪।

গেল দিন মন কঠিন অভাজন।
চির দিন পরাধীন অকারণ।
করে ধন উপার্জ্জন, শিব শক্তি সেবার্চ্চন,
না করি দান বিতরণ সাধারণ। ১
করে নিত্য কুভোজন, অলাভেতে আভরণ,
সদায় রুষ্ট পরিজন বন্ধুগণ॥ ২
দ্বিজাতিথি দুঃখী জন, অপ্রাপ্তেতে কুবচন,
করে নিত্য কুঘোষণ প্রাণগণ (৬)। ৩
গয়া কাশী আদি মন, কোন তীর্থ পর্য্যটন,
না করিলে কদাচন বৃন্দাবন॥ ৪

১৫। খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

পতিতপাবনী দায় মোচনী শিবে।
দায় দায় প্রায় আমার প্রাণ কি যাবে॥

(৬) প্রাণগণ—না 'প্রাণপণ'।

এ কি মা কঠিন দায়, চিন্তানলে মন কায়,
দগ্ধ করে সর্ব্বদায়, কৃতান্ত ভাবে। ১
চেষ্টা সাধ্যে শেষ নহে, হৃদয় পঙ্কজে রহে,
না সহে দায় ভার দেহে, নিস্তার এবে॥ ২
করে তারা কি মন্ত্রণা, দেয় এ দায় যন্ত্রণা,
করে তার বিবেচনা, বুঝিনা ভাবে। ২
কৃপা করে ভবদারা, কর এই দায় সারা,
বৃন্দাবনে পরাৎপরা, তার প্রভাবে॥ ৪

১৬।

ভবেশ্বরী পদতরি বিনা আরোহণে।
দুস্তার ভবসাগর তরিবে কি গুণে॥
(আমার মন নাবিক)
লম্পট দুর্ব্বার মন, করে কপট ভজন,
ওরাঙ্গা পদে শরণ, পাবে কি ভেবেছ মনে। ১
আছে ভবার্ণব তীরে, কৃতান্ত কালদণ্ড ধরে,
কিসে ফাকি দিয়ে তারে, বাঁচিবে প্রাণে॥ ২
যদি চাহ নিজ হিত, সেবা কর যথোচিত,
কালী পাদপদ্মে চিত জপ পূজনে। ৩
কৃপাময়ীর কৃপাবলে, কৃতান্তে জয় করে হেলে,
বৃন্দাবন যাবে চলে, চড়ে বিমানে॥ ৪

১৭।

ভবগদ মহৌষধ কালী নাম সার। অরে মন!
সত্ত্বগুণ রসায়ন অমিয়া আধার॥ ওরে মন!
পাপ তাপ আদি (আধি) ধ্যাধি, সেবনে নাম ঔষধি,
ঘুচিয়া হবে সমাধি সিদ্ধি অসাধার (৭)। ওরে মন! ১

(৭) অসাধার—অসাধারণ? 'বিস্তর' অর্থে শব্দটি চট্টগ্রামে লৌকিক ভাষায় প্রচলিত আছে; যথা—'পুকুরে অসাধার মাছ আছে'।

জপে শ্রীকালীর নাম, সাধে ধর্ম্ম অর্থ কাম;
অন্তে যাবে কালীধাম, হইয়া নিস্তার॥ ওরে মন! ২
কালীপদ ভেলায় চড়ে, নামব্রহ্ম পানাহারে,
কালীনাম-ডঙ্কা মেরে, তর পারাবার। ওরে মন! ৩
ওহে বৃন্দাবনের মন, কালী সেবায় চির দীন (৮),
থাক হয়ে পদে লীন শিবের আকার॥ ওরে মন! ৪

১৮। সিন্ধু ভৈরবী।

দীন তারিণী শিবে!
নিজ সুতে কত আর যন্ত্রণা দিবে॥
করে নানা প্রতারণা, বিস্তারে ভব বাসনা,
ভোগাইবে এ লাঞ্ছনা, ভক্তি অভাবে। ১
আদান প্রদানে ধন, করো না আর বিড়ম্বন,
কর মনাশয় পূরণ, গুণ প্রভাবে॥ ২
অধীনে স্বাধীন করে, জ্ঞান মানে রাখ স্থিরে,
স্বধর্ম্মেতে সদাচারে, জীবনে ভবে। ৩
অন্তিমে চরণ পাশে, আশ্রয় নিজ দাসে,
বৃন্দাবন সেন ভাষে, কাকুতি রবে॥ ৪

১৯। কাপি সিন্ধু—মধ্যমান ঠেকা।

মনের বাসনা শ্যামা কত কহিব।
যা ইচ্ছা যা কর তাহা সহিব সহিব॥
বিষয় দায়ের ভার, যথাসাধ্য অনুসার,
জ্ঞানে তব সদ্বিচার, বহিব বহিব। ১
সেবা করে আশুতোষে, মজিয়া সিদ্ধির রসে,
রাতুল চরণ পাশে, রহিব রহিব॥ ২
তব মায়া দুঃখানলে, যাবত জীবন জ্বলে,
ঘুরে ফিরে ভূমণ্ডলে, দহিব দহিব। ৩

(৮) 'দিন'ও হইতে পারে।

মা তোমায় কপটী বলে, বৃন্দাবন অবিকলে,
* * * ॥ ৪

২০। ললিত।

কালী কালী বল মন দিন গেলো দিন গেলো।
দারুণ কৃতান্ত দূত সেজে এলো সেজে এলো॥
হানিয়া প্রচণ্ড দণ্ড, করে মহা লণ্ড ভণ্ড,
ভাঙ্গিবে কায় ব্রহ্মাণ্ড, করে বল করে বল। ১
সোণা রূপা হীরা কষা, সঞ্চয় করে তামা কাসা,
কি কর বিষয় আশা, এ বিফল এ বিফল॥ ২
কি কর দেহ গৌরব, ভুষিয়া ভূষণ সব,
এ কায় দহিবে তব, চিতানল চিতানল। ৩
যত সব পরিবারে, সব করে বহির্দ্বারে,
নিবেক সর্ব্বস্ব হরে, বৃন্দাবন ত্যজ ছল॥ ৪

২১।

আমি কি পাইব শ্যামা তোমার চরণ দুটি।
রেখেছে ধূর্জ্জটি যাহা আপনি হৃদয়ে আটি॥
যেম্‌নি তুমি উলঙ্গিনী, উলঙ্গ পিনাকপাণি,
মিলেছে সঙ্গিনী তেমনি উলঙ্গিনী কোটী। ১
(অসম্পূর্ণ।)

২২।

দীন দয়াময়ী কালী শরচ্চন্দ্র নিভাননা।
কবে আর পূরাইবে দীনের মন বাসনা॥
অসার সংসারে মজে, দিন গেল বৃথা কাজে,
বেন্ধে নিতে যমরাজে, করে সদা কুমন্ত্রণা। ১
কৃতান্তের দূতগণ, দেহ-গেহে আগমন,
মদ রূপে অনুক্ষণ, করে নানা বিড়ম্বনা॥ ২

শ্বাস কাস জ্বর বায়ু—রূপা হইয়ে শোষে আয়ু,
অবশ ইন্দ্রিয় পায়ু, পেয়ে কঠিন যন্ত্রণা। ৩
জন্মাবধি মন মতে, না সেবিল গো অসিতে,
বৃন্দাবনে শ্রীপদেতে, ছায়া দেও ভবাঙ্গনা॥ ৪

২৩।

গুরু নাম জপ রে মন ভাই।
গুরু বিনে ভবসিন্ধু ত্রাণকর্ত্তা নাই॥
ওহে মনুরা আমার!
গুরু সর্ব্ব আদি মূল, ব্রহ্মা বিষ্ণু শ্রীনকূল,
নহে গুরু সমতুল, অনন্ত গোসাঞি। ১
গুরু ব্রহ্ম জ্ঞাতা দাতা, সব সিদ্ধি মূল জ্ঞাতা,
নিস্তারক পিতা মাতা, বন্ধু সর্ব্ব ঠাঞি॥ ২
গুরু পদে ভক্তি যার, করস্থিত মুক্তি তার,
গুরু পদ কর সার, হয়ে অনুযাই। ৩
জ্ঞান কর গুরু জায়া, সাক্ষ্যাত সে মহামায়া,
বৃন্দাবন মন কায়া, শ্রীপদে মিশাই॥ ৪

২৪। বেলাবরী (বেলাবলী)।

কি গুণে পাইবে মন সারদা চরণ।
করিয়ে এমন কপট সাধন ভজন॥
গুরু মন্ত্র শক্তি তিনে, ভজ এক ব্রহ্ম জ্ঞানে,
সতত ধ্যান মননে, কৈরে প্রাণপণ। ১
বিনা শুদ্ধ উপাসনা, শক্তি পদ পাইবে না,
পরিহর প্রবঞ্চনা, জল্পনা কথন॥ ২
তত্ত্ব চিন্তায় অবিরত, করহ মনন ব্রত,
কৃপণের ধনের মত, মন বৃন্দাবন। ৩

২৫। শ্রীরাগ—ধ্রুবপদ।

কালী কল্যাণী কালবরণী কৃপানী,
ক্রূর-দুরন্ত-কুলান্তকারিণী।
ত্বং হি ত্রিলোক জননী, সর্ব্ব শক্তি স্বরূপিনী,
সৃষ্টি-স্থিতি-বিলাসিনী অসম্পূর্ণ।

২৬। সারঙ্গ—আড়া।

কেলি করে মূলাধারে কালী কুলকুণ্ডলিনী।
বাসান্ত বর্ণ মণ্ডলে, সদা শম্ভুর কোলে,
নবরসে কাদম্বিনী॥
বেদেশ গণেশ নিতি, করেন শ্রুতি পাঠ স্তুতি,
অসম্পূর্ণ।

২৭।

অনন্তরূপিনী শ্যামা মহা কাল মোহিনী মা।
অক্ষোভ্য ক্ষোরিণী তারা বেদে নাহি সীমা মা॥ ধ্রু।
হইয়া ভুবনেশ্বরী, ত্রিয়ম্বকে (৯) মোহ করি,
ভৈরবীর রূপেতে মা॥
দক্ষিণা মূর্ত্তির সহ, কেলি কর অহরহ,
করিতে কবন্ধ মোহ, ছিন্নমস্তা হৈলে গো মা। ১
ভক্ষিয়া আপন স্বামী, ধূমা রূপ হৈলে তুমি,
বৈধব্যাচার কর গো মা।
এক বক্ত্র রুদ্র সঙ্গে, কালারূপেতে রঙ্গে,
ভঙ্গী লীলা কর গো মা॥ ২
মাতঙ্গী মাতঙ্গ দেবে, কমলা শ্রীবিষ্ণু শিবে,
মোহিলে কটাক্ষেতে মা।
অন্নপূর্ণা যোগ ভরে, দশবক্ত্র মহেশ্বরে,
শ্রীদুর্গা শ্রীনারদে মা॥ ৩

---

(৯) ত্র্যম্বক।

দেবাসুর চরাচরে, শক্তি রূপে সৃষ্টি কৈরে,
স্থিতি কর জননী মা।
নিজ ইচ্ছা অনুসার, জগত বিনাশ কর,
বৃন্দাবনেশ্বরী গো মা॥ ৪

শ্রীআবদুল করিম।

হুগলী কাহিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ত্রিবেণী।

মুক্তবেণী ত্রিবেণী হিন্দুর পরম তীর্থস্থান*। একদিন গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিস্রোত স্বর্গের মন্দাকিনী রূপে "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছিল। আজ কালের কঠোর নিষ্পেষনে যমুনা প্রায় অদৃশ্য—সুন্দর বনে 'ছোট দুর্গা' ও 'বুড়া দুর্গা' রূপে পরিণত হইয়া সাগরে মিশিয়াছে। সরস্বতী ক্ষীণকায়া সূত্র রেখার ন্যায় ধীরে ধীরে পূর্ব্ব কাহিনী গাহিতে গাহিতে তাম্রলিপ্তির নিকট ভাগীরথীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছে, আর জুবিলী সেতুর কৃপায় ভাগীরথী দিনে দিনে শুখাইতেছে—ছোট বড় চড়া পড়িতেছে। ভাগীরথীর শেষ পরিণাম ভাবিতে ভক্ত হিন্দুর হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু ধন্য হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব! শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইয়াছে, বিধর্ম্মীদিগের ভ্রুকুটি ভঙ্গী ও কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আজও তীর্থ মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী আজও ত্রিবেণী তীর্থে ভাগীরথী সলিলে অবগাহন করিয়া ধন্য হইতেছে।

* প্রদ্যুম্ন নগরাক্ষম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা।
স্নাত্বাতত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষতে॥" মহাভারত।

"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে।"
রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

মুসলমান অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ত্রিবেণী উড়িষ্যার কেশরী বংশের নৃপতিদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। নরপতি মুকুন্দদেব ত্রিবেণী ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। "কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি"। রাজা মুকুন্দদেব, তাঁহার রাজত্ব এবং কেশরী বংশ কত শতাব্দী গত হইল লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু ত্রিবেণীঘাট আজও মুকুন্দদেবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ত্রিবেণীর ন্যায় মহা পুণ্যক্ষেত্রে একটীও উল্লেখযোগ্য দেবালয় নাই। ত্রিবেণী এবং সরস্বতীর তীরে অনেক দেবমন্দির ছিল তবে কি সেগুলি বিধর্ম্মী যবন কিম্বা নরাধম কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বা কালের কঠোর প্রভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে? ত্রিবেণীর একটী সুবৃহৎ মন্দির মুসলমানদিগের মসজীদ রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার নাম গাজী দরাফ্*। গাজী দরাফ পূর্ব্বে যে হিন্দু দেবমন্দির ছিল সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। চারিটী প্রশস্ত প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ দেবমন্দির সমূহ বিরাজ করিত। কয়েকটী ভগ্ন সোপান অতিক্রম করিয়া প্রথম প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে উত্তর দিকে দুইটী প্রকোষ্ঠ সম্বলিত প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ দৃষ্টি গোচর হয়। প্রবেশ দ্বার ও প্রাচীর প্রশস্ত প্রস্তর ফলকে গ্রথিত। দেবালয়ের গঠন প্রণালীর দৃঢ়তা দেখিলে অবাক হইতে হয়! মুসলমানি আক্রমণ ও অত্যাচার এবং সর্ব্বধ্বংসী কালকে উপেক্ষা করিয়া আজও সেই প্রাচীর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রস্তর সরাইয়া দ্বারগুলি মিশর দেশীয় দ্বারের ন্যায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। দ্বারের প্রত্যেক দিকের অভ্যন্তর ভাগ ছয় হস্ত পরিমিত লম্বা এক এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রথম প্রকোষ্ঠের একটী বৃহৎ গবাক্ষ ভাগীরথীর দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। গবাক্ষের বহির্ভাগের কারুকার্য্য ঝরিঝরে ও সুন্দর। সেই প্রকোষ্ঠে পূর্ব্ব থাদিমদিগের সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গনের সম্মুখে আর একটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গঠন প্রণালী ভিন্ন প্রকারের। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদিগের কঠোর হস্তে এই মন্দিরটী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। কয়েকটী মন্দির স্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেগুলি প্রাচীন কালের বলিয়া স্পষ্টই অনুভূত হয়। একটী স্তম্ভে দেবনাগরী অক্ষর খোদিত রহিয়াছে, বহু কষ্টে তাহার

* Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal No. IV, 1870.

একরূপ পাঠোদ্ধার করা যায়। মার্শম্যান সাহেব অনুমান করেন মন্দিরটী ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মার্শম্যান সাহেবের অনুমান ঠিক নহে, খোদিত লিপি গুলি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জাফর খাঁ বা দরাফ্ খাঁর সমাধি স্তম্ভ ৭১৩ হিজরী বা ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মন্দির গুলি কিরূপে মুসলমান-দিগের হস্তগত হইল, তৎসম্বন্ধে নানা প্রবাদ মূলক গল্প প্রচলিত আছে। মসজীদে অদ্যাপি যে কুর্শীনামা রক্ষিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে শা জাফর খাঁ গাজী তদীয় ভাগিনেয় শাহসুফীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, চাকলা মুকসুসাবাদ, পরগণা কোনওয়ার পর্ত্তুপের অন্তর্ভুক্ত মুণ্ড গাঁও হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ এই স্থানে আগমন করেন। দরাফ খাঁ মহানাদের অধিপতি মান নৃপতিকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হুগলীর রাজা ভূদেবের সহিত এক যুদ্ধে মান নৃপতি হত হন। তাঁহার মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তাঁহার দেহ ত্রিবেণীতে সমাহিত হয়। শা জাফর খাঁ গাজীর পুত্র আগোয়ান খাঁ সরকার সপ্তগ্রামের অধীন হুগলীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয়লাভ করেন। আগোয়ান খাঁ রাজকন্যার পানিগ্রহণ করেন এবং রাজাকে সবংশে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। রাজকন্যা এবং আগোয়ান খাঁ ত্রিবেণীতেই মৃত্যুমুখে পতিত ও সমাহিত হন। ফিরোজ সাহ ইঁহাদিগকে 'খাঁ' উপাধি প্রদান করেন।

জাফর খাঁ গাজী ও তদীয় ভাগিনেয় অন্য উদ্দেশ্যে ত্রিবেণীতে আগমন করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়*। পাণ্ডুয়ার মসজীদ ও স্তম্ভ সাহ সুফী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। সাহ সুফী দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ সাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জাফর খাঁ গাজীর ভাগিনেয়। পাণ্ডুয়ার মসজীদের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বের আয়মা সংক্রান্ত এক খানি দলীল আছে। জাফর খাঁর ত্রিবেণী মসজীদ পাণ্ডুয়া মসজীদের সমসাময়িক সুতরাং মাতুল ও ভাগিনেয় বে একই সময়ে একই উদ্দেশ্য সাধন জন্য এপ্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার সংশয় নাই। দিল্লী হইতে ইঁহাদের আগমনের কারণ এইরূপ কথিত আছে। ত্রিবেণীর চারি ক্রোশ পশ্চিমে মাহানাদ নামক স্থানের হিন্দু রাজার জনৈক মুসলমান প্রজা পুত্রের মঙ্গলার্থে গো হত্যা করিয়া গো মাংস

* Vide Journal of the Asiatic Society, May, 1847.

ব্যবহার করিয়াছিল। হিন্দু রাজা এই সংবাদ পাইয়া মুসলমানের পুত্রকে বধ করিবার আদেশ দেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে মৃত বালকের পিতা দিল্লিতে সম্রাট ফিরোজ সাহের নিকট উপস্থিত হইয়া ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে। সম্রাট মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে জাফর খাঁ ও সাহ সুফীর অধীনে একদল সেনা প্রেরণ করেন। মহানাদের রাজার নাম মান নৃপতি। জাফর খাঁ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন।

জাফর খাঁ হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ ও হিন্দু রাজ্যের বিনাশ সাধন করিয়াও পরিশেষে দেবী সুরধুনীর কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন ও হিন্দুদের নিকটেও পূজনীয় হইয়াছিলেন। একদা জাফর খাঁর কঠোর সাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবী সুরধুনী ভাগীরথী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া সশরীরে ভক্ত জাফরকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন*। জাফর খাঁ দেবীর কৃপায় কোরাণ বিস্মৃত হইয়া হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন, তিনি মনের আবেগে যে সুরধুনীর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি ভক্তির সহিত পঠিত ও গীত হইয়া থাকে।

দরাফ খাঁর স্তোত্রের এই কয় ছত্র কে না জানে?

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সা তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বম্ মহত্বম্॥

হে সুরধুনি মুনিকন্যে তুমি পুণ্যবান্ ব্যক্তিকেই তারণ কর কিন্তু সে তাহার নিজ পুণ্য দ্বারাই তরিয়া যায়, তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য কি? যদি গতি-বিহীন পাপী আমাকে পরিত্রাণ কর তাহা হইলে সেই যে তোমার মহত্ব সেই মহত্বই প্রশস্ত মহত্ব।

জাফর খাঁ বা দরাফ খাঁর স্থাপিত কুঠার পূর্ব্ব দিকের প্রথম কক্ষের গবাক্ষের বহির্ভাগে স্থাপিত। এই কুঠারকে লোকে গাজীর কুড়ুল বলে।

* ঠিক যেন—

"Another Venus breathing fresh and fair
A goddess sparkling in her wavy dress."

এই কুড়ুল উপলক্ষে এপ্রদেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। লোকে বলে "যেন গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না"।

ত্রিবেণীতে পূর্ব্বে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। গত শতাব্দীর উজ্জ্বল রত্ন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বংশবাটীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইঁহার অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ছিল। একদা ত্রিবেণীর ঘাটে জগন্নাথ আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। সেই সময় ভিন্নভাষী দুই জন ইউরোপীয় গোরার দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরকে গালি দিয়াছিল। আদালতে নালিশ হইলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তিনি উভয়ের পর পর কথা গুলি—ভাষা না জানিয়াও কেবল স্মরণশক্তির বলে—যথাযথ বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন। জজের ও লোকের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে উত্তরায়ণ দিনে ত্রিবেণীতে একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলায় নানাস্থান হইতে বহুলোকের সমাগম হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বংশবাটী।

বংশবাটী* বা বাঁশবেড়িয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সরকার সপ্তগ্রামের অধীন একটী ক্ষুদ্র মৌজা ছিল। রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় পাটুলী†

* বংশবাটী প্রভৃতয়ো হুগলী মাপ্য বর্ত্ততে।
খলাপি তটিনী নিত্যং বহতে বালুকাস্তরে॥
এখানে খলাপি নদী কোথায়?

† গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে পাটলিগ্রাম বাসিনাম।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ॥

মগধরাজ বৈজলের সভাপণ্ডিত কবিরাম প্রণীত দিগ্বিজয়প্রকাশে "কিলকিলা" বিবরণ দ্রষ্টব্য।

"পাটুলীতে দত্ত উদয় সভা শোভা করে।" উত্তরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলপঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

হইতে বাঁশবেড়িয়ায় রাজধানী স্থাপন করায় ইহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। ১০ই সফর ১০৯০ হিজরী অব্দে (১৬৭৩ খৃঃ অঃ) রামেশ্বর রায় বাদসাহ আওরঙ্গজেবের নিকট এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে 'রাজা মহাশয়' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। এই সনন্দের সঙ্গে বাদসাহ তাঁহাকে পঞ্চপার্চা (পঞ্চ পোষাক) খিলাত দিয়াছিলেন এবং বাসের জন্য বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি জায়গীর দিয়াছিলেন। রাজা রামেশ্বর রাজপ্রাসাদ পরীখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন। পরীখার পরিধি প্রায় এক মাইল। ধনুর্ব্বাণ ঢাল তরবারি ও বন্দুক লইয়া পদাতিগণ এই গড়ের প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। মাঝে মাঝে কয়েকটী কামানও রাখা হইয়াছিল। বর্গীরা ত্রিবেণী লুট করিতে আসিলে লোকেরা এই গড়ের ভিতর আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিত*। একবার বর্গীরা গড়বাটী অবরোধ করিয়াছিল। রাজা রামেশ্বরের পুত্র রাজা রঘুদেব নৈশ যুদ্ধে মারহাট্টাদিগকে পরাস্ত ও দুরীভূত করিয়া দেন। রাজা রঘুদেব পূর্ব্ব পরীখার সংস্কার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে আর একটী নূতন পরীখা খনন করাইয়াছিলেন। রাজা রঘুদেব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগকে এক লক্ষ বিঘা ভূমি ব্রহ্মত্বর দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। রাজা রামেশ্বর নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থ ও বৈদ্য এবং বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে আনাইয়া বংশবাটীতে বাস করাইয়াছিলেন। এক এক পল্লীতে এক এক জাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কাশী হইতে পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাগীশকে আনাইয়া রাজা রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রাম মধ্যে ৪০।৪৫টী টোল স্থাপন করিয়া কাশী ও মিথিলা হইতে অধ্যাপক আনাইয়া ছাত্রদিগের স্মৃতি শ্রুতি বেদ বৈদান্ত ন্যায় সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। টোলের সমস্ত ব্যয় রাজসংসার হইতে দেওয়া হইত। তখনও ভাটপাড়ায়

* It had a fort mounted with four pieces of cannon and surrounded by a trench; when the Marhattas came near Tribeni, the people fled hither for protection. Vide Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol III and Gazetteer of India Vol I.

পণ্ডিত বংশের বাস হয় নাই। ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ নারায়ণ ঠাকুর নবাব আলীবর্দ্দীর সমসাময়িক*।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঁশবেড়িয়ায় ২৫। ২৬টী চতুষ্পাঠী ছিল তন্মধ্যে পঁচিশ জন অধ্যাপকের নাম আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ১ রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন স্মৃতি-শাস্ত্র, ২ রামসুন্দর তর্কসিদ্ধান্ত ঐ, ৩ মাধব ন্যায়লঙ্কার, ৪ শিবরাম ভট্টাচার্য্য, ৫ কমল ন্যায়বাচস্পতি, ৬ পাটুলীর শিরোমণি, ৭ রামরাম ভট্টাচার্য্য†, ৮ গণেশ ন্যায়বাগীশ, ৯ ব্রহ্মাণ্ডদেব ন্যায়রত্ন, ১০ ভৈরব তর্কবাচস্পতি-ন্যায়শাস্ত্র, ১১ আত্মারাম ন্যায়লঙ্কার, ১২ ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন-ন্যায়শাস্ত্র, ঢাকা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের অনেক ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ১৩ বাবুরাম চূড়ামণি-স্মৃতিশাস্ত্র, ১৪ নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ, ১৫ ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ, ১৬ কৈলাস সিদ্ধান্ত বাগীশ-ন্যায়শাস্ত্র, ১৭ রামহরি তর্কবাগীশ ঐ, ১৮ মদন তর্করত্ন-ব্যাকরণ, ১৯ হরনাথ তর্কসরস্বতী, ২০ হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য-স্মৃতি, ২১ রাধানাথ শিরোমণি, ২২ দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত-ন্যায়শাস্ত্রে প্রধান পণ্ডিত। ছাত্র সংখ্যা ৩০। ৩২। অধিকাংশ ছাত্র বিক্রমপুর ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের। ছাত্রেরা ১৪। ১৫ বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত। ২৩ রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, ২৪ রামচরণ ন্যায়লঙ্কার-ন্যায়, সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ২৫ কৃপারাম তর্কবাগীশ-সমগ্র স্মৃতি শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ও পরস্পর মীমাংসক ইঁহাদের উপর আর কেহ ছিল না‡। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত মহেন্দ্র

* খ্যাতনামা লেখক, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ,র "শূদ্রমনি রাজা নৃসিংহ দেব রায় মহাশয়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল। † "বংশবাট্যাং রামরামঃ ত্রিবেণ্যাং রঘুরাঘবঃ।"

‡ পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর
যে দিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এই স্থলে জন্মে ছিল শ্রীধর রতন,
কথক কুলের কেতু কাঞ্চন বরণ;
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়।
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়॥

দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্য দ্রষ্টব্য।

নাথ তর্কপঞ্চানন (বাঁশবেড়িয়া রাজবাটীর সভাপণ্ডিত), তারকনাথ তত্ত্বরত্ন (বর্দ্ধমান রাজবাটীর সভাপণ্ডিত), মহেশচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (বাঁশবেড়িয়া রাজপুরোহিত) প্রভৃতির চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পাঠী গুলিও লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে কেবল পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চাননের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার ও নৃসিংহ সরস্বতীর চতুষ্পাঠী বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে লোকে শাস্ত্রালাপ সঙ্গীত নাটক কাব্য প্রভৃতির আলোচনা লইয়া আনন্দে দিন কাটাইত। কথক শিরোমণি শ্রীধর কথকতায় ও সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করিতেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোকের যে সুখ ও শান্তি ছিল এখন তাহা কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। কাল ম্যালেরিয়া জ্বরে বংশবাটী জর্জ্জরিত। আদম সুমারীতে প্রকাশ, প্রতি দশ বৎসর অন্তর বংশবাটীর এক সহস্র হিসাবে অধিবাসী সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

বংশবাটী বিদ্যোন্নতির জন্য বিখ্যাত। সংস্কৃত বিদ্যার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী বিদ্যার অভ্যুদয় হইয়াছে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভা বংশবাটীতে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে দুই শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করায় বিদ্যালয়টী উঠিয়া যায়*।

* The Tatwabodhini Sabha formerly had a flourishing English School, containing two hundred pupils at Bansberia which was established in 1843; but some of the boys embracing Vedantism, their parents became alarmed lest they should forsake Puranism and withdrew many of them. The members of the Sabha thought that *Bansberia being an eminent seat of Hindu learning* presented a more favourable opening for a school than Calcutta but Puranism and Vedantism being antagonistic, the success of the school was retarded. —Vide Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol III p. 303.

অল্প দিন পরে সুবিখ্যাত মিশনরি ডাক্তার ডাফ্ বাঁশবেড়িয়া মিশনরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার বাঙ্গলাতেই স্কুল হইত। ডাফ্ সাহেব একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাবে ইষ্টক নির্ম্মিত বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে না পারায় চিন্তাকুল ছিলেন। সিন্ধু প্রদেশ জয় করিয়া সেনাপতি সার্ জেম্‌স আউটর‍্যাম (Sir James Outram) প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা লুটের অংশ রূপে প্রাপ্ত হন। এই টাকা তিনি স্বয়ং গ্রহন না করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয় করেন। ইহার মধ্য হইতে ছয় সহস্র মুদ্রা তিনি ডাফ সাহেবের নিকট বংশবাটী মিশন স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ জন্য প্রেরণ করেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইলে তিনি এক দিন এখানে অবস্থান করিয়া যান*। এই বিদ্যালয়টি পঞ্চবিংশ বর্ষকাল স্থায়ী হয়। পরে অনেক ছাত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করায় স্কুলটি উঠিয়া যায় ও স্কুলবাটী বিক্রীত হয়। বিগত দশ বৎসর কাল বাঁশবেড়িয়া রাজ কর্ত্তৃক একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ছাত্র সংখ্যা ৮০।

বাঙ্গালী পাদরীর অধীনে সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টান গির্জ্জা বাঁশবেড়িয়াতেই স্থাপিত হয়। প্রথম পাদরীর নাম তারাচাঁদ। ইনি ইংরাজী ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলী জেলায় নীলের চাষ আরম্ভ হয়। বাঁশবেড়িয়াতেও একটী বড় নীলকুঠী ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বাঁশবেড়িয়ার কুঠীয়াল ছিলেন বার্চ্চ সাহেব (J. B. Birch)। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কুঠীয়ালের নাম টেম্পল্ (Temple)। ইনি ১৭০০ বিঘা চরভূমী প্রতি বিঘা বার্ষিক এক টাকা খাজনায় জমা লন। ইহার মধ্যে ১৫২৩ বিঘা ভূমীতে রীতিমত নীল

* The resting-place in Westminister Abbey and the equestrian statues by Foley on the Thames Embankment and fronting the Calcutta Clubs commemorate his victories in Persia and the relief of Lucknow. But let not the Sindh blood-money and Duff's Bansberia school be forgotten, though recorded not on living marble or enduring brass.

Vide Dr. Smith's Life of Dr, Duff, Vol II. p. 50

বপন হইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কুঠীয়াল ছিলেন, ক্রাটেনডেন্, ম্যাক্‌কিলপ্ কোম্পানী (Cruttenden, Mackillop & Co.)।

বাঁশবেড়িয়া বাসুদেব মন্দির রাজা রামেশ্বরের স্থাপিত। ১৬০১ শকাব্দে (১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে মন্দিরের গাত্রে একটী শ্লোক অদ্যাপি খোদিত রহিয়াছে।

মহী ব্যোমাঙ্গ শীতাংশুগণিতেশকবৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরং॥ ১৬০১।

বাঁশবেড়িয়া সয়ম্ভবা মন্দির ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক খানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অঙ্কিত আছে:—

আশা চলেন্দু সম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ সয়ম্ভবা।
রেজেতৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেব দত্ততঃ॥

সুবিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির রাজা নৃসিংহদেবের পত্নী প্রসিদ্ধা রাণী শঙ্করী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন।' মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে:—

শাকাব্দে রসবহ্নি মৈত্র গণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং॥
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥
শকাব্দা ১৭৩৬ *।

হংসেশ্বরী মন্দির সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"There is a famous temple with 13 pinnacles, and as many images of Siva dedicated to the Goddess Hanseswari. It was built by Rani Sunkari Dassi the wife of Raja Nrisinha Deb Rai, a Zamindar of the place, at a cost of a lakh of rupees, (£ 10,000) and

* Vide List of Ancient Monuments of Bengal, 1896. Calcutta Review Vols. XCVI, CXI and Hunter's Gazetteer of India and Statistical Account of Bengal, Thornton's Gazetteer. &c.

was formerly protected by an armed fort, armed with four cannons and surrounded by a trench, as a defence against the Mahrattas. The temple occupies 15 acres of ground. On the occasion of the festival of the Goddess to whom the temple is dedicated, the Rani used to invite Pundits from all the neighbouring countries."

নবম পরিচ্ছেদ।

সপ্তগ্রামের অধঃপতন।

হুগলীর অবরোধ ও পতনের পর মোগলগণ হুগলী অধিকার করিলেন। অধিকাংশ পর্ত্তুগীজ শৃঙ্খলাবস্থায় আগরায় প্রেরিত হইল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা মোগলগণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল। সরস্বতী নদীর অবস্থা ক্রমে এরূপ শোচনীয় হইল যে মোগলগণ সপ্তগ্রাম বন্দর পরিত্যাগ করিয়া হুগলীকে রাজকীয় বন্দরে পরিণত করিতে বাধ্য হইলেন। যে সপ্তগ্রাম রোমকদিগের সৌভাগ্যরবির মধ্যাহ্ন কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত জগৎবিখ্যাত বন্দর ছিল, আজ তাহা চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হইল।

হরিদ্বার হইতে দেবী সুরধুনী যাত্রা করিলে তৎসমভিব্যাহারে সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ* বঙ্গে শুভাগমন করিয়া সপ্তগ্রামে আম্রকাননে বা সরস্বতী তীরে অবস্থান করিয়া দেবীর

* মহানাদে বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটী সরোবর আছে। এই বশিষ্ঠ গঙ্গা বশিষ্ঠের স্থাপিত। ইহাতে দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া ইহার জলের সঞ্জীবনী শক্তি ছিল—মৃতব্যক্তি প্রাণ পাইত। কথিত আছে ফকীরডাঙ্গা নিবাসী রাজমল্লিক নামক জনৈক মুসলমান ফকীর বশিষ্ঠ গঙ্গায় গোমাংস নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করায় বশিষ্ঠ গঙ্গার সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হয়। গোমাংস নিক্ষেপ কালে বশিষ্ঠ গঙ্গা হইতে সূচীভেদ্য ধূমস্তম্ভ উদ্গত, "রাম রাম" শব্দে দিক্ পূর্ণ, এবং ঘন ঘন ভূকম্প হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ ১৩০৮ চৈত্রের "পূর্ণিমা"য় দ্রষ্টব্য।

আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবদুর্ল্লভ দেবী সুরধুনীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা শঙ্খ ধ্বনি সহ সম্বর্দ্ধনা করিয়া দেবীর প্রীতি সাধন করেন*।

আজ সেই পবিত্র ভূমির নাম পর্য্যন্ত অনেকে অবগত নহেন।

হুগলীতে বন্দর স্থাপিত হইলেও সপ্তগ্রামে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। বানিজ্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রাম মহানগরী সামান্য পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিল। অবশেষে বিচারালয় এবং অন্যান্য সাধারণ কার্য্যালয় হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হইল। সপ্তগ্রাম এইবার নগণ্য হইয়া পড়িল। হুগলীতে এক জন ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার নামে সাহসু অধীন থাকায় সকল কার্য্যই স্বাধীন ভাবে পরিচালিত করিতেন। নবাব এ[illegible]াদ কুলী খাঁর আমলে হুগলীর ফৌজদারের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে [illegible] করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে ফৌজদারের বেতন অধিক ছিল কিন্তু পরিশেষে বাৎসরিক বত্রিশ সহস্র মুদ্রা বেতন নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

হুগলীতে ইংরাজ বণিক।

যে সময়ে পর্ত্তুগীজেরা মোগলদিগের সহিত বঙ্গদেশে প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিল সেই অবসরে ইংরাজদিগের অভ্যুদয় হয়। টাকার গাছ দেখিতে ও স্বর্ণলোভে পর্ত্তুগীজদের পরই ইংরাজ আগমন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দূত হকিন্স (Hawkins) আগরায় আগমন করিয়া দিল্লীশ্বর জাঁহাগীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জাঁহাগীর তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হন। সম্রাটের অনুগ্রহলাভ করিয়া তিনি তথা ১৬১১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া তৎপরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। পর বৎসর ইংরাজেরা সৌরাষ্ট্র বা সুরাটে প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। হকিন্সের পর ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সার্ টমাস রো (Sir Thomas Roe) প্রথম পদার্পণ করেন। পর বৎসরের প্রথমেই তিনি জাঁহাগীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট তাঁহাকে

* তত্র সপ্তর্ষয়ো বীক্ষ্য গঙ্গাং দেব সুদুর্লভাং।
অভ্যর্চ্চ বীক্ষ্য সানন্দা শঙ্খ শব্দেন নারদা॥ ইত্যাদি।
মহাভাগবত পুরাণ।

এক জন ক্ষমতাবান নরপতির দূত স্বরূপ সম্বর্দ্ধনা করেন। সার্ টমাস্ রো অল্প দিনের মধ্যেই সম্রাটের প্রকৃতি বুঝিয়া লইলেন। সম্রাট সাম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁর হস্তের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। নূরজাহাঁ তাঁহার নাসিকায় রজ্জু দিয়া যে দিকে টানিতেন তিনি সেই দিকেই ফিরিতেন। প্রকৃত পক্ষে নূরজাহাঁই দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সার্ টমাস্ রো দেখিলেন যে তাঁহার স্বদেশীয় নরপতি প্রথম জেম্‌সের ন্যায় জাঁহাগীরের দ্বারা কোনও উপকারের আশা নাই। এক জন মিনার্ভার দাস আর এক জন ভিনাসের সেবক। প্রথম জেম্‌সকে লোকে পণ্ডিত মূর্খ বলিত। (the wisest fool in Europe) আর জাঁহাগীর অতি মদ্যপায়ী ছিলেন। ভারতের ন্যায় পারস্য রাজ্যেও এই সময় ইংরাজ দূত (the Shirleys) প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে প্রাচ্য দেশ সমূহে ইংরাজ ব্যবসা বানিজ্যের অধিকার লাভের জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। পর্ত্তুগীজদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের অভ্যুদয় হইল। এতকাল পর্য্যন্ত ইংরাজেরা সুযোগ অভাবে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট তনয়ার কঠিন পীড়া হইল। কবিরাজী, হেকিমী এবং অন্যবিধ চিকিৎসা ব্যর্থ হইল। তখন শোকার্ত্ত সম্রাট হতাশ হইয়া রাজধানীতে একজন ডাক্তার পাঠাইবার জন্য সুরাটে ইংরাজ প্রতিনিধিকে পত্র লিখিলেন। লণ্ডন কোম্পানীর "হোপ্‌ওয়েল" জাহাজের ডাক্তার গেব্রিয়েল বাউটান্ (Gabriel Boughton) উপস্থিত প্রাপ্য চিকিৎসকদের মধ্যে ভাল বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাকে সত্বর সম্রাট সমীপে প্রেরণ করা হইল। বাউটনের প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হইলেন। তাঁহার চিকিৎসার গুণে অল্প দিনের মধ্যেই সম্রাট তনয়া আরোগ্য লাভ করিলেন।

সম্রাট তাঁহার উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট পুরস্কার প্রার্থনা করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। ইচ্ছা করিলে বাউটান্ চির জীবনের মত নিজে ধন সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিতেন কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক বাউটান্ স্বদেশের জন্য স্বীয় স্বার্থ বলিদান করিলেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন যে বঙ্গদেশে ইংরাজদিগকে কুঠী স্থাপন ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেওয়া হউক। কৃতজ্ঞ সম্রাট প্রার্থনা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা মঞ্জুর

করিলেন। বালেশ্বরের নিকট পিপ্‌লী বানিজ্য কুঠী স্থাপন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তথা প্রথম ইংরাজ জাহাজ নঙ্গর করিল। রাজকীয় ফার্ম্মান্ সাহায্যে বাউটান্ পণ্যদ্রব্য বিনাক্লেশে ক্রয় বিক্রয় করিলেন। এই সময়ে আজিম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। এ সময় ইংরাজ কোম্পানীকে লোকে "জন্ কোম্পানী" বলিত। তাঁহারা পিপ্‌লী ভিন্ন অপর কোনও বন্দরে জাহাজ লইয়া যাইতে পারিতেন না। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একই ভাবে কাজকর্ম্ম চলিতেছিল। ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাউটান্ রাজমহলে* বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সাহ সুজার পরিবারে আশ্চর্য্য চিকিৎসা কৌশল প্রদর্শন করিয়া হুগলীতে একটী কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই অধিকার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই পর্ত্তুগীজদের স্থানে ইংরাজেরা আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা হুগলীতে কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের জাহাজ হুগলী পর্য্যন্ত আসিতে পাইত না। গঙ্গার মুখে জাহাজ নঙ্গর করিত, পণ্য দ্রব্য নৌকা করিয়া হুগলীতে আনিতে হইত। সাহ সুজা বিংশ বর্ষকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন। তাঁহার শাসন কালে বঙ্গের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল। য়ুরোপীয় বাণিজ্য তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সুজার শোচনীয় পরিণামের কথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সুজার পর মির জুম্‌লা বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হন। মির জুম্‌লার পরিচয় বোধ হয় দিতে হইবে না। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মির্ জুম্‌লা পুনরায় ঢাকায় বঙ্গদেশের রাজধানী সংস্থাপন করেন এবং বহু যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি রাজধানীর পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মির জুম্‌লার পর জগৎ বিখ্যাত নুরজাহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ

* এক সময়ে রাজমহল মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। গৌড়ের ন্যায় ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে সাহ সুজার প্রাসাদের ভগ্নাংশ উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন তন্মধ্যে তিন বৎসর তিনি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

সায়েস্তা খাঁর রাজ্যের প্রথম আমলে য়ুরোপীয় বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর বাঙ্গালার কুঠীগুলি মান্দ্রাজের অধীন করা হয় এবং বালেশ্বরে ও কাশীমবাজারে কুঠী নির্ম্মিত হয়। ইংরাজদের প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষের নাম মার্শাল। ইনি ইংরাজদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইংরাজেরা হুগলীতে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তথা জাহাজ লইয়া আসিবার অনুমতি পান নাই। ইহাতে অনেক সময় বিশেষ অসুবিধা হইত। এজন্য তাঁহারা সায়েস্তা খাঁর নিকট হুগলীতে জাহাজ লইয়া আসিবার প্রার্থনা করিলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গায় রীতিমত জলকাণ্ডারী নিযুক্ত হয়। সায়েস্তা খাঁর নিকট কেবল ইংরাজেরাই উপকৃত হইয়াছিলেন এমন নহে অপর তিনটী য়ুরোপীয় জাতিও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ওলন্দাজেরা (Dutch) শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতেছিল। তাহারা ইতিপূর্ব্বে সিংহল ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সুবিধা করিতে পারে নাই। সায়েস্তা খাঁর অনুগ্রহে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা হুগলীতে কুঠী নির্ম্মানের অনুমতি পাইয়াছিল। কিছুকাল হুগলীতে থাকিয়া তাহারা চুঁচুড়ায় গিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করে। পর বৎসর ফরাসীরা চন্দননগরে ও দিনেমারেরা (Danes) শ্রীরামপুরে কুঠী নির্ম্মাণ ও বসবাস আরম্ভ করে*।

* It was during the Government of Shaista Khan, that is to say about the year 1676 that the French and the Danes established themselves in Bengal. The precise period of the introduction of the Dutch is not recorded; but the agents of these nations prudently obtained ground, on which to erect their factories, at some distance below Hooghly, where the present towns of Chinsurah, Chandernagore and Serampore now

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের শাসন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন বটে কিন্তু তিনি দিল্লীর দরবারে য়ুরোপীয়দিগের কল্যাণ মানসে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। প্রত্যেক শাসনকর্ত্তা নব নিয়োজিত হইলেই ইংরাজদিগকে নূতন করিয়া ফার্ম্মান লইতে হইত। ফার্ম্মান পাওয়া অল্প আয়াস সাধ্য ছিল না। মোগল কর্ম্মচারী ও শাসনকর্ত্তাদিগকে অর্থ দ্বারা মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া ফার্ম্মান লইতে হইত। নবাব সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিবার সময়, ইংরাজ কুঠীর কর্ত্তা, তাঁহার সমভিব্যাহারে দিল্লীতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। যাহাতে স্থায়ী ভাবে ফার্ম্মান পাওয়া যায় দূত প্রেরণের তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। বহু যত্ন ও চেষ্টায় এবং নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুগ্রহে ইংরাজেরা দিল্লী দরবার হইতে স্থায়ী ফার্ম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইলেন*। সে সময় ফরাসী চিকিৎসক খ্যাতনামা ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার দিল্লীর রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

stand. The English agent on the contrary, built his factory in the middle of the town of Hooghly, which was the cause of frequent dispute with the inhabitants, and terminated by their being expelled the country.

Vide Stewart's History of Bengal p. 302.

* ফার্ম্মান খানির ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ :—

In the name of God. Amen.

To all present and future rulers in Surat, that remain in hopes of the Emperor's favour. Be it known that at this happy birth of time it is agreed, of the English nation, besides their usual custom of 2 per cent for their goods, more 1½ jezia, or poll-money, shall be taken.

Wherefore it is commanded, that in the said place, from the first day of Shuval, in the 23rd year of our reign, of the said people, 3 and a half rupees per cent, of all their goods on account of custom and poll-

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই তারিখে ফার্ম্মান সহ কোম্পানীর দূত হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই শুভ অনুগ্রহ লাভের জন্য হুগলীতে আনন্দোৎসব করা স্থিরীকৃত হইল। এই উপলক্ষে তিন শত তোপ ধ্বনি এবং নানাবিধ শুভানুষ্ঠান করা হইল। তাৎকালিক প্রথা অনুসারে রাজকর্ম্মচারীগণ নানা আবওয়াব ধরিয়া কোম্পানীর নিকট নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত বাজে আদায় করিত। এই ফার্ম্মান লাভে সে সকল বন্দ হইল। ফার্ম্মানের মর্ম্ম এই যে ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের উপর সর্ব্বসমেত শত করা ৩॥০ হিসাবে শুল্ক আদায় হইবে তদতিরিক্ত কেহ আদায় করিতে পারিবে না। এই সময় বালেশ্বর ও হুগলী ভিন্ন কাশীমবাজার, পাটনা মালদহ ও ঢাকায় কোম্পানীর শাখা কুঠী ছিল। এই সকল কুঠী হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি রপ্তানি হইত। এক বৎসরে এক সহস্র টন্ সোড়া ও এক লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ড স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বানিজ্য অতি বিস্তৃত ও বিশেষ লাভজনক হওয়ায় এই ফার্ম্মান প্রাপ্তির পর কোর্ট অব ডিরেক্টারদের অনুমত্যানুসারে মান্দ্রাজের কর্তৃত্ব হইতে বঙ্গদেশকে পৃথক করা হইল। ডিরেক্টার হজেস্ সাহেব বঙ্গের সমুদয় কুঠীর ও কোম্পানীর সম্পত্তির প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন এবং হুগলী তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র স্থির হইল। তাঁহার বর্ত্তমান পদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য মান্দ্রাজ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ হইতে বিংশতি জন য়ুরোপীয় সৈন্য তাঁহার দেহ রক্ষক রূপে হুগলীতে প্রেরিত হইল। বঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর এই প্রথম সেনা স্থাপন ও ইংরাজ শক্তির প্রথম বীজ বপন হইল। এই সময়ের পূর্ব্বে সকল বঙ্গদেশাভিমুখী জাহাজ

money, be taken for the future. And at all other places, upon this account let no one hinder or molest them for custom, rawdarree, peashins, phirmaish, and other matters by the Emperor's Court forbidden, nor to make any demands in these particulars: observe. Written on the 23rd day of the month Saffer, in the year twenty-three.

Vide "East India Charters."

দাক্ষ্রাজ হইয়া আদেশ সহ বঙ্গদেশে আসিত। এখন হইতে একেবারে বঙ্গদেশে আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথম যে জাহাজ খানি গঙ্গায় প্রবেশ করে তাহাতে ত্রিশটী কামান ছিল।

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে নাবাব সায়েস্তা খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। সায়েস্তা খাঁর সাহায্যেই ইউরোপীয় বণিকগণের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরাজ কোম্পানীও তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোম্পানী তাঁহার উপর বরাবরই খড়্গ হস্ত ছিলেন। কোম্পানীর বাণিজ্য অতিশয় লাভজনক হওয়ায় অনেক ইংরাজ ব্যবসায়ী গোপন ভাবে লাভের আশায় ব্যবসা আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ইহাদের কোনও সংশ্রব ছিল না। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ্ যে চার্টার বা ক্ষমতা-পত্র তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে কোম্পানীর এজেণ্ট ভিন্ন অপর কেহ ব্যবসা করিতে পারিবে না। এই সকল ব্যবসায়ীদিগকে ইণ্টারলোপার্ (Interlopers) কহিত। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাদের ব্যবসা বন্দ করিতে না পারায় কোর্ট অব ডিরেক্টারেরা স্থির করিলেন যে ইহাদিগের জাহাজ কোনও মতেই গঙ্গায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। এজন্য গঙ্গার মুখে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা নবাবের নিকট দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি চাহিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ দেখিলেন যে এরূপ আদেশ প্রদান করিলে ইংরাজ কোম্পানীকে নদীর উপর অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইবে। ইহা সমগ্র রাজ্যের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নহে। সেই সময়ে বেহার অঞ্চলে রাজনৈতিক গোলযোগ চলিতেছিল। পাটনার ইংরাজ কোম্পানীর এজেণ্ট এই গোলযোগে যোগদান করায় নবাবের আদেশে কারারুদ্ধ হন। এই ঘটনায় নবাব ইংরাজদিগের উপর অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের সমুদায় কুঠী বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলেন। এই প্রকারে ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ বিশৃঙ্খল ঘটিল এবং অর্দ্ধেকেরও কম পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য পোত সকল প্রত্যাগমন করিল। ওলন্দাজেরা এই সুযোগে নিজেদের ব্যবসার সুবিধা করিয়া লইল ও চুঁচুড়ায় দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে দুর্গ নির্ম্মাণ শেষ হয়।

ইংরাজ কোম্পানী দেখিলেন যে হয় তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা বল প্রকাশে স্বীয় সত্ত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শেষ সঙ্কল্পই তাঁহারা স্থিরতর করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশীয় নরপতি দ্বিতীয় জেম্‌সের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ছয় শত সৈন্য সহ দশ খানি রণতরি এড্‌মিরাল্ নিকোলসনের অধীনে বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। বঙ্গোপসাগরে এক তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইয়া জাহাজ গুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়ায় কেবল কয়েক খানি রণতরী গঙ্গাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ হইতে হুগলীতে চারিশত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া নবাব অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন এমন কি তিনি সন্ধি স্থাপন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। যখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল তখন একটী দুর্ঘটনায় সমুদয় পণ্ড হইল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর হুগলীর বাজারে তিন জন ইংরাজ সৈন্য মাংস খরিদ করিতে গিয়া নবাবের লোকদের সহিত বিবাদ করায় প্রহারিত হন। এই সামান্য ঘটনা তুমুল কাণ্ডে পরিণত হইল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ সমবেত হইয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষেই অনেক সৈন্য হত আহত হইল। যুদ্ধ কালে নৌসেনাপতি নিকলসন্ হুগলী সহরের উপর কামান বর্ষণ করিতেছিলেন, তাহাতে পঞ্চশত গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। এমন কি কোম্পানীর নিজের গুদাম ঘর পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইল। ইহার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ছিল, সমুদায় নষ্ট হইল। হুগলীর ফৌজদার আবদুল গনি এই ব্যাপারে অতিশয় ভীত হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদের সোড়া জাহাজে বোঝাই দিবার সর্ত্তে যুদ্ধ বন্ধ রাখিলেন। সম্রাটের নিকট দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইংরাজেরা অবাধে ব্যবসা করিবার অধিকার পাইলেন।

এই ঘটনা নবাবের কর্ণগোচর হইবা মাত্র তিনি পাটনা, মালদহ, কাশীমবাজার ও ঢাকার কোম্পানীর শাখা কুঠী গুলি বাজেয়াপ্ত ও কুঠীয়াল দিগকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। হুগলীতে দ্বাবিংশ জন জমাদার এবং বহু পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রেরিত হইল। এই সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করা

হইল। অর্দ্ধেক সৈন্য হুগলীতে রহিল, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সৈন্য ইংরাজদিগের পলায়নের পথ রোধ করিবার জন্য কতক তেলিনীপাড়ার নিকট এবং কতক টানা দুর্গে প্রেরণ করা হয়। হুগলীর ইংরাজ বণিকগণ তথা অবস্থান করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া হুগলী ত্যাগ করা স্থির করিলেন। সে সময় হুগলী ঘোলঘাট কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণক্। চার্ণকের আদেশে হুগলী কুঠীর যাবদীয় সম্পত্তি সহ বণিক এবং সৈন্যগণ জাহাজে রওনা হইলেন। চার্ণক একখানি বজরায় যাত্রা করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ কোম্পানীর জাহাজ আটক করিবার জন্য তেলিনীপাড়ার নিকট গঙ্গার উপর উভয় পার্শ্ব হইতে কতকগুলি মোটা লৌহ শৃঙ্খল বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিল। জব চার্ণক এই শৃঙ্খল গুলি ভগ্ন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন*। নদীর উভয় পার্শ্ব হইতে অজস্র গুলি গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। কোম্পানীর সৈন্যগণ রণতরি হইতে গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হুগলীর ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে সুতানুটী নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়া নঙ্গর করিলেন। জব চার্ণক হুগলী ত্যাগের এক সপ্তাহ পরে নবাবের তিন জন প্রধান কর্ম্মচারী হুগলীতে আগমন করেন। চার্ণক সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য পুনরায় হুগলীতে গমন করেন। সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা পূর্ব্ব সত্ত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সন্ধি স্থাপনে নবাবের গুঢ় অভিসন্ধি ছিল। যেমন করিয়া হউক কিছু সময় লইয়া ইংরাজদিগকে একেবারে সমূলে বিনাশ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি হুগলীতে বহু সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সকল দেখিয়া চার্ণক সুতানুটী পরিত্যাগ করিয়া হিজলী গমন করিলেন। হিজলী যাইবার পথে তিনি টানা দুর্গ জয় ও নবাবের কতকগুলি জাহাজ হস্তগত করেন। হিজলী বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট স্থান, আদৌ বাস যোগ্য নহে। হিজলী অস্বাস্থ্যকর নিম্ন জলাভূমি, লম্বা লম্বা ঘাসে পরিপূর্ণ ছিল, পানীয় জল বিন্দুমাত্র পাইবার যো ছিল না। স্থান নির্ব্বাচনটী অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। এই জঘন্য স্থানে চার্ণক শত্রুহস্ত হইতে আত্ম রক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিন মাসের

* Vide Historical Fragments of the Mogul Empire by Robert Orme, p 281-85.

মধ্যে অর্দ্ধেক সৈন্য জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সৈন্য হাঁসপাতালে প্রেরণের উপযোগী অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছিল কিন্তু ভাগ্য দেবী আবার সুপ্রসন্না হইলেন। সুরাট কুঠীর অধ্যক্ষেরা বল প্রকাশে স্বীয় সত্ব রক্ষণে যত্নবান হইলেন। বঙ্গদেশে গোলযোগ আরম্ভ হইবা মাত্র তাঁহারা সুরাটের কুঠী বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সমুদ্র গামী মুসলমান জাহাজ বল পূর্ব্বক অধিকার করিতে লাগিলেন। সুরাট বন্দর হইতে ধার্ম্মিক মুসলমানগণ মক্কাতীর্থে যাইবার জন্য জাহাজে রওনা হইত। ইংরাজেরা বন্দর ও সমুদ্রের উপর আধিপত্য করায় মক্কা গমনের পথ এক রূপ রুদ্ধ হইল। ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাঘাত হওয়ায় ধার্ম্মিক সম্রাট ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ইংরাজদের সহিত সদ্ভাব পুনঃস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

দিল্লীর সম্রাট এই সময় দাক্ষিণাত্য অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। জব চার্ণক, বেঞ্জা গঙ্গারু, বেঞ্জা বসমান্ এবং ডাক্তার চন্দ্রশেখরকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিবার জন্য সম্রাট সমীপে গমন করেন। চার্ণক প্রতি পদ বিক্ষেপে সেলাম কুর্ণীস করিতে করিতে এবং দুই পদ অগ্রসর হইয়া এক পদ পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া যোড় হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার উকীল সম্রাটকে বুঝাইয়া দিলেন যে সামান্য বিবাদ উপলক্ষ করিয়া হুগলীর ফৌজদার এবং বঙ্গদেশের নবাব তাঁহাদিগকে হিজলীতে বিতাড়িত করিয়াছেন। সম্রাট বিচার করিয়া যেরূপ আদেশ দিবেন তাঁহারা তাহাই শিরোধার্য্য করিবেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে চার্ণক সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্য করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকনে সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিলেন। সম্রাটের আদেশ লইয়া চার্ণক এক যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া আসিলেন। সম্রাট আনন্দের সহিত চার্ণককে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন এবং কলিকাতায় কুঠী নির্ম্মাণ করিবার পরওয়ানা দিলেন*।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইংরাজদের সহিত রীতিমত সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজেরা সাম্রাজ্যের নানাস্থানে কুঠী নির্ম্মাণের

* Vide Historical Fragments of the Mogul Empire by Robert Orme.

অধিকার পাইলেন। উলুবেড়িয়ায় অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ প্রভৃতি এবং জাহাজ রক্ষা এবং সংস্কার করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। চার্ণক নবাবের যে সকল জাহাজ আটক করিয়াছিলেন তাহা ফেরত দিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধি সংস্থাপনের পর ইংরাজেরা উলুবেড়িয়ায় আগমন করেন। তথা কিছু কাল অবস্থানের পর সুতানুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বঙ্গের নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইংরাজদিগকে হুগলীতে পুনরাগমন করিবার আজ্ঞা দিলেন এবং সুতানুটীতে ইষ্টক কিম্বা প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে ইংরাজ-দিগের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং চার্ণকের নিকট হইতে বহু অর্থ চাহিয়াছিলেন। চার্ণকের নিকট সে সময় তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য যথেষ্ট সৈন্য বা তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য প্রচুর অর্থ ছিল না। চার্ণক ঢাকায় নবাবের নিকট দুই জন দূত প্রেরণ করিলেন। যাহাতে কোম্পানী নির্ব্বিবাদে সুতানুটীতে অবস্থান করিতে পারেন দূত প্রেরণের তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। বহু কষ্টে দূতেরা অভিপ্সিত কার্য্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়া আসিতেছিলেন এমন সময় সহসা কোম্পানীর কর্ম্মক্ষেত্র গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল। হুগলীর যুদ্ধের বিবরণ ও ইংরাজদের হিজলীতে অবস্থানের সংবাদ কোর্ট অব ডিরেক্টারদের নিকট পৌঁছিবা মাত্র তাঁহারা কাপ্তেন হীথের অধীনে একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। আদেশ দিলেন যে হয় অভিপ্সীত দুর্গ ও টঙ্কশালা নির্ম্মাণ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে নতুবা বঙ্গের সমুদায় কুঠী উঠাইয়া দিয়া কোম্পানীর যাবদীয় সম্পত্তি সহ মান্দ্রাজে গমন করিতে হইবে। কাপ্তেন হীথ্ উষ্ণ মস্তিষ্ক ও অপরিণামদর্শী কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছেন। তিনি বুদ্ধিহীন লোকের ন্যায় কোম্পানীর সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার জাহাজে উঠাইয়া লইয়া ৮ই নভেম্বর তারিখে বালেশ্বর যাত্রা করেন। কাপ্তেন হীথ্ যখন বালেশ্বরের পথে তখন কোম্পানীর বালেশ্বরের দুইজন কুঠীয়ালকে তত্রত্য মুসলমান রাজকর্ম্মচারী জামিন স্বরূপ আবদ্ধ রাখেন। এ দিকে ঢাকায় দুই জন প্রতিনিধি রহিলেন। এ সকল বিষয়ে আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ২৯শে নভেম্বর বালেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি নগর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন এবং

সমগ্র নগরটী ভস্ম স্তূপে পরিণত করেন। এই প্রকারে বালেশ্বর ধ্বংস করিয়া তিনি চট্টগ্রাম যাত্রা করিলেন কিন্তু নগর অধিকার করিতে অক্ষম হইয়া জাহাজ সহ আরাকানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পৌঁছিয়াই তিনি অরাকানাধিপতির নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যদি তিনি ইংরাজদিগকে আরাকানে বাস করিতে ও ব্যবসা বাণিজ্য করিতে দেন তাহা হইলে মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরাজেরা তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে কোনও উত্তর না পাওয়ায় তিনি অধৈর্য্য হইয়া সমুদয় জাহাজ সহ মান্দ্রাজ গমন করিলেন। মোট ১৫খানি জাহাজ ছিল তাহাতে গবর্ণর, কৌন্সিলের সদস্যগণ, কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ ও পণ্য দ্রব্যাদি পূর্ণ ছিল। এই প্রকারে পঞ্চাশ বৎসর বঙ্গদেশে অবস্থানের পর ইংরাজ কোম্পানী বঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সুরক্ষিত ছিল। তাহা ব্যতীত কোম্পানীর যত কুঠী ছিল সম্রাটের আদেশে সমুদায় বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করা হইয়াছিল। সম্রাটের আদেশ পালন করিতে হইয়াছিল নবাব সায়েস্তা খাঁকে। বঙ্গদেশে কোম্পানীর কোনও চিহ্ন রহিল না। ঢাকায় দুই জন ইংরাজ প্রতিনিধি শৃঙ্খলাবস্থায় কারারুদ্ধ রহিলেন।

গান।

জয়, সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ভারত সম্রাট
নব বিধু সম ভারত গগনে। ১
মরি, কি চারু সুষমা, নাহিক উপমা,
হীরক তারকা-কিরণ বদনে॥ ২
আজ, ভারত প্রকৃতি হ'য়ে এক মতি
শোক তাপ ভুলি, মাতে জয় গানে। ৩
গাও, জয় নব রাজ, জয় নব রাজ,
গাওরে সুতানে দিগঙ্গনাগণে॥ ৪
মোরা, বংশবাটী বাসী মাগি দিবানিশি
রাজার মঙ্গল হংসেশ্বরী সনে। ৫

শ্রীনকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্ন।

গদাই পুরুত।

দশম পরিচ্ছেদ।

(নিমন্ত্রণে)

বক্তা গদাই।

যখন অল্পে অল্পে চৈতন্য সঞ্চার হইল তখন দেখি আশ্রমে পড়িয়া আছি। কিন্তু সকল কথাই মনে রহিয়াছে। এ কথা সে কথা ভাবিতেছি এমন সময় দেখি আমার মাথার শিয়রের কাছে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি সেইরূপ দুইটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বর্ণময় দেহ। বীণা ঝঙ্কারের ন্যায় একটি শব্দ কর্ণকুহরে গেল। শুনিলাম "এত চেষ্টা করিলাম কিছু করিতে পারিলাম না এখনও প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে হয়—গায়ত্রী জপিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে হয়।" আমি বলিলাম—কি করিয়া প্রাণত্যাগ করিব? উত্তরে শুনিলাম—"আমার প্রাণত্যাগ হোক এই গভীর চিন্তা।" তখন দ্বিতীয় বর্ণময় দেহ বলিলেন "কলির এরূপ জীবের পক্ষে তাহা অসাধ্য—বড় বড় সাধুরাই পারেন না। ছাড়িয়া দাও—এ যাত্রা হইল না, ভোগ রহিয়াছে, আমাদের মূলেই ভুল হইয়াছে।" তখন প্রথম মূর্ত্তি বলিলেন "তিন দিন সময় রহিল—পার ত মূলমন্ত্র জপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিও। তিন দিন তুমি পূর্ণ স্বর্গীয় ভাবে থাকিবে। তিন দিনে কৃতকার্য্য হইতে না পার—একটু মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইবে, পরে আপনার স্বাভাবিক মানবাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ভয় করিও না। তোমার সাহায্যে রহিলাম" বলিয়া মূর্ত্তিদ্বয় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় দেখিলাম একজন আমার মাতার মত আর একজন সেই জ্ঞাতি খুড়া রামচরণের মত।

মূর্ত্তিদ্বয় চলিয়া গেলে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। স্বর্গ হাতে পাইয়া বঞ্চিত হইয়াছি এই ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। তখন শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার শ্বাস হইয়াছে, আমার প্রাণ-বায়ু যেন পা হইতে ক্রমে উরুতে উঠিল, যেন উরু হইতে উদরে আসিল পা যেন অসাড় হইয়া গেল, ক্রমে শ্বাস যেন কণ্ঠে আসিল। এমন সময় সহসা একটা শব্দ হইল আর সমুদয় ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম বৃথা চেষ্টা, হইবে না।

শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম একজন সাধু উঠানে বসিয়া আছেন। আমাদের আশ্রমের অনতিদূরে উহাঁর আশ্রম এটা জানিতাম, কখন কখন তাঁহাকে দেখিতেও পাইতাম কিন্তু কখন তাঁহার আশ্রমে যাই নাই, তিনিও কখন আমাদের আশ্রমে আসেন নাই। আজি সহসা তাঁহাকে আশ্রমে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি সুমিষ্ট বচনে আমাকে বলিলেন—আজি আমার আশ্রমে আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি সেখানে নারায়ণের প্রসাদ পাইতে হইবে চলুন। আমার শরীর নিতান্ত দুর্বল অনুভব হইতেছিল, কি করিয়া আহারাদির যোগাড় করিব তাহাও মনে উঠিয়াছিল এখন নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হইল। যাহা হৌক ভাব গোপন করিয়া বলিলাম "কোন বিশেষ ব্যাপার কিছু আছে না কি?" তিনি বলিলেন "কিছুই নয় সকলই ভগবানের ইচ্ছা" বলিয়া একটু মিষ্ট হাসি হাসিলেন। হাসিটি বড় মধুর। তাহাতে কেমন একটা দয়া, সহানুভূতি, প্রেম মাখা বোধ হইল। আমি গলিয়া গেলাম, নিমন্ত্রণ লইলাম। সাধু বলিলেন এখনই আসিতে হইবে। আমি আশ্রমের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাধুর সঙ্গে চলিলাম।

নানা কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সাধুর আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু পথে যাইবার সময় আমি আকাশে স্পষ্ট কথা শুনিতে লাগিলাম। আকাশে চাহিয়া কিছু দেখিতে পাই না অথচ কথা শুনিতে পাইতেছি। একটু মনোযোগ দিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমারই কথা হইতেছে। যেন দুই জন লোকে আমার কথা কহিতেছে। একটু মনোযোগ সহকারে শুনিয়া বুঝিলাম একজনের স্বর সেই জাতি খুড়া রাম চরণের ন্যায় আর অপরের স্বর আমার মাতার মত। কথাটা যতটা মনে আছে এইরূপ শুনিয়াছিলাম।

প্রথম স্বর—এ সাধুর সঙ্গে যাওয়ায় কোন ক্ষতি ত হইবে না?

দ্বিতীয় স্বর—না, বরং ভালই হইবে।

প্রথম স্বর—সেই মন্ত্রটা দান করিলে ভাল হয় না?

দ্বিতীয় স্বর—স্নানের পর দিব।

আমি বুঝিলাম একটা মন্ত্র লাভ হইবে। আমার আবার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। শরীরে যেন বল আসিল।

ক্রমে আমরা সাধুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সাধু বলিলেন "চলুন প্রথমেই স্নান করিয়া আসি" আমি রাজি হইলাম। স্নান করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল আর স্নানের পর মন্ত্র লাভ হইবে বলিয়া আমার জানা ছিল। তাই আমি একেবারে রাজি হইলাম।

দুই জনে স্নান করিতে গেলাম, যাইবার সময় আবার আকাশে নানা কথা শুনিতে পাইতে লাগিলাম। সাধুকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কোন কথা শুনিতে পাইতেছেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন "কাহার কথা, এখানে ত তৃতীয় ব্যক্তি নাই। কোন দূরাগত কথাও ত শুনি নাই। আপনি কি কোন কথা শুনিতে পাইতেছেন?" আমি বিপদে পড়িলাম বলিলাম "চলুন"।

একটি ক্ষুদ্র তটিনী তীরে যাইয়া উভয়ে অবগাহন স্নান করিলাম। স্নান করিবার পূর্ব্বে আকাশ-বাণী শুনিলাম "গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান কর"। আমি সহসা গায়ত্রী ভুলিয়া গেলাম। কিছুতেই আর মনে পড়ে না, বড় কাতর হইলাম। তখন আকাশ-বাণী শুনিলাম "হা হতভাগা, গায়ত্রী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলে" আমি চমকাইয়া উঠিলাম। সাধু দেখিলেন কিছু বলিলেন না। তখন গম্ভীর স্বরে কে একজন গায়ত্রী আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি অনুসরণ করিয়া ডুব দিলাম। ডুব দিয়া উঠিয়া দেখি আকাশ বর্ণময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহে ছাহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোন কথা শুনিতে পাইলাম না।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া সাধু রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গেলেন। আমাকে আহ্নিকের যোগাড় করিয়া দিয়া গেলেন। আমি আহ্নিক করিতে বসিলাম। পুরাতন মন্ত্র জপ করিবার মানস হইল। আকাশ-বাণী নিবারণ করিল। তখন তৃতীয় এক নূতন স্বর—বলিল "দিন, লোকটা উদ্ধার হইয়া যাক"।

রামচরণের স্বর—উহার জন্য যদি আমাকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় সেও ভাল তবু আমি উহাকে মন্ত্র দিব।

তখন বাতায়ন পথে স্বর শুনিলাম "উত্তরাস্য হইয়া বস এই মন্ত্র আবৃত্তি কর বলিয়া মন্ত্রটি বলিয়া দিলেন। আমি একবার দুইবার তিনবার আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করিয়া লইলাম। মনে হইল "এই বই ত নয়—ইহা কখনও ভুলিব না।" তখন আকাশে উচ্চ হাস্য শুনিলাম। আগন্তুক স্বর

বলিলেন "আমি ত হাজার ক্রোশ দূরে গিয়াছিলাম। যাহা হৌক—হইয়াছে, চলুন।"

তখন আমি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম আশ্রমের গাছে পালায় চালে চতুর্দ্দিকে মরীচিকাময় দেহ। শীতকালে মধ্যাহ্ন সময়ে মাঠে কি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মরীচিকা কাঁপিতেছে দেখা যায়—কাছে গেলে আর দেখা যায় না, কেবল দূর হইতে দেখা যায়। ঐরূপ মরীচিকার দেহ চতুর্দ্দিকে দেখিলাম তাহার ভিতর আবার সব অবয়ব আছে। তাহারা কথা কহিতেছে শুনিতে পাইলাম।

আমি তখন বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া গিয়াছি। আমি কি জাগ্রত না সুপ্ত। এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি—এ কি এ। মাথা কেমন করিতে লাগিল।

তখন সহসা সাধু আসিয়া বলিলেন—হবিষ্যান্ন প্রস্তুত, আহ্নিক হইয়াছে কি?—আমি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিলাম হাঁ'।

সাধু ডাকিলেন। উভয়ে আহার করিতে বসিলাম।

গাছে পালায় শুনিলাম 'আহা দেখ লোকটি ভাল, আহা তোমরা সকলে কৃপা কর, উহার মনে আর এখন কিছুই নাই, এই প্রকৃত সময়।

তখন হঠাৎ শরীরে একটা কি রূপ ভাবান্তর হইল। সর্ব্বশরীরে প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম চক্ষু ফুটিয়া আনন্দাশ্রু বাহির হইতে লাগিল। অশ্রু আর গোপন করিতে পারিলাম না। ব্যাপার বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিল। আমি মুখে যাহা উচ্চারণ করি, গাছে পালায় সকল মূর্ত্তির মুখেই তাই উচ্চারিত হয়। তাঁহারা যাহা উচ্চারণ করেন আমার মুখে তাহা আপনা হইতে উচ্চারিত হয়।

মনে করিলাম এ কি, মনের ভাব কিছুই ত লুকাইবার যো নাই। এই কি স্বর্গ? নিশ্চয়ই এইরূপ স্বর্গ। ভগবানের মনের সঙ্গে সকলের মন এক। কিছু গোপন নাই। জয় কালী জয় হরি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈল কাননে।

বক্তা গদাই।

আনন্দে শরীর পুলকিত হইল। স্ফূর্ত্তিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। পূর্ব্বে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের কথা শুনিয়াছিলাম নিজ দেহে তাহার দুই একটি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। দেহ মন প্রাণ স্বীকার করিল এমন অপূর্ব্বভাব এরূপ অপরূপ সুখ পূর্ব্বে কখনই ভোগ করি নাই। মনে মনে বুঝিলাম আমি আজ ধন্য। কে যেন কর্ণকুহরে মৃদুস্বরে মধু ঢালিয়া বলিতে লাগিল ইহারই নাম স্বর্গভোগ। আমি বুঝিলাম আজ মহাভাগ্যবান, আমি আজ ধন্য, নরদেহে স্বর্গভোগ আস্বাদন করিলাম।

ধীরে ধীরে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া কাননের দিকে অগ্রসর হইলাম। কাননে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কানন ব্যাপিয়া লিঙ্গদেহধারী আত্মাগণ বিচরণ করিতেছেন গাছে পালায় সর্ব্বত্র। আমি যেমন যাইতেছি অমনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। বলিলাম "এই যে ইঁহারা এখানেও।" অমনই সকলের মুখে, এই যে ইঁহারা এখানেও, এই যে ইঁহারা এখানেও, এই যে ইঁহারা এখানেও। বাক্য স্রোত তরঙ্গে তরঙ্গে নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল। বলিলাম "কি মজা"। আবার সেইরূপ কি মজা, কি মজা, কি মজা স্রোতের ন্যায় বহিয়া গেল। এমন সময় দেখিলাম সেই পূর্ব্বকার দুইটি মূর্ত্তি, মাতার ও জ্ঞাতি খুড়া রামচরণের, আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। দেখিলাম দুইটি মূর্ত্তিই তাল বৃক্ষের মত দীর্ঘ আর দেহ মরীচিকাময়। সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে মূর্ত্তিদ্বয় যত কথা কহিল, সব বুঝিতে পারিলাম না। কেবল শেষ কথাটা স্পষ্ট শুনিলাম। "যদি না যাও তবে আমরা যাই।" বলিয়াই মূর্ত্তিদ্বয় আকাশে উঠিয়া গেল। আমি হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কতদূর কতদূর দেখিলাম শেষে আর দেখিতে পাইলাম না। আকাশের গাত্রে মিশিয়া গেল। ধূমের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

একটু অগ্রসর হইয়া মনঃসংযোগে দেখিলাম। বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রস্তর সমস্ত বস্তুতেই এমন একটি পদার্থ দেখিতে পাইলাম যাহা পূর্ব্বে মানুষচোখে

দেখিতে পাইতাম না। সকল বস্তুতেই সেই পদার্থ—সেই শক্তি—দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম ইহা কি, যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিতে পাইতাম না অথচ এখন—নিশ্চয়ই কাহারও অনুগ্রহে, যাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না—এখন দেখিতে পাইতেছি। ঐ পদার্থ ঐ শক্তি ঐ সত্ত্বা দেখিতেছি সজীব চৈতন্য বিশিষ্ট। ভাবিতে লাগিলাম ইহাই কি ভগবানে ভগবানত্ব যাহা সকল পদার্থে দেখিতেছি। তখন সহসা চণ্ডী মনে পড়িয়া গেল—দেবগণ শুম্ভ নিশুম্ভের ভয়ে ভীত হইয়া জগদম্বাকে যে কথা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িয়া গেল—

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্ন-মেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের অধিষ্ঠাত্রী এবং যিনি অখিল ভূত সমূহে ব্যাপ্তি রূপে বিদ্যমানা সেই দেবীকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার।

যিনি চৈতন্য রূপে এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সেই দেবীকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার।

মনে হইল মা এখন তোমায় ধরিয়াছি, এখন তোমায় দেখিতে পাইতেছি। তবে মা এতদিন তোমায় চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই নাই কেন? আবার চণ্ডী মনে পড়িল—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি

মা তুমিই এই নিখিল প্রাকৃতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছ তুমিই মায়া—মায়া বশেই আমরা দেখিতে পাই নাই। এখন বুঝিতেছি কে দয়া করিয়া আমার মায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। মানুষ সাধনায় সিদ্ধ হইলে বুঝি মা তোমায় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ববস্তুতে এইরূপেই দেখিতে পায়। আর যাহারা মায়াচ্ছন্ন, সিদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা গাছে গাছই দেখে, ছাগলে ছাগলই দেখে, পাথরে পাথরই দেখে, ইষ্টকে ইষ্টকই দেখে, বুঝিতে পারে না মায়ারূপ চিকের আড়ালে তুমি বড় মানুষের মেয়ে সর্ব্বদা বসিয়া থাক। তখন মনে হইল শাস্ত্রে ত সবই আছে। কেবল মা তোমার মায়ার কোপে পড়িয়া লোকে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, বুঝিয়াও বুঝে না। গীতায়ও ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি বিশদরূপে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতো ঽক্ষিশিরোমুখম।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩—১৪
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থ চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৮

* * * *

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৮
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিত মীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৯

যিনি সর্ব্বত্র পাণিপাদ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র অক্ষি মস্তক মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। ১৪

যিনি সমুদয় ইন্দ্রিয় গুণস্বরূপ রূপাদি বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ ইন্দ্রিয় নিচয় বিরহিত নিঃসঙ্গ সর্ব্বাধার নির্গুণ হইয়াও গুণের প্রতিপালক।

যিনি জীব গণের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, স্থাবর এবং জঙ্গম স্বরূপ সূক্ষ্মত্ব হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়, অজ্ঞানীর দূরস্থ এবং জ্ঞানীর নিকটস্থ।

সকল ভূতে অবিভক্ত হইয়া যিনি বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, যিনি স্থিতি কালে প্রাণিগণকে পালন করেন, প্রলয়ে সংহার করেন এবং সৃষ্টি কালে সৃজন করেন তিনিই জ্ঞেয়।

তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি অজ্ঞানের পর পারে অবস্থিত, তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞান গম্য; এবং সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। ১৮

* * * * *

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত প্রাণিগণের নাশে অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি দেখেন তিনিই দেখেন। ২৮

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শনকারী, আপনাকে নষ্ট করে না, তজ্জন্য পরমাগতি লাভ করে। ২৯

মর্ত্ত্যে এই পরমাগতিই সিদ্ধত্ব। ভাবিলাম বুঝিলাম ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বলিবার কোন কথা আর নাই। গুরুদেবের মুখে মুখে অনেক কথাই শুনিয়া শিখিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোনও দেশে সিদ্ধি, সাধনা ও সিদ্ধত্বের ব্যাপার আছে বলিয়া জানি না ও শুনিও নাই। অপর জাতিরা জড় লইয়াই ব্যস্ত। জড় কি তাহাও বুঝে না। গুরু মুখে শুনিয়াছি ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি এখানে কর্ম্ম করিবার জন্য কখন কখন দেবগণও জন্ম ও দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। একে মনুষ্য জীবনে কর্ম্ম আশু ফলপ্রদ তাহাতে ভারত কর্ম্মভূমি—একেবারে মণি কাঞ্চন যোগ। এখানে জন্মিয়া মোক্ষলাভও সহজ সাধ্য। জীবের শিব হইবার উপায়, ভগবানে লীন হইবার উপায় ভগবানই স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণরূপে দ্বাপরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই গীতা, আর কালতে শিবরূপে যাহা বলিয়াছেন তাহাই তন্ত্র। তন্ত্র অনুসারে কার্য্য করিয়া তিন দিনে লোক সিদ্ধ হইতে পারে। শব সাধনা করিয়া এক দিনে—এক রজনীতে—লোক সিদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে। ভারতের হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়া—তাহার উপর ব্রাহ্মণের ঘরে পুরোহিতের ঘরে, ক্রিয়াবান সংস্কৃতজ্ঞ ভট্টাচার্য্যের ঘরে, জন্মিয়াছি বলিয়া মনে মনে একটা অহঙ্কার স্পর্দ্ধা আসিল। কিন্তু সহসা মনে পড়িল ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা। ভারত কি ছিল আর কি হইয়াছে। স্বধর্ম্মনিরত হিন্দু রাজার কথা, ব্যাস বাল্মীকির কথা জোর করিয়া চাপা দিলাম। কিন্তু তথাপি মনে আসিল যে ধর্ম্ম কর্ম্ম একবারে লোপ, কেবল কপটতা, ব্যাভিচার, অনাচার আর নাস্তিকতা, সংসারে সমাজে বা একাকী থাকিয়াও মানুষের সুখ নাই সন্তোষ নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আজ সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যাভিচার দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্ণ সঙ্কর অবাধে রাজত্ব করিতেছে, পরমার্থ চিন্তা গিয়া কেবল অর্থের চিন্তা সার অবলম্বন হইয়াছে সুতরাং রোগ শোক লোককে দিন দিন মলিন করিতেছে। ভেজাল ছাড়া শরীর পালন জন্য আহার করিবারও

শুদ্ধ খাদ্য নাই। নীতি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। নীতিই ধর্ম্মের ভিত্তি। নীতি নাই ধর্ম্ম দাঁড়াইবে কোথায়? সংসারে সুখ নাই পরিবারে মিল নাই, সকলে কপটতার ও অসরলতার মশারি খাটাইয়া বসিয়া আছে। সংসারে ধর্ম্ম হইবে কোথা হইতে? তাহার উপর 'গুরু' নামধারী ব্যক্তিগণের বিড়ম্বনা আছে। জগদম্বা মাগো তোমার কর্ম্মভূমি ভারত আজ এই সকল কারণে মিশনরীর কর্ম্মভূমি হইয়াছে আর জেনানা মিশনের রঙ্গভূমি হইয়াছে। কতকাল পরে ভারতে তিমির জাল ঘুচিবে তোমার মোহময়ী রাত্রির অবসান হইবে—কতকাল পরে আবার দিবা প্রকাশের পূর্ব্বলক্ষণে পূর্ব্বগগণ অরুণবর্ণে ও নানা রাগে রঞ্জিত দেখিব? মাগো দেখিতে কি পাইব? মাগো স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ভারত-সেবা কি ধর্ম্মের বহির্ভূত? তোমার সন্তানগণ সরল ভাবে তোমার মুখপানে চায় না কেন মা?

মুহূর্ত্তমধ্যে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া বিদ্যুৎবেগে চক্ষের পল্লবের অন্তরালে চিন্তার স্রোত চলিয়া গেল। উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। যদৃচ্ছা ক্রমে চলিতে চলিতে একটি বদরীবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম। বৃক্ষটি কুসুমিত মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গগণ আনন্দে মধু—মধুই হইবে—সংগ্রহ করিতেছে। বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম বৃক্ষ সচেতন। তখন কর্ণে বাক্য প্রবেশ করিল। "আসুন আসুন আমাদের রাজকন্যা আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন, এই খানে বসুন। বিশ্রাম করুন আপনি অতিথি।" বসিলাম। ঝর ঝর করিয়া বদরী কুসুম মস্তকে গাত্রে পতিত হইল, মধুর ন্যায় চটচটে গুঁড়া গুঁড়া গাত্রে সব কি পড়িতে লাগিব। বুঝিলাম বৃক্ষের ইহাই অতিথি সৎকার। অভূতপূর্ব্ব ভাবোদয়ে হৃদয় গলিয়া গেল। কে কথা কহিতেছে দেখিতে পাইলাম না বুঝিতে পারিলাম না অথচ কথা শুনিলাম। ক্রমে আমাকে আহ্বান স্বরূপ একটি সংস্কৃত শ্লোকও শুনিলাম। কোনও একটি স্বতন্ত্র কুসুম কথা কহিতেছে এইটিই বুঝিলাম কিন্তু কোনটি বুঝিতে পারিলাম না। আমি আতিথ্য স্বীকার করিয়া বৃক্ষতলেই বসিলাম। এবং মন আবার ভাবনার দোলায় দুলিতে লাগিল। জগতে অসম্ভব কিছু কি আছে? কিছুই অসম্ভব নাই। আমার কাছে যাহা অসম্ভব তাহা আপনার নিকট অতি পুরাতন কথা অতি সাধারণ প্রতিদিন পরিচিত ব্যাপার। শুনিয়াছি ভূতত্ত্ববিদ্যাবিদ পণ্ডিতগণ

পৃথিবী খনন করিয়া দূর অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে যে সকল কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে বুঝা যায় এই পৃথিবীতে এমন বৃহদাকারের জন্তুগণ এক দিন বাস করিয়াছিল যাহাদের তুলনায় হস্তী ব্যাঘ্র সিংহ কীটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রাবণের কুড়ি হাত ও দশ মুণ্ড বিশ্বাস করিতে অনেক য়ুরোপীয় এখন নারাজ হইবেন কিন্তু তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ইতিহাসবেত্তাগণ ও ভ্রমণকারী যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, শুধু উল্লেখ কেন তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাহাদের যে সকল বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের লোকও পাঠ করিলে গুলির আড্ডার কথা বলিতে পারে। শুনিয়াছি তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, পুরাকালে এই পৃথিবীতে গাছে জন্তু হইত, গাছে ফল হইত সেই ফল পক্ক হইলে বিদীর্ণ করিয়া পক্ষী শাবক নির্গত হইত। এক জাতীয় মনুষ্য ছিল তাহাদের সর্ব্বাবয়ব মনুষ্যের মত কিন্তু কেবল মাত্র মস্তকটি ঘোটকের মত। এক জাতীয় মনুষ্য ছিল যাহাদের কপালের মাঝখানে কেবল একটি মাত্র চক্ষু ছিল। এক জাতীয় মনুষ্য ছিল যাহাদের একটি কর্ণ শরীরের সমান বড় হইত; কর্ণধারী ব্যক্তি কখনও মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া ঐ কর্ণ দ্বারা লেপের ন্যায় গাত্রাচ্ছাদন করিতেন কখন ও বা কর্ণ শয্যার ন্যায় বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিতেন। এক জাতীয় মনুষ্য ছিল যাহাদের মস্তকটি বক্ষদেশে কতকটা আমাদের কবন্ধের ন্যায় তবে প্রভেদ এই যে কবন্ধের মস্তক দেখা যায় না ইহাদের মস্তক বক্ষদেশে স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। এক জাতীয় মনুষ্য ছিল তাহারা এমন খর্ব্বাকৃতি যে সেই মনুষ্য মুষ্টি মধ্যে রাখিতে পারা যায়। আবার তদ্বিপরীতে অতি দীর্ঘাকার মনুষ্যও বর্ণিত হইয়াছে। অনেকে মৎস্যনারী দর্শন ও মৎস্য-নারীর সঙ্গীত শ্রবণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কটিদেশের উর্দ্ধাংশ মনুষ্যের ন্যায় এবং নিম্নাঙ্গ মৎস্যের ন্যায়। বর্ত্তমান কালেও আফ্রিকায় সে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহা কিছু দিন পূর্ব্বে অসম্ভবের পদবীতেই সংস্থিত ছিল। যখন ইংরেজ সেনাপতি প্রথমে জুলু-রাজ চক্রবর্ত্তী "চাকা" কে দেখিয়াছিলেন তখন তিনি কি মনে করিয়াছিলেন তাহা ভগবানই জানেন। বৃক্ষ সম্বন্ধেও কতই না আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি, মালাকা

ঝাঁজি কীট খায়, ড্রসেরা বর্ম্মাণি কীট ভোজন করে, পুষ্পাধারে কীট রাখিলে তখনই আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায়, পরে ক্ষণকাল পরে আবার প্রস্ফুটিত হয় তখন দেখা যায় কীট আর নাই গলিয়া তরল হইয়া গিয়াছে ও বৃক্ষ তাহা চুষিয়া লইতেছে। কিন্তু যদি কীটের পরিবর্ত্তে পুষ্পাধারে একটি ছোট ঢিল বা প্রস্তর খণ্ড দেও তাহা হইলেও প্রথমে পুষ্পাধার আপনা হইতে মুদিত হইবে পরে হখন ড্রসেরা টের পাইবে যে কীট নহে তৎপরিবর্ত্তে সে প্রস্তর বা ঢিল পাইয়াছে তখন সহসা এমন বিদ্যুৎবেগে আবার প্রস্ফুটিত হইবে যে পুষ্পাধার হইতে জোরে প্রস্তর খণ্ডটি মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইবে বা দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। সাহেবরা যাহাকে পিচার প্ল্যাণ্ট, বলেন সে গাছে ঢাকনীযুক্ত গ্লাসের ন্যায় এক একটি আধার থাকে তাহাতে বৃষ্টির জল জমিলে বানর প্রভৃতি জীবগণ সেই জল পান করে। কিন্তু যখন আধারটি ঢাকা থাকে তখন তাহাতে যে রস জমিয়া থাকে তাহা বৃক্ষ নির্গত রস ও তাহাতে কীট গলিয়া যায়। কীট পড়িয়া দ্রবীভূত হইলে বৃক্ষ সেই রস পান করে। গাছের রসে সুন্দর নবনীত হইতেছে। এরূপ বৃক্ষ আছে যে তাহার তলায় যাইবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে শাখা গুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তোমাকে অক্রমণ করিবে ও তোমাকে এরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরিবে যে তুমি আর নড়িতে চড়িতে পারিবে না। ক্রমে টানিয়া আনিয়া তোমাকে স্কন্ধদেশের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিবে ও তুমি ক্রমে গলিয়া রস রূপে বৃক্ষের তৃপ্তি সাধন করিবে। কেবল তোমার অস্থিরাশি বৃক্ষ তলে পড়িয়া থাকিবে। "উপাস" নামে এক জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহার ছায়ায় বসিলেই তোমার প্রাণ যাইবে, তুমি বিষে জর জর হইবে ও শেষে বিষ পানে যেরূপ লক্ষণ হয় সেইরূপ লক্ষণসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ এই সকল রহস্য এখনও উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। এখন আমি কোন ঐশী শক্তি দ্বারা পরিচালিত এখন আমি বৃক্ষের কথা শুনিব ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে?

এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় দেখিলাম যিনি আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন সেই সন্ন্যাসী আমার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি আসিয়া পরম সমাদরে আমাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমার মানসিক ভাব সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। অপর দুই একটি কথা

মাত্র কহিলেন। তাঁহার আদরে ও যত্নে আমি তিন দিবস তাঁহার আশ্রমে অতিবাহিত করিলাম। প্রতিদিনই আহারের পর একবার করিয়া কাননে যাইতাম ও নানাস্থান ভ্রমণ করিতাম ও নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিতাম। কতক কতক এমন ব্যাপার ও দর্শন করিয়াছিলাম যাহা লোকের নিকট প্রকাশ করা যায় না। যাহা হৌক তৃতীয় দিবসে যখন আমি ঐরূপ কানন পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি তখন সহসা মনে হইল যে শক্তিবলে আমি দর্শনাদি করিতেছি যেন সেই শক্তি হারাইব। পাছে ঐ শক্তি হারাইয়া ফেলি এই ভয়ে আকুল হইয়া উঠিলাম।

এ কথা সে কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার স্বগ্রামের পিতার কথা মনে পড়িল—স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। স্ত্রীর মূর্ত্তি যেন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহার দুঃখের কথা মনে হইবা মাত্র মন একটু চঞ্চল হইল, হৃদয়ে একটু যেন আঘাত লাগিল, চক্ষু দুটি সরস হইয়া আসিল। মায়াতে জড়িত হইয়া যতই তাহার কথা ভাবিতে লাগিলাম ততই দৃষ্টিস্থলা হইয়া আসিতে লাগিল। অন্যমনস্ক হইয়া গোটাকত ম্লেচ্ছ বা যাবনিক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি (দুই একটি ইংরাজী কথাও তাহার মধ্যে ছিল) আর অমনি একটি বিশাল শব্দ শুনিলাম—যেন সহসা দুই "গাটি কপাট পড়িয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। সহসা চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি—গাছে পালায় প্রস্তরের উপর শিখর গাত্রে কয় দিন যে সমস্ত আত্মাগণ বা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেহ দেখিতেছিলাম তাহারা দেখিতে দেখিতে আকাশের গাত্রে লীন হইয়া গেল যেন বায়ুতে মিশিয়া গেল। এই—এই—এই—যা আর নাই। সর্ব্বত্র সঞ্চারিণী যে "চিতি" দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা যেন ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়ার ন্যায় উড়িয়া গেল। চকিত চঞ্চল নেত্রে চাহিয়া দেখি কোথাও আর সেই অদ্ভুত শক্তির বিকাশ নাই। যে পাথর সেই পাথর, যে গাছ সেই গাছ, যে পক্ষী সেই পক্ষী। নূতনত্ব উড়িয়া গেল, সেই পুরাণ সেই চিরকালের পুরাতন দৃশ্য, যাহা চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছি তাহাই আবার দেখিতে লাগিলাম। মুখে বার বার কত কথা উচ্চারণ করিলাম। কই আর ত গাছে পালায় মুখে মুখে আমার উচ্চারিত সেই শব্দ নাই? কে আমার সেই ঐশী শক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে হরণ করিয়া লইল? নারিকেল ফলাম্বুবৎ যে শক্তি-লক্ষ্মী আমাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন তিনি এখন কোথা চলিয়া গেলেন। তিনি আমাকে গজভুক্ত

কপিত্থবৎ জড় রাখিয়া একেবারে, বুঝি চিরদিনের মত, কোথা অন্তর্ধান হইলেন? কে বলিবে কোথা গেলেন? কে আমাকে এমন করিল? দেখিতেছি আমার প্রাণ চলিয়া গিয়াছে আমি এখন শবদেহের ন্যায় পড়িয়া আছি। শরীরে বার বার কম্পন উপস্থিত হইল যেন শরীর সহসা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল—যেন উঠিবার নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। আবার কোথা হইতে একটা দারুণ ভীতি আসিয়া উপস্থিত হইল, সহসা একটা বড় ভয় পাইলাম। এমন সময় চাহিয়া দেখি যেন আমার মাতা ও জ্ঞাতি খুড়া রামচরণ সহসা আমার নিকট দিয়া প্রবল বেগে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় এই কথাটি শুনিলাম—"পুনর্মূষিক"। তখনই একটা প্রবল ঘূর্ণী বায়ু আসিল। কেবল শুষ্ক লতা তৃণ বালুকা ধূলা যে ঊর্দ্ধে উঠিল এমন নহে অল্প বিস্তর বড় কাষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রবল ঘূর্ণী বায়ুর প্রভাবে নভোগামী হইল। আমিও ঘূর্ণী বায়ুর মধ্যস্থলে পড়িয়া ওলট পালট হইলাম ও যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইলাম। চক্ষু একেবারে অন্ধ হইবার উপক্রম হইল। নাসারন্ধ্র কর্ণবিবর একেবারে ধূলাময় ও বালুকা পূর্ণ হইয়া গেল। তখন উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। কোন্ দিকে যাইতেছি তাহা ঠিক করিতে না পারিয়াই চলিতে লাগিলাম।

একটু অগ্রসর হইয়া দেখি একটা নিম্ববৃক্ষ শাখায় একটা প্রকাণ্ড বিকটাকার স্ত্রী মূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছে, তাহার পায়ে বিকৃত মোটা দুইগাছা পিতলের কি কাঁসার মল। এমন মোটা মল আমি কস্মিনকালে দেখি নাই। নাকে একটা হাঁসুলীর মত নথ; নথই হইবে নহিলে নাকে আর কি গহনা পরিবে? দুই কানে এক জোড়া "মান্দরে"র ন্যায় পাশা—পিতলের হইবে। উলাঙ্গিনী। চক্ষের পলকে যতদূর দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি। মুখ ব্যাদান করিয়া আবার বার বার জিহ্বা বাহির করিয়া, বিকট মুখভঙ্গী সহকারে আমাকে ডাকিতেছে। সেই মূর্ত্তি দেখিলেই লোকের গাত্র কাঁটালের গাত্র হইয়া যায় তাহার উপর বিকট মুখভঙ্গী সহকারে ডাক। আমি দারুণ ভয়ে ভীত হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলাম। অনেকটা গিয়া মনে হইল নিরাপদ স্থানে আসিয়াছি। তখন একবার পেছনের দিকে দৃষ্টি করিয়া সঙ্গে আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য দাঁড়াইলাম ও দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিলাম—কিছু দেখিতে পাইলাম না। কতকটা আশ্বস্ত ও নিরুদ্বেগ

হইয়াছি মনে করিয়া যেমন সম্মুখ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছি—ইচ্ছা চলিয়া যাইব—আর অমনি দেখি সম্মুখস্থ একটী নিশিন্দা গাছে আবার সেই মূর্ত্তি, আহ্লাদ সহকারে আমাকে বলিতেছে "এই যে আমি এখানে। তুমি যেখানে যাবে আমিও যাইব পালাবে কোথা"। কর্ণকুহরে সমস্ত কথা না যাইতে যাইতেই যে দিক হইতে আসিয়াছিলাম সেই মুখী হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম, পদদ্বয় ও সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা প্রভৃতি লাগিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, তবু বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, কেবল ছুটিতেছি। তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম আমার চতুর্দ্দিকে প্রেতগণ ঘুরিতেছে। রাস্তার দুই ধারে স্থানে স্থানে বৃক্ষোপরি দুই চারিটার দর্শনও হইতেছে। এই রূপে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে অদূরে দেখিলাম আমার আশ্রয় দাতা সন্ন্যাসী—আমারই দিকে বোধ হয় আমার অন্বেষণে আসিতেছেন। আমি ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তিনিও নিদারুণ ভয়ে আমাকে অভিভূত দেখিয়া "ভয় কি ভয় কি" বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিলেন ও মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাকে প্রায় ক্রোড়ে লইয়া আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন ও মুখে বলিতে লাগিলেন 'ভয় কি'। আমি তখন বলিলাম ঐ যে দেখুন না প্রেতগণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছে—বোধ করি আশ্রমে পর্য্যন্ত যাইবে। সন্ন্যাসী আশ্বাস দিয়া বলিলেন 'ইঃ আশ্রমে' আর ঢুকিতে হয় না, আশ্রমের চতুর্দ্দিক বন্ধন করা আছে। কার সাধ্য আশ্রমে প্রবেশ করে?" আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

ক্রমে আমরা আশ্রমে পঁহুছিলাম, ঢুকিবার সময় দেখিলাম অদূরে সেই প্রেতিনীটাও নিকট জ্ঞাতি খুড়া রামচরণ দাঁড়াইয়া আমাকে মুখ ভঙ্গিমা সহকারে ভয় দেখাইতেছে। নূতনের মধ্যে দেখিলাম রামচরণের দেহ—পারদের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত। চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নি শিখা নির্গত হইতেছে।

প্রকৃতি।

"That Nature breathes among the hills
and groves." Wordsworth.

"Thy temple is the face of day,
Earth, ocean, heaven, thy
boundless throne." Byron.

অধরে মধুর হাস, নানা রঙে চিত্রি বাস,
কে রমণী জগত ব্যাপিনী?
কি এক মধুর হাসে, কি এক মধুর ভাষে,
ভুলাও মানবে সুহাসিনী?
নিশিথে ছড়ায় কর নীলাম্বরে শশধর,
তারাদল হাসিতেছে তায়;
আলো ঢালি দেশে দেশে রমণী গো, এক বেশে
দেখা দাও, জগত ঘুমায়!
প্রভাতে নূতন বেশে, সাজি এস হেসে হেসে
মাথায় লইয়া অরুণ ভাতি;
নীলিমার নীলকান্তি, পূরবে কাঞ্চনকান্তি
ডেকে আন বিভাবসু জ্যোতি!
কাননে লতিকা কায় ফুটে ফুটে উঠে তায়
নব তারা কোরক ছড়ায়ে;
জেগে উঠে যত নর, না জানি গো নিরন্তর
কি মায়ায় রাখিছ বাঁধিয়ে!
গভীর, গভীর জলে সিন্ধু অম্বুরাশি তলে
ছড়াইছ সদা মুক্তা মণি;
ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে, অতি দূরে যথায় জীমূত উড়ে
অদ্রি পদে পড়িতেছে নমি,
তুমি সে গিরির মাথে সদাই তুষার পাতে
রবি করে স্বর্ণময় কর;
যে হেরে গো'মনলোভা সেই সে মাধুরী শোভা
উছলয়ে তাহারি অন্তর।

তুমিই গহন বনে বৃক্ষ কায় অনুক্ষণে
সাজাইছ বনলতা ফুলে ;
তুমি লয়ে প্রবাহিনী, কল্লোলিনী নির্ঝরিণী,
ধৌত কর বন বৃক্ষ মূলে !
অসীম ক্ষেত্রের মাঝে তুমিই সবুজ সাজে
দেখা দাও মনোহরা রাণী ;
তুমিই সাগর জলে ঊর্দ্ধে তুলি বাহুবলে
তটদেশে আছাড় হুঙ্কারি !
পুনঃ তুমি মরুক্ষেত্রে শুষ্ক মুখে শুষ্ক নেত্রে
দেখা দাও প্রকৃতি রমণী ;
বালুকা বসন পর, অনল বিস্তার কর,
নাহি শোভে বস্ত্রে বৃক্ষ-মনি ?
তুমিই বসন্তকালে মাধুরিমা নিজ ভালে,
পুষ্পদল শরীরে ফুটাও ;
পুনঃ গ্রীষ্মে তুমি নারী বর্ষিয়া অনল বারি
জীবদেহ তুমিই শুকাও !
নয়ন সলিলে ভাসি বরিষায় দিবানিশি
কাঁদ তুমি লীলাবতী বামা ;
পুনরায় শীতপাতে শিতল সমীর সাথে,
কেঁপে আস তুমি মনোরমা ;
কি খেলা গো লীলাময়ী খেলা সদা, স্নেহময়ী
তোমা বিনা জগৎ থাকে না ;
যেমতি চাঁদিমা বিনা চন্দ্রকান্তি মাধুরিমা
এ জগতে কভু সম্ভবে না !
"আদ্যাশক্তি মহামায়া" রাধিকা রমণী,
"আদ্যাশক্তি মহামায়া" প্রকৃতি জননী।

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুরাকালে আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিয়াছেন কি না পাঠক মহাশয় যদি জানিতে কৌতুহলী হইয়া থাকেন তাহা হইলে যোগের কথা শুনিবার পূর্ব্বে আরও একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। আমরা গৌরচন্দ্রিকা ত্যাগ করিয়া একেবারে কাজের কথা বলি, একেবারে কীর্ত্তন আরম্ভ করি। বেদ জগতের মধ্যে সর্ব্ব পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া সর্ব্ববাদী সম্মতি ক্রমে পরিগণিত হইয়াছেন। সেই বেদের বেদ ঋগ্বেদ, যাহারা রন্ধন পাত্রে মাংস ব্যবহার না করিয়া উত্তম ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত করিতে পারেন তাহাদিগকেই নিপুণ পাকাচার্য্য বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ ইঙ্গিতে নিরামিষাশী হইতে বলিয়াছেন কিন্তু যজুর্ব্বেদ স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন—"মনুষ্যেরা কৃষি লব্ধ দ্রব্য আহার করিয়াই প্রাণধারণ করেন। তুমি গো-হত্যা করিও না, তুমি মেষ বা অজা হত্যা করিও না। দ্বিপদ জন্তুগণও (পক্ষী ও মনুষ্য) বধ করা তোমার উচিত নয়। জন্তুগণকে রক্ষা করুন। হে পবিত্র, আপনিই ব্রীহিযব প্রভৃতি রক্ষা করেন। উদ্ভিদই সুধীগণের জীবন ধারণের উপায়।" মহাভারতেও এবিষয়ের উল্লেখ আছে। পিতামহ ভীষ্ম কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, পশু হনন না করাই সুনীতি, প্রকৃত সন্ন্যাস এবং অকৃত্রিম সত্য এবং ইহার প্রত্যেকটিই সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। বুদ্ধদেবের কথা আর কি বলিব ? অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। প্রকৃত বৌদ্ধ এখনও হিংসা করে না। জেন্দাবেস্তার কথা একবার সবিস্তারে পাঠক মহাশয়কে শুনাইয়াছি। এখন জেন্দাবেস্তা মাংস ভক্ষণ ও পশুহনন সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন। "যাহারা আপনাদের তৃপ্তিসাধন জন্য বা আনন্দ উদ্দেশে বাক্‌শক্তি হীন জীব জন্তুগণকে পীড়া দিয়া থাকে তাহাদের জন্য ভবিষ্যতে নিদারুণ মর্ম্মযাতনা ও নরকাগ্নি সঞ্চিত আছে নিশ্চয় জানিও।"

কথিত আছে যিশু জন্মাইবার আট শত বর্ষ পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ভূমে আমিষ ভোজন অজ্ঞাত ছিল। হিসিয়ড সেই সময় "স্বর্ণ যুগ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খৃষ্ট জন্মের পাচ শত বর্ষ পূর্ব্বে পিথাগোরস নামক গ্রীক

পণ্ডিত আমিষ ভোজনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যুনানী কবি অভিদ পিথাগোরসের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার আবার ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে পাঠক বর্গের কৌতুহল নিবৃত্তি জন্য আমরা একটু ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"And when you eat the well deserving beast,
Think on the labourer of your field you feast.
* * * *

Deaf to the call that lies beneath the knife,
Looks up and from her butcher begs her life;
Deaf to the harmless kid, that ere he dies
All methods to procure thy mercy tries,
And imitates in vain thy children's cries.
Where will he stop who feeds with household bread?
Then eats the poultry which before he fed.
Let plow thy steers that when thy lose their breath
To nature, not to thee, thay may impute their death,
Let goats for food their loaded udders lend.
And sheep from winter cold thy sides defend,
But neither springs nor nets, nor snares employ,
And be no more ingenious to destroy.
* * * *

Take not away the life you can not give,
For all things have an equal right to live;
* * * *

But nourish life with vegetable food
And shun the sacrilegious taste of blood.

সক্রেতিস বলিয়াছেন যে ভূমণ্ডলে মানব জীবন ধারণ করিতে মানবকে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন বিপদ পোহাইতে হয় সে সমস্তের একমাত্র কারণ আমিষ ভোজন। মানবের সর্ব্ব প্রকার ব্যাধির কারণ মাংস ভক্ষণ ও পশু হনন। ইহাকেই তিনি সংগ্রামের কারণ বলিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট জন্মিবার চারিশত

বৎসর পূর্ব্বে প্লেটো তাঁহার "রিপব্লিক" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে সক্রেতিসের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সেনেকা ৬৫ খৃঃ অঃ রোম-সম্রাট নিরোর নিষ্ঠুরতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি বলিয়াছেন "পুরাকালে আমাদের এত চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল না, অস্ত্র চিকিৎসার জন্য নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না আর বাক্স বাক্স ঔষধেরও আবশ্যকতা ছিল না। একটি সামান্য সরল স্বাভাবিক কারণে লোকের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ও সরল ছিল। বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য-ভোজ্যই বিবিধ প্রকার রোগের আকর। কেবল একটা পেটের জন্য কত শত—কি স্থলচর কি জলচর কি উভচর—প্রাণীর প্রাণ যায় একবার ভাবুন। যখন খাদ্যের প্রকার এমন ভিন্ন ভিন্ন তখন মানুষের রোগও বিভিন্ন আকারের না হইবে কেন? দেশের রাঁধুনীর যদি সংখ্যা গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে রোগ সংখ্যায় আর বিস্মিত হইবেন না।" পরম পণ্ডিত সেনেকা আর এক স্থলে বলিয়াছেন "যে উদর এখন বহুমূল্য প্রাণী দিয়া আমরা পূরণ করি সেই উদর পূরণ করিতে উদ্ভিদই যথেষ্ট। আমাদেরও না সেই কথা?

সচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য লম্বোদরস্যার্থে কঃকুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥

প্লুটার্কও মাংস ভোজনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। যে সংস্কৃত শ্লোকটি দেখিলেন প্লুটার্ক যেন ঠিক তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন "দেখা যায় ইতর জন্তুগণ কেহ ফল খায়, কেহ মূল খায় কেহ বা ঘাস খায়। তাহারা ত হীন বল জন্তুর আহার কাড়িয়া লয় না। কিন্তু মানব, ধন্য তোমার উদর, তুমি না কর কি? তুমি ত কোন দ্রব্যই বাদ দেও না, সকল দ্রব্যই ত তুমি আস্বাদন করিয়া থাক, ধন্য তোমার ক্ষুধা। কোন্‌টা তোমার খাদ্য আর কোন্‌টা অখাদ্য তাহা কি এখনও ঠিক হয় নাই। তোমার স্বাধীনতা আছে, তোমার ক্ষমতা আছে তোমার উপায় আছে বলিয়া মানব তুমি আপনার অভাব সৃষ্টি করিয়া মাংস ভোজন করিতেছ—শাক শবজীর ত অভাব নাই, তাহারা ত অফুরন্ত—তবে কেন অসুখ জনক অপবিত্র খাদ্য আহার কর—তবে কেন হত্যার মাংস খাও। ইহাতে তুমি যে বন্য জন্তু অপেক্ষাও অধম ও অধিকতর নিষ্ঠুর হইতেছ।

শোণিত, খুন-মাংস ইহা ত বনের বাঘ, শকুনি ও সর্পেরই উপযুক্ত আহার। মানুষের ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই—এটা কেবল বেশীরভাগ।

যদি জিজ্ঞাসা কর পিথাগোরস কেন মাংস ভোজনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন তাহা হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করিব, বলিতে পার সে নৃশংস হতভাগা কে যে প্রথমে এই মাত্র গমনাগমন করিতেছে। বুদ্ধি বলে ব্যাপার বুঝিতেছে, শব্দ করিতেছে এমন জীবন্ত প্রাণীকে সহসা হত্যা করিয়া তাহার রক্ত মাংসময় ছিন্ন বিছিন্ন দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া আপনার টেবিল সাজায় ও তাহার রক্তে আপনার পবিত্র মুখ কলুষিত করে ও তাহার শব দেহের মাংসে আপনার ওষ্ঠাধর কলুষিত করে ও তাহাই তাহার খাদ্য বলিয়া পরিচয় দেয়? কি করিয়া চক্ষু সেই রক্ত মাংসময় ছিন্ন বিছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৃষ্টি সহ্য করিল? কি করিয়া নাসা সেই নিদারুণ দুর্গন্ধ সহ্য করিল আর জিহ্বা কেমনে সেই আধপচা মাংসযুক্ত আঘাতের স্পর্শ ও পচা রক্ত এবং কল্‌তানির স্পর্শ সহ্য করিবে? কেন পৃথিবীর অপবাদ দেও খাদ্য কি পৃথিবীতে নাই? শ্রীশ দেবী (Ceres) বা বেক্‌স দেব (Bacchus) কি যথেষ্ট খাইতে দেন নাই। তাহাদের দত্ত ফলাদির সহিত হত্যাকাণ্ড ও রক্ত লিপ্ত করিতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না। সিংহ ব্যাঘ্র বা সর্পকে তোমরা হিংস্রক জন্তু বলিয়া বর্ণনা কর কেন না তাহারা মাংসাশী কিন্তু দেখিতে গেলে নিষ্ঠুরতর তোমরা কোন অংশেই তাহাদের দ্বিতীয় বা ন্যূন নও। কিন্তু ব্যাপার এই যে তাহাদের পক্ষে মাংস ভক্ষণ ভিন্ন জীবন ধারণের অন্য কোন উপায় নাই আর তোমাদের পক্ষে অন্য যথেষ্ট উপায় থকিতেও ইহা একটা ঘোরতর বিলাসিতা ও অপরাধ। তোমরা যদি এক দিন সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্প মারিয়া খাইতে পারিতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম যেন তাহারা তোমাকে খায় বলিয়া আত্ম রক্ষার জন্যই খাইতেছে কিন্তু তাহা ত তোমরা কর না, তোমরা গৃহপালিত পশু পক্ষী খাও, নিরস্ত্র পশু পক্ষী খাও যাহারা আত্মরক্ষার্থ তোমার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদিগকে দেখিলে আমার ইহা স্পষ্ট অনুমান হয় যে প্রকৃতি দেবী তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, ধরাধামে কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বিকাশের জন্য। হায় হায় মনুষ্য কি অসভ্য! মুদ্দারমরাসের অবতার স্বরূপ কসাই ও সূপকার যখন মৃতদেহ দ্বারা ধনীর টেবিল সাজায় তখন কি ভয়াবহ দৃশ্যই না

চক্ষে পতিত হয়! আবার আমার মনে হয় যে আহারের পর সে দৃশ্য যত ভয়াবহ আহারের পূর্ব্বে তত নহে—কেন না এখানে অস্থি খণ্ড ওখানে মাংস খণ্ড, অর্দ্ধ চর্ব্বিত মাংস বা অস্থি খণ্ড ঘর ময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখিলে দৃশ্য অধিকতর ভয়াবহই মনে হয়।

যাঁহারা বলেন স্বভাবই মাংস ভোজন দেখাইয়া দিতেছেন তাঁহাদিগকে বলি যে মানুষকে মাংসাশী বলা একটা ভ্রম। মানুষের আকার প্রকার দেখ—মাংসাশী নহে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে। কোনও মাংসাশীর ন্যায় তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নহে। শ্যেন পক্ষীর মত অতি কঠিন তীক্ষ্ণ বক্র চঞ্চু মানুষের কোথাও নাই। বাঘের মত সিংহের মত থাবা নাই, কুক্কুরের মত সুতীক্ষ্ণাগ্র দন্তাবলী মানুষের নাই। কঠিন মাংস হজম করিবার শক্তি মানবের পাকস্থলীতেও নাই রক্তের উষ্ণতাতে নাই। অপর দিকে যদি মানবের ক্ষুদ্র মুখ বিবরটির প্রতি, তাহার কোমল জিহ্বাটির প্রতি, তাহার সমতল সরল দন্তাবলীর প্রতি, তাহার অল্পশক্তি বিশিষ্ট পাকস্থলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিবোধ হইবে যে প্রকৃতি দেবী কখনই মানুষকে মাংসাশী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই এবং কখন ও এরূপ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। এত কথা সত্ত্বে যদি তুমি বল না মানুষের মাংস খাইবার অধিকার আছে তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই মাংস ভক্ষণ করিতে দিব কিন্তু তোমাকে সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় সর্পের ন্যায় মাংস খাইতে হইবে। তোমাকে নখর ও দন্তের সাহায্যে জীব হত্যা করিতে ও পরে তাহার আম মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে। আমি তোমাকে ছুরি কাঁচি তরবাল কুঠার কাটারি লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিব না। কই ব্যাঘ্র ত অস্ত্র ব্যবহার করে না? একবার যাও না ঐ যে স্কন্ধ বাঁকাইয়া শৃঙ্গ পাতিয়া বলীবর্দ্দ আসিতেছে, যাও না, তোমার নখর ও মুখ সাহায্যে উহার আম মাংস একবার খাইতে যাও না; মার মার দন্ত ও নখর সাহায্যে হত্যা কর। মরিয়াছে—মাটিতে পড়িয়াছে। এইবার হইল, বাঘের মত বসো খাইতে আরম্ভ কর, ঐ খানে বৃষের প্রাণটা আছে উহার হৃদয়ে মুখ পূরিয়া দিয়া, গায়ে মাথায় মুখে রক্ত মাখিয়া আম মাংস খাও। এতক্ষণ যে ব্যাপার হইল—যাহা তুমি সত্য সত্য করিলে—এখন তোমায় জিজ্ঞাসা করি প্রাণী ভোজন করিতে, বুদ্ধিজীবী জীব ভোজন করিতে কি—তোমার

জন্ম হইয়াছে? না হয় নাই। জিজ্ঞাসা করি কেন—তুমি কসাই বাড়ী হইতে আনিয়াই কাঁচা মাংস খাও না? কেন তুমি আগুণ দিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া সহস্র প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ও মসলা দিয়া সেই কাঁচা মাংসের স্বরূপ বদলাইয়া দাও—কেন তুমি তাহার রূপ ও আস্বাদন বদলাইয়া দিয়া মনকে আঁখিঠার যে তুমি জীবী জীব খাইতেছ না? না না জ্ঞানীর জন্য মাংস ভোজন নহে। শেষ কথা এই ঘোরতর মূর্খের পক্ষেই মাংস ভোজন।"

পাঠক মহাশয় ব্যাপারটা দেখিলেন প্লুটার্কের লেখাটার জোরটা দেখিলেন—তবু অনুবাদে আমরা মর্ম্ম ঠিক রাখিতে পারি নাই।

পরফিরি খৃঃ তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি ও লগুড় হস্তে মাংস ভোজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। "তাহারা বলুক যে মাংস ভোজনের যোগাড় করিতে কত সময় ও অর্থ নষ্ট হয়, তাহারা বলুক মাংস ভোজনে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কুৎসিৎ মনোবৃত্তি নিচয় সাতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কি না, যাহা নিরামিষ ভোজনে কখন হয় না? ইহা যদি তাহারা অস্বীকার করিতে না পারে, তাহাদের জ্ঞানী ও চিকিৎসকেরাও যদি অস্বীকার করিতে না পারে, তবে কেন মাংস ভোজনের দ্বারা তাহারা নিজের উপরই অত্যাচার করিতেছে? তবে কেন আমরা মাংস ভোজন ত্যাগ করিব না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শত শত গুপ্ত বিপদের ফাঁদ যাহা মাংস ভোজন সঙ্গোপনে পাতিয়া রাখিয়াছে সেই সকল হইতে উদ্ধার না পাইব কেন? নিশ্চয় জানিও যাহারা নিরামিশ ভোজী তাহাদের মধ্য হইতে কখনও খুনী, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী, ডাকাত ও চাটুকারের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু যাহারা মাংস ভোজী তাহাদের মধ্যেই এই সমস্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। মানব জীবন ধারণ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, অতি সামান্য চেষ্টাতেই হয়। আর সেই জন্য সাম্য ও ন্যায়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মনের শান্তি বিসর্জ্জন দিবার আবশ্যকতা নাই।

পাঠক দেখিবেন আমরা কেবল মাত্র বৈদেশিকদিগের কথিত বিবরণ দিতেছি। তাহার কারণ এই। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার মাতা হইতেছেন রোম, মাতামহী হইতেছেন গ্রীস। প্রমাতামহী আরব ও বৃদ্ধ মাতামহী ভারতের কথা স্বীকার করিরেন কি না জানি না বলিয়া ত্যাগ করিলাম কিন্তু একথা জানা কথা যে মহম্মদ গো হত্যার পক্ষপাতী ছিলেন

না। তাই য়ুরোপীয় সভ্যতার বর্ত্তমান মাংসভোজী শিষ্য সম্প্রদায়কে আমরা রোম ও গ্রীসের কথাই শুনাইতেছি যে দেখুন তাঁহারাই কি বলেন। আর দুই একটি কথা বলিলেই এই কথা শেষ হইবে। সে কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। য়ুরোপ আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া আজ খৃষ্টীয়ান। যেন খৃষ্টানের মাংস ভোজন নিষেধ নাই। কিন্তু দেখিতে পাই প্রথমে যে সকল মহাত্মারা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, যাঁহারা ইতর ভদ্র দীনদুঃখী রাজা সম্রাট সকলের নিকট নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, যাঁহাদের নির্য্যাতনের কথা পাঠ করিতে চক্ষে জল আসে সেই সকল মহাত্মারাও মাংস ভোজনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের নাম মাত্র উল্লেখ করিব বিশেষ বিবরণ দিবার স্থান ও সময় নাই। ক্লীমেণ্ট (আলেকজান্দ্রিয়া) টারটুলিয়েন, কুসটম ইহারা সকলেই মাংস ভোজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় এ সম্বন্ধে খৃষ্টানের ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল কি বলিয়াছেন একবার এই সময় শুনিবেন কি? জেনিসিস প্রথম অধ্যায় ২৯। ৩০ দেখুন।

"And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so."

এই ত বাইবেলের কথা। কিন্তু হায় বাইবেলের কথা কয় জন খৃষ্টান শুনে? এই সে দিন চর্চ্চগামীদিগের লোক সংখ্যা ইংলণ্ডে লওরা হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে অতি অল্প সংখ্যক লোকই চর্চ্চে যান। সে যাহা হৌক এই খৃষ্টানের নিকট গাভী কি বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন তাহা শুনিবেন কি?

"Despite my long and useful life
They give me to the butcher's knife.
He ties me up without a tear
And cuts my throat from ear to ear.

My mouth is dumb, unformed for cries
But hot tears glisten in my eyes
Soon all my luckless flesh and bone
Ungrateful mortals fatten on.
My murderers shall come to grief
Along with all who relish beef;
When I am a man and you a cow
I'll treat you as you treat me now.*

(অনুবাদ)

গাভীর অভিযোগ।

চির দিন খাটি আমি তাহাদেব তরে।
তারা কিন্তু দেয় মোরে কসা'য়ের করে॥
নাহি ফেলে ফোঁটা জল বাঁধিবার কালে।
আকর্ণ ছুরিকা টানি কেটে দেয় গলে॥
ফুকারে কাঁদিতে নারি বাক্‌শক্তি হীন।
উষ্ণ অশ্রু আছে কিন্তু দুই চক্ষে লীন॥
অকৃতজ্ঞ নর খাবে অস্থি মাংস চয়।
অভাগায় খেয়ে ত্বরা হবে স্থূলকায়॥
মম হত্যাকারী সবে উৎসন্ন যাবে।
সুখে আর যত জন মোর মাংস খাবে॥
তুমি যদি গাভী হও আমি পুন নর।
মোর ব্যবহার টের পাবে অতঃপর॥

কেলোগ সাহেব বলেন বাইবেল মতে আদিম মনুষ্যেরা যাহারা কেবল ফল মূল খাইতেন তাহারা অধিক দিন বাঁচিতেন। তার পর যেমন মাংস আহার আরম্ভ হইল অমনি পরমায়ু কমিতে লাগিল। নোয়া বাঁচিয়াছিলেন

* Quoted by J. H. Kellogg M.D. in his book "Shall we Slay to Eat." p 16 from "The cow's complaint" written by a Buddhist priest and translated into English by a medical friend of the author.

৯৪০ বৎসর, সেন (পুত্র) ৬০০ বৎসর, প্রপৌত্র শালা ৪৩৩; শালার প্রপৌত্র রু ২৩৯; রুর প্রপৌত্র টেরা ২০৫; টেরার প্রপৌত্র যোজেফ ১১০ বৎসর। ডেবিডের সময় লোকের পরমায়ু ছিল ৭০ বৎসর। আর এখনকার লোকের পরমায়ু গড় হিসাবে হইয়াছে ৪২।

বর্ত্তমান কালের নিরামিষ ভোজীদের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের নাম। শেলি, গ্রে, পোপ, টমসন, মিল্টন প্রভৃতি কবিগণ। অপর শ্রেণীর মধ্যে দোথ হলার, রুষো, পেলি হিউফল্যাণ্ড, ডাক্তার এবারনীতি, ডাক্তার ল্যাম্ব, ডাক্তার চেইন, লামার্টিন, সাইক্লে, বুকো, সোপেনহর প্রভৃতি। স্যর বি, ডব্লিউ রিচার্ডসন, ডাক্তার জন্ বেল, আচার্য্য নিউম্যান, সঙ্গীত অধ্যাপক ওয়াগনার। রেমিনী বাহুলীন বাজাইতেন তিনি বলিতেন যে দিন নিরামিষ খাই সে দিন বাজাই ভাল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৬ বৎসর বয়স হইতে নিরামিষ ভোজী হন। এলবাট, ফুলার, ডানা, হপর্ণ, এমার্সন, থরো, গ্রীকলে প্রভৃতি বড় বড় লোক সকলেই নিরামিষ ভোজী। পৃথিবীতে এই সকল সাময়িকপত্র নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী; গুড হেল্‌থ, মডার্ণমেডমিন, মেডিকেল মিসনারী, গসপেল অব হেল্‌থ, প্যাসিফিকা হেল্‌থ জর্ণাল, দি ভেজিটেরিয়ান, দি ভেজিটেরিয়ান মেসেঞ্জার এণ্ড রিবিউ, দি এমেরিকান ভেজিটেরিয়ান, ফুডহোম এণ্ড গার্ডন, Vegetarischer Vorwaerts, Die Vagetarische Rundschau Die Vegetarische Warte, Unser Hansar zt, Der Vegetarier, হেরাল্ড অব হেল্‌থ, হেরাল্ড অব দি গার্ডেন এজ, দি হার্বিঞ্জার, দি জর্ণাল অব হাইজিন, দি হিউম্যানিটি হেল্‌থ মেসেঞ্জার, আউয়ার এনসেল ফ্রেণ্ডস্, আউয়ার ডম্ এসিসেলস্, Le Vulgarisate nr et Messager de l' Hygiene, সাউথ এমেরিকান জর্ণাল অব হেল্‌থ Gute Gesundheit, La Salud.

কেলোগ সাহেব তাঁহার পুস্তকে প্রমান করিয়াছেন (shall we Slay to Eat) যে বিজ্ঞান মতে মানুষের আহার নিরামিষ হওয়া উচিত। তিনি মানুষের সর্ব্বাঙ্গের গঠন লইয়া বিচার করিয়াছেন ও ইহা দেখাইয়াছেন যে মাংস ভোজীর লেজ হয় কিন্তু বন মানুষ, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং শ্রেণীর বানরের ও মানুষের লেজ নাই।

তিনি দেখাইয়াছেন যে মাংস ভোজনে কতক গুলি ব্যাধির উৎপত্তি

হয়। যক্ষ্মা, বিসূচিকা, টাইফয়েড জ্বর, ব্রাইট্‌স ডিসিজ, মূত্রাশয়ের অপর অনেক রকম পীড়া, টীস্থ পয়জন, বাত, পেটের ব্যারাম, ক্যান্সার ও দাঁতের পীড়া।

তারপর তিনি দেখাইয়াছেন যে লোকে ভ্রম ক্রমে বলে মাংস বেশী পুষ্টিকর, তাঁহার এই তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে মাংস পুষ্টিকর কি শস্যাদি পুষ্টিকর—

তালিকা।

দ্রব্যের নাম।	এক পৌণ্ডে কতটুকু খাদ্য আছে।
বীফ্ বা গোমাংস	৫১২
আলু	৪৪৫
দুগ্ধ	৩০৯
চাউল	১৯৪৪
মটর শুঁটি	১৭১১
গোধূম	১০৮৮
বাদাম	১৬৯৬
ওয়াল নট (আখরেট)	২৯৫৩
হেজেল নট	৩৫৫৩
বাদাম	২৮৫৩
পী নট (কলাই দীঃ)	২৫৬০
নারিকেল	১৭২৮
মলটেড নট (যব শুষ্ক)	২২৩৬

তবেই পাঠক পাঠিকা দেখিলেন যে মাংস বেশী পুষ্টিকর বলিয়া সাধারণের যে একটা ধারণা আছে সেটা ভ্রম। আমিও একজন সাধুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে তামস ও রাজস খাদ্য খাইতে নাই কেবল সাত্ত্বিক খাদ্য খাইতে হয়। কাল ও লাল দ্রব্য সাধারণ তামস ও রাজস। আর শ্বেত দ্রব্য সাত্ত্বিক। মসুর ডাল রাজস, পুঁইশাক তামস এই জন্য পুষ্টিকর হইলেও ত্যজ্য। কিন্তু আতপ চাল, দুগ্ধ, যব, গোধূম, ঘৃত, ইক্ষু, কদলী প্রভৃতি ইহারা সকলেই সাদা এবং সাত্ত্বিক। এই বলিয়া তিনি বলেন সাদা বড় মটর ও বরবটি বা হনুমান কড়াই তুল্য সাত্ত্বিক পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই।

পশ্চিমাঞ্চলে কেবল মাত্র সাদা মটরের বা বরবটির ঠাকুরের নিকট নৈবেদ্য দিবার রীতি আছে। ডাক্তার কেলোগের পুস্তক হইতে আমরা অনেক কথাই সংগ্রহ করিলাম। পাঠক মহাশয়কে পুস্তক খানি পাঠ করিতে বার বার অনুরোধ করি। ইহা ১৮৯৯ সালে উত্তর আমেরিকার মিচিগান সহরে গুড হেল্‌থ পবলিসিং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। ডাক্তারও বলিয়াছেল—

An ounce of meat contains 32 food units, while an ounce of rice contains 121 food units and an ounce of pea nuts 160 food units. It thus appears that flesh food is inferior in force producing qualities even to those cereals that contain a large proportion of starch and that are often regarded as a light diet, such as rice, an ounce of which contains nearly three times as many food units as are contained in a like weight of lean meat, while the food value of an ounce of pea-nuts is over four and one-half times that of an ounce of beef.

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে মাংস অপেক্ষা ভাত তিনগুণ ও মটর প্রভৃতি সাড়ে চারিগুণ পুষ্টিকর। মনে পড়ে একবার একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী আগরা সহরে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সময় গো রক্ষণী সভা একটু বেশী বড়াচড়া করিয়াছিলেন বলিয়া ও বখরিদে দুই একটি দাঙ্গা হইবার কারণ, বক্তৃতা কালে বক্তা এই মর্ম্মে বলেন যে তোমরা হাজার বল আমরা গোমাংস ভক্ষণ ছাড়িব না, ছাড়িতে পারিব না। ইংলণ্ডের বল বীর্য্য প্রতাপ গৌরবের একমাত্র কারণ বৃটিসের গোরাসেনা আর সেই গোরাসেনার উৎপত্তির কারণ গোমাংস। গোমাংসই ইংলণ্ডকে বর্ত্তমান পদবীতে সমাসীন করিয়াছে ইত্যাদি। স্মরণ হয় এই বক্তৃতা সমালোচনা কালে "অমৃত বাজার পত্রিকা" দেখাইয়াছিলেন যে মোগল সম্রাটের মধ্যে কেহ কেহ সাজেহান প্রভৃতি গোহত্যা নিবারণ কল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিল্লীর মুসলমান বাদসাহ শাহ আলম গোহত্যা নিবারণ ও গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়া যে এক আদেশ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন

অমৃত বাজার তাহার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ। রোগী, বৃদ্ধ ও শিশুর প্রাণ রক্ষার এক মাত্র উপায় গোদুগ্ধ। ধর্ম্মার্থে উপবাসীরও দুগ্ধ সম্বল। যে ভাত ডাল রুটী খাইয়া জীবন ধারণ কর ভারতে তাহার উৎপত্তির কারণ গো-জাতি। ধর্ম্মার্থে পশু হনন উপলক্ষে যে গোহত্যাই করিতে হইবে শাস্ত্রে এমন বিধান নাই। এই সকল ও অপরাপর কারণ দর্শাইয়া বাদসাহ গোহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় রাজ বক্তা অজ্ঞান ও ভ্রম বশতই ঐরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে ভ্রম নিরসন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভূমণ্ডলে হস্তী ও সিন্ধুঘোটকের তুল্য বলশালী জন্তু আর দ্বিতীয় নাই। বৃটিস গোরা অপেক্ষা তাহাদের শক্তি অনেক অধিক। তাহারা কিন্তু মাংস ভোজন করে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বন মানুষ—ওরাংউটাং শিম্পাঞ্জি, গোরিল্লা ইহারা মাংস খায় না কিন্তু শক্তি অসাধারণ। গোরিল্লা সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ব্যাধের বন্দুক শুদ্ধ পল্লবের মত ভাঙ্গিয়া দেয় কিন্তু শিকারী ব্যাধের মাংস খায় না। বক্তা জানিতেন না কি যে তাঁহার ইংলণ্ডেই মৃগয়ামোদী ব্যাক্তিগণ মৃগয়ার পূর্ব্ব দিন শিকারী কুকুরকে মাংস খাইতে দেন না? মাংস খাইলে পরিশ্রম করিতে পারিবে না ছুটিতে পারিবে না, দম থাকিবে না বলিয়া মাংস খাইতে দেয় না। বল্গা হরিণ তীরের ন্যায় ছুটিতে পারে, বেগে অদ্বিতীয় কিন্তু মাংস খায় না। অতি প্রাচীন কালে গ্রীশের পশু-যোদ্ধাগণ (গ্লাডিয়েটর) নিরামিশ ভোজন করিত। স্পার্টার অভ্যুদয় কালে লাইকরগসের আইনে সকলে নিরামিষ ভোজন করিত। মিসরের রাজা সেমের উচ্চে ৮ ফিট ৭ ইঞ্চি ও বক্ষে প্রশস্তে ৫ ফিট ছিলেন। তিনি ও পারস্য রাজ সাইরস নিরামিষ ভোজী ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস বলেন যে যাহারা পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা সকলেই নিরামিষ ভোজী ছিল। লেস্‌পস্ সাহেব সুয়েজ খাল কর্ত্তন করেন। তিনি বলিয়াছেন যে নিরামিষ ভোজী হিন্দু ও আরবগণ এই কার্য্যে ইংরেজদের অপেক্ষা দ্বিগুণ কার্য্য করিতেন, অন্ন ও ছাতু আহার করায় তাহাদের পীড়া হইত না কিন্তু মাংস ভোজীদের সদাসর্ব্বদা পীড়া হইত। একথা জানা কথা যে হংকং, রুম, স্মীর্ণা, আথেন্স ও দক্ষিণ আমেরিকায় রায়ো জেনিরোর কুলীরা সাড়ে সাত মণ পর্য্যন্ত মোট মাথায় করে।

ইহারা সকলেই নিরামিষাশী। বাইসিকেল দৌড় বাজীতে ভায়েনা সহরে ১৩ জন মাংসাশীকে পরাস্ত করিয়া নিরামিষ ভোজী দুই জন ৩৬১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াও জয় লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথম মাংসাশী ২২ ঘণ্টা পরে আসিয়াছিলেন।

জার্ম্মেনীতে আর একটি বাজী হয়। ৭০ মাইল ১৪ ঘণ্টায় যাইতে হইবে এইরূপ স্থির হয়, ২২ জন যাত্রীর মধ্যে ৮ জন নিরামিষ ভোজী ছিলেন। সময় উত্তীর্ণ হইবার অগ্রেই ৬জন নিরামিষাশী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হন। আরও দুই জন পথ ভুলিয়া ৫ মাইল বেশী চলিয়া একটু বিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হন। এই ছয় জন উপনীত হইবার পরও একটু ক্লান্ত হন নাই। দেড় ঘণ্টা পরে একজনমাত্র মাংসভোজী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়েন; বাকী তাঁহার সঙ্গী কয়জন মধ্য রাস্তাতেই রণে ভঙ্গ দেন। এই রূপ অনেক বাজী নিরামিষ ভোজী জিতিয়াছেন। বেকংগো জাতিও কেবল মাত্র নিরামিষ ভোজী হইয়া বহু পরিশ্রম করিতে পারে। এডওয়ার্ড পামার, ডাক্তার হেগ স্যার হোম, বেরণ কুভিয়ার, লরেন্স, স্যার আর ওয়েন, পুচে, চার্লস বেল, ড্রেজওয়েকী ওল্ডফীল্ড ডক্তার মার্সডেন, ফদারজিল, কুনী, লর্ড বেকন প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন মানব জীবন ধারণে মাংস ভোজনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বক্তা বল বীর্য্যের জন্য বলিয়াছিলেন যে গোমাংস খাইতে হইবে নহিলে ইংলণ্ডের বীর্য্যহীনতা হইবে। হায় হায় বক্তার কি এটাও জানা ছিল না যে, যে জাপান আজ সর্ব্বাংশে ইংলণ্ডের সমকক্ষ প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলিয়া সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে পরিগণিত, সেই জাপান মাংস খান না—জাপানী ভেতো জাপানী, ভেতো বাঙ্গালীর মত ভেতো জাপানী। হায় ভেতো বাঙ্গালীও এক দিন সেনাপতিত্ব করিয়াছিল। যাহা হৌক জাপানীর দেখিয়া ত বুঝা উচিত যে মাংস ভক্ষণ বিনা মানুষ পরাক্রমে ও বীর্য্যে শীর্ষস্থানীয় হইতে পারে; অথচ যোগপথ খোলা থাকে।

এক্ষণে নিরামিষ ভোজীদিগের যে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ হয় তাহারই দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া একথার উপসংহার করিব। ড্রাকেন বর্গ (দিনেমার) ১৪৬ বৎসর বাঁচে। জীন করিণ (হঙ্গেরী) ১৭২ বৎসর ও তস্য স্ত্রী ১৬৪ বৎসর বাঁচে। পেতরাস জার্টান (হঙ্গেরী) ১৮৭। হেনরি জেঙ্কিন্স (ইংরেজ)

১৬৯। দক্ষিণ আমেরিকার একজন কাফ্রী স্ত্রীলোক ১৭৫ বৎসর বাঁচে। জীন এফিংহাম (ইংরেজ কর্ণওয়াল) ১৪৪, ইনি কখন মদ্য পান করেন নাই বা মাংস খান নাই। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ৩ মাইল পথ বেড়াইয়াছিলেন। এনথনি সেনিস ১১১ বছর। কর্ণারো (ইতালী) ঐরূপ। ডাক্তার এডবার্ড পামার অনেকগুলি দীর্ঘজীবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আর আমাদের বঙ্গদেশে গলিতে গলিতে বা গ্রামে গ্রামে সেকালের দীর্ঘজীবী লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঠক মহাশয় দেখিলেন কেবল মাত্র মাংস ভোজন ত্যাগ করিয়া লোকে কতদিন বাঁচিতে পারে। এখন আবার একজন আমেরিকান ডাক্তার বলিয়াছেন যে রুটি না খাইয়া কেবল ফল মূল ও ঝরণার জল খাইলে মানুষ অনায়াসে বহু দিবস বাঁচিয়া থাকিতে পারে। হায় আর্য্য ঋষিগণ! কোথা তোমরা—তোমরা না ফল মূল ঝরণার জল খাইতে? যাহা হৌক এই আহারের উপর আবার যদি যোগের সংযোগ হয় তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে না কি? মানুষের তাহা হইলে ইচ্ছা মৃত্যু হইবে না কি?

যাহাহৌক যাঁহারা আগরা-বক্তার দলের লোক তাঁহাদের উপকারার্থে আমরা একটুকু কেলোগ ডাক্তারের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিব?

"The popular notion that a flesh diet has in some way contributed to the intellectual superiority of the English-speaking races can not be shewn to have any real foundation in fact. That the English and other flesh eating nations have acquired commercial and political supremacy in modern times in not due to the fact that they have been flesh-eaters, but rather in spite of it. Thorough investigation of the subject shows that as a matter of fact, the bone and sinew of the British nation—the peasantry, or farmers,—make very little use of meat, while in Ireland and Scotland, with the exception of the wealthier classes (those who live in towns), flesh is used so sparingly that it must be considerd rather as a luxury than a food. The advantages

which the English-speaking and other civilized nations enjoy over semi-civilized and uncivilized nations and tribes are due to other causes than the use of flesh food. As evidence of this it is only necessary to call attention to the numerous wild tribes who live almost exclusively upon flesh food, and yet are by all odds the most degraded, the most immoral, and the most rapidly perishing of all human beings, civilized or uncivilized. And that flesh eating is not essential to intelligent progress is clearly shewn enough by the fact that the people of India, who are practically a nation of vegetarians, have maintained from the most remote ages a very complete literature and a very high grade of civilization and in India the most cultivated and intelligent of all classes are the Brahmans and Buddhists, who are strict vegetarians, and have been such for more than two thousand years."

ইহার মর্ম্মার্থ এই—লোকে যে মনে করে, যে মাংস ভোজনকারী বলিয়াই ইংরাজী ভাষায় যাহারা মনোভাব প্রকাশ করে সেই জাতি সকলের বুদ্ধি বৃত্তির প্রাধান্য—তাহার কোনই ভিত্তি নাই, ইংরাজেরা এবং অপর মাংস ভোজী জাতিরা বর্ত্তমান কালে যে রাজকীয় ও বাণিজ্য বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার কারণ মাংস ভোজন নয়—বরং তদন্যথাই তাহার কারণ। বৃটিষ জাতির যাহারা অস্থি মজ্জা—অর্থাৎ কৃষকেরা—তাহারা মাংস খায়ই না, বিশেষ গবেষণা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আবার আয়র্লণ্ডে ও স্কটলণ্ডে—ধনী অথচ যাঁহারা নগরে বাস করেন ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও—মাংসের ব্যবহার এত অল্প যে ইহাকে খাদ্যই বলা যায় না, কোন দিনের খোষ খানা বলা যাইতে পারে। অসভ্য কিংবা অর্দ্ধ সভ্য জাতির উপর ইংরেজী-ভাষীরা আর অপর সভ্য জাতিরা যে কতকটা সুবিধা (আধিপত্য) পাইয়াছেন তাহার অপর কারণ আছে, মাংস ভক্ষণ নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা অনেক কেবলমাংসভোজী বন্য জাতির উল্লেখ করিতে পারি। তাহারা জঘন্য নীতিবহির্ভূত জাতি এবং শীঘ্রই ধ্বংস

হইবে। মাংস ভোজনে যে বুদ্ধির উন্নতি হয় না তাহার দৃষ্টান্ত ভারত প্রদান করিতেছে। ভারতবাসী কাহাত নিরামিষ ভোজী, ইহারা কি অতি পুরাকাল হইতে আপনাদের পূর্ণ সাহিত্য ও সম্পূর্ণ সভ্যতা সংরক্ষণ করিয়া আসে নাই? আবার সেই ভারতের মধ্যে যাহারা অতিশয় বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত তাহারাই ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ—আর তাহারাই দুই সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর নিরামিষ ভোজন ব্রত অবলম্বন করিয়া আসিতেছে।

পাঠক মহাশয় এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যোগীদের আহার কেন নিম্নকথিত রূপ হইল।

গোধূম শালি যব যষ্টিক শোভনান্নম্
ক্ষীরাদ্যখণ্ড নবনীত সিতামধূনি।
শুণ্ঠী কপোলক ফলাদিক পঞ্চ শাকম্
মুদ্গাদি দিব্য মুদকঞ্চ যোগীন্দ্র পথ্যম॥

হঠ প্রদীপিকা।

গোধূম, শালি ধান্য, যব, যষ্টিক ধান্য রূপ সুচারু অন্ন, ক্ষীর অখণ্ড নবনীত, চিনি, মধু, শুণ্ঠী, কপোলক ফল, পঞ্চশাক মুদ্গ প্রভৃতি এবং উত্তম জল এই সকল সামগ্রী যোগীদের পথ্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দত্তাত্রেয় অলর্ককে বলিতেছেন (এক চত্বারিংশ অধ্যায়—১১ হইতে ১৫ শ্লোক দেখুন) যবাগূ, তক্র, দুগ্ধ, যাবক, ফল, মূল, প্রিয়ঙ্গু, কণ, পিণ্যাক ও শক্তু এই সকল বস্তুই যোগিগণের ভিক্ষা করা উচিত। এই সকল বস্তুই তাঁহাদের কল্যাণকর ও সিদ্ধিদায়ক আহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অতএব পরম সমাহিত ও ভক্তি যুক্ত হইয়া এই সকল দ্রব্য উপযোগ করাই কর্ত্তব্য। যোগী ভোজনের পূর্ব্বে একবার জলপান পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া "প্রাণায়" এই বাক্যে আহার করিবেন, ইহাই যোগীর প্রথমা আহুতি বলিয়া অভিহিত। তদনন্তর ক্রমানুসারে "অপনায়" বলিয়া দ্বিতীয় আহুতি, "সমানায়" বলিয়া তৃতীয় "উদনায়" বলিয়া চতুর্থ এবং "ব্যানায়" বলিয়া পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে প্রাণায়াম দ্বারা পৃথক করতঃ স্বেচ্ছাক্রমে শেষ ভোজন সমাপন করিবেন, তদনন্তর পুনরায় আর একবার সলিল পান করিয়া আচমনান্তে হৃদয়দেশ স্পর্শ করিতে হইবে। (পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)। পাঠক মহাশয় দেখিবেন এখনও ব্রাহ্মণের গণ্ডুষে এই ব্যাপার বর্ত্তমান।

হঠ প্রদীপিকা এই সকল খাদ্য যোগীদের অপথ্য বলিয়াছেন; সংস্কৃত উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই অনুবাদই দি, কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ, উষ্ণ দ্রব্য, হরীত শাক, বদরী ফল, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, বরাহ ও ছাগলাদির মাংস, দধি, তক্র, কুলত্থ কলায়, পিণ্যাক, হিঙ্গু, লসুন প্রভৃতি।

যোগীরা হয় যাবাবর না হয় গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা করিবে; কিন্তু গৃহস্থগণের নিকট ভিক্ষাই প্রশস্ত। যখন গৃহি-জনের গৃহ অগ্নি বিহীন ও ধূমশূন্য হইবে, যখন গৃহস্থ ব্যক্তি ভোজন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে তখনই যোগী প্রত্যহ ভিক্ষায় গমন করিবেন। যোগবিদ্ ব্যক্তি আতিথ্য, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, যাত্রা, মহোৎসবে কদাচ কুত্রাপি গমন করিবেন না এবং সিদ্ধির জন্য মহাজনের নিকট গমন করাও উচিত নহে। তবে যোগী বাস করিবেন কোথা?

সুরাজ্যে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে
একান্ত মাঠকা মধ্যে স্থাতব্যং হঠ যোগীনাম্।

যেখানে অনেক ধার্ম্মিক লোক বাস করিয়া আছেন এবং সুখে ভিক্ষা পাওয়া যায় সুরাজ্যের এমন নিরুপদ্রব স্থানে যোগমঠে নির্জ্জনে হঠযোগী বাস করিবেন। তাঁহার যোগমঠ এই রূপ হইবে—ক্ষুদ্র দ্বার থাকিবে, অপচ রন্ধ্র হীন গর্ত্তযুক্ত অতি উচ্চও নয় অতি নীচুও নয়; সর্ব্বাংশে গোময় লিপ্ত এবং নিঃশেষ রূপে যোগবাধক দ্রব্য বিহীন হইবে; বাহিরে মণ্ডপ, কূপ ও বেদী প্রস্তুত হইবে আর সমস্ত মঠটি চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত হইবে। দত্তাত্রেয় সংহিতা বলেন এই মঠ প্রতি দিন আলস্য বর্জ্জন পূর্ব্বক সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে, ধূপ, গুগ্গুল প্রভৃতি ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা সুবাসিত করিতে হইবে। আর যোগী বীর্য্যধারণ করিবেন।

যদি সঙ্গ করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুক্ষয়ে বিন্দু হীনাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জং কুর্য্যাদভ্যাস মাদরাৎ।
যোগিনো হঙ্গস্য সিদ্ধঃস্যাৎ সততং বিন্দু ধারণাৎ॥

স্ত্রীসঙ্গ করিলে বিন্দু ক্ষয় হয় এবং বিন্দু ক্ষয় হইলে আয়ু নাশ ও বল নাশ হয় অতএব সযত্নে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ অভ্যাস করিবে। বিন্দু ধারণ দ্বারাই যোগীদের সমুদয় যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

হুগলী কাহিনী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ কোম্পানীর বঙ্গে পুনরাগমন এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলী।

নবাব সায়েস্তা খাঁ অতি বৃদ্ধ হওয়ায় কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থানে ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গের নবাব নিযুক্ত হইলেন। ইনি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইঁহার শাসনাধীনে ইংরাজদিগের সৌভাগ্যরবি পুনরুদিত হইয়াছিল। তাঁহারা পুনরায় বঙ্গে ব্যবসা বানিজ্য করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট তারিখে সুতানুটীতে জব চার্ণক্ ইংলণ্ডের পতাকা উড্ডীন এবং কলিকাতার ভিত্তি স্থাপন করেন। কলিকাতার সমৃদ্ধি দেখিতে চার্ণক জীবিত ছিলেন না কারণ দুই বৎসর পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রাসাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বারাকপুরে বড় লাটের পল্লী আবাসের নিকটে সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জার প্রান্তে সমাধিস্থ আছেন। চার্ণকের স্মরণার্থ আজও লোকে বারাকপুরকে "চানক" নামে অভিহিত করে। নবাব ইব্রাহিম খাঁর আমলে মির আলি আকবর হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

ইংরাজেরা অনেক দিন হইতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ ও টঙ্কশালা স্থাপনের অভিলাষী ছিলেন কিন্তু মোগল রাজ কর্ম্মচারীদিগের বিদ্বেষভাব বশতঃ তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এমন একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিল। চিতোয়ার জমীদার শোভাসিংহের যথা সর্ব্বস্ব বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম লুণ্ঠন করেন। শোভাসিংহ প্রতিহিংসা চরিতার্থ মানসে সৈন্য সামন্ত সহ বন পথে গমন করিয়া অকস্মাৎ বর্দ্ধমান রাজবাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণরাম হঠাৎ বিপৎপাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। শত্রুদিগের গতি প্রতিরোধ করিবার কোনও উপায় না দেখিয়া নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য স্বীয় পুত্র জগৎরামকে গোপনে নদীয়ায় পাঠাইলেন। তিনি রাজপুত বীরের ন্যায় রাজপরিবারস্থ মহিলাদিগকে শত্রু

হস্তে লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। এই ভয়ঙ্কর হত্যাভিনয়ের অব্যবহিত পরে শোভাসিংহ সসৈন্য বর্দ্ধমান রাজবাটী আক্রমন করিলেন এবং যুদ্ধে কৃষ্ণরামকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। সমগ্র বর্দ্ধমান শোভাসিংহের হস্তগত হইল। কৃষ্ণরামের দুহিতা ঘটনা বিপর্য্যয়ে নিহত না হওয়ায় শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। শোভাসিংহ তাঁহার কমনীয় সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রণয়াস্পদ হইবার জন্য সযতনে সসম্মানের সহিত তাঁহার তত্ত্বাবধারনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এদিকে জগৎরাম নদীয়ার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ যশোহরের ফৌজদার নুরুল্লার প্রতি শোভাসিংহকে শাস্তি দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। শোভাসিংহের সহিত পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ সসৈন্যে যোগদান করেন। ফৌজদার নুরুল্লা শোভাসিংহের বিরুদ্ধে হুগলীতে তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। বিদ্রোহী সেনার সম্মুখীন হইবা মাত্র নবাব সৈন্য ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। কাজেই হুগলী বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল। ইংরাজেরা এই সুযোগে সুতানুটীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

বিদ্রোহী সেনাপতি হুগলী অধিকার করত অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া, চতুর্দ্দিকে, লুণ্ঠন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রাণ ভয়ে অনেকে চুঁচুড়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সকল অত্যাচার ও লুণ্ঠন নিবারনের জন্য ওলন্দাজেরা হুগলীতে দুই খানি রণতরী প্রেরণ করিলেন। রণপোত হইতে অজস্র গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। বিদ্রোহীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া হুগলী ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে প্রস্থান করিল। তথা হইতে অধিকাংশ সৈন্য সহ রহিম খাঁকে নদীয়া ও মুর্শীদাবাদ দখল করিবার ভারার্পন করিয়া, শোভাসিংহ স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সহ বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধমানে পৌছিয়া শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজদুহিতাকে স্বীয় পাপ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। প্রত্যাখ্যাত হইয়া নরপিশাচ বল প্রকাশে রাজকন্যাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। যেমন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল অমনি দৃপ্ত সিংহিনীর ন্যায় রাজদুহিতা স্বীয় বিপুল কেশরাশি মধ্যে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া নরপশুর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন। তৎপরে তিনি

স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় লোমহর্ষণ অভিনয় ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অভিনীত হইয়াছিল।

শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা, (মতান্তরে) পুত্র, হিম্মৎসিংহ একদল সেনা সহ বর্দ্ধমানে আগমন করিয়া অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণ জগৎরামকে আশ্রয় প্রদান করায় তাঁহাকে শাস্তি প্রদান মানসে হিম্মৎ সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সৈন্যদল বর্দ্ধমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যত দিন শোভাসিংহ জীবিত ছিলেন তত দিন পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ তাঁহার সহকারী রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল রহিম খাঁকেই সর্ব্ব প্রধান সর্দ্দাররূপে স্বীকার করিয়া লইল। এই উচ্চ পদবী ও সম্মানের জন্য রহিম খাঁ "রহিম সাহ" উপাধি ধারণ করিলেন।

বিদ্রোহীরা দিন দিন দুর্দ্ধর্ষ হইতে লাগিল ও নানা স্থান অধিকার করিয়া লইল। নবাব ইব্রাহিম খাঁ বিদ্রোহ দমনে অক্ষম হওয়ায় সম্রাটের পৌত্র আজিম্ উশান্ বঙ্গের নবাব এবং জবরদস্ত খাঁ প্রধান সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন। জবরদস্ত রণনিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি সমুদয় সৈন্য একত্রীভূত করিয়া বিদ্রোহীদিগের অন্বেষণে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত গমন করেন। তথা এক ভীষণ যুদ্ধে তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। রহিম খাঁ মুরশীদাবাদ হইতে বর্দ্ধমান এবং তথা হইতে উড়িষ্যায় বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অল্পদিন পরে রহিম খাঁ পুনরায় দলবল সহ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জবরদস্ত খাঁর বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া নবনিয়োজিত নবাবের মনে ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। জবরদস্ত নবাবের আভ্যন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলেন এবং অষ্ট সহস্র উৎকৃষ্ট সৈন্য সহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশ একরূপ অরক্ষিত অবস্থায় পতিত হইল। নবাব আজিম্ উশান্ বর্দ্ধমানে গমন করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত একটী দরবার করিলেন। তৎপ্রদেশস্থ রাজা ও জমীদাগণ দরবারে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান

এবং আনন্দোৎসব করিলেন। পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ জবরদস্ত খাঁকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং কাপুরুষ নবাবকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। রহিম বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুগলী ও নদীয়া লুণ্ঠন করত বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী হইল। রহিম খাঁ স্বহস্তে নবাবকে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি বীর যোদ্ধা সহ নবাব শিবির আক্রমণ করিল কিন্তু হামিদ খাঁ নামক নবাবের এক বীর অনুচরের প্রতিকূলতায় তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। হামিদ খাঁ রহিম খাঁকে সম্মুখ সমরে নিহত করেন। রহিমের সৈন্যগণ সর্দ্দারের মৃত্যুতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

আজিম উশান হুগলী বন্দরের শুল্কের পুনঃ সংস্কার করেন। নিম্নলিখিত হারে শুল্ক স্থাপিত হয়ঃ— মুসলমানেরা শতকরা আড়াই টাকা, হিন্দুরা শতকরা পাঁচ টাকা এবং খৃষ্টানেরা শতকরা সাড়ে তিন টাকা। ইংরাজদিগকে এই হিসাবে শুল্ক দিতে হইত না কারণ দিল্লীর সরকার হইতে তাঁহারা এক ফার্ম্মাণ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে শুল্ক হিসাবে তাঁহাদিগকে কেবল মাত্র বাৎসরিক ৩০০০৲ তিন সহস্র মুদ্রা দিতে হইত। বঙ্গদেশ মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়ার জন্য শুল্ক গ্রহণ প্রথা এই সময় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

ইংরাজ কোম্পানীর এজেণ্ট ওয়ালস সাহেবের চেষ্টা ও যত্নে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ষোল হাজার টাকা সেলামী গ্রহণে, সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমীদারীসত্ত্ব ইংরাজ কোম্পানীকে প্রদান করা হয়। এই জমীদারীর, যাহা এক্ষণে সুবিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছে, কার্য্য বিলাতী সিবিলিয়ন ও একজন এদেশীয় দেওয়ানের দ্বারা পরিচালিত হইত। সিবিলিয়ানকে "জমীদার" এবং তাঁহার দেওয়ানকে লোকে "কালা জমীদার" কহিত। শ্বেতাঙ্গের মাসিক বেতন দুই শত টাকা এবং কৃষ্ণাঙ্গের ত্রিশ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত ছিল। পরে ত্রিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা বেতন স্থিরীকৃত হয়। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্রকে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। সিবিলিয়ান জমীদার অপেক্ষা তাঁহার অধিক ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেব যখন কোম্পানীর জমীদারীর কর্ত্তা হন তখন গোবিন্দরামকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজের হুগলী ত্যাগের পরই ইংরাজেরা আসিয়া তাহাদের স্থান

অধিকার করেন সুতরাং পর্ত্তুগীজদের অভাব বড় একটা কেহ বুঝিতে পারে নাই। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে যখন ইংরাজেরা হুগলী ত্যাগ করিলেন, এবং কেহ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে আসিল না, তখনই হুগলীর অধঃপতন আরম্ভ হইল। হুগলীতে ফৌজদার থাকিলেন বটে কিন্তু তিনি স্বীয় কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেন না ও কর্ত্তব্য কার্য্যে আদৌ মনোযোগী হইতেন না। এজন্য অনেকের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল, অনেক ধনী মহাজন হুগলী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ফৌজদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুসলমান আইন কানুন অনুসারে বিচার আচার করিবার জন্য কলিকাতায় একজন কাজী প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ কোম্পানী নবাব আজিম উশানকে মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া কাজী প্রেরণ স্থগিত রাখিলেন।

এই সময়ে "ইংলিশ কোম্পানী" নামে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিলাতে এক নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন কোম্পানী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এজেণ্ট প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় হুগলীতেও এজেণ্ট প্রেরিত হইয়াছিল। এই দুইটী কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইংরাজদিগের ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল। সেজন্য ১৭০২ খৃষ্টাব্দে "ইউনাইটেড্ কোম্পানী অব্ মার্চ্চাণ্টস্ ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিস্" নাম দিয়া দুইটী কোম্পানী যুক্ত হইয়া গেল*। এই কোম্পানীদ্বয় যুক্ত হওয়ায় ইংরাজ বাণিজ্যের ধ্বংসের জন্য যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহা অপসারিত হইল কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে পুনরায় বিপদ রাশি ঘনীভূত হইয়া আসিল।

১৭০২ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আওরঙ্গজেব ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বঙ্গের নবাব পদে উন্নীত এবং মুরশীদকুলী খাঁ উপাধিতে বিভূষিত করেন। আজও মুরশীদ কুলীর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। মুরশীদ কুলীর ন্যায় বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা মোগল রাজ্যে অতি অল্পই ছিল। অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়াও তিনি অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন। ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার বিরাগ উৎপাদন করেন। তিনি কোম্পানীর

* Marshman's India p. 217.

উপর এরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন যে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানী দিল্লীতে ভারত সম্রাটের * নিকট দূত প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দূতদিগের মধ্যে হামিল্টান্ নামক একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি সম্রাটের কঠিন পীড়া আরোগ্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে ইংরাজ কোম্পানীর প্রার্থনা মঞ্জুর করাইয়া লন। ডাক্তার হামিল্টনের প্রার্থনামতে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে ৩৮টী পল্লীগ্রাম ইংরাজ কোম্পানী ক্রয় করিবার রাজকীয় আদেশ প্রাপ্ত হন কিন্তু মুরশীদ কুলীর ষড়যন্ত্রে তাঁহারা উক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মুরশীদের গুপ্ত আদেশে উক্ত গ্রাম সমূহের জমীদারগণ তাঁহাদের জমীদারী বিক্রয় করিতে অসম্মত হন। সুতরাং কোম্পানীকে পঞ্চাশ বর্ষ কাল সুতানুটী, কলিকাতা, গোবিন্দপুর এই তিনটী পল্লী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল।

"রাজস্ব আদায়ে মুরশীদ কুলীর কঠোর বন্দোবস্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মুরশীদের গুণ গ্রাহিতাও সামান্য ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ জমীদার যথা সময়ে রাজস্ব উসুল করিতে না পারায় নবাবের আদেশে বৈকুণ্ঠ কুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব একথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাহার সমুদায় দেনা শোধ করিয়া তাহাকে নরকমুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন †"।

এত দিন জৈনুদ্দিন হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। মুরশীদ কুলী নবাব হওয়ার পরই জৈনুদ্দিনকে বিদায় দিয়া তৎপদে স্বীয় প্রিয় অনুচর ওয়ালী বেগকে নিযুক্ত করেন। এই আমলে হুগলীর ফৌজদারের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করা হয়। নবাবের বিনা আদেশে কোনও কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা রহিল না। আদেশের বিপরীত কার্য্য করিলে জবাবদিহি করিতে হইবে, নিয়ম করা হয়। পূর্ব্বে ফৌজদার একরূপ স্বাধীন ভাবেই সকল

* আজিম উশানের পুত্র সম্রাট ফেরোকশিয়ার।

† চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এর "শূদ্রমণি রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

কার্য্য করিতেন এখন নবাবের হস্তের ক্রীড়নক রূপে পরিণত হইলেন। ওয়ালী বেগের পর আশান আলি খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

মুরশীদ কুলীর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব হন। সুজাউদ্দীন অত্যাচারী ছিলেন না। ইতিহাসে সুজার রাজত্ব শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানী মান্দ্রাজের আদর্শে কলিকাতায় "মেয়র্স কোর্ট" প্রতিষ্ঠিত করেন। "কনসিডারেসন্‌স্" প্রণেতা খ্যাতনামা বোল্ট সাহেব মেয়র কোর্টের জনৈক জজ ছিলেন। গবর্ণরেরা এই কোর্টে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। মেয়র্স কোর্ট উঠিয়া গেলে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। সার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারক ছিলেন। সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরকাল নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে "মেয়র্স কোর্ট" স্থাপনের জন্য ইংরাজ কোম্পানী একবার ভিন্ন কোনও রূপ বাধা বিঘ্ন প্রাপ্ত হন নাই। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে সুজা কুলী হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন। ইনি একবার ইংরাজদের রেশমপূর্ণ এক খানি নৌকা আটক রাখেন, কোম্পানী একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া নৌকা উদ্ধার করেন। নবাব ইংরাজদের এই অসমসাহসিকতার কার্য্য অবগত হইয়া অতিশয় বিরক্ত হন এবং এদেশীয়দিগকে কলিকাতা বা অন্য কুঠীতে শস্য বিক্রয় করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। এই আদেশে ইংরাজ দিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কোম্পানী নবাবকে মূল্যবান উপহার দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে বাধ্য হন। সুজাউদ্দিনের আমলে কোম্পানীর বানিজ্য অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বিলাতের প্রভুদের স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া স্বীয় স্বীয় উন্নতির জন্য পৃথক ভাবে ব্যবসা করিত। এজন্য কোম্পানী আশানুরূপ লাভবান হইতে পারেন নাই।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের পরে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব নিযুক্ত হন কিন্তু অল্প দিন রাজত্ব করিতে না করিতে ঘেরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দ্দী খাঁর দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন। আলিবর্দ্দী বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহন করেন। নবাব আলিবর্দ্দীর আমলে বর্গীদের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এজন্য দেশময় অরাজকতা বিরাজ করিত। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তাহাদের অত্যাচার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। মীর হবীব বর্গীদের দলে

মিশিয়া বহু সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ বাগেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সকল স্থান লুণ্ঠন করিয়াছিল। হুগলীও লুণ্ঠিত হয়। বহু লোক ধনে প্রাণে মারা গিয়াছিল*। বর্গীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই সময়ে ইংরাজেরা কলিকাতার চতুর্দ্দিকে পরীখা খনন করাইয়াছিলেন। সেই পরীখা অদ্যাপি মার্হাট্টা ডিচ্ নামে খ্যাত আছে †।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা শমন সদনে প্রেরিত হন। ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর কিছু কাল বঙ্গে শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। কিন্তু অধিক দিন এরূপ থাকে নাই। মোগল শিবিরেই আলিবর্দ্দীর মহা শত্রু ছিল। আলিবর্দ্দীর বিখ্যাত সেনাপতি মুস্তফা খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। ইহারই শৌর্য্য বীর্য্যে আলিবর্দ্দীর সৌভাগ্যোদয় হয়। মুস্তফা খাঁ অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী এবং উক্ত সংখ্যক পদাতিক সৈন্য সহ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া রাজমহল লুণ্ঠন করিলেন, মুঙ্গের অধিকার করত পাটনায় শিবির সংস্থাপন করিলেন। বাঙ্গালা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি নাগপুরের মহারাষ্ট্রদিগকে বাঙ্গালা অধিকারে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য অহ্বান করিয়াছিলেন। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের‡ হত্যার প্রতিহিংসা লইবার জন্য নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মুস্তফার প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত সম্মত হইলেন ও বহু সৈন্য সহ

* The Marhatta free-booters much resembled the Scythians of old and like them were all horsemen. Their incursions were greatly dreaded by the people of Bengal, who were repeatedly plundered of their property and tortured in their person.

† This celebrated ditch continues to mark the Municipal boundaries of Calcutta and has fixed on its citizens the *soubriquet* of the ditch.—Vide Marshman's India p. 27.

‡ এরূপও কথিত আছে যে ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুরে যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। রোজিলাসের যুদ্ধে যেরূপ ক্যাপ্টার এবং পোলাকস্ সাহায্য করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও সেইরূপ বিগ্রহ মদনমোহন বিষ্ণুপুরের রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। আলিবর্দ্দী মুস্তফাকে দমন করিবার জন্য বিহারে গিয়াছিলেন। বর্গীদের বাঙ্গালা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তিনি তাহাদের গতিরোধের জন্য অবিলম্বে মুরশীদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তাঁহার জামাতা বিহারের শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দিনকে বিদ্রোহী মুস্তফাকে দমন ও বাঙ্গালা প্রবেশ প্রতিরোধ করিবার ভার দিয়া আসেন। কিছু কাল পরে এক যুদ্ধে জৈনুদ্দিন মুস্তফাকে পরাভূত ও নিহত করিয়া তাহার সৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। এ দিকে নবাবও বর্গীদিগকে কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত করেন। কাটোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রঘুজী স্বদেশে সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বর্গীরা বারম্বার পরাজিত হইয়াও মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা আক্রমণে নিরস্ত হয় নাই। উড়িষ্যা বর্গীদের অধিকারে ছিল। নবাব পুনরায় তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বর্ষাকালের পূর্ব্বে মুরশীদাবাদে প্রত্যাগমন করেন।

কিছু দিন পরে পাঠান সামসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বিহারের শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দিনকে হত্যা করে। জৈনুদ্দিনের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা পিতৃপদে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। হাজি আমেদের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আহম্মদ পূর্ণিয়ার ফৌজদার পদে নিয়োজিত হন। এই সৈয়দ আহম্মদের পুত্র শকত জঙ্গের সহিত উত্তর কালে সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ হইয়াছিল।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী বর্গীদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ইহার পর তাহারা আর বঙ্গদেশ আক্রমণ করে নাই, সন্ধির সর্ত্তানুসারে সন্তুষ্ট ছিল। বাঙ্গালার চৌথ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ রাজস্ব আর উড়িষ্যার রাজত্ব পাইয়া তাহারা যে সন্তুষ্ট থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন সদাশয় পীর খাঁ। পীর খাঁ নবাবের অন্যায় আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ হইতেন। তাঁহার ন্যায়পরতা ও সদাশয়তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা নৃসিংহ দেব স্বহস্তে পীর খাঁর সদাশয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ক্ষীরোদ বাবুর প্রবন্ধ হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—"সন ১১৪৭ সালে মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দ দেব রায়ের কাল হয় সেকালে আমি গর্ভস্ত ছিলাম, বর্দ্ধমানের জমিদারের

পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে, খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্তপুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারি আপন মালিকের জমিদারি সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে থামথা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কিসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল, পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার দখল আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমত বেইনসাপী ও বেদায়ত কখন হয় নাই। * * *

সন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শ্রীযুক্ত মেস্ত্র হিষ্টিন সাহেব ও সাহেবান কৌষল হক ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীক করিয়া, আমার সিরায জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারির মধ্যে যে সকল মহাল বর্দ্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিষ পরগণার সামিল হইয়াছিল, সেই মহালাতের জমিদারিতে ইস্তক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌসল ও কমিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।" বর্দ্ধমানের পেস্কার মানিকচন্দ্র বা মানিকচাঁদ পরে সিরাজউদ্দৌলার আমলে হুগলীর ফৌজদার ও কলিকাতা অধিকারে প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। ইংরেজ বলেন অন্ধকূপ হত্যার জন্য মানিকচাঁদই সম্পূর্ণরূপ দায়ী*।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রেল তারিখে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* Seraj-ood-dowla has passed as a monster of cruelty chiefly on this account. But he knew nothing of this deed of darkness, till the next morning, the whole blame rested on the Hindoo, Manik Chand, who had been left in charge of the fort for that night,

Vide "Marshman's History of Bengal."

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পলাশীর যুদ্ধ এবং ইংরাজ রাজত্ব।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের শাসন ভার তদীয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার উপর পতিত হইল। মাতামহের অতিশয় আদরে সিরাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিলেন। সিরাজ তখন বিংশ বর্ষের যুবক। এত অল্প বয়স হইতেই তিনি ঘোরতর অত্যাচারী হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশবাসীগণ তাঁহার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু বা রাজ্যচ্যুতি কামনা করিত। য়ুরোপীয় বণিকগণ তাঁহার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। বঙ্গের মসনদে বসিয়া সিরাজ অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানীর সহিত বিবাদ বাধাইয়া বসিলেন। কোম্পানী, কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করায় ও টাকার সহযোগী শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র আশ্রিত কৃষ্ণদাসকে নবাব হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করায়, নবাবের বিরাগভাজন হন। সিরাজ বহু সৈন্য সহ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। হুগলীর ফৌজদার মানিকচাঁদকে প্রধান সেনানায়ক পদে বরণ করা হয়। মানিকচাঁদ কলিকাতা আক্রমণ করেন। কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক ও সেনাপতি মিকিস্ কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করেন। অগত্যা কলিকাতাস্থ অবশিষ্ট ইংরাজগণ ২০শে জুন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ঐ তারিখের রজনী অতীব ভীষণ, কারণ ঐ রাত্রিতেই সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর "অন্ধকূপ হত্যার" অভিনয় হইয়াছিল। সেনাপতি মানিকচাঁদের আদেশে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন লোককে আবদ্ধ রাখা হয়। একে ভীষণ গ্রীষ্ম তাহার উপর অল্প পরিসরযুক্ত বায়ুরুদ্ধ প্রকোষ্ঠে এত অধিক লোকের সমাবেশের পরিণাম যে অতীব শোচনীয় হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? পর দিবস প্রাতে কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করিলে দেখা গেল কেবল মাত্র ২৩ জন লোক জীবিত আছে অবশিষ্ট সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই অন্ধকূপ হত্যার স্মরণার্থ ঘটনাস্থলে সম্প্রতি বড়লাট লর্ড কর্জ্জন "হলওয়েলস্ মনুমেণ্ট" স্থাপন করিয়াছেন*। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে একটী বিপরীত মত আছে।

* স্মৃতি স্তম্ভের গাত্রে এইরূপ খোদিত আছে:—

"This monument has been erected by Lord Curzon, Viceroy and Governor-General of India, in the year 1902 upon the site in reproduction of the design of the original monument to the memory of the 123 persons who perished in the Black Hole prison of Old Fort William, on the night of the 20th of June, 1756. The former memorial was raised by their surviving fellow-sufferer, J. G. Holwell, Governor of Fort William, on the spot where the bodies of the dead had been thrown into the ditch of the ravelin. It was removed in 1821."

নবাব কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া সেনাপতি মানিকচাঁদের হস্তে কলিকাতা শাসনের ভারার্পণ করত মুর্শীদাবাদ যাত্রা করিলেন এবং কলিকাতা-বিজয় স্মরণার্থ কলিকাতার নাম আলিনগর রাখিবার আদেশ দিলেন।

অন্ধকূপ হত্যার ভয়ঙ্কর সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিবামাত্র তত্রস্থ ইংরাজদের মনে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। ভাগ্যক্রমে ক্লাইব সেই সময় স্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। অক্টোবর মাসে ক্লাইব ও ওয়াটসন ২৪০০ সৈন্য সহ মান্দ্রাজ হইতে রণপোতে যাত্রা করিলেন। নভেম্বর মাসে তাঁহারা বজবজের নিকটে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে বজবজের মোগল দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মানিকচাঁদ দুইদিন পূর্ব্বে একদল পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সহ বজবজ দুর্গে গিয়াছিলেন। তিনি বেগতিক দেখিয়া বাধাপ্রাপ্তি সত্ত্বেও কলিকাতায় প্রত্যাগমন করত কলিকাতার দুর্গ রক্ষার্থে ৫০০ সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ মুর্শীদাবাদ গমন করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী ক্লাইব কলিকাতা পুনরধিকার করেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করে। কয়েক দিন পরে ক্লাইব বিখ্যাত হুগলী বন্দর আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

হুগলী আক্রমণ* করিতে দুইশত য়ুরোপীয় সৈন্য এবং আড়াইশত সিপাহী তিন খানি ক্ষুদ্র জাহাজে কলিকাতা হইতে ৫ই জানুয়ারী রওনা

* "Accordingly Hooghly, a very large and rich city belonging to the Nabob situate on the river about

হয়। "ব্রিজ্‌ওয়াটার" নামক জাহাজে ২০টী এবং "কিংফিশার" নামক জাহাজে ১৬টী কামান ছিল। "থাণ্ডার" নামক জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এই জাহাজ গুলিতে ১৫০ জন নাবিক ছিল। নৌ সেনাপতি ছিলেন কাপ্তেন কিং। প্রধান সেনাপতি ছিলেন মেজর কিলপ্যাট্রিক্ এবং তাঁহার সহকারী ছিলেন কাপ্তেন কুট্ (ইনি পরে কমাণ্ডার-ইন্-চিফ্ সার আয়ার কুট্ নামে বিখ্যাত হন)। ১১ই জানুয়ারী মোগল সৈন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে পর হুগলী লুট হয়। ২০টী কামান, যৎসামান্য গোলাগুলি ভিন্ন মূল্যবান কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ অধিবাসী যথাসর্ব্বস্ব লইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের ফোর্ট গাষ্টেভাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হুগলী দখলের পর "কেণ্ট" নামক জাহাজের কাপ্তেন স্পিক্‌কে হুগলীর নৌসেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। তিনি কাপ্তেন কুটের অধীনে পঞ্চাশ জন য়ুরোপীয় সৈন্য এবং একশত সিপাহী সহ গমন করিয়া সাহাগঞ্জ খামারপাড়া প্রভৃতি লুট করেন এবং স্থানে স্থানে ধান্যগোলাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করেন। প্রত্যাগমন কালে মোগল সৈন্য ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার নিকট লুণ্ঠনকারীদিগকে বাধা প্রদান করে। যুদ্ধে জনৈক সেনাপতি, "কেণ্ট" জাহাজের নাবিক হ্যামিল্টান্ এবং কয়েক জন সৈন্য হত এবং তিন জন নাবিক ও পঁচিশ জন সৈন্য আহত হয়।

নন্দকুমার মানিকচাঁদের পর হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি ইংরাজদিগকে কিছুকাল বাধা প্রদান করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন। এই নন্দকুমারই পরে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। তদানিন্তন রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন। এক সময়ে মোগল সরকারে তাঁহার এতদূর প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে ওয়ারেন হেষ্টিংস পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার শোচনীয় পরিণামের কথা সকলেই অবগত আছেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে জালিয়তি অপরাধে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে তাঁহার ফাঁসী হয়। তাঁহার পুত্রের নাম রাজা গুরুদাস।

---

thirty miles above Calcutta, was fixed upon as the next object of our military operations.

Vide Ives' Voyage.

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা এবং হুগলী অধিকারের সংবাদ পাইয়া অতিশয় বিচলিত হইলেন এবং অবিলম্বে চল্লিশ সহস্র সৈন্য সহ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্লাইব সন্ধি সংস্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু নবাব তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না। তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া বীর হৃদয় যুদ্ধের জন্য নাচিয়া উঠিল। ক্লাইব অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া মোগল সৈন্যের পরীখা আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ বাধিল, পরিশেষে নবাব সৈন্য পরাজিত হইল। অগত্যা নবাব সন্ধি সংস্থাপনে বাধ্য হইলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজেরা পূর্ব্ব সুবিধা ও সত্ব সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। নবাব সরকার হইতে তাঁহাদের যাবদীয় ক্ষতি পূরণ করা হইল।

সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না। য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীতে এই সময় যুদ্ধ ঘোষণা হইল। ক্লাইব দেখিলেন যে চন্দননগরে ফরাসী দুর্গ ও সৈন্য থাকিতে কলিকাতা কখনই নিরাপদ নহে। ফরাসী দুর্গ অধিকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই স্থির করিয়া ক্লাইব মার্চ্চ মাসে ফরাসডাঙ্গা আক্রমণ ও অবরোধ করিলেন। নয় দিবস অবরোধের পরে ফরাসডাঙ্গা হস্তগত হইল। ফরাসী দুর্গে ব্রিটিস পতাকা উড্ডীন হইল। এই ঘটনা নবাবের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ইংরাজদিগকে শাস্তি দিবার মানসে সিরাজ পলাশী ক্ষেত্রে বহু সৈন্য সমবেত করিলেন। পলাশী মুর্শীদাবাদ হইতে বিংশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ক্লাইব পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের কয়েক জন প্রধান জমীদারের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধোদ্যম সংবাদে সুচতুর ক্লাইভ নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ও সেনাপতি মিরজাফরকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করত ১৩ই জুন তারিখে চন্দননগর হইতে এক সহস্র য়ুরোপীয় ও দুই সহস্র দেশীয় সৈন্য ও আটটী কামান সহ পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পঞ্চম দিবসে তিনি কাটোয়া পৌছিয়া তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিলেন। অতি বর্ষা হেতু কয়েক দিন তথা অবস্থান করত ২২শে জুন ক্লাইব ক্ষুদ্র সেনা লইয়া নবাব শিবিরের সন্নিকটে পলাশীর আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। নবাবের পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও পঞ্চাশটী কামান ছিল। চিরস্মরণীয় ২৩শে জুন প্রত্যুষে উভয় পক্ষের সেনা সমর সাজে সজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইল। কয়েক ঘণ্টা

সমরাভিনয়ের পর ইংরাজেরা জয়ী হইলেন। সেনাপতি মির জাফর সমস্ত দিন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে সসৈন্যে ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ২৯শে জুন ক্লাইব মুর্শীদাবাদে গমন করত রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন ও মির জাফরকে সিংহাসনে বসাইলেন। পরে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট হইতে নবাব নিয়োগের ফার্ম্মাণ আনাইয়া দিলেন।

এই রূপে এক বৎসরের মধ্যে ইংরাজেরা নগণ্য অবস্থা হইতে অতীব উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হইলেন। ক্লাইবকে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারেরা বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। ক্লাইভ এই উচ্চ ও দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিয়াছিলেন। তিনি বিলাত গমনের পূর্ব্বে মোগল সৈন্য ছত্রভঙ্গ এবং ফরাসী ও ওলন্দাজ শক্তি হ্রাস করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্লাইভ বিলাতে ছিলেন সেই সময়ে ভ্যানসিটার্ট সাহেব গবর্ণরের কার্য্য করেন। ভ্যানসিটার্ট রাজকার্য্য পরিচালনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মির জাফরকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাশিমকে নবাব নিযুক্ত করা হয়। মিরকাশিম স্বাধীন চেতা, সদাশয় এবং সুশাসক বলিয়া বিখ্যাত। বঙ্গের মসনদে বসিয়া তিনি স্বাধীন ভাবে অসাধারণ ক্ষমতার সহিত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি শীঘ্রই বিস্মৃত হইলেন যে রাজ্য প্রাপ্তির জন্য তিনি ইংরাজদের নিকট ঋণী। তিনি গঙ্গার উপর সুরক্ষিত মুঙ্গের সহরে গমন করিলেন। তথা সৈন্য সংগ্রহ করত সেনাপতি গুর্গন খাঁর দ্বারা তাহাদিগকে রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যুদ্ধ বিশারদ গুর্গন খাঁ আর্ম্মানি বংশোদ্ভব। তাঁহার আসল নাম ছিল গ্রেগরি। মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত আপদ বিপদে পরস্পর সাহায্য করিবার সর্ত্তে গোপনে, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই প্রকারে সুরক্ষিত হইয়া তিনি নানা স্থানে শুল্ক রহিত করিলেন। ইংরাজ কোম্পানীর বানিজ্যের বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইল। ইংরাজেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। নবাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধ বাধিল। প্রথম প্রথম কয়েকটী যুদ্ধে নবাব জয়লাভ করিলেন কিন্তু এই ক্ষণিক ভাস্কর জ্যোতিঃ শীঘ্রই গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত করিল। মেজর এডাম্-

সের অধীনস্থ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নবাব সৈন্য দুইটী যুদ্ধে পরাভূত হইল। নবাব মিরকাশিম অবশেষে অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অযোধ্যার নবাব মিরকাশিমকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ না করায় তাঁহার সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে ভাগ্যদেবী ইংরাজদিগের উপর সুপ্রসন্না হইলেন। এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় অযোধ্যা ইংরাজ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল। অগত্যা দিল্লীর সম্রাট সাহ আলম ইংরাজ শিবিরে গমন করিয়া সন্ধী প্রার্থী হইলেন। মির জাফর দ্বিতীয় বার বঙ্গের মসনদে বসিলেন। অধিক দিন নবাবী করিতে হইল না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই বৎসর মে মাসে লর্ড ক্লাইব * দ্বিতীয় বার বঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আগষ্ট মাসে সম্রাট ইংরাজ কোম্পানীকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী † প্রদান করেন কিন্তু পরবর্ত্তী সাত বর্ষ কাল দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধারণে রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ‡। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর এই প্রথম প্রবেশ। সন ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ বা "ছেয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিতে লোকে আজও শিহরিয়া উঠে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর বহুদর্শী কর্ম্মচারী ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারেরা হেষ্টিংসকে সকল বিভা-

* Baron Clive of Plassey in the peerage of Ireland.

† In a letter from the Select Committee in Bengal, dated the 30th September 1765 and signed by Clive himself, the Dewani is explained to be "The collecting of all the revenues, and after defraying the expenses of all the army, and allowing a sufficient fund for the support of the *Nisamut*, to remit the remainder to Delhi, or wherever the king shall reside or direct."
—Bolt's *Considerations*, p. 34.

‡ Vide Lord Macaulay's graphic description of the great famine of "76" in his Essay on Lord Clive.

গের সংস্কার করিবার জন্য বিশেষ ভাবে আদেশ দেন। হেষ্টিংস রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যালয় সমূহ মুর্শীদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত যাবদীয় কার্য্য পরিদর্শন জন্য স্থানে স্থানে য়ুরোপীয় "কালেক্টার" নিযুক্ত করা হয়। কলিকাতায় আপীল সংক্রান্ত দুইটী আদালত স্থাপিত হয়। হেষ্টিংস আইনজ্ঞ ছিলেন না বটে কিন্তু তিনি বিনা সাহায্যে স্বয়ং মোটামুটী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া আদালত সমূহে প্রচলিত করেন *। ইহা হইতেই হেষ্টিংসের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে কার্য্যাদি একরূপ বেশ চলিতেছিল কিন্তু ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে দুই জন নূতন সদস্যের † আগমনে সকল কার্য্যের এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিল যে হেষ্টিংস অবশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। বিলাতে গমন করিয়া তাঁহাকে যে বিপদ জালে জড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। হেষ্টিংস সহস্র দোষ সত্ত্বেও

* Hastings was the administrative organiser, as Clive was the territorial founder of the British Indian Empire. Cornwallis only completed the edifice.

Vide Malleson's Founders of the Indian Empire p. 496.

† Of these members, Sir Phillip Francis, the reputed author of Junius's Letters, proved his bitterest enemy. Referring to his Indian appointment by which Junius was silenced, Lord Campbell, in his admirable Life of Lord Mansfield observed :—"At last, the great boar of the forest, who had gored the king and almost all his Court, and seemed to be more formidable than any "blatant beast," was conquered —not by the spear of a knight-errant, but by a little provender held out to him and he was sent to whet his tusks in a distant land."—Lives of the Chief Justices Vol III. p. 376.

যে একজন ক্ষমতাবান শাসনকর্ত্তা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাৎকালিক কোনও বিখ্যাত রাজনৈতিক বলিয়াছিলেন "though he was not blameless, if there was a bald place on his head it ought to be covered with laurels."

হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। হেষ্টিংসের আমলে সদস্যগণের দলাদলিতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। কর্ণওয়ালিস সকল বিভাগেই শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। তাহাদের যথেষ্ট উপরি পাওনা এইবার হ্রাস হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহারে ভূমি সংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া কর্ণওয়ালিস চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার বিচার সম্বন্ধীয় সংস্কারও উল্লেখযোগ্য। রাজস্ব সংক্রান্ত "কালেক্টর"ই ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের কার্য্য করিতেন। কর্ণওয়ালিস রাজস্ব বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক করিয়া দেন। রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত রেভিনিউ বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে কেবল রাজস্ব বিভাগের কার্য্য করিবার জন্য কালেক্টারগণকে আদেশ দেন। প্রত্যেক জেলা ও প্রধান প্রধান নগরে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। প্রত্যেক আদালতে একজন জজ, সামান্য মোকদ্দামা বিচার জন্য একজন রেজিষ্ট্রার ও একজন বা ততোধিক সহকারী নিযুক্ত করেন। এই সকল আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর জন্য কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শীদাবাদ এবং পাটনায় চারিটী প্রাদেশিক আপীল আদালত স্থাপিত করেন। এই প্রাদেশিক আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল জন্য কলিকাতায় সদর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর কোর্টে ফৌজদারী আপীলও গৃহীত হইত। জেলা ও নাগরিক জজদের হস্তে ম্যাজিষ্ট্রেটেরও ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা সামান্য অপরাধের বিচার ও দণ্ড বিধান করিতে পারিতেন। গুরুতর অপরাধ হইলে সার্কিট জজদিগের নিকট বিচার জন্য প্রেরণ করা হইত। প্রাদেশিক জজেরাই ফৌজদারী মোকর্দ্দামায় সার্কিট জজের কার্য্য করিতেন। পুলিস বিভাগে দারোগাদের অসীম ক্ষমতা ছিল। তাহারা ভাল মন্দ যাহা ইচ্ছা অবাধে করিতে পারিত। ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা লোকে দারোগাকে অধিক ভয় করিত। লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগের সংস্কার করিয়া আইন

সংস্কার কার্য্যে জর্জ্জ বার্লো নামক সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করেন। এই আইনকে "কর্ণওয়ালিস কোড" কহিত। আইনের বিধিগুলি সুস্পষ্ট ও বিশদ করাই কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এই নূতন আইন অতি বিস্তৃত ও জটিল হইয়া পড়ায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কর্ণওয়ালিস যে একজন বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। তবে মোগল সম্রাটদিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাদি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে ভাল কাজ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি এদেশীয়-দিগকে বঞ্চিত করিয়া য়ুরোপীয়দিগের উপর জেলার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ফৌজদারের পদ উঠাইয়া দেন।

কোম্পানীকে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ফার্ম্মাণ অনুযায়ী হুগলীর ফৌজদারের নিকট বার্ষিক ৩০০০৲* বানিজ্য শুল্ক দাখিল করিতে হইত। ইহা ব্যতীত প্রতি চারি মাস অন্তর ৪২৫৲। ৪৩০৲ টাকা ভূমির রাজস্ব এবং হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক ২০০৲ নজরানা দিতে হইত। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখের মন্ত্রণা সভায় বার্ষিক বানিজ্য শুল্ক ভবিষ্যতে মুর্শীদাবাদে দাখিল করা স্থির হয় কিন্তু ভূমির রাজস্ব হুগলীতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাখিল করা হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় ছয় মাস পরে হুগলীর ফৌজ-দারের নায়েব সোলেমান বেগের সহিত কোম্পানীর ঘোলঘাট কুঠীর সংলগ্ন জমীতে একটী বাজার উপলক্ষে গোলযোগ ঘটে †। তখনও বোধ হয়

* ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ৩,০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ২,৩২৫৲ টাকা বার্ষিক শুল্ক হিসাবে দাখিল করা হয়।

† "Consultations, 3rd January, 1758.—The Zamindar acquaints the Board that Solaman Beg, the Phousdar's Naib at Hugly, has placed four Simtaburdars at the Company's old factory in Golegaut in Hugly, and likewise threatened to cut down the English colors there, and has planted a pair of Moor's colors close by the English on the Company's ground, and his people drove away some coolies that were clearing a spot of ground there in order to settle a market. Mr. Collett thinks the Company have an undoubted right to settle any market or bazar in their own ground; he therefore hopes some method will be taken to reprove the insolence of Solaman Beg. Ordered that the President do write to Solaman Beg that we think this a piece of insolence."—Vide Long's "Selections from Unpublished Records" p. 137.

নায়েব সোলেমান বুঝেন নাই যে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজেরাই বাঙ্গালার সর্ব্বময় প্রভু হইয়াছেন, এখন আর পূর্ব্ব চালচলন খাটিবে না।

নবাব খাঁ জেহান খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার ছিলেন। ইয়ারবেগ খাঁর পরই ইনি ফৌজদার হন। ইনি কর্ম্মচ্যুত হইলেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মোগল দুর্গে বাস করিবার অনুমতি এবং মাসিক ২৫০৲ পেনসন পাইয়াছিলেন। মোগল দুর্গ বর্ত্তমান কালেক্টার সাহেবের কুঠী, ব্রাঞ্চস্কুল, জেনানা মিশন, ডাকঘর, নর্ম্মাল স্কুল (পুরাতন আদালত গৃহ) প্রভৃতি স্থান লইয়া অবস্থিত ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট খাঁ জেহান শেষ ফৌজদার বলিয়া বিশেষ সমাদর পাইতেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নূতন লাট প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লর্ড ওয়েলেস্‌লী একটী বিরাট বল নাচের আয়োজন করেন। নবাব খাঁ জেহান এই নাচে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে দেউলিয়া অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিধবা পত্নীকে যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা পেনসন প্রদান করেন। মোগল দুর্গের পশ্চিম দিকের পরীখা ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ৪২ জন কয়েদীর দ্বারা দুর্গ এবং ফৌজদারের আবাস গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমতল করা হয়। ইষ্টকাদির দ্বারা রাস্তা নির্ম্মাণ এবং কাষ্ঠাদি ১৫০০৲ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনের সময় বহু নিরাশ্রয় ব্যক্তি এই দুর্গে আশ্রয় লই-য়াছিল। ইহাদের মধ্যে ২০০ জন লোককে রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। মোগল দুর্গের সংলগ্ন সাহচাঁদের সমাধি এবং মসজীদ এখনও বর্ত্তমান আছে। মোগল আমলে মসজীদে আলো দিবার জন্য মাসিক ৩৷৵০ বরাদ্দ ছিল। গবর্ণর জেনারলের আদেশে মহম্মদ মানিরকে যাবজ্জীবন উক্ত বরাদ্দ মত টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ আমলে হুগলী জেলা।

হুগলীর ফৌজদার পদ উঠিয়া যাওয়ার পর কিছুকাল হুগলী নগণ্য অবস্থায় পতিত হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হুগলীকে একটী জেলায় পরিণত করা হয়। ইহার পূর্ব্বে হুগলী সহর ও জেলার কতকাংশ নদীয়া জেলার সামিল এবং কতক বর্দ্ধমান জেলার সামিল করা হইয়াছিল। হুগলী জেলা প্রধানতঃ বর্দ্ধমান জেলা হইতে কতকাংশ বাহির করিয়া লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী ২৭ বৎসরকাল রাজস্ব বিভাগ বর্দ্ধমান কালেক্টারের অধীন ছিল। হুগলীর প্রথম জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন অনারেবল্ সি, এ, ব্রুস্ (Hon'ble C. A. Bruce.)। সকৌন্সিল বড় লাটের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালেখি চলিত। এখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা তাঁহার খাতির এবং ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বেশী ছিল। ব্রুস্ সাহেবের পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ব্রুক্ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

ব্রুক সাহেব গ্রাম্য পাইকদিগের দোষ দর্শাইয়া একটী রিপোর্ট লেখেন। সে সময় ডাকাইতি অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি রিপোর্টে ডাকাইত দমনের রীতিমত বন্দোবস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তাহাদের দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় কিন্তু কিছুতেই শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। ডাকাইতেরা অপ্রতিহত ভাবে লুণ্ঠন করিতে লাগিল *। অধিবাসীদিগের জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় শতাধিক ডাকাইত ছিল। পর বৎসর সেক্রেটারী ডাউড্স-ওয়েল সাহেব ডাকাইতগণের অত্যাচার কাহিনী বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ

* The history of the crime of the Hooghly district between 1795 and 1845 is practically a history of dacoity. Other heinous crimes were no doubt committed but the one crime with which the old records ring without changing is that of gang robbery."—Vide Toynbee's Administration of the Hooghly District, p. 39.

করেন *। বড় লাট বাহাদুর এই ভয়ঙ্কর অরাজকতার বিষয় কোর্ট অব ডিরেক্টারদের নিকট লিখিয়া পাঠান †। তাহার ফলে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। গোয়েন্দার সাহায্যে ডাকাইত ধরিবার ব্যবস্থা করা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রধান কার্য্য ছিল। কলিকাতা বিভাগের সকল জেলা

* সেক্রেটারী ডাউড্সওয়েল্ সাহেব ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অবস্থা এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"Were I to enumerate only a thousandth part of the atrocities of the dacoits and of the consequent sufferings of the people, and were I to soften that recital in every mode which language would permit, I should still despair of obtaining credit. Robbery, and even murder itself, are not the worst features in this hideous and disgusting picture. An expediment of common occurrence with the dacoits merely to induce a confession of property supposed to be concealed is to burn the proprietor with straw or torches until he discloses the property or perishes in the flames. Volumes might be filled with the recital of the atrocities of the dacoits, every line of which would make the blood run cold with horror. These enormities, be it remembered, are still committed with impunity in the immediate vicinity of the capital of British India."—Mr. Secretary Dowdeswell.

† ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গবর্ণর জেনারল এইরূপ লিখিয়া পাঠান :—"The evidence lately adduced, exclusive of a multiplicity of other proofs, establishes beyond a question the cmmission of robberies, murder, and the most atrocious deliberate cruelties : in a word, an aggregate of the most atrocious crimes, committed with few exceptions in every part of Bengal."—G. G's despatch to the Directors in May, 1810.

অপেক্ষা হুগলী জেলার ডাকাইতদের অত্যাচার অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। এমন কি ইংরাজদিগকেও ডাকাইতের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত *।

শ্যাম মল্লিক, রাধা ডাকাইত, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ এবং পীতাম্বর প্রভৃতি খ্যাতনামা দস্যু সর্দ্দারগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তৎকালে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ জনপদ সমূহের অধিবাসীগণ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। শ্যাম মল্লিক ডাকাইত ছিল বটে কিন্তু তাহার উদারতার কথাও শুনা যায়। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন কিন্তু স্বভাব বশতঃ আদৌ সঞ্চয় করিতেন না। শ্যাম মল্লিক এক রাত্রিতে পণ্ডিতকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সুশিক্ষা দিবার জন্য সদল বলে পণ্ডিতের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয় এবং পণ্ডিতকে ধরিয়া আনিবার জন্য অন্দরে লোক প্রেরণ করে। বাটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল কিন্তু কোথাও পণ্ডিতকে পাওয়া গেল না। তিনি দস্যুগণ বাটী প্রবেশ করিবা মাত্রই প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্যাম মল্লিক পণ্ডিতকে না পাইয়া হতাশ হইয়া সদলে চলিয়া গেল, লুণ্ঠন করিল না। বিশ্বনাথ ডাকাইতকে লোক "বিশ্বনাথ বাবু" বলিত। বিশ্বনাথ গরিবের 'মা বাপ' ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেরউড্ অরণ্যের দস্যুর ন্যায় ধনবানের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া গরিবদিগকে তাহা অকাতরে বিতরণ করিত। রাধা ডাকাইতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাকে ধরিবার জন্য সুদক্ষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়। বহুকাল গোয়েন্দাগণকে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইয়াছিল। অবশেষে এক বারবণিতার গৃহে রাধা ধৃত হয় এবং হুগলীর জজ সাহেবের বিচারে তাহার ফাঁসীর আদেশ হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে অনেক ডাকাইত ধৃত হইয়া প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

* "In 1780, they burnt to ashes 15,000 houses and 200 souls in Calcutta. In fact even Anglo-Indians lived in the utmost dread and until they had well secured their household goods for the night, they would never unbolt their doors." Vide Hunter's Annals of Rural Bengal.

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব হইতে বিতাড়িত হইয়া মিশনরী ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান দিনেমারদিগের শ্রীরামপুর সহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পর বৎসরের প্রথমেই মালদহ হইতে ক্যারী সাহেব আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। এখানে ইঁহারা এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ওয়ার্ড মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধারন করিতেন। ক্যারী বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিতেন। মার্শম্যান এবং তাঁহার স্ত্রী ধর্ম্মপ্রচার ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সকল বিষয়েই বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্রদত্ত বেতন কোন কোনও মাসে চারি সহস্র টাকা পর্য্যন্ত আদায় হইত। কিছুকাল পরে ক্যারী মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লীর প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই উদারচেতা পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রদর্শকদিগের নিকট হুগলী জেলার অধিবাসীগণ চির কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ আছেন *। ডাক্তার মার্শম্যানই সর্ব্বপ্রথম "সমাচার দর্পণ"† নামক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন। গবর্ণমেণ্টের

* Vide Calcutta Review, Vol. XXXII. 1859.

† "The famous Dr. Carey objected, fearing it would anger the authorities and spoil his missionary and educational work. His colleagues, Dr. Marshman and Mr. Ward overruled him. When the proof-sheets came out, Dr. Marshman took them into Calcutta with a rough English translation and laid them before the Vice-President and the Chief Secretary, promising they should be discontinued if objected to. No objection was made. Lord Hastings, the Governor-General, gave his approval, and the journal was established. It was well supported by the rich Bangalees, and the Marquis of Hastings helped it to the best of his ability, ordering that it should be circulated through the country at a fourth of the usual postage rates, which were then tremendously high."—Vide Students' Chronicle.

আদেশ এবং বিজ্ঞাপনাদি পারস্য ভাষায় সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্শম্যান সাহেব "বাঙ্গালা গেজেট" প্রকাশিত করেন। হুগলী জেলার জন্য একুশ খানি গেজেট ক্রয় করা হইত।

ব্রুক্ সাহেবের পর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আরনেষ্ট (Mr. Earnest) সাহেব জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত তাঁহাকে চুঁচুড়া, চন্দননগর এবং শ্রীরামপুরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কমিশনরের কার্য্যও করিতে হইত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই ইংরাজেরা চুঁচুড়া দখল করেন এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ওলন্দাজদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া পুনরায় ইংরাজ অধিকারে আসিয়াছে। চন্দননগর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পুনরায় দখল করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। শ্রীরামপুরও ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা অধিকার করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্যর্পণ করেন। পুনরায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ হস্তগত হইয়াছে। সে সময়ে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং আধিপত্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ রেগুলেশন অনুসারে হুগলীতে মিউনিসিপ্যাল আইন প্রচলন করা হয়। পূর্ব্বে সহরটী ১৮টী মহল্লায় বিভক্ত ছিল এক্ষণে বালী এবং ঘোলঘাট এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ৬০জন চৌকীদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। চৌকীদার নিযুক্ত হওয়ার পর হুগলী সহরে চুরী, ডাকাইতি হ্রাস হইয়াছিল *। বালী বিভাগে ২,৩৫৯ গৃহ ছিল, ইহা হইতে মাসিক ১৭৫৲ ট্যাক্স আদায় হইত। ৩২ জন চৌকীদার মাসিক ৪৲ হিসাব বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ঘোলঘাট বিভাগে ১,৭১৯টী বাড়ী ছিল। ট্যাক্স আদায় হইত মাসিক ১৬০৲। ২৮ জন চৌকীদার ছিল।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ডি, সি, স্মীথ্ (Mr. D. C. Smyth) সাহেব হুগলীর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। স্মীথ সাহেব হুগলীর উন্নতি কল্পে যথেষ্ট

* গবর্ণর জেনারলের আদেশ মত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রিপোর্টে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"Since the establishment of the Choukidars in the town of Hooghly there have been no robberies or thefts." গবর্ণর জেনারল এই সময় জেলার কতক অংশ পরিদর্শন করেন।

পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। ইঁহার আমলে হুগলী ইমামবাড়ীর দুই জন মাতোয়ালী পঞ্চদশ সহস্র টাকা আত্মসাৎ করা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন এবং আলি আকবর খাঁকে মাতোয়ালী নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইনিও পূর্ব্বোক্ত অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন। হুগলীতে কালেক্টার না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে অগিল্‌বি সাহেব (Mr. A. Ogilvie) হুগলীর সহকারী কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আর সাণ্ডার্স (Mr. R. Saunders) হুগলীর বানিজ্য শুল্কের এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কালেক্টার নিযুক্ত হন। হণ্টার সাহেব বলেন সাণ্ডার্স সাহেবই হুগলীর প্রথম কালেক্টার *। টয়েনবী সাহেব বলেন ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হুগলীতে প্রথম কালেক্টারী স্থাপিত হয়। বেলী সাহেব (Mr. W. H. Belli) হুগলীর প্রথম কালেক্টার †। বেলী সাহেব স্বয়ং বর্দ্ধমানে গিয়া হুগলী জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ পত্র লইয়া আসেন। এই নূতন জেলার ভূমির রাজস্ব ছিল ১১,২৩,৪৭৪৲ এবং ষ্ট্যাম্প, আবগারী ইত্যাদি বিভাগের আয় ছিল ৭৬, ৫২৬৲ অর্থাৎ মোট বার লক্ষ সিক্কা টাকা। বর্দ্ধমান ও জঙ্গল মহলের (বাঁকুড়া) আয় ছিল ত্রিশ লক্ষ টাকা। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর রাজস্ব সংক্রান্ত কালেক্টরই বানিজ্য শুল্কের কালেক্টারের কার্য্য করিতে আদিষ্ট হন। এজন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত মাসিক ২০০৲ দেওয়া হইত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কাষ্টম আফিস উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত দুই শত টাকা দেওয়া বন্দ হয়। কালেক্টার বেলী সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। বেলী সাহেব প্রায় বিশ বৎসর কাল হুগলীর কালেক্টার ছিলেন।

* "The resolution constituting the district of Hugli is dated 26th February, 1819. Mr. R. Saunders the first Collector was appointed on the 1st March, 1819."—Vide Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. III. p. 253.

† Vide C. Toynbee's "Administration of the Hugli District" p. 32.

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে কালেক্টার বেলী সাহেব কালেক্টারীর "রেকর্ড কীপার" কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। উক্ত কার্য্য ব্যতীত তাঁহার প্রতি চুঁচুড়ার খাস মহলের প্রজাদিগকে ওলন্দাজ পাট্টার পরিবর্ত্তে ইংরাজী পাট্টা প্রদান করিবার ভার দেওয়া হয়। ১৮৩৫।৩৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে কমিশনর এভ্‌লিন্ গর্ডন (Mr. Evelyn Gordon) সাহেব হুগলী পরিদর্শন করিতে আসিলে চুঁচুড়ার প্রজাবর্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জয়কৃষ্ণ বাঁবুর বিরুদ্ধে ইংরাজী পাট্টা প্রদান কালে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ আনয়ন করেন। বোর্ডের আদেশ অনুসারে কমিশনর স্বয়ং তদন্ত করত অভিযোগ সত্য স্থির করিয়া জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে কর্ম্মচ্যুত করেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নিম্ন লিখিত থানা লইয়া হুগলী জেলা গঠিত হয়ঃ—১। হুগলী, ২। বাঁশবেড়িয়া (এখন পোলবায় স্থানান্তরিত হইয়াছে), ৩। বেণীপুর (এক্ষণে বলাগড়), ৪। পাণ্ডুয়া, ৫। ধনিয়াখালী, ৬। হরিপাল, ৭। রাজবল হাট (এক্ষণে কৃষ্ণনগর), ৮। জাহানাবাদ (এক্ষণে আরামবাগ), ৯। দেওয়ানগঞ্জ (এক্ষণে গোঘাট), ১০।১১। চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল (এক্ষণে মেদিনীপুর জেলার সামিল), ১২।১৩। বাগনান ও আমতা (এক্ষণে হাওড়া জেলা ভুক্ত)। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ১৪। রাজাপুর (এক্ষণে হাওড়া জেলার সামিল জগৎবল্লভপুর) এবং ১৫ বৈদ্যবাটী (এখন সিঙ্গুরে স্থানান্তরিত) হুগলী জেলা ভুক্ত করা হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ১৬। কোটরা (এক্ষণে শ্যামপুর হাওড়া জেলায়) এবং ১৭। উলুবেড়িয়া (এক্ষণে হাওড়া জেলায়) হুগলী জেলার সামিল করা হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৮। চুঁচুড়া হুগলী ভুক্ত হয়। এই সকল থানার অন্তর্গত ৩৭৮৭ পল্লীগ্রাম ছিল তন্মধ্যে ৫টী বৃহৎ পল্লীগ্রাম ছিল, সে গুলিতে ২০০০ হইতে ২৫০০ পর্য্যন্ত বাটী ছিল। ১৬টী পল্লীগ্রামে ৫০০ হইতে ১০০০ বাটী ছিল। হাওড়া সহর এবং সালকীয়া তখন কলিকাতার অংশরূপে পরিগণিত হইত। হাওড়া জেলা তখন হুগলী জেলার সামিল ছিল। এখনও হাওড়া হুগলীর কালেক্টরের অধীন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পৃথক করা হয়। স্মীথ সাহেব জজের কার্য্য করিতে লাগিলেন, আর এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। হাণ্টার সাহেব বলেন যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে পৃথক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত

করা হয়। প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম ব্রাউনলো সাহেব (Mr. H. B. Brownlow)*।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় নিম্নলিখিত স্থানে নয় জন মুনসেফ নিযুক্ত করা হয়ঃ—হুগলী, নওসরাই, মহানাদ, বৈদ্যবাটী, রাজাপুর, দ্বারহাট্টা, ক্ষীরপাই, বালী এবং উলুবেড়িয়া। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুনসেফ পদ সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব্বে মুনসেফদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে কমিশন দেওয়া হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কমিশন দেওয়া রহিত করিয়া মাসিক ১০০৲ হইতে ১৫০৲ পর্য্যন্ত বেতন নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এত অল্প বেতন থাকায় অনেক মুনসেফ অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এজন্য পরে ২০০৲ হইতে ৪০০৲ বেতন বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষণে হুগলী জেলায় হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ এবং হাওড়া জেলায় হাওড়া, আমতা এবং উলুবেড়িয়ায় মুনসেফী আদালত আছে। মুনসেফের সংখ্যা ১২ জন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিন জন মুনসেফ জেলার জজ মার্টিন (Mr. C. R. Martin) সাহেবের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করায় তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। নূনা বাই নাম্নী জনৈক মহিলা সেই সময় অভিযোগ করেন যে মার্টিন সাহেব নূনা বাইয়ের আত্মীয়কে মুনসেফী চাকরী দিবেন বলিয়া ঘুস লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট উকীল টাফাজাল্ হোসেনও জজ সাহেবকে দিবেন বলিয়া এক জন মক্কেলের নিকট অনেক টাকা ঘুস লইয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ রেগুলেশন অনুসারে তদন্ত করা হয়। জজ সাহেব নির্দ্দোষী প্রমাণিত হন। গবর্ণমেণ্ট উকীলকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। মিথ্যা

* "Up to 1829, a single officer exercised the powers of Judge and Magistrate, throughout the entire district of Hooghly with Howrah, but owing to an increase in both departments, the offices were separated on the 26th September, 1829 and Mr. H. B. Brownlow was appointed Magistrate of the district, the civil jurisdiction remaining with the Judge—Hunter's Statistical Account of Bengal Vol III, p. 253.

অভিযোগ আনয়নের জন্য নুন্ন বাই সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুনসেফগণের অদৃষ্টে কি হইয়াছিল তাহা প্রকাশ নাই।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সদর আমিন পদ এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান সদর আমিন পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সদর আমিন পদ উঠাইয়া দিয়া প্রধান সদর আমিনের পদের "সবর্ডিনেট্ জজ" নামকরণ করা হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম্ বেটিঙ্ক ডেপুটী কালেক্টারের পদ সৃষ্টি করেন। হুগলীর প্রথম ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন রমাপ্রসাদ রায়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর সাহেব পীড়িত হওয়ায় রমাপ্রসাদ বাবু জেলার ভার প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালীর মধ্যে সম্ভবতঃ ইনিই সর্ব্বপ্রথম অস্থায়ী কালেক্টারের কার্য্য করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরো ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন। হাওড়ায় একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। প্রথম জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন উইলিয়ম্ টেলর সাহেব। ইনি সরঞ্জমী বাবদ মাসিক ২৫০৲ পাইতেন। ইহার পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জি, এফ ককবার্ণ সাহেব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ইহার আমলে হাওড়া সালকীয়া ভিন্ন বৈদ্যবাটী থানার সংলগ্ন কতকগুলি পল্লীগ্রাম হাওড়ার অধীন করা হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারহাট্টা (পরে শ্রীরামপুর) এবং ক্ষীরপাই (পরে আরামবাগ) মহকুমা স্থাপন করা হয়। দ্বারহাট্টা মহকুমায় প্রথম ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন লুই ষ্টুয়ার্ট জ্যাকসান্ সাহেব (ইনি পরে হাই-কোর্টের বিচারপতি সার লুই জ্যাক্সান্ নামে বিখ্যাত হন)। বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল ক্ষীরপাই মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাঁচবৎসর কাল কালেক্টারীতে তহবীল তছরুপাত হইয়া আসিতেছিল। জরিমানা, ফেরী ফণ্ড প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকা হইতে মুহুরীরা ১৬,০২৩৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে প্রকাশ পায়। হতভাগ্য কোষাধ্যক্ষকে সমুদয় টাকা দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। কর্ম্মচ্যুতি ব্যতীত অপরাধীদিগকে অন্যরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল কি না জানা যায় না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নিয়মিত লোক গণনার প্রয়াস হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট স্যামুয়েলস্ সাহেব, গোমস্তা মণ্ডল ও জমীদারদিগের নিকট পূরণ করিয়া দিবার জন্য সাদা ফারম পাঠাইয়া দেন। এই রিটার্ণ পূরণ হইয়া আসিলে দারোগাদিগকে তাহা ঠিক হইয়াছে কি না তদন্ত জন্য

দেওয়া হয়। এই লৌক গণনায় প্রকাশ সে সময়ে সমগ্র জেলার লোক সংখ্যা ছিল ১,৫০৮,৮৪৩ জন তন্মধ্যে হুগলী সহরে ৭০,০২৫ জন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সামুয়েলস্ সাহেব হুগলী সহরের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হুগলী চুঁচুড়া ও চন্দন-নগরের অধিবাসীগণকে লইয়া একটী সভা করেন। সেই সভা হইতে মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। কমিটির ক্ষমতা এবং দায়িত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। ইহার ফলে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১০ আইন পাশ হয়। ইহাই বাঙ্গালার প্রথম মিউনিসিপ্যাল আইন। এই সময় কালেক্টার ছিলেন ট্রয়ার সাহেব। ইনি ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা-দের শঠতায় বিষম বিপদ জালে জড়িত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক নিয়মানুসারে ষ্ট্যাম্প বিক্রেতারা জামিন দিয়া ধারে ষ্ট্যাম্প লইতে পারিত। অনেক দিন হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছিল। কালেক্টারেরা মনে করিতেন কাজ ভালই চলিতেছে। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপার এরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট তাহা আর গোপন রহিল না। তদন্তে প্রকাশ পাইল যে ষ্ট্যাম্প বিক্রেতাদের নিকট ২১,১০৯৲ ষ্ট্যাম্পের মূল্য বাবদ বাকী পড়িয়াছে। তাহাদের জামিন স্বরূপ গচ্ছিত টাকা ইহার তুলনায় যৎসামান্যমাত্র। কাজেই বক্রী সমুদায় টাকা পূরণ করিয়া দিবার জন্য কালেক্টার আদিষ্ট হইলেন। ট্রয়ার সাহেব অল্পদিন মাত্র কালেক্টার হইয়া-ছেন তাঁহার পূর্ব্ব আমল হইতে ঐরূপ চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বহুকষ্টে তিনি অব্যাহতি পান। স্যামুয়েলস্ সাহেবের পর এস্ ওয়াকোপ (S. Wau-chope) ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। হুগলী জেলায় ডাকাইতির অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ওয়াকোপ সাহেবকে "ডাকাইতি কমিশনর" নিযুক্ত করা হয়। সমগ্র জেলায় অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। অকর্ম্মণ্য পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে ডাকাইতরা ভ্রূক্ষেপও করিত না। সকল গৃহস্থই সশঙ্কিত অবস্থায় রজনী অতিবাহিত করিত*। তাহাদের অমানুষিক

* ডাকাইতের অত্যাচার পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও (১৯০৩ খৃঃ) লোকে পূর্ব্বের ন্যায় সশঙ্কিত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। হুগলী জেলায় ঘন ঘন ডাকাইতি হইতেছে কিন্তু ডাকাইত ধরিবার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা হয় নাই।' গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

অত্যাচারে কি ধনী কি গৃহস্থ সকলেই জর্জ্জরিত হইতেছিল। হুগলী হইতে মগরা পর্য্যন্ত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এতদূর বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল যে উক্ত রাস্তা পাহারা দিবার জন্য এক জন য়ুরোপীয় কনেষ্টবল ও চারি জন অতিরিক্ত বরকন্দাজ নিযুক্ত করা হয়। দস্যুদিগের দ্বারা যে কেবল এদেশীয়েরা নিগৃহীত হইত তাহা নহে, য়ুরোপীয়দিগকেও অনেক সময় লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ওয়াকোপ সাহেব উপযুক্ত গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া জেলার সর্ব্বত্র ডাকাইত ধরিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি জন মানব শূন্য গভীর অরণ্যে, পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকায় এবং নানা দুর্গম স্থানে নির্ভিকচিত্তে ডাকাইত অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ডাকাইতদের সহিত কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধও বাধিয়াছিল। ওয়াকোপ সাহেব এবং তাঁহার সহযোগীদের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে ডাকাইতগণ ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনেকে ধৃত হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইল। হুগলী জেলায় শান্তি পুনঃস্থাপিত হইল।

ওয়াকোপ সাহেব যখন "ডাকাইতি কমিশনর" নিযুক্ত হন তখন লেসেষ্টর (Mr. G. P. Leycester) সাহেবকে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। ইঁহার আমলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর হুগলী পরিদর্শনে আগমন করেন। ষ্টার্লিং (Mr. G. Sterling) সাহেবের পর ডেবিড্ মনি (Mr. David Money) হুগলীর কালেক্টার নিযুক্ত হন। মনি সাহেব লোক রঞ্জনে বিশেষ পটু ছিলেন। এই সময়ে হুগলীর সিভিল ও সেসন্স জজ ছিলেন রাসেল সাহেব (Mr. Whitworth Russel)। ইনিও সুনাম অর্জ্জন করেন। ইঁহার তৈল চিত্রপট জজের আফিষে অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। ইঁহার দেওয়ান ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। রসেল সাহেব ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত হুগলীর জজীয়তী করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার জরীপ কার্য্য শেষ হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অলিভার সাহেবের তত্ত্বাবধারণে সমগ্র জেলার জরীপ কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে জরীপ কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয়। হুগলী কালেজের ছাদ প্রথন ষ্টেশন রূপে ব্যবহৃত হয়। জেলার অধিবাসীগণ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে

না পারায় বিশেষ বাধা প্রদান করে। জরীপে নিযুক্ত লোক জনকে এজন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই কারণে জরীপ হইতে অযথা বিলম্ব হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন সার ফ্রেডরিক হ্যালিডে। ইনি পূর্ব্বে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী হুগলী হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে স্থাপন করেন। জুলাই মাস হইতে ট্রেন চলিয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন হইতে না হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সে সময় হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন কক্‌রেল সাহেব (Mr. F. R. Cockerell)। ইঁহার পর লর্ড ইউলিক্ ব্রাউন (Lord Ulick Browne) হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় হুগলী জেলায় যদিও কোন উৎপাত হয় নাই তথাপি লোকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। ৩৪ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্যগণ ব্যারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহী হয়। হুগলী লুঠ হইবার আশঙ্কাও ছিল সেজন্য জেলার জমীদারগণ অধিক সংখ্যক লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কতকগুলি দেশীয় খৃষ্টানকে অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরী রূপে নিযুক্ত করা হয়। বিদ্রোহ সময়ে কলিকাতা হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া বহুসৈন্য যাতায়াত করিত। জমীদারদিগকে রশদ এবং মালপত্র বহন জন্য গোশকট সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত। সে সময় গোযান এবং কুলী পাওয়া অতিশয় দুর্ঘট হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারত রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যেক জেলায় ঘোষণা পত্র পঠিত হয়। রাজ্ঞী ভারতের প্রজাদিগকে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমভাবে প্রতিপালন এবং উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবার আশ্বাস বাণী ঘোষণা করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারীর আদেশ অনুযায়ী বর্দ্ধমান বিভাগে একজন কমিশনর নিযুক্ত করা হয়। বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা লইয়া বর্দ্ধমান বিভাগ গঠিত হয়। কমিশনরের আফিস বর্দ্ধমানে ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুনের আদেশানুসারে কমিশনরের আফিস হাওড়ায় স্থানান্তরিত হয়। উক্ত বৎসর

৭ই সেপ্টেম্বর হুগলীতে আফিস লইয়া যাওয়া হয়। সার্কিট হাউসে আফিস হইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রেল পুনরায় হাওড়ায় আফিস স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মহারাণী বিক্টোরিয়ার "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি ধারণ উপলক্ষে হাওড়ায় কমিশনর সাহেব এক দরবার করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ আফিস চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর চুঁচুড়া হইতে বর্দ্ধমানে আফিস লইয়া যাওয়া হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে চুঁচুড়ায় পুনরায় কমিশনর সাহেবের আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে হুগলীর আদালত সমূহ চুঁচুড়া বারিকে স্থানান্তরিত করা হয়। মণ্টেসর, আলেকজাণ্ডার, টয়েনবী, রমেশ-চন্দ্র দত্ত, বোর্ডিলন্, বাকল্যাণ্ড, উইলিয়মস্, কেনেডী, ফল্ডার সাহেব প্রভৃতি বিভাগীয় কমিশনরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান কমিশনর হইতে-ছেন কার্সটেয়ার্স সাহেব (Mr. R. Carstairs)। ইহারই যত্নে বৈদ্যনাথে "কার্সটেয়ার্স টাউন" স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে এক জন সিবিলিয়ানকে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এই উভয় পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ছিলেন ভূত-পূর্ব্ব কালেক্টার বেলী সাহেবের পুত্র সি, এস্, বেলী সাহেব (Mr. C. S. Belli)। ইহাকে লোকে "ছোট বেলী" কহিত। বেলী সাহেবের সময় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন বড় লাট সাহেব মঞ্জুর করেন। এই আইন প্রচলিত হওয়ার অল্প দিন পরে হুগলীতে এই আইন অনুসারে একটী বিচার হয়। হোসেন বক্স, টি, মরেল্ নামক জনৈক সাহেবের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ করে। জজ হব্ হাউস্ (Mr. C. P Hobhouse) সাহেবের বিচারে মরেল সাহেবের ৫০০৲ জরিমানা হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম ও সদর কোর্ট উঠাইয়া দিয়া হাইকোর্ট প্রতি-ষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন সার বার্ণস পিকক্। এই সময় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন এবং পুলিশ আইন পাশ হয়। বেলী সাহেবের পর এ, ভি, পামার (Mr. A. V. Palmer) ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পামার সাহেব হুগলী ত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ছিলেন ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ককরেল সাহেবের ভ্রাতা আর, ভি, ককরেল সাহেব

(Mr. R. V. Cockerell)। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হইলে ককরেল সাহেব হুগলী মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম চেয়ারম্যান হন। ইহার যত্নে হুগলী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাবুগঞ্জ পর্য্যন্ত সুন্দর পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হয়। এই রাস্তা বাঁশবেড়িয়ার রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয়ের জমীদারী কুলীহাণ্ডার উপর দিয়া গিয়াছে। রাজা সমুদায় জমী বিনামূল্যে দান করেন। প্রথমে রাস্তাটীর নাম "হংসেশ্বরী রোড" রাখিবার প্রস্তাব হয় পরে কমিশনর সাহেবের অনুরোধে "ককরেল রোড" নাম দেওয়া হয়*। ককরেল সাহেবের সময় হুগলীর জজ ছিলেন পিগু সাহেব (Mr. Arthur Pigou)। পিগু সাহেব ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রেল হুগলীতে মৃত্যুমুখে পতিত ও ধরমপুরে সমাহিত হন। ইহার স্থানে ব্রাইট সাহেব জজ হন। ব্রাইট সাহেবের পর প্রিন্সেপ সাহেব [Mr. H. T. Prinsep] হুগলীর জজ নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় রীতিমত লোক গণনা করা হয়। হুগলী সহরে সে সময় লোক সংখ্যা ছিল ৬৭,৫৩৮ জন। ১৮৮১ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় লোক গণনা হইয়াছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই জাহানাবাদ ও গোঘাট থানা বর্দ্ধমান জেলার এবং ঘাটাল ও চন্দ্রকোনা থানা মেদিনীপুর জেলার এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে খানা-কুল থানা হাওড়া জেলার সামিল করা হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর জাহানাবাদ, গোঘাট এবং খানাকুল থানা পুনরায় হুগলীর সামিল করিয়া জাহানাবাদ মহকুমা স্থাপন করা হয়†। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর খানাকুল থানার সিঙ্গটী আউটপোষ্ট হাওড়ার সামিল করা হয়‡। এই

Hooghly, *June 30th, 1865.*

**My dear sir,*

I have received with much satisfaction your note of this day's date and am much pleased to find that you have come to such a very favourable determination regarding the road.

The name of the Goddess "Hangseswari" tho' pleasing in application is difficult of pronunciation among the lower classes and especially by those not thoroughly acquainted with Hindu mythology. Perhaps she may have another name (which I am not aware of) more euphonious.

I shall not fail to apprise the Municipality of the intention expressive of the gift of the land for the purpose of the road which will be a great boon to the public, which I am sure will be a gratification to the donor.

I am
Yours faithfully
(*Sd*) C. F. Montresor.

† Vide Calcutta Gazette of 18th June 1879.

‡ Vide Government Notification No. 3838J, of 3rd Sepember, 1894.

আউট পোষ্ট ৪২টী পল্লীগ্রাম লইয়া ৩৪ বর্গ মাইল বিস্তৃত ছিল। লোক সংখ্যা ছিল ৪২,৪১৪। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রেল জাহানাবাদ মহকুমার আরামবাগ নাম করণ হয় *। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে আসানসোল কিম্বা রাণীগঞ্জে একটী পৃথক জেলা স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে আরামবাগ মহকুমা পুনরায় বর্দ্ধমানের সামিল হওয়া সম্ভব। কালনা এবং কাটোয়া মহকুমা হুগলী জেলা ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

ককরেল সাহেবের পর পেলু সাহেব [Mr. F. H. Pellew] হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার নিযুক্ত হন। পেলু সাহেব নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। জেলার জমীদারদিগকে তিনি এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। পেলু সাহেবের পর হুগলী জেলায় অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার নিযুক্ত হন তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—মিয়ার্স, উইকীস, সার উইলিয়ম হারশেল্, বার্ট, টয়েনবী, কুক্, ডিউক্, এলেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, গীক্, ল্যাং, ফ্রেঞ্চ, ইংলিস সাহেব প্রভৃতি।

হুগলী জেলা এখন ১৩টী থানায় বিভক্ত। হুগলী সদরের অধীন ৫টী থানা আছে ঃ—হুগলী, পোলবা, বলাগড়, ধনিয়াখালি এবং পাণ্ডুয়া। শ্রীরামপুর মহকুমাতেও ৫টী থানা আছে ঃ—শ্রীরামপুর, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা, হরিপাল এবং কৃষ্ণনগর। আরামবাগ মহকুমায় ৩টী থানা আছে ঃ—আরামবাগ, গোঘাট এবং খানাকুল। হাওড়া এক্ষণে একটী পৃথক জেলা একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন পুলিশ সাহেব এবং একজন ডাক্তার সাহেব আছেন। কিন্তু হাওড়া এখনও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে হুগলীর কালেক্টারের অধীন। হুগলী সদরে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার, একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৬। ৭ জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। শ্রীরামপুর মহকুমার ভার প্রায়ই একজন সিবিলিয়ানের উপর এবং আরামবাগ মহকুমার ভার একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর দেওয়া

* Vide Government Notification No. 36 J. D. of 19th April 1900, in the Calcutta Gazette of 25th April 1900.

হয়। হাওড়া জেলায় কোনও পৃথক জজ নাই। হাওড়া হুগলীর জজের অধীন। ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জজ হাওড়া সেসনের বিচার করেন। হাওড়া, হুগলী এবং শ্রীরামপুরের জন্য একজন স্মলকজ কোর্ট জজ আছেন। হুগলীতে দুইজন সব্ জজ এবং একজন মুনসেফ, শ্রীরামপুর এবং আরামবাগে তিনজন করিয়া ছয়জন মুনসেফ আছেন। হাওড়ায় মুনসেফ আছেন তিন জন, আমতা ও উলুবেড়িয়ায় একজন করিয়া মুনসেফ আছেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় প্রথম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ইংলিস সাহেবের অভিপ্রায়মত গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা হ্রাস করিয়া নব গঠিত বেঞ্চ স্থাপন করেন। ইংলিস সাহেব [Mr. T. Inglis] অতিশয় পরোপকারী এবং লোক রঞ্জনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইংলিস সাহেব আবগারী কমিশনর নিযুক্ত হইলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ হইতে হ্যামিল্টন্ [Mr. R. C. Hamilton] সাহেব হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার আমলের প্রধান ঘটনা নৃপতি সপ্তম এডবার্ডকে ভারতের সম্রাট ঘোষণার জন্য দিল্লীর বিরাট দরবার। হুগলী জেলার দরবার হইয়াছিল হুগলী কালেজ হলে। সভাপতি ছিলেন বর্দ্ধমান বিভাগের সদাশয় কমিশনর আর, কার্সটেয়ার্স [Mr. R. Carstairs] সাহেব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দৈব দুর্ঘটনা।

সন ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে (১৮২৩ খৃঃ সেপ্টম্বর) হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। ভাগীরথীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছিল। ধরমপুর মোল্লা কাশিমের হাট, রাণীর মাঠ এবং বালী একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। রাস্তা সকল জলপূর্ণ হওয়ায় লোক যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের বন্যা এবং উক্ত বৎসরের ২রা নবেম্বরের প্রবল ঝটিকার * সময়ও এত জল বৃদ্ধি হয় নাই। সহরের যে যে উচ্চ ভূমিতে জলপ্লাবন হয়

* Vide Mr. Geddes' Experience of Former Famines.

নাই সে সকল স্থানে বহু লোকে আশ্রয় লইয়াছিল। মফঃস্বলে জলপ্লাবন হওয়ায় অনেকে হুগলীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট স্মীথ সাহেব তাহাদিগকে আশ্রয় ও সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের বাসের জন্য মোগল দুর্গের নিকটে অস্থায়ী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অক্ষম দিগকে ১২৩৲ মূল্যের খাদ্য প্রদান করা হয়। সক্ষমদিগকে ষ্টেশন রোডে কার্য্য করাইয়া ১৩৮৲ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই প্রবল বন্যায় পরগণা মণ্ডলঘাটের (এক্ষণে মেদিনীপুর জেলায়) বিশেষ ক্ষতি হয়। কালেক্টার বেলী সাহেব স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রজাদের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন। সেই বৎসর উক্ত পরগণার রাজস্ব গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মণ্ডলঘাট প্রভৃতি পরগণায় পুনরায় বন্যা এবং ঝড় হইয়া বিশেষ অনিষ্ট হয়। চৈত্র কিস্তি পর্য্যন্ত ২,০৪,৯৭২৲ রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রূপনারায়ণ এবং দামোদর নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া মণ্ডলঘাট পরগণা পুনর্ব্বার জলমগ্ন হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দামোদর নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া হুগলী জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জমীদারগণের ১৭০টী বাঁধ ও ভেড়ী ভাসিয়া যায়। বালী হইতে ধনিয়াখালী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জলমগ্ন হইয়া বিশাল সমুদ্রের আকার ধারণ করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পর এপ্রদেশে এরূপ বন্যা পূর্ব্বে হয় নাই। হুগলী চুঁচুড়ার পয়ঃপ্রণালী এবং রাস্তা জলমগ্ন হইয়াছিল। জলপ্লাবনে শস্য অজন্মা হইল। অন্নকষ্ট এবং মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। সন ১৩০৯ সালের বন্যাতেও হুগলী জেলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর ঝড় হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখের ঝড় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। অকস্মাৎ ঘূর্ণীবায়ু উত্থিত হইয়া ছয় ঘণ্টা ধরিয়া প্রবলবেগে বহিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হয়। এই দৈব দুর্ব্বিপাকে বহুলোক আশ্রয় হীন হইয়াছিল *। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের ঘূর্ণী ঝটিকাতেও জেলার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল।

* "The Rupnarayan and Damudar rose eight feet above the ordinary level of the spring tides, and almost every embankment of the Hooghly Collectorate is swept away. The greater part of the country is covered with salt-water, and there has been great destruction of property. The country presents such a scene of ruin and distress that I cannot adequately describe it."—The Superintendent of Embankments.

১৭৭০ এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর, ১৮৩৩ এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের বন্যায় হুগলী জেলায় অজন্মা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই নিদারুণ অন্নকষ্টের সময় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন প্রকাশ নাই।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে হুগলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদ সমূহে ভয়ানক মড়ক উপস্থিত হয়। বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মড়ককে "কাল প্লেগ" কহিত। ইহার পর "ডেঙ্গু জ্বরের" আবির্ভাব। তাহার পর কাল "ম্যালেরিয়া জ্বর"। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রবল প্রতাপে অদ্যাপি হুগলী জেলা বাসীগণ সশঙ্ক। সন ১৩০৫ সাল হইতে "বিউবনিক প্লেগের" আবির্ভাব হইয়াছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনের "ভূমিকম্পে" জেলার নানা স্থানে অনেক ক্ষতি হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী-শিক্ষা।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তার কল্পে মাসিক ৮০০৲ ব্যয় মঞ্জুর করেন। এই টাকা চুঁচুড়ার পাদরী মার্শ্মাণ সাহেবকে দেওয়া হইত। তিনি এই টাকা ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশটী ইংরাজী স্কুলে বিতরণ করিতেন ঃ—নৈহাটী, ভাটপাড়া, গৌরীপুর, বীবীহাট, মানকুণ্ড, হালদারপাড়া, হাজিনগর, হুগলী, খাসবাটী, বাঁশবেড়িয়া, হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া, কলুপুখুরী এবং ক্যাঁকশিয়ালী। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখ হইতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদান বন্ধ করেন। ইহাতে অনেক গুলি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে হুগলীর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট স্মীথ সাহেব জেলার

জমীদারদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া হুগলীতে 'সব্‌স্কুপসন স্কুল' স্থাপন করেন। হুগলী কলেজ স্থাপিত হইলে এই স্কুলের নাম "ব্রাঞ্চ স্কুল" রাখা হয়। স্কুল বাটীর জন্য গবর্ণমেণ্ট ২ বিঘা ৭ কাঠা জমী প্রদান করেন। সংগৃহীত অর্থ হইতে স্কুল বাটী নির্ম্মিত হয়। এই স্কুলের প্রথম হেড মষ্টার ছিলেন বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মীথ সাহেবের * যত্নে স্কুলটীর অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ মহশীন নামক একজন ধনী ও দয়ালু মুসলমান ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রচুর ধন সম্পত্তি সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৫,০০০৲ তহবীল তছরুপ করা অপরাধে হুগলী ইমামবাড়ীর দুইজন মাতওয়ালীকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। গবর্ণমেণ্টের আদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া একজন দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের আদেশের অনুকুলে মোকর্দ্দামা নিষ্পত্তি হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে মহশীন ফণ্ডে আট লক্ষ টাকা মজুত হয়। এই প্রচুর অর্থ হইতে হুগলী কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়†। হুগলী কালেজের সুন্দর ও সুবৃহৎ অট্টালিকা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পেরন্ [Pérron‡] নামক একজন ফরাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। পেরন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সামান্য নাবিক রূপে এক খানি ফরাসী জাহাজে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সিন্ধিয়া রাজের সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পেরন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হন। বেভারিজ সাহেব

* হুগলীর সাবেক আদালতের সম্মুখে সুন্দর ইষ্টক নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত ঘাটটী স্মীথ সাহেবের উজ্জ্বল কীর্ত্তি। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্মীথ সাহেব চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ঘাটটী নির্ম্মাণ করেন। ঘাটটী "স্মীথ সাহেবের ঘাট" বলিয়া পরিচিত।

† কালেজের গাত্রে এক খানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত রূপ অঙ্কিত আছে :—College of Mohamad Mohsin. "This College was established through the munificence of the late Mohamad Mohsin, and was opened on the 1st of August, 1836."

‡ Vide Colonel Malleson's "Final French struggles in India" 1878.

বলেন পেরন্ অর্দ্ধক্রোড় টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেরন্ এই সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত চুঁচুড়ায় বাস করেন। পরে প্রাণকৃষ্ণ হালদার এই বাটীর মালিক হইয়া ইহাকে প্রমোদ ভবনে পরিণত করেন। প্রকাণ্ড হলে প্রায়ই নাচের মজলিস হইত। অবশেষে প্রাণকৃষ্ণ কোম্পানীর কাগজ জাল করা অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে একটী দেওয়ানী ডিক্রীর নিলামে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া নিবাসী জগমোহন শীল উক্ত বাটী ক্রয় করেন। জগমোহনের নিকট হইতে বিশ হাজার টাকা মূল্যে কালেজের জন্য বাটীটি ক্রয় করা হয়। হুগলীর সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব (Dr. Thomas A. Wise) কালেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১০ বৎসর পরে কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন প্রিন্সিপ্যাল হন। রিচার্ডসন সাহেব সেকন্দীয়ার পাঠে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইহার পর জেম্‌স কার্, রবার্ট থোয়েটস্, গ্রিফিথ্‌স, বুথ্ প্রভৃতি প্রিন্সিপ্যাল হন। এক্ষণে ডারু, বিলিং সাহেব প্রিন্সিপ্যাল। মধ্যে বিলিং সাহেব ছুটী লইলে কলেজের হেড মাষ্টার বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, প্রিন্সিপ্যালের কার্য্য করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ক্ষীরোদ বাবু সর্ব্ব প্রথম হুগলী কালেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হন। কালেজের মাসিক ব্যয় ছিল প্রায় পাচ হাজার টাকা। পূর্ব্বে লর্ড অকল্যাণ্ড, ডালহউসী প্রভৃতি গবর্ণর জেনারলগণ হুগলী কালেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে আগমন করিতেন।

হুগলী জেলায় এক্ষণে অনেক পল্লীগ্রামে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা বোর্ড এবং জমীদারগণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শ্রীরামপুরের মিশনরী ডাক্তার মার্শমানই প্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপন এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কালেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মার্শম্যান সাহেবের পরই মিশনরী ডাক্তার ডাফের নাম উল্লেখযোগ্য, ইনি হুগলী জেলায় শিক্ষা বিস্তার করে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইনি বাঁশবেড়িয়া, মহানাদ ও চুঁচুড়ায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন তন্মধ্যে চুঁচুড়া ফ্রি চার্চ্চ স্কুল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আদালত সমূহে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হয়। রুবকারীতে পারস্য ভাষা ব্যবহার হইত বটে কিন্তু যে সকল জমীদার ৮০০০৲ কিম্বা ততোধিক রাজস্ব দিতেন তাঁহাদের সহিত ইংরাজী ভাষায় পত্র আদান প্রদান চলিত। রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবে বাঙ্গালা মাসের পরিবর্ত্তে ইংরাজী মাস প্রচলিত করা হয়। ডেপুটী কালেক্টার নিযুক্ত করিবার সময় ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ প্রার্থীগণের আবেদন সর্ব্বাগ্রে মঞ্জুর হইত। অনেক সময় কালেজের প্রিন্সিপ্যালকে ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রগণকে ডেপুটী কালেক্টারী কিম্বা ইংরাজী বিভাগের অপর কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়া পাঠাইতে লেখা হইত। হুগলী ম্যাজিষ্ট্রেট আঁফিসে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল তারিখে পারস্য ভাষা সম্পূর্ণ রূপে রহিত হয়। ইংরাজী বিভাগে অনেক লোক নিযুক্ত করা হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হুগলী ইমামবাড়ী এবং মহম্মদ মহশীন।

নবাব মুরশীদ কুলীর আমলে আগা মহম্মদ মুতাহার নামক জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু পারস্য সওদাগর হুগলীতে আসিয়া বাস করেন। সম্রাট অওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ইনি অনেক জায়গীর লাভ করেন। মুতাহার একটী কন্যা এবং পত্নী রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। কন্যার নাম মামুজান খানাম্। মৃত্যুকালে মুতাহার এই কন্যাকে সর্ব্বস্ব দিয়া যান। মিরজা সালা উদ্দিনের সহিত মামুজানের বিবাহ হয়। মুতাহারের ভাগিনেয় হাজি ফৈজুল্লার সহিত মুতাহারের বিধবা পত্নী পুনরায় বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধা হন। এই পরিণয়ের ফলে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ মহশীন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মামুজানের মৃত্যু হইলে মহম্মদ মহশীন বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। মহশীন দার পরিগ্রহ করেন নাই। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনি পরোপকারের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেন। ১২১৩ সালের ৯ই বৈশাখ (১৮০৬ খৃঃ ২০শে এপ্রেল) মহশীন

এক উইলের দ্বারা ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য সমগ্র বিষয়ের উপসত্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। মহশীন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ২৯শে নবেম্বর মানবলীলা সম্বরণ করেন। মহশীন রাজব আলি এবং সাকের আলিকে মাতওয়ালী নিযুক্ত করেন। সন ১২২০ সাল ২৮শে বৈশাখ সাকের আলির মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থানে তদীয় পুত্র বেকার আলি মাতওয়ালী নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে রাজব আলি তাঁহার পুত্র ওয়াসিক আলি ওরফে মগোল জানকে তাঁহার স্থানে মাতওয়ালী নিযুক্ত করেন। এই দুই জন মাতওয়ালী পরস্পর বিরোধ করায় বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। ১৮১০ সালের উনবিংশ রেগুলেশন অনুসারে বোর্ড অব রেবিনিউ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নবেম্বর তারিখে নবাব আলি আকবর খাঁ বাহাদুরকে পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। সে সময় স্মীথ্ সাহেব হুগলীর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি মাতওয়ালী দুই জনকে ১৫০০০৲ তহবীল তছরুপাত করা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করেন। বেকার আলি মনঃকষ্টে পাগল হইয়া যান। ওয়াসিক আলি পুনরায় মাতওয়ালী হইবার জন্য দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে নবেম্বর সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া ওয়াসিক আলি বিলাতে আপীল করেন। সেখানেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৮,৬১,১০০৲ তহবীলে মজুত হওয়ায় এই অর্থ দ্বারা হুগলী কালেজ স্থাপন এবং হুগলীর বর্ত্তমান ইমামবাড়ী নির্ম্মিত হয়। নবাব আলি আকবর এতদিন মাতওয়ালীর কার্য্য করিতেছিলেন। তিনিও কতক টাকা আত্মসাৎ করায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মচ্যুত হন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী জানপুরের মৌলবী সৈয়েদ কেরামত আলী মাসিক ৫০০৲ বেতনে মাতওয়ালী নিযুক্ত হন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে মৌলবী জৈনুদ্দিন হোসেন খাঁ অল্প দিনের জন্য মাতওয়ালীর কার্য্য করেন। মাতওয়ালী কেরামত আলীর আমলে ২,১৭,৫১৮৲ ব্যয়ে ইমামবাড়ী নির্ম্মিত হয়। ইমামবাড়ীর ঘড়ীটী বিলাত হইতে ১১,৭২১৲ মূল্যে ক্রয় করিয়া আনা হয়। কেরামত আলীর আমলেই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বড় ইমামবাড়ী মহশীন ইমামবাড়ীর *

---

* "One of the noblest buildings in Bengal is the Emambarah of Hooghly. The Courtyard is spacious and grand, The trough in the middle is a little-sized

সহিত যুক্ত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই আগষ্ট কেরামত আলীর মৃত্যু হওয়ায় বাঢ়ের নবাব আমির আলীর উপযুক্ত পুত্র সৈয়দ আসরাফ উদ্দিন আহমেদ খাঁ বাহাদুর মাতওয়ালী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি একাল পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত ইমামবাড়ীর কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইমামবাড়ী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সিভিল সার্জ্জন ছিলেন ডাক্তার ওয়াইজ। বর্ত্তমান ডাক্তার সাহেব আছেন কাপ্তেন ইনিস্ (Captain H. Innes)। সম্প্রতি ওল্ডহ্যাম সাহেব ইনিস সাহেবের স্থানে আসিয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চুঁচুড়া।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা (Dutch) বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করে। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা হুগলী হইতে বিতাড়িত হইলে ওলন্দাজেরা আসিয়া প্রথমে হুগলী পরে চুঁচুড়ায় কুঠী স্থাপন করে। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহজঁহা ওলন্দাজদিগকে চুঁচুড়ায় কুঠী নির্ম্মাণের সনন্দ প্রদান করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জহুরী ট্যাবর্ণিয়ার (Tavernier) হুগলীর (চুঁচুড়ার?)

tank. The two-storied buildings, all around, are neat and elegant. "The great hall has a royal magnificence. But it is profusely adorned in the Mahomedan taste with chandeliers, and lanterns, and wall-shades of all the colours of the rain-bow. The surface of the walls is painted in blue and red inscriptions from the Koran. Nothing can be more gorgeous than the doors of the gateway. They are richly gilded all over, and upon them is inscribed, in golden letters, the date and history of the Musjeed."—Vide Bholanath Chunder's "Travels of a Hindu," Vol. I, p. 13.

ওলন্দাজ কুঠীতে আগমন করেন। কুঠীর কর্ত্তারা তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন *। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টার (Streynsham Master) চুঁচুড়ায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন চন্দননগর এবং বরাহনগর তৎকালে ওলন্দাজদিগের অধীন ছিল। ষ্ট্যাবরিনাস (Stavorinus) বলেন ওলন্দাজেরা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট গাষ্টেভাস্ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের উত্তর দিকের ফটকে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ এবং দক্ষিণ ফটকে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দ অঙ্কিত ছিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ অঙ্কিত প্রস্তর ফলক খানি চুঁচুড়ায় বর্ত্তমান কমিশনর সাহেবের আবাস ভবনে রক্ষিত হইয়াছে †। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে হ্যামিল্টান সাহেব ওলন্দাজদিগের বরাহনগর (বরনাগুল?) এবং চুঁচুড়ার কুঠী পরিদর্শন করেন। তিনি বরাহনগর দুর্নীতির আকর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু চুঁচুড়ার

---

* "1666 A.D. 20th February—I arrived at Hughli, where I stayed till the 2nd of March, during which time the Hollanders bid me very welcome and made it their business to shew me all the divertisements which the country was capable to afford. We went several times in pleasure boats upon the river, and we had a banquet of all the delicacies that the gardens of Europe could have afforded us; salads of all sorts, colewarts, asparagus, pease; but our chiefest dish was Japan beans, the Hollanders being very curious to have all sorts of pulse and herbs in their gardens, though they could never get artichokes to grow in that country."—Vide Tavernier's Travels in Wheeler's Early Records of British India, p, 160.

† এই প্রস্তর ফলকে O. V. C. অঙ্কিত আছে। ইহার অর্থ—Ostindiche Vereenigde Compañie অর্থাৎ United East India Company.

সুখ্যাতি করিয়াছেন *। চুঁচুড়া ব্যাটেভিয়ার অধীন ছিল। ব্যাটেভিয়া হইতে চুঁচুড়ায় রাজ-কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। চুঁচুড়ায় একজন ডিরেক্টার বা গবর্ণর থাকিতেন। তাঁহার কৌন্সিলের সদস্য থাকিতেন ৭ জন তন্মধ্যে ৫ জন সদস্য সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন বাকী দুই জন আবশ্যক মত পরামর্শ দিতেন মাত্র। গবর্ণরের বেতন অল্প ছিল বটে কিন্তু তাঁহার উপরি পাওনা যথেষ্ট ছিল।

* "Barnagul is the next Village on the River's Side above Calcutta, where the Dutch have an House and Garden, and the town is famously infamous for a Seminary of female Lewdness, where Numbers of Girls are trained up for the Destruction of unwary youths, who study more how to gratify their brutal Passions, and how to shun the evil Consequences that attend their Foily, notwithstanding the daily Instances of Rottenness and Mortality that happen to those who most frequent these Schools of Debauchery. The Dutch Shipping anchors there sometimes to take in their Cargoes for Batavia. * * *

"About half a league further up (from Chandarnagar) is the Chinchura, where the Dutch Emporium stands. It is a large Factory, walled high with Brick. And the Factors have a great many good Houses standing pleasantly on the River side, and all of them have pretty Gardens to their Houses. The Chinchura is wholly under the Dutch Company's Government. It is about a Mile long, and about the same Breadth, well inhabited by Armenians and the Natives. It is contiguous to Hughly, and affords sanctuary for many poor Natives when they are in Danger of being opprest by the Mogul's Governor, or his Harpies."—Captain Hamilton's Narrative.

গবর্ণরের বাৎসরিক সাংসারিক ব্যয় হইত প্রায় এক লক্ষ টাকা। চুঁচুড়ার মধ্যে কেবল মাত্র গবর্ণর পাল্কীতে চেয়ারে বসিয়া গমনাগমন করিতে পারিতেন। সেরূপ পাল্কী অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। তিনি যখন সহর পরিদর্শনে বহির্গত হইতেন তখন রাস্তার দুই পার্শ্বে লোকে বাদ্য বাদন করিত। রূপার আশা শোটা সহ চোবদারগণ অগ্রে অগ্রে যাইত। কৌন্সিলের সদস্যগণও অল্প সংখ্যক চোবদার সঙ্গে লইতে পারিতেন। প্রত্যেক সদস্য এক এক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন অল্প বেতনে সেরিফ নিযুক্ত হইতেন। সেরিফ জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। সেরিফের হস্তে অপরিসীম ক্ষমতা থাকায়, তাঁহার আয় যথেষ্ট ছিল। তিনি ইচ্ছামত বেত্র দণ্ড এবং জরিমানা করিতে পারিতেন। জরিমানার আয় তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। ধনী ব্যবসাদারগণের নিকট সামান্য অপরাধে তিনি বিশ হাজার হইতে ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় করিতেন।

চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণর কিরূপ জাঁকজমকের সহিত ইংরাজ গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন ষ্ট্যাবরিনাস্ (Stavorinus) তাহা লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার সাহেব (Mr. Cartier) কলিকাতার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন। তদুপলক্ষে ওলন্দাজ গবর্ণর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কয়েক জন সদস্য এবং পঞ্চবিংশতি জন দেহরক্ষক সমভিব্যাহারে চুঁচুড়া হইতে ওলন্দাজ গবর্ণর সুবৃহৎ বজরায় যাত্রা করিলেন। বজরা ছাড়িবামাত্র দুর্গ হইতে ২১টী তোপধ্বনি হইল। প্রত্যেক সদস্যের পৃথক বজরা ছিল। মোট ৩৬ খানি বজরা রওনা হইল। পরদিবস প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় বজরা গুলি চিৎপুরে নঙ্গর করিল। ইংরাজ গবর্ণরের প্রতিনিধি রাসেল সাহেব (Mr. Russel) সদলে আগমন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রাসেল সাহেবের গ্রাম্য আবাসে সকলে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। কলিকাতার গবর্ণরের প্রেরিত পাঁচ খানি অশ্বযানে করিয়া সকলে কলিকাতা সহরে গমন করিলেন। সাবেক গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকট একটী সুবৃহৎ এবং সুসজ্জিত বাটী ওলন্দাজ গবর্ণরের অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই বাটীর সম্মুখে একজন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর অধীনে ৮০ জন সিপাহী রক্ষিত হইয়া-

ছিল। কলিকাতার গবর্ণর কার্টিয়ার সাহেব ওলন্দাজ গবর্ণরের আগমন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কৌন্সিলের সদস্যগণ সহ তথায় আগমন করিলেন। ওলন্দাজ গবর্ণর কার্টিয়ার সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে "আপনি নব নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছেন তজ্জন্য আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। যে কয় বৎসর আপনি কলিকাতায় অবস্থান করিবেন আশা করি সুখ্যাতির সহিত ইংরাজ কোম্পানীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বদেশে সগৌরবে প্রত্যাগমন করিবেন।" কার্টিয়ার সাহেব উত্তরে একটু মৃদু হাস্য করিলেন। এক ঘন্টাকাল উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তার পর কার্টিয়ার সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ওলন্দাজ গবর্ণর গবর্ণমেণ্ট হাউসে গমন করিয়া কার্টিয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। একটী সুবৃহৎ হলে ৬০। ৭০ জন একত্রে ভোজন করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অর্দ্ধেক সৈনিক বিভাগের লোক ছিলেন। সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট হাউসে সৈনিক পুরুষগণের জন্য আহার্য্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। আহারান্তে প্রত্যেকের সম্মুখে একটী করিয়া হুকা রক্ষিত হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া সকলে হুকায় ধুমপান করিলেন। তৎপরে সকলে স্বীয় স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় ওলন্দাজ গবর্ণরকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতার গবর্ণর তাঁহার গ্রাম্য আবাস বেলভিডিয়ারে গমন করিলেন। সেখানে সখের ঐক্যতানিক বাদ্য বাদন হইলে পর মহাসমারোহে নৈশ ভোজন সম্পন্ন হইল। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সকলে সহরে প্রত্যাগত হন। পর দিবস প্রাতে নয় ঘটিকার সময় কার্টিয়ার সাহেব ওলন্দাজ গবর্ণরকে সেই রাত্রিতে বলনাচের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। কার্টিয়ার পত্নী এবং ওলন্দাজ গবর্ণর নৃত্য আরম্ভ করেন। বহু সাহেব বিবির সমাগম হইয়াছিল। অনেক বিবি মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। পর দিবস প্রত্যুষে বলনাচ ভঙ্গ হয়। অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় ওলন্দাজ গবর্ণর কলিকাতার গবর্ণরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই বজরায় পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। ওলন্দাজ গবর্ণর কলিকাতা আগমন এবং প্রত্যাগমন কালে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে ১৯টী তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। ওলন্দাজ গবর্ণর কলিকাতা গবর্ণরের ভৃত্যবর্গকে এক

হাজার টাকা বকসিস প্রদান করেন। পর দিন প্রাতে বজরা গুলি আসিয়া গিরেটীতে নঙ্গর করিল। ফরাসী গবর্ণর সিভেলিয়ার সাহেব (Mr. Chevalier) ওলন্দাজ গবর্ণরকে স্বীয় বাগানবাটীতে লইয়া যান। তথা সকলে প্রাতরাশ সমাপন করেন। ওলন্দাজ গবর্ণর সদলে অশ্বারোহণে গিরেটী হইতে চন্দননগর হইয়া চুঁচুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গবর্ণরের নিরাপদে প্রত্যাগমন জন্য সকলে আনন্দ প্রকাশ এবং মহা সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। ফোর্ট গাষ্টেভাস্ হইতে ২১টী তোপধ্বনি হইল।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ওলন্দাজেরা ইংরাজ কোম্পানীকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহারা ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে নবাব মীর জাফরের সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিয়া * সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। ব্যাটেভিয়া হইতে ৭ খানি রণতরী গঙ্গায় প্রবেশ করিল। ৩ খানি জাহাজে ৩৬টী করিয়া কামান, ৩ খানিতে ২৬টী করিয়া এবং ১ খানিতে ১৬টী কামান ছিল। জাহাজ গুলিতে ৭০০ য়ুরোপীয় ও ৮০০ ম্যালে প্রদেশীয় সৈন্য ছিল। ওলন্দাজেরা প্রকাশ করিল যে রণতরীগুলি মেগাপতনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, স্রোতের গতিকে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ক্লাইবের ওলন্দাজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্লাইব বেশ বুঝিলেন যে বঙ্গদেশে ইংরাজের স্থানে ওলন্দাজ শক্তি স্থাপনই এই রণতরী আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন য়ুরোপে ইংরাজ ও ওলন্দাজের মধ্যে পূর্ণ সখ্যতা বিরাজ করিতেছিল। ক্লাইব রাজনীতি অনুসারে রণতরী গুলির গতি

* "The Dutch began to trade in Bengal as early as the commencement of the last century; they were always the first in opulence and importance, till the English became the rulers of the country in the last revolution; and perhaps they would still have been so had the well-planned but badly-executed attempt made as before mentioned, during the administration of the Governor-General Mossel in 1759, succeeded to our wishes."—Vide Stovorinus' Voyages.

প্রতিরোধ করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি নিজের উপর দায়িত্ব রাখিয়া রণতরী গুলি আটক করিলেন। সে সময় ইংরাজ পক্ষে কলিকাতায় ৩৩০ জন য়ুরোপীয় সৈন্য এবং ১২০০ সিপাহী ছিল। কলিকাতায় য়ুরোপীয়দিগের মধ্য হইতে ৩৬০জন সখের সৈন্য গঠিত হইল, ইহার কর্ণেল হইলেন হলওয়েল সাহেব। ভাগ্যক্রমে মাসলিপত্তম যুদ্ধে জয়ী হইয়া কর্ণেল ফর্ড এবং কাপ্তেন নক্‌স্ সেই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বর্ত্তমান বোটানিক্যাল উদ্যানের নিকট থানা দুর্গ এবং গঙ্গার অপর দিকে চার্ণক দুর্গ ছিল। ক্লাইব কাপ্তেন নক্‌স্‌কে এই দুইটী দুর্গ রক্ষার ভার দিলেন। কর্ণেল ফর্ডকে সমুদয় সৈন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব দিলেন। জাহাজ আটক জন্য চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণর ভয় প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর ওলন্দাজ সৈন্য সাঁকরাইলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিল। ক্লাইব ওলন্দাজ সৈন্যের গতিরোধ জন্য কর্ণেল ফর্ডের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ফর্ড লিখিত আদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব তখন তাস খেলিতেছিলেন। তাস খেলিতে খেলিতে লিখিলেন "প্রিয় ফর্ড, অবিলম্বে যুদ্ধ কর। কৌন্সিলের আদেশ আগামী কল্য পাঠাইব।" সরস্বতী তীরে বিদেরা ক্ষেত্রের যুদ্ধে ফর্ড ওলন্দাজ দিগকে পরাভূত করিলেন *। এইবার হইতে ওলন্দাজদিগের দিন দিন

* "The action was short, bloody and decisive. In half an hour the enemy were completely defeated and put to flight, leaving 120 Europeans and 200 Malays dead on the field, 150 Europeans and as many Malays wounded, whilst Colonel Roussel and 14 other officers, 350 Europeans and 200 Malays, were made prisoners. The troop of horse and the Nawab's cavalry—which latter did nothing during the action—were very useful in pursuing the fugitives afterwards, which they did with such effect, that only 14 of the enemy finally escaped and reached Chinsura. The loss of the English on this occasion was comparatively trifling. The advantage of a skilfully chosen position, the effect of a well-directed and well-served artillery, and finally the aid of cavalry, all tended to render this victory so decisive and complete in spite of the disparity of numbers."—Vide Malleson's History of the Bengal Army, p. 270.

অবনতি হইতে লাগিল। তাহাদের রাজ্যলাভের বাসনা চিরকালের জন্য বিদায় দিতে হইল।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা চুঁচুড়া দখল করেন এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রত্যর্পন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই চুঁচুড়া পুনরায় ইংরাজ হস্তগত হয়। সেই সময় হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা চুঁচুড়া শাসন করেন। প্রথমে বার্চ্চ সাহেব পরে সিবিলিয়ন ফর্ব্বস সাহেব চুঁচুড়ার বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগকে পুনরায় দেওয়া হয়। তদুপলক্ষে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ গবর্ণর আনন্দোৎসব করেন *। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চ লণ্ডন সহরে ওলন্দাজদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এক সন্ধি হয়। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে চুঁচুড়া ইংরাজ অধিকারে আসিয়াছে। ইংরাজেরা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট গাষ্টেভাস ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন বেলের তত্ত্বাবধারনে নূতন দুর্গ বা গোরাবারিক নির্ম্মিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারিকে ইংরাজ সৈন্য থাকিত। ইংরাজ গোরা সৈন্যের অত্যাচারে চুঁচুড়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সমূহ জর্জ্জরিত হইতেছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের

* "On the occasion of the rehoisting of the Dutch flag at Chinsura on Monday last, the Hon'ble J. A. Van Braom gave a grand dinner, and in the evening a Ball and supper to Mr. Forbes, the English Commissioner, and principal families in Chinsura, Chandernagore, and Serampore. We are informed that the entertainment was arranged in the most gratifying manner, and the greatest harmony and cordiality prevailed."—Vide Calcutta Gazette of 18th September, 1817.

১৯শে মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটির সম্পাদক গোরাদিগের অত্যাচার কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বারিক হইতে গোরা সৈন্য বিদায় গ্রহণ করিলে চুঁচুড়ার অধিবাসীগণ নিশ্চিন্ত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর আফিস এবং হুগলী হইতে আদালত সমূহ চুঁচুড়া বারিকে স্থানান্তরিত হওয়ায় চুঁচুড়ার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দননগর।

ইস্পাহান নিবাসী ম্যাকারা (Maccarah) নামক জনৈক লোকের সাহায্যে ফরাসীগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে চন্দননগরে কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। একশত বৎসর এই কোম্পানীর অধীনে ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের রাজকার্য্য পরিচালিত হয়। পরে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করেন। যে সময়ে মুসোঁ ডুপলেঁ চন্দননগরের গবর্ণর ছিলেন সেই সময় ফরাসীরা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। উত্তরে তিব্বত পশ্চিমে পারস্যোপসাগর পূর্ব্বে চীন রাজ্য পর্য্যন্ত ফরাসী বানিজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। চন্দননগরের যশঃ সৌরভে অন্যান্য বিদেশীয় বণিকগণের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইত। ডুপলেঁ প্রখর বুদ্ধিশালী রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি নিত্য নূতন ব্যবসার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিতেন সেকারণ প্রচুর পরিমাণে অর্থাগম হইত। ডুপলেঁ চন্দননগর পরীখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন। তিনি দ্বাদশ বৎসর চন্দননগরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি ফরাসী গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া পণ্ডিচারীতে গমন করিলে চন্দননগরের অবনতি আরম্ভ হয়। চন্দননগরের উজ্জ্বল শ্রী ক্রমে ম্লান হইতে লাগিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মুসোঁ রেনল্ট (M. Ranault de St Germain) চন্দননগরের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন।

ইহার অধীনে ১৪৬ জন য়ুরোপীয় এবং ৬০ জন সিপাহী ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোপে পড়িয়া ইংরাজগণ ওলন্দাজ এবং ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। ওলন্দাজেরা সাহায্য করিতে একেবারেই অস্বীকার করেন। ফরাসীরা ভদ্রভাবে উত্তর দেন যে ইংরাজদিগকে তাঁহারা চন্দননগরে আশ্রয় দিতে পারেন। নবাব কলিকাতা বিজয়ের পূর্ব্বে ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন। ফরাসীরা সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। নবাব ফরাসীদিগকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যগতিকে ঘটিয়া উঠে নাই। ক্লাইব এবং ওয়াটসন্ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী কলিকাতা পুনরধিকার এবং কয়েক দিন পরে হুগলী ধ্বংস করেন। নবাব প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৫,০০০ অশ্বারোহী এবং ১০,০০০ পদাতিক সৈন্য সহ কলিকাতা আগমন করিতেছিলেন। এই সময় ইংরাজেরা সংবাদ পাইলেন যে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ ঘোষনা হইয়াছে। তাঁহারা ভাবিলেন যদি ফরাসীরা নবাবের সহায়তা করে তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিত পরাজিত হইবেন। এমন সময় সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিলেও বঙ্গে ইংরাজ ও ফরাসীতে যাহাতে সদ্ভাবে থাকেন তজ্জন্য চন্দননগরের ফরাসী ডিরেক্টর ইংরাজদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষের অভিপ্রায় মত সন্ধির সর্ত্ত সকল লিপিবদ্ধ হইল। কেবল ক্লাইব ও ওয়াটসনের স্বাক্ষর হইতে বাকী থাকিল। নবাব কলিকাতা আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অল্পদিন পরে নবাব সংবাদ পাইলেন আমেদ সাহ আবদালী দিল্লী অধিকার করিয়াছেন। আমেদ সাহ যদি বঙ্গদেশ অধিকার করিতে আসেন সেই আশঙ্কায় নবাব ক্লাইবকে মাসিক এক লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দুই দিন পরে সংবাদ আসিল তিন খানি ইংরাজ রণতরী, তিন দল পদাতিক সৈন্য এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্য কামান সহ গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইব ও ওয়াটসন্ অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন ভাগ্যদেবী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্না নতুবা নবাবের বিশাল সেনা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে কেন? বিলাত হইতে আশাতিরিক্ত সাহায্য আসিয়া পৌছিবে কেন? তাঁহারা স্তোক বাক্যে

ফরাসী দূতদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেই চন্দননগর অধিকার করা। যখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর জন্য আসিল ওয়াটসন্ সহী করিতে অস্বীকার করিলেন, কহিলেন চন্দননগরের দূতদিগের সন্ধি করিবার কোন ক্ষমতা নাই। পণ্ডিচারীর দূত আবশ্যক। গত্যন্তর যুদ্ধ। এ দিকে ফরাসী ডিরেক্টর রেনল্ট সন্ধি লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন কেবল দূতেরা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া আনিবার অপেক্ষা মাত্র। অকস্মাৎ দূতেরা প্রত্যাগমন করিয়া দুঃসংবাদ দিল যে ইংরাজেরা চন্দননগর অধিকার করিতে আসিতেছেন। চন্দননগর যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। রেনল্ট য়ুরোপীয় অধিবাসীগণকে চন্দননগর রক্ষার্থে আহ্বান করিলেন। এইরূপে তিন শত য়ুরোপীয় সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইংরাজ রণতরীর গতি রোধ জন্য গঙ্গায় কয়েক খানি জাহাজ জলমগ্ন করিয়া রাখা হইল। দুর্গ* (Fort de' Orleans) ও গির্জ্জার উপরে এবং স্থানে স্থানে কামান সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইল। পূর্ব্ব পরীখার চতুর্দ্দিকে আর একটী পরীখা খনন করা হইল। ৭ই মার্চ্চ হাওড়া হইতে ইংরাজ পক্ষে ৭০০ য়ুরোপীয় সৈন্য এবং ১৫০০ সিপাহী পদব্রজে যাত্রা করিল। ওয়াটসন্ ১৫০ গোলন্দাজ সৈন্য এবং কামান সহ জাহাজে রওনা হইলেন। কয়েক দিন ধরিয়া উভয় পক্ষে গোলা গুলি

* "Chandernagore, the principal settlement of the French in this part of the Indies, strongly garrisoned. The fort was a regular square, about ¾ mile in circumference, with four bastions each mounting 16 guns, besides some on the curtain, and a battery of four pieces of cannon on the top of a church. There was a dry fosse round the three sides to the land, with a glacis of about 40 yards. At the northward port" (*i. e.* gate) "was a ravelin mounting five guns, and opposite the port towards the water side was a mud battery of six guns which flanked down the river."—Vide Ives' "Voyage from England to India."

বর্ষণ হইতে লাগিল। দুর্গের বহির্ভাগের প্রধান গোলেন্দাজ ছিল টেরান (Terraneau) নামক জনৈক ফরাসী। টেরন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ইংরাজদিগকে একটী গুপ্ত পথ বলিয়া দিল। ইংরাজেরা সেই পথে আসিয়া সবেগে আক্রমণ করিলেন। ২৪শে মার্চ্চ প্রাতে সকলে বুঝিল ফরাসীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যখন ফরাসীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া কাতর হইয়া পড়িল—১১০ জন সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, তখন রেনল্ট আত্মসমর্পণ জন্য অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্বেত পতাকা উত্তোলন করিলেন। ইংরাজেরা জয়ী হইলেন। ফরাসী ডিরেক্টর এবং রাজকর্ম্মচারীগণ যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যথেচ্ছা গমন করিবার অনুমতি পাইলেন। সৈন্যগণ বন্দী স্বরূপ আবদ্ধ রহিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে চন্দননগর ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইংরাজেরা পুনরায় চন্দননগর অধিকার এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করেন।

গিরেটীর বিখ্যাত উদ্যান বাটী ফরাসী গবর্ণরদের গ্রাম্যাবাস ছিল*।

* "Chandernagore is built all along the river, and is embellished with many handsome houses. Farther down, about half-way between Chandernagore and Serampore, is a place called Garetti. Here, on the same side with Chandernagore, the French Governor has built a noble house, or rather a palace, and has laid out an extensive and pleasant garden. And in this neighbourhood the English have a military fort, where often one thousand men, and sometimes more, are encamped. ... ... Chandernagore is built, about a mile in length, with two parallel, and several cross streets behind it, which have some good buildings. The ruins of the Fort, demolished by the English, are at the north end of the place, and sufficiently demonstrate its' former strength. The trade of the French here has, since the last war, been greatly on the decline. Their settlement and fort of Chander-

এখন তাহা জঙ্গলাকীর্ণ। এরূপ সুরম্য হর্ম্ম্য তৎকালে এ প্রদেশে ছিল না। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই বাটীতে চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান য়ুরোপীয়গণ সমবেত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। বাটীটি সুন্দররূপে সুসজ্জিত ছিল। এই খানে ফরাসী গবর্ণর, ক্লাইব, ভেরলেষ্ট, হেষ্টিংস্ ও সার উইলিয়ম্ জোন্সকে মহাসমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করেন। এই বাটী প্রবেশ বর্ত্ম শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজীতে সুশোভিত ছিল। এই বর্ত্মে অভ্যাগতদিগের সার্দ্ধশত অশ্বযান অপেক্ষা করিত। ষ্ট্যাবরিনাস্ বলেন ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ওলন্দাজ গবর্ণর ফরাসী গবর্ণরের সহিত মহাসমারোহে সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি ফরাসী গবর্ণরকে অনুরোধ করেন যেন গিরেটীর উদ্যান বাটীতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়।

চন্দননগরে ফরাসী বিদ্রোহের সময়ঃ গিরেটীর বাগানবাটী এক দিন ফরাসী গবর্ণরের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ফরাসী বিদ্রোহ হয়, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে ক্ষুদ্রাকারে তাহার পুনরভিনয় হয়*। চন্দননগরবাসীগণ একজন আইনজ্ঞের অধীনে সমবেত হইয়া গবর্ণরের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। নৃপতি ষোড়শ লুই যেরূপ ভার্সেলীতে গিয়া আশ্রয় লন, চন্দননগরের গবর্ণরও সেইরূপ প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া গিরেটীর উদ্যানবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফ্রান্সের বিদ্রোহীরা যেরূপ ভাবে

nagore were then wholly destroyed by the English. At the peace which followed, it was conditioned that the Fort should not be rebuilt, nor should they be allowed to fortify themselves in anyway. The English are very strict on these points and are very careful that the French do not infringe these conditions in the least. It was not long ago, that they enforced their rights in this respect without any ceremony.—Stavorinus' Voyages (1769-70).

* Vide "Notes on the right bank of the Hooghly" in the Calcutta Review of 1845.

ষোড়শ লুই এবং মেরী এণ্টনিয়েট্‌কে ভার্সেলী হইতে প্যারী নগরীতে লইয়া আসে, এক্ষেত্রে গবর্ণরকেও সেইরূপ ভাবে গিরেটী হইতে চন্দননগরে ধরিয়া আনা হয়। এখন গবর্ণরের শিরশ্ছেদ হইলেই অভিনয় সম্পূর্ণ হইত। গবর্ণর ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। এক দল ইংরাজ সৈন্য চন্দননগরে গিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মুসোঁ ফুমিয়ন চন্দননগরের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে চন্দননগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে দিল না। অগত্যা কিছু কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া তিনি পণ্ডিচারীতে প্রত্যাগমন করেন *।

মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে কুঠী স্থাপনের জন্য ফরাসীরা কেবল মাত্র ৭ বিঘা জমী নিষ্কর প্রাপ্ত হন। বক্রী সমুদায় জমীর জন্য তাঁহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দিতে হয়। গোন্দলপাড়া তালুক পূর্ব্বে হুগলীর ফৌজদার নবাব খাঁজাহান খাঁর জমিদারীভুক্ত ছিল। শ্রীরামপুর কুঠী স্থাপনের পূর্ব্বে এখানে দিনেমারদিগের কুঠী ছিল। এখন ফরাসীরা গোন্দলপাড়ার পত্তনীসত্ব উপভোগ করেন।

* "Monsieur Fumeron, sometime ago appointed Chief of Chandernagore by the Government of Pondicherry, has been trying in vain for many months past, to take possession of his Government, but the popular Chiefs of Chandernagore have uniformly resisted his authority, and even denied him admission in the settlement. Thus situated, M. Fumeron has resided in Calcutta since his arrival in Bengal, but at length seeing no hope of a change in the sentiments of those, over whom he was intended to preside, he has left Calcutta, and embarked on board *la Fidèle* for Pondicherry, which sailed from hence a few days ago."—Vide Calcutta Gazette of 18th October, 1792.

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামপুর।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা (Danes) ভাগীরথী তীরে প্রথম বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা নবাব আজিম-উশানের নিকট হইতে হুগলীর নিকট কুঠী স্থাপনের জন্য এক ফার্ম্মাণ প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী তাঁহাদিগকে বাৎসরিক দশ কিস্তিতে ৩০,০০০৲ রাজস্ব দিতে হইত। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের কুঠীর কর্ত্তা ছিলেন স্কট্‌ম্যান সাহেব (Mr. Scotman)। তিনি চন্দননগরের দক্ষিণে গোন্দলপাড়ায় থাকিতেন। সেজন্য গোন্দলপাড়াকে এখনও লোকে দেনমারডাঙ্গা কহে। নবাবের বাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর সহিত শুল্ক সম্বন্ধে স্কটম্যান সাহেবের প্রায়ই বিবাদ হইত। এজন্য দিনেমারেরা পৃথক স্থানে কুঠী স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কাশিমবাজারে ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মুসোঁ ল এর যত্নে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দীর নিকট হইতে দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপনের পরওয়ানা প্রাপ্ত হন। মুসোঁ ল স্বয়ং সেই পরওয়ানা এবং হুগলীর ফৌজদারের প্রতি হুকুমনামা সহ ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দননগরে আগমন করেন। ফার্ম্মাণে কুঠী স্থাপনের জন্য ৬০ বিঘা জমী দিবার কথা ছিল তন্মধ্যে দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে ৩ বিঘা এবং আকনায় ৫৭ বিঘা জমী গ্রহণ করেন। দেনমার্কাধিপতির নামে শ্রীরামপুরের "ফ্রেডেরিক্‌স নগর" নামকরণ করা হয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে দিনেমার পতাকা উড্ডীন হয়। নবাবকে উপঢৌকনে এবং জমীর মূল্য বাবদে দিনেমারদিগের এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের চতুর্দ্দিকে মাটীর প্রাচীর এবং তাহার উপর খড়ের চাল দেওয়া হইয়াছিল।

কাপ্তেন হ্যামিল্টান ১৭২০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যে দেনমারডাঙ্গার অবস্থান কালে দিনেমারদিগের একবার এরূপ শোচনীয় অবস্থা হয় যে তাহারা মোগল প্রজার পণ্যপূর্ণ নৌকা লুঠ করিয়া প্রাণধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল *। ক্রফোর্ড সাহেব (Lieut-Col. D. G. Crawford, M.B.)

* "There are several other villages on the river sides, in the way to Hooghly, which lies twenty miles above Barnagul, but none remarkable till we come to the Danes' factory, which stands about four miles below Hooghly, but the poverty of the Danes has made them desert it, after having robbed the Moghul's subjects of some of their shipping, to keep themselves from starving."—Vide Captain Hamilton's Narrative in Wheeler's Early Records of British India p. 195-96.

বলেন হুগলীর ফৌজদার বাদলচাঁদ এবং দেওয়ান লাহুড়ী মাল দিনেমার বণিকগণের উপর পুনঃপুনঃ অত্যাচার করায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে অক্টোবর তাহার প্রতিবিধানের জন্য দিনেমারেরা আবেদন করেন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিতে যাইতেছিলেন। তিনি শ্রীরামপুরের কুঠীর কর্ত্তা স্কটম্যান্ সাহেবকে সসৈন্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান করেন। স্কটম্যান বলিয়া পাঠান যে তাঁহার একটীও সৈন্য বা কামান নাই। তিনি সামান্য ভাবে দুই তিনটী ভৃত্য লইয়া মৃৎকুটীরে বাস করিতেছেন। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ চলিয়াছিল। দিনেমারেরা কোনও পক্ষই অবলম্বন করেন নাই তবে ফরাসীদের সহিত তাঁহাদের বরাবর সাহানুভূতি ছিল *।

মার্কিন যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স, হলণ্ড এবং উত্তর মার্কিনের

* Minutes of Consultation, Fort William 11th January, 1759.—Letter from Mr. Ziegenbalg and the Gentlemen of Frederick Nagore, asking why their Company's ship *The King of Denmaak* was stopped. Reply to be sent to Mr. Ziegenbalg and the Gentlemen of the Danish Factory, stating that their partial behaviour towards the French and the help given by them to our enemies with provision, have forced us to watch their conduct carefully, and to detain their ship, but that if they please we will land their rice at Madras.

শত্রুতা বৃদ্ধি হয়। এই কয় জাতির জাহাজ ইংরাজ বাণিজ্য পোত দেখিলেই লুঠ করিত। এই সুযোগে দিনেমারেরা বাণিজ্যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ৪৫ বৎসর পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে ইংরাজ ও দিনেমারে যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজেরা শ্রীরামপুর অধিকার করেন। অল্প দিন পরে আমিন্সের সন্ধির পর শ্রীরামপুর দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় য়ুরোপে গোলযোগ ঘটে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ক্যারীর অধীনে এক দল ইংরাজ সৈন্য গমন করিয়া শ্রীরামপুর দখল করেন। গবর্ণর জেনারল লর্ড মিণ্টোর পুত্র অনারেবল্ কাপ্তেন জর্জ্জ ইলিয়ট এবং কাপ্তেন মণ্টেগ্ ও কাপ্তেন ডিকর্সি তিন খানি রণপোতে গমন করিয়া শ্রীরামপুর বন্দরে দিনেমারদিগের কয়েক খানি মূল্যবান পণ্যপূর্ণ বাণিজ্য পোত অধিকার করেন *। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে শান্তি সংস্থাপিত হইলে ইংরাজেরা শ্রীরামপুর দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন।

দিনেমারদিগের বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, ক্রমে এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল যে দেনমার্ক হইতে অর্থ আনিয়া শ্রীরামপুরের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দেনমার্কাধিপতি বার লক্ষ টাকা মূল্যে ইংরাজদিগকে ট্রাঙ্কুইবার এবং শ্রীরামপুর বিক্রয় করেন। শ্রীরামপুরে স্কটম্যান যেদিন দিনেমার পতাকা উড্ডীন করেন তাহার ঠিক ৯০ বৎসর তিন দিবস পরে শ্রীরামপুরে ইংরাজ পতাকা উড্ডীন

* In consequence of intelligence received by Government of a rupture between Great Britain and Denmark, a detachment of troops from the Garrison of Fort William, under the command of Lieutenant-Colonel Cary, took possession of the Danish settlement of Serampore, at six o'clock in the morning of the 28th ultimo. The Danish ships in the River Hooghly were, on the same day taken possession of by the Hon'ble Captain Elliot, of H. M. S. *Modeste*, by Captain Montague, of H. M. S. *Terpsichore*, and by Captain Decourcy, of H.M.S. *Dasher*.—Vide Calcutta Gazette of 4th February, 1808.

হইয়াছে। শ্রীরামপুরের শেষ দিনেমার গবর্ণর ছিলেন লিণ্ডহার্ড সাহেব (The Hon'ble L. Lindhard)। গবর্ণরের স্থানে লুই জ্যাকসন্ সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামপুরের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি দিনেমার গবর্ণরের আবাস ভবনে থাকিতেন। শ্রীরামপুর হইতে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হয়। ক্যারী মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড শ্রীরামপুরের শিক্ষা বিস্তার কল্পে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরামপুরের ভাগীরথী তীরের দৃশ্য অতীব সুন্দর *।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হুগলীতে শেষ সতীদাহ।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তদশ রেগুলেশন অনুসারে সহমরণ প্রথা রহিত হয়। ১৮১৫ হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলায় ১৩৯৮ জন সতী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। বঙ্গদেশের প্রথম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হেলিডে সাহেব (Sir Frederick Halliday) যখন হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি স্বচক্ষে একজন সতীর সহমরণ দেখিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন

* "Serampore is a snug little town that possesses an exceeding elegance and neatness of appearance. The range of houses along the river makes up a gay and brilliant picture. The interior keeps the promise which a distant view has given. The streets are as brightly clean as the walks in a garden. There is not much bustle or activity, the place greatly wears the character of a suburban retreat. But time was when there was a busy trade, and 22 ships cleared from the small port in the space of six months."—Vide Bholanath Chunder's "Travels of a Hindu" (1845).

আমরা মাননীয় শ্রীযুক্ত বাকল্যাণ্ড সাহেবের পুস্তক * হইতে তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম। "সহমরণ প্রথা রহিত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে আমি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। এক দিন আমি সংবাদ পাইলাম ভাগীরথী তীরে একজন হিন্দু রমণী সহমরণে যাইতেছেন। সে সময় মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক ওয়াইজ সাহেব ও বড় লাটের পাদরী সাহেব আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সহমরণ দেখিতে উৎসুক হইলেন। আমরা সকলে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম চিতা সজ্জিত। তথায় বহুলোক সমবেত হইয়াছে। সহমরণোদ্যতা রমণী মাটীতে বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা কয়েক খানি কাষ্ঠাসন আনাইয়া রমণীর নিকটে উপবেশন করিলাম। আমার সমভিব্যাহারী ডাক্তার ও পাদরী সাহেব রমণীটিকে সহমরণে যাইতে নানা প্রকারে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা ইংরাজীতে যাহা যাহা বলিলেন আমি বাঙ্গলাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি সকল কথা বুঝিলেন কিন্তু কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি ধীর স্থির ও প্রশান্ত ভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল। কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি চিতারোহণ করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া পাদরী সাহেব পুনরায় নিষেধ করিয়া বলিলেন 'আপনি কি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহা বোধ হয় আপনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।' সতী আমার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন। পাদরীর কথা শুনিয়া অবজ্ঞা ভরে আমার দিকে চাহিলেন। সতীর প্রশান্ত মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি একটী প্রদীপ আনিতে বলিলেন। প্রদীপ আসিলে সতী স্বয়ং ঘৃত দিয়া সলিতা জ্বালিলেন। যখন প্রদীপ বেশ জ্বলিয়া উঠিল তখন সতী প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইল। পেন কলম বাতির আলোয় পুড়িলে যেরূপ হয় সতীর অঙ্গুলি কতকটা সেইরূপ দেখিতে হইল। সতীর মুখে কোনও রূপ বিকৃতির চিহ্ন দেখিলাম না।

* Vide "Bengal under the Lieutenant-Governors" by the Honbl'e C. E. Buckland, C. I. E. Member, Board of Revenue.

কিছুমাত্র সঙ্কুচিত বোধ হইল না। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য অঙ্গুলি নাড়িলেন না। যেরূপ নিশ্চল ভাবে বসিয়াছিলেন সেইরূপই রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে তিনি আমাকে কহিলেন "এইবার আপনার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আমাকে যাইতে অনুমতি করুন।" আমি অনুমতি দিলাম। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে সুসজ্জিত চিতার নিকট গমন করিলেন। চিতা তিন হস্ত উচ্চ এবং প্রস্থে দুই হস্ত। কাষ্ঠরাশি দ্বারা চিতা সুসজ্জিত। সতী তিন চারিবার চিতা প্রদক্ষিণ করত চিতারোহণ করিলেন। তিনি স্বীয় ভুজে মস্তক স্থাপন করিয়া এক পার্শ্বে শয়ন করত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—যেন প্রশান্ত ভাবে নিদ্রিত। তাঁহার উপর কাষ্ঠ স্থাপন করা হইল। তাঁহার আত্মীয়গণ বংশ খণ্ডের সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিল। আমি নিষেধ করিলাম। তাহারা অনিচ্ছা পূর্ব্বক আমার কথা শুনিল কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিল না। চিতার নিকট সতীর ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে চিতায় অগ্নি প্রদান করিতে বলা হইল। অনেক সময় দূরদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি আনিয়া সতীর চিতায় স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রেও সেইরূপ করা হইয়াছিল। চিতায় অগ্নি প্রদান করা হইল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে ঘৃত ও ধুনা দেওয়া হইতে লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমি চিতার নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলাম। অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া আসিলাম। চিতা হইতে কোনও রূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। চিতাভ্যন্তর নিশ্চল, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য একবার কাষ্ঠস্তূপ ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পর সব স্থির ও নিষ্কম্প হইল। যতক্ষণ চিতা জ্বলিতেছিল সতীর পুত্র চিতা পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। যখন সব শেষ হইল, যখন সতীদেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, তখন পুত্র করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বোধ হয় হুগলী জেলায় বা বঙ্গদেশে এই শেষ সতীদাহ। বড় লাট বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের আদেশে সতীদাহ রহিত হইয়াছে বটে কিন্তু বঙ্গদেশে সতীর অপ্রতুল নাই।

জগন্নাথদেবের পুরীদর্শন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীতে জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া অতুলকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যাপার যাহা তাহা রাজা ভিন্ন কে সংসাধন করিতে পারে? দেবালয়ের সীমানা বহুদূর ব্যাপিয়া—চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর—সেই প্রাচীরের চারিদিকে বৃহৎ চারি দ্বার। পূর্ব্বদিকে সিংহ দ্বার—দক্ষিণের দ্বারও প্রসিদ্ধ। এরূপ সুবৃহৎ মন্দির ভারতের অন্য কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। ইহার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক মন্দির আছে তথায় অনেক দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থান পীঠস্থান রূপে পরিগণিত—সেই পীঠস্থানে বিমলা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত, দেখিলে কাশীর অন্নপূর্ণাকে মনে পড়ে। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই মন্দির স্বীয় শোভা অব্যাহত ভাবে বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দুরন্ত কালাপাহাড় ইহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই বিশাল মন্দিরের ভিতর দক্ষিণে বলরাম মধ্যে সুভদ্রা এবং বামে জগন্নাথ দেব বিরাজ করিতেছেন। সকলেই পূর্ব্বমুখী, বোধ হয় এই জন্যই পূর্ব্বদ্বার সিংহ দ্বার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

এই বিশাল মন্দিরের স্থানে স্থানে অশ্লীলতাপূর্ণ ছবি সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা শুধু বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশে এই স্থানে উপনীত হয়েন তাঁহারা এই সকল কুৎসিৎ ছবি দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তীর্থ দর্শনে গমন করেন তাঁহারা উহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবকে দেখিবার জন্য যাঁহাদের উৎকণ্ঠা তাঁহারা অশ্লীলতার দিকে লক্ষ্য করিবেন কেন? এই অশ্লীলতার প্রলোভনে যদি মুগ্ধ হও তবে মন্দিরে প্রবেশ করিবার তোমার অধিকার নাই—তুমি অশ্লীলতার ক্ষুদ্র তর্কে নিমগ্ন থাক আর প্রকৃত ভক্ত ভক্তিনাথের চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হউন। মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে আনন্দবাজার। এই স্থানে জগন্নাথদেবের প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা এক বিরাট ব্যাপার। ঠাকুরের ৫২ বায়ান্ন ভোগ হইয়া থাকে। দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত ভোগ চলিতেছে। প্রাতঃকালে মুড়কি ভোগ—তাহার পর খিচুড়ী ভোগ তাহার

পর বিবিধ প্রকারের ভোগ। খিচুড়ী ভোগ,, অন্ন ভোগ, ডাউল ও ব্যঞ্জন এবং নানা প্রকারের অন্ন আনন্দ বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে রন্ধন হইয়া থাকে এবং সেই পাত্র সমেত বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে যখন খিচুড়ী কিম্বা অন্ন বিক্রয় হইয়া থাকে—তখন উহা হয়ত একস্থানে রাশীকৃত থাকে এবং তাহা ক্রমশঃ বিক্রীত হয়। তাহা হইলে অপ্রীতিকর হইতে পারিত, কিন্তু যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রের রন্ধনকৃত সামগ্রী সেই সেই পাত্র সহ বিক্রীত হয় তখন অশ্রদ্ধার কোন কারণ থাকিতে পারে না। স্থান মাহাত্ম্যের গুণে এই স্থানে হিন্দুর কোন প্রকার অশ্রদ্ধা বা অপ্রীতি হইতে পারে না। জাতিভেদ এখানে নাই। সাম্যের মন্দিরে ভ্রাতৃভাবের মধুরতায় নিমগ্ন হইয়া সকলে প্রীতি ভোজন করিয়া থাকেন—সে দৃশ্য বড়ই মধুর।

এই আনন্দবাজারের মাহাত্ম্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন ইহা বুদ্ধদেবের কীর্ত্তির পরিচায়ক কিন্তু অপর দিকে দেখিতে গেলে ইহা হিন্দুহৃদয়ের সাম্য ও উদারতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মানবীয় ধর্ম্মের মধুর ভাব ইহার অন্তর নিহিত। মানবহৃদয়ের যত প্রকার ভাব আছে তাহা ধর্ম্মের এক একটি দ্বার। হিন্দু হৃদয়ের সেই শত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিবিধ আলোকে সমুজ্জ্বল ভাবে আপনার দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এমন সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম কি জগতে আর আছে?

বলরাম জ্ঞান ও শক্তির অবতার। জগন্নাথ প্রেমের দেবতা। এই উভয়ের মিলনে জগতের মঙ্গল। সর্ব্বমঙ্গলা সুভদ্রা উভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের মহৎ তত্ত্বের অভিনয় দেখাইতেছেন। জ্ঞান ও শক্তির সহিত কোমলতা মিশিলে তবেই প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক দিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব জ্ঞানের অভিমানে উদ্ধত ছিলেন, তখন তিনি বলরাম রূপে লীলা করিতেন। পরিশেষে ৺গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিলে যখন তাঁহার প্রকৃতি শুভক্ষণে সুভদ্রার ভাবে পরিণত হইল তখন তিনি বিশ্বপতির বিশ্বপ্রেমে ডুবিয়া প্রেমের লীলার অভিনয় করিতে লাগিলেন। বোধ হয় এই জন্যই এই স্থান মহাপ্রভুর এতই তৃপ্তিকর বোধ হইয়াছিল এবং শেষ জীবন এই স্থানে অতিবাহিত করিতে এতই অনুরাগ বাড়িয়াছিল। জগন্নাথকে ছাড়িয়া মহাপ্রভু যাইবেন কোথায়? তাঁহারই

সান্নিধ্যে দক্ষিণ দিকে মহাপ্রভুর মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালীর ইহা বড়ই আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

বাঙ্গালীর আর একটি আনন্দের বিষয় এই যে সমুদ্রতটে ভক্ত হরিদাস ও অপর অনেক বৈষ্ণবগণের সমাধিস্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্থানটি কি মনোরম। অনন্ত প্রসারিত নীলাম্বুতটের শোভায় সমাকৃষ্ট হইয়া ভক্তগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন—মৃদঙ্গের গম্ভীর শব্দের সহিত সাগর নিনাদ মিশিয়া যে গুরুগম্ভীর ভাবের উৎপত্তি হইত তাহাতে হরিনামের বীজ প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তি তরঙ্গের কতই মনোহর উচ্ছ্বাস হইত। এখনও সাগরের সেই উচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু হায় সে মৃদঙ্গ কোথায় সে হরিনামের সর্ব্বপাপ সংহারক মহামন্ত্রের ধ্বনি কোথায়? মহাপ্রাণ ভক্তগণ প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন কে আর সেই মধুর স্থানে প্রমত্তভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করিবে?

সমুদ্রতটে বাস স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই হিতকর। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গের পক্ষে ইহা অতীব উপাদেয় স্থান। এতদিন আমরা মধুপুর সিমুলতলা এটোয়া মথুরা প্রভৃতি স্থান নির্ব্বাচন করিতাম—কিন্তু ক্রমে সেই সেই স্থান এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যকর নাই। এখন নূতন স্থানের প্রয়োজন হইয়াছে। শুভক্ষণে কলিকাতা হইতে পুরী পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছে। এই সমুদ্রতটে বাস বাঙ্গালীর পক্ষে সহজসাধ্য। সাগরকূলে অনেক স্থান পতিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই স্থানে ক্রমে গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে। এখন যাঁহারা এই সকল স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিবেন তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইবেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানে বসন্ত চির বিদ্যমান। সমুদ্রে স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই হিতকর। ম্যালেরিয়া এই স্থান কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

পুরীতে বিধবার একাদশী নাই। এই স্থানে বিধবা যতবার ইচ্ছা প্রসাদ ভক্ষণ করিতে পারেন। জগন্নাথের আশ্রয়ে দুঃখ ক্লেশ পাইতে হয় না। হিন্দু বিধবার পক্ষে কাশীধাম মহাতীর্থ। কিন্তু তথায় একাদশী ও অনাহারের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু পুরীধামে বিধবারা বাস করিলে তাঁহাদিগকে কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে হয় না। এই স্থান ক্রমে বাঙ্গালীর সমাগমে বাঙ্গালীটোলা হইবে এবং বাঙ্গালীর বিধবারা আসিয়া বাস করিবার সুবিধা পাইবেন। বালবিধবাদিগকে এই স্থানে রাখিতে হৃদয় হিন্দুমাত্রেরই ইচ্ছা হইবে। কালে এই স্থানে বিধবাশ্রম স্থাপিত এবে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

পুরীতে তিনটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। শ্বেত, মার্কণ্ডেয় ও চন্দন সরোবর তিনটীর মধ্যে চন্দন সরোবর অতীব মনোহর। ইহার জলও পরিষ্কৃত সুস্বাদু। তদ্ভিন্ন এই স্থানে বড় বড় কূপ আছে—সচরাচর তাহারই জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

থাকিবার স্থান যথেষ্ট আছে। স্নানযাত্রার সময়ে অসুবিধা হইতে পারে কিন্তু অন্য সময়ে গেলে অল্প ভাড়ায় থাকিবার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায়। বের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত রাস্তা তাহার পার্শ্বের গৃহাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে পযোগী। দক্ষিনাংশেও আবাসস্থান পাওয়া যায়। বোধ হয় বর্ষাকাল স্থান বাসের পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে—শীতকাল বাসের পক্ষে ইহা ই মনোরম।

দেপোণ্ডাদের বিশেষ কোন দৌরাত্ম্য নাই। যাঁহারা ৺ গয়া ও ৺ প্রয়াগ- সা গিয়াছেন তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এখানকার িণ্ডারা তত ধনী নহেন এবং ইহারা কিঞ্চিৎ ভীরু সুতরাং দৌরাত্ম্য করি- দ্বা তত সাহস নাই।

ভ উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে তীর্থানুরক্ত হিন্দুর মন আকৃষ্ট না িতে পারে। তাঁহার কাছে এ সব বাজে কথা বলিয়া মনে হইতে পারে। গন্নাথ দেবের ও তাঁহার মন্দিরের মাহাত্ম্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে তাহা নুভূত হইবার নহে। ভাষার কি সাধ্য যে তাহা ব্যক্ত করে?

ভক্তির চক্ষে না দেখিলে প্রকৃত দর্শন হয় না। দেব দেবী প্রাতে উঠিয়া দন্তমার্জ্জন মুখ প্রক্ষালন ও প্রাতঃস্নান করিলেন তৎপর পূজাদি হইল তৎপর বিবিধবার ভোগ হইল—সন্ধ্যার সময়ে কর্পূর আরতি হইল—মোহন বশে তাঁহারা সজ্জিত হইলেন এবং শেষে শয়ন করিলেন—এ অভিনয়ে ভক্তিহীন দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ হইবে কেন? তিনি হয়ত অভিনয় দেখিতে দখিতে মন্দিরের অশ্লীলতার কথা স্মরণ করিয়া বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু দেখুন বিশাল মন্দিরের প্রত্যেক স্থান হইতে ভক্তির তুফান উঠিতেছে—কত মধুর সঙ্গীতের প্রবাহ যাইয়া দেব দেবীর চরণ প্রক্ষালিত করিতেছে। দেব! তোমার নাকি মূর্ত্তি তত সুন্দর নহে—কিন্তু ঐ যে তোমার ললাটের

মণি জ্বলিয়া উঠিল—তুমি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে শোভমান হইয়া ভক্তমণ্ডলের সার্থক করিলে। ঐ দেখ মন্দিরের এক পার্শ্বে এক বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া 'প্রাণ 'প্রাণনাথ' বলিয়া কি যেন কি ধরিবার জন্য কি যেন কি হৃদয়ে ধারণ বার জন্য উন্মত্তা হইয়া নৃত্য করিতেছে। নয়ন যুগলে আনন্দাশ্রু বহি বাহুযুগল জগন্নাথের দিকে প্রসারিত রহিয়াছে। কে বলিবে যে এই বিধবা দুঃখিনী—না না—বিশ্বপতিকে যে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য উ সে বৃদ্ধা কেন হইবে? বিধবা কেন হইবে? দুঃখিনী কেন হইবে? তা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী আর কে আছে? ঐ শুন চারিদিক হইতে "জয় জগন্নাথ" রবে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। সহসা ভক্ত নয়ন মুদ্রিত করি —দেব দেবী সহ মন্দির কোথায় বিলীন হইয়া গেল,—অনন্ত শূন্যে ও ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল—সহসা শান্তির রাজ্যে সৌন্দর্য্যের আলোক প্র হইল এবং তদালোকে যোগেশ্বরের সচ্চিদানন্দরূপ সমুজ্জ্বল হইয়া ভা প্রবাহে দিগন্ত ভরিয়া গেল। তীর্থ পর্য্যটক বুঝিলেন তীর্থে আসিয়া তাঁ কি লাভ হইল।

ওঁ

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলা